সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে
ডাঃ দেবপ্রসাদ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩২০
দ্বিতীয় সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৫৭

মুদ্রক শ্রীপরেশচন্দ্র বসু
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১।১ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

প্রিয়সুহৃদ্

শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র

প্রেমাস্পদেষু—

কৃষ্ণকুমার,

কিশোর বয়সের সুমধুর স্মৃতির সঙ্গে সর্বাগ্রে তোমাকেই মনে পড়ে; ধর্মজীবনের প্রথম পদবিক্ষেপে তুমিই আমার প্রিয় সঙ্গী ছিলে; আর যখন সংশয়তিমির-মধ্যে বিশ্বাসের ক্ষীণ রেখা ঈষদ্ ব্যক্ত হইতেছিল, তখনও তোমার কাছেই সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলাম; তাহা স্মরণ করিয়াই আমার ক্ষুদ্র জীবনের এই স্মৃতি-গ্রন্থ—তোমার আমার প্রাণতুল্য ব্রাহ্মসমাজের এই পুণ্যকথা—তোমাকেই অর্পণ করিলাম।

তোমার

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ

তিন বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থের মুদ্রন আরম্ভ হয়; মস্তিষ্কের গুরুতর পীড়াবশত ধীরে ধীরে কার্য চলিতেছিল; কিন্তু গত বৎসর একেবারেই বন্ধ ছিল। অতঃপর আর কর্মক্ষম হইবার আশা নাই দেখিয়া রুগ্নদেহে অতি কষ্টে গ্রন্থ শেষ করিতে হইল। শেষভাগে বহু ঘটনা পরিত্যক্ত হইল, যাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিতে হয়, তাহা আর লেখা গেল না। ময়মনসিংহ জেলা ব্রাহ্মসমাজের অতি বিস্তৃত কার্যক্ষেত্র; এই জেলা হইতে ১২ জন ব্রাহ্ম প্রচার কার্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন; তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে দিতে ইচ্ছা ছিল, কেহ কেহ দয়া করিয়া লিখিয়াও দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিকূলতায় সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। এই গ্রন্থসংসৃষ্ট প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রতিকৃতি দিবার বাসনা ছিল, তাহাও অপূর্ণ রহিয়া গেল। পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, আমার শ্রদ্ধাস্পদ ধর্মবন্ধু শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্মদাস বসু, বাবু মধুসূদন সেন ও ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ এবং স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান গুরুদাস চক্রবর্তী, রজনীকান্ত গুহ ও গগনচন্দ্র হোম এই গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক সহায়তা করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ
ব্রাহ্ম-পল্লী
১০ শ্রাবণ, ১৩২০

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন

শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের আত্ম-জীবনস্মৃতি 'ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর' গ্রন্থখানি বহুদিন দুষ্প্রাপ্য থাকায় ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল। পূর্ববাংলার বিশেষত ময়মনসিংহ জেলার ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ইতিহাস বিষয়ে ইহা অতি মূল্যবান গ্রন্থ। নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া গভীর ধর্মজীবন লাভের ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ভগবৎনির্ভরশীল গৃহস্থ জীবনের সুন্দর চিত্র এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্মপিপাসু ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

এই সংস্করণে ৩টি পরিশিষ্ট এবং গ্রন্থকারের একটি আলেখ্য যোজিত হইয়াছে।
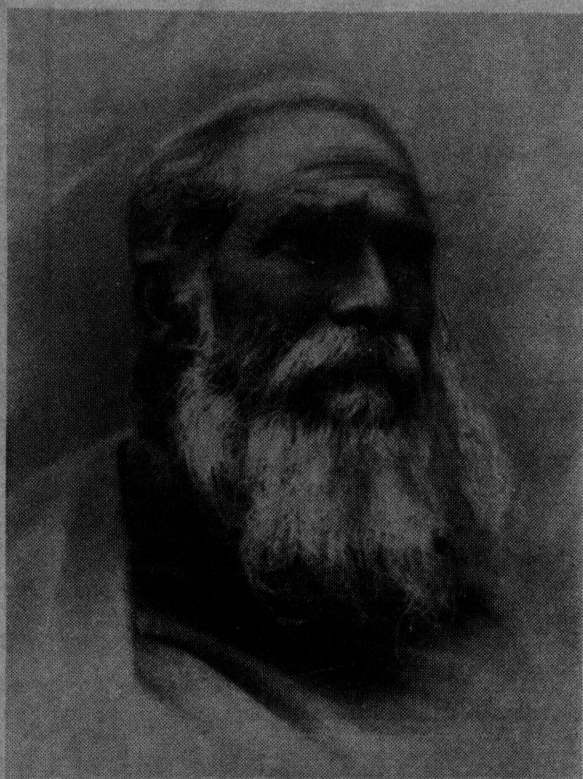
পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ

জন্ম : ১ এপ্রিল, ১৮৫১ মৃত্যু : ২৩ জুলাই, ১৯৩৮

ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর

উপক্রমণিকা

বংশপরিচয়

আমাদের বংশের আদি পুরুষ লালা চন্দ্রশেখর চন্দ উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। মোগলরাজত্বের সময়ে তিনি কোন উচ্চতর রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। শেষ বয়সের কোন ঘটনাবশত আলাপসিংহ পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া পূর্ববঙ্গে আগমন করেন। আলাপসিংহ পরগণা তখন জঙ্গলময় ও হিংস্র জীবজন্তুর আবাসভূমি ছিল। চন্দ্রশেখর স্বীয় জমিদারীতে বসতি না করিয়া বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমপ্রান্তস্থিত জনাই নদীর তীরবর্তী লুকিয়া গ্রামে বাসস্থান নির্ধারণ করেন। এই লুকিয়া গ্রাম তৎকালে বড়বাজু পরগণার মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং আমাদের বংশ 'লুকিয়ার চন্দ' নামে পরিচিত হইয়াছিল।

লালা চন্দ্রশেখর চন্দের পরবর্তী ৫ম পুরুষ রায় বিনোদরাম চন্দ চৌধুরী অতিশয় তেজস্বী পুরুষ এবং পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে আলাপসিংহ পরগণার ৸৹ আনা অংশ চন্দ বংশের এবং ।৹ আনা অংশ পুটিজানার রায় মহাশয়দিগের হস্তগত ছিল।* যাহা হউক, বিনোদরাম অসাধারণ শাসনগুণে জমিদারীর বিলক্ষণ উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। জমিদারীর আয়ও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শুনিয়াছি, আলাপসিংহের কাঠাল নামক

* ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আমার প্রিয়ছাত্র শ্রীমান কেদারনাথ মজুমদার এম, আর, এ, এস, তৎপ্রণীত 'ময়মনসিংহের বিবরণ' গ্রন্থে আলাপসিংহ পরগণা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"এই পরগণা পূর্বে জঙ্গলবাড়ীর ২২ পরগণাভুক্ত ছিল। অতঃপর টীকরার জমিদারদিগের জমিদারীভুক্ত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাহা পুনরায় বড়বাজুর চন্দ ও পুটিজানার রায়দিগের হস্তগত হয়। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে ১১৩২ ও ১১৩৩ বঙ্গাব্দে মুক্তাগাছার বর্ত্তমান জমিদার বংশের পূর্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য পুটিজানার রামচন্দ্র ও ভবানীদেব রায় হইতে ।৵৹ আনা ও লুকিয়া গ্রামনিবাসী বিনোদরাম চন্দ হইতে ।।৵৹ আনা জমিদারী দুই খণ্ড কওয়ালা সম্পাদনে ক্রয় করেন।" এখানে অংশ সম্বন্ধে আমাদের লেখার সঙ্গে অনৈক্য আছে। আমাদের বংশের বয়োবৃদ্ধদের মুখে ঐরূপ শুনিয়াছি। সম্ভবতঃ কেদারবাবুর লেখাই সত্য, কারণ তিনি সরকারী কাগজ পত্র হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

বৃহৎ গ্রামে যে আয় হইত, তাহার সমস্তই আমাদের কুলদেবতা গোবিন্দ বিগ্রহের সেবায় ব্যয়িত হইত। এই বিনোদরামের সময়ে লুকিয়ার চন্দ বংশের যেমন উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, তেমনি ইঁহার কার্যদোষেই এই বংশের গৌরব-রবি চিরকালের জন্য অস্তগত হইল।

কথিত আছে, বিনোদরাম অতিশয় বিদ্যানুরাগী, দানশীল এবং বিলাসী ও মদ্যপায়ী ছিলেন। তিনি জমিদারীর টাকা অজস্র ব্যয় করিতেন, কিন্তু নবাব সরকারে দেয় রাজস্ব পরিশোধ করিতেন না। ক্রমে বহু টাকা বাকী পড়িয়া গেল। এই সময়ে মোগল রাজত্বের চরম দশা উপস্থিত হইয়াছিল; মুরশিদাবাদের নবাব একরূপ স্বাধীন হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইচ্ছামত জমিদারদিগকে উৎপীড়ন বা পদচ্যুত করিতেন, বিনোদরামের ন্যায় তেজস্বী পুরুষ নবাবকে গ্রাহ্য করিলেন না; কিন্তু তাহার ফল অতিশয় ভয়ানক হইল।

বহুদিন বিনা করে জমিদারী ভোগ করিয়া বিনোদরামের মনে স্বাধীন ভাবের উদয় হইল। নবাবের লোক আসিলে তাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এই ধৃষ্টতা নবাবের কর্ণগোচর হইলে তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। তখন বিনোদরাম প্রাচীন ও অসমর্থ; তিনি পলায়ন করিয়া স্বীয় জমিদারী আলাপসিংহ পরগণায় গমন করিলেন; সৈন্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিল।

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য নামক একজন বুদ্ধিমান ও পদস্থ ব্রাহ্মণ, রাজসাহী জেলার কোনও রাজ-সরকারে কর্ম করিতেন। তাঁহার সহিত বিনোদরামের বন্ধুতা ছিল। বিনোদরাম জমিদারী ও প্রাণ রক্ষার উপায় না দেখিয়া এই শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের নিকট আলাপসিংহের বিশাল জমিদারী (দাস দাসী হাতী ঘোড়া ইত্যাদি সহ) দশহাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়ই বর্ত্তমান মুক্তাগাছার জমিদার-বংশের আদি পুরুষ। বিনোদরাম চন্দ হইতে গ্রন্থকার পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষ এবং শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য হইতে মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর পর্যন্ত ছয় পুরুষ অতীত হইতেছে।*

---

* আমরা বাল্যকাল হইতে বংশের বয়োবৃদ্ধদিগের মুখে যেরূপ বিবরণ শুনিয়া আসিয়াছি মূলে তাহাই লিখিত হইল। মুক্তাগাছার সুশিক্ষিত জমিদার স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র

জমিদারী গেলেও চন্দবংশের অবস্থা তেমন হীন হয় নাই; লুকিয়া এবং তৎপার্শ্ববর্তী ৭ খানি গ্রাম ইঁহাদের তালুক ছিল। "তালুক রামনাথ চন্দ" নামে কতকগুলি মহাল এখনও ময়মনসিংহের কালেক্টরীর তৌজিভুক্ত দেখা যায়। এই রামনাথ চন্দ বিনোদরাম চন্দ চৌধুরীর পিতা। জমিদারী অপেক্ষাও এই তালুকগুলির প্রতিই ইঁহাদের অধিক মমতা ছিল। কিন্তু সর্বগ্রাসী কালপ্রবাহে সে সকল তালুক ও বিশাল অট্টালিকাপূর্ণ লুকিয়ার "চন্দবাড়ী" কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। লুকিয়ার নীচে ক্ষুদ্র জনাই নদী প্রবাহিত হইত, পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি, বাল্যকালে তাঁহারা এই নদী সাঁতারিয়া পার হইতেন, এবং পরপারবর্তী ষাট্টিয়া গ্রামের ঘটক মহাশয়েরা স্নান সময়ে লুকিয়ার ঘাটে আসিতেন। সেই ক্ষুদ্র স্রোত চিলমারীর নিকটস্থ স্থানে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত ছিল, কালক্রমে ব্রহ্মপুত্রের মহাপ্রবাহ এই ক্ষুদ্র খাতে প্রবাহিত হইয়া "দাওকোবা" নামে ভীমকায় নদীর সৃষ্টি হইল। ইহাই ময়মনসিংহের পশ্চিম প্রান্তে প্রবাহিত সুবিশাল যমুনা নদী। এই নদীস্রোতে কত লোকের সর্বনাশ হইয়াছে এবং কত প্রাচীন বংশের ধনসম্পত্তি ও কীর্তিকাহিনী পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে।*

নদী-প্রবাহে ভূসম্পত্তি সকলই ভাসিয়া গেল; কিন্তু বংশাভিমান গেল না। আমার জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠতাত মাধবচন্দ্র চন্দ রায় তখন বংশের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার ইচ্ছাক্রমে নির্ধারিত হইল, যমুনার চরায় যেখানে নিজ

আচার্য মহাশয়ের নিকট বিনোদরাম চন্দ চৌধুরী প্রদত্ত পারস্য ভাষায় লিখিত জমিদারী বিক্রয় কবালা ছিল। তিনি ঐ সম্বন্ধে অনেক গল্প আমাদের নিকট বলিতেন এবং সেই বংশের সন্তান বলিয়া আমাকে বিলক্ষণ স্নেহ ও আদর করিতেন।

* "১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রেনেল সাহেব বঙ্গদেশের মানচিত্র প্রস্তুত করেন। ঐ মানচিত্রে যমুনার উল্লেখ নাই। ইহার ৩০ বৎসর পর বুকানন হেমিল্টন এই জেলার ভূমি জরিপ করেন, তাঁহার লিখিত বিবরণে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনার বিষয় প্রথম অবগত হওয়া যায়, সুতরাং এই ত্রিশ বৎসর মধ্যে কোন সময়ে যমুনার উৎপত্তি অনুমান করা যাইতে পারে।" ময়মনসিংহের বিবরণ ৬৩ পৃষ্ঠা। আমার পিতৃদেব ১৮৬৮ সনে প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন, তিনি বাল্যকালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জনাই নদী দেখিয়াছেন, সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যমুনার উৎপত্তি হইয়াছে। উদ্ধৃত বিবরণেও তাহাই দেখা যাইতেছে। বস্তুত যমুনার বয়স শত বৎসরের অধিক নহে।

তালুক পাওয়া যায় সেখানেই বাস করিতে হইবে, কদাপি পরের ভূমিতে প্রজা হইয়া বাস করা হইবে না। এই প্রতিজ্ঞানুসারে বহুদিন যমুনার চরায় চরায় বাস করা হইল। কিন্তু নিয়তির এমনই আক্রোশ যে যেখানেই বাড়ী করা যায়, দুই এক বৎসর মধ্যেই সেস্থান নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। ইহাতে এই বংশের সাংসারিক অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িল। ধনসম্পত্তি লোকজন ক্রমে ক্রমে সকলই গেল, কেবল রহিলেন একমাত্র কুল-দেবতা গোবিন্দ বিগ্রহ। এই বিগ্রহ এখনও আমাদের কোন জ্ঞাতি-পরিবারে নিত্য পূজিত হইতেছেন। তখন হইতেই লোকে আমাদের বংশের প্রসঙ্গে বলিত, "গোবিন্দ ভরসা করেন চন্দ মশায়রা।"

এইরূপ অবস্থায় যমুনার চরভূমি ফুলবাড়ী নামক গ্রামে বাঙ্গলা ১২৫৭ (১৮৫১ খৃঃ) ৭ই চৈত্র আমার জন্ম হয়। পিতা স্বর্গীয় জগন্নাথ চন্দ মহাশয় অতিশয় সরল, শান্ত ও ধর্মনিষ্ঠ লোক ছিলেন। তাঁহার ছয় পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। আমি অষ্টম সন্তান। বাল্যকালে আমরা ঘোরতর দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। আর জ্ঞাতিগণের সঙ্গে যমুনার চরায় চরায় ভ্রমণ করা অসম্ভব দেখিয়া পিতৃদেব বড়বাজু পরগণার বাঙ্গড়া নামক গ্রামে যাইয়া আমার পিসীমার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গ্রামের তৎকাল-প্রসিদ্ধ রামদুলাল সেন আমার পিসাত ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে আমাদের জন্য পৃথক বাড়ী প্রস্তুত হইল, আমরা তথায় বাস করিতে লাগিলাম। এই গ্রামেই আমার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। ৭ম বৎসর বয়ক্রম সময়ে উক্ত গ্রামনিবাসী ধর্মানুরক্ত ও সুপণ্ডিত স্বর্গীয় গোলকচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকটে আমার বিদ্যারম্ভ হয়। ইনি অতিশয় সুশ্রী, সাধু-প্রকৃতি ও গম্ভীর স্বভাবের লোক ছিলেন, সকলেই ইঁহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। বিদ্যারম্ভ দিনে ইনি আমার মস্তকে হাত রাখিয়া বিশেষ ভাবে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পিতৃদেবকে আশান্বিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সে পবিত্র মূর্তি এখনও স্মরণ আছে। এই সময়ে আমরা তিন ভাই এবং দুই ভগিনী জীবিত ছিলাম। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় বিদেশে থাকিয়া বিদ্যা-শিক্ষা করিতেন।

এই গ্রামে বাস করিবার সময়ে যে সকল ঘটনা হয়, তন্মধ্যে দুইটী স্মরণ-যোগ্য। আমি ৭ম বৎসর বয়সে দুরন্ত জ্বরপ্লীহা রোগে আক্রান্ত হইয়া তিন

বৎসর শয্যাগত থাকি। পিতৃদেব এবং অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় বিদেশে বাস করিতেন ; মা একাকিনী গৃহে থাকিয়া এই তিন বৎসর আমাকে নিয়া কতই ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। হাতে টাকা নাই যে তদ্বারা চিকিৎসা করাইবেন, কেবল পাগলিনীর ন্যায় লোকের দ্বারস্থ হইতেন এবং যে যাহা বলিত তাহাই করিতেন। ক্রমে রোগ চরম সীমায় উপস্থিত হইল, জীবনের কোন আশাই রহিল না। আমার বেশ স্মরণ আছে, পীড়ার কঠিন অবস্থায় কেবল নানা দেবদেবীর মূর্তি দর্শন করিতাম এবং স্বপ্নে যেন এক অজ্ঞাত দূরদেশে চলিয়া যাইতাম। এমন সময়ে একদিন একজন বাউল আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তখন পুরুষ কেহই বাড়ীতে ছিলেন না, মা লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি অনেক আশ্বাস দিয়া আমাকে ঔষধ না দিয়া "গোঁসাইর নামে" রাখিতে বলিলেন এবং কতকগুলি প্রক্রিয়া বলিয়া দিলেন। বিধাতার কৃপায় কয়েক মাস মধ্যেই আমি রোগমুক্ত হইয়া উঠিলাম।

দ্বিতীয় ঘটনা আমার কনিষ্ঠা ভাগিনীর বিবাহ। সারদার তখন ৫ কি ৬ বৎসর বয়স ; দারিদ্রবশত আর্থিক কোন প্রত্যাশা পাইয়াই হউক বা ধনীঘরের ভাল ছেলেটী দেখিয়াই হউক, বাবা একটি ১২ বৎসরের ছেলের সহিত সারদার বিবাহ দিলেন। নিয়তির এমনি গতি, সম্বৎসর মধ্যেই সারদা বিধবা হইল। সে তখন দুধের শিশু বলিলেই হয়। সারদা বড় একটা কিছু বুঝিল না, কিন্তু আমার সেই বয়সেই তাহার জন্য এমনই প্রাণ আকুল হইয়া পড়িল যে সে কষ্ট বহু দিন ভুলিতে পারি নাই।

ওদিকে আমাদের জ্ঞাতিগণের অবস্থা ক্রমে ফিরিতে লাগিল। আমাদের নিকটতম জ্ঞাতি রাজনাথ চন্দ মহাশয় ওকালতি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জামালপুরে কার্য করিতে লাগিলেন। কালে তিনি একজন প্রসিদ্ধ উকীল হইয়াছিলেন। আমার মধ্যম ভ্রাতা তাঁহার কাছে থাকিয়া আইন শিক্ষা করেন এবং পরীক্ষা দিয়া মোক্তারি সনদ প্রাপ্ত হন।

পূর্বোক্ত মাধবচন্দ্র চন্দ মহাশয়ের তিন পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন। সর্ব-জ্যেষ্ঠ হরচন্দ্র চন্দ ময়মনসিংহে যাইয়া সুপ্রসিদ্ধ আনন্দমোহন বসুর পিতা স্বর্গীয় পদ্মলোচন রায় মহাশয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন। তিনি ইঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। পদ্ম রায় মহাশয় আলাসদর আমিনের

ডিক্রিজারির মহরের ছিলেন। তৎকালে এই পদে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও বিলক্ষণ উপার্জন ছিল। হরচন্দ্র দাদা ইঁহার অধীনে তায়েদনবিশ হইলেন। তাহাতেও সামান্য আয় হইত না। কিন্তু তিনি উহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া গোপনে আইন পড়িয়া ওকালতি সনদ প্রাপ্ত হইলেন। তখন জজ সাহেবেরা মৌখিক পরীক্ষা নিয়া ওকালতির সনদ দিতেন। এই ঘটনা অবগত হইয়া পদ্ম রায় মহাশয় বলিলেন, হরচন্দ্র, তুমি কেন উকিল হইবে, আমি তোমাকে শীঘ্রই আমলা করিয়া দিব। ইহার কিছুদিন পরেই পেস্কারের পদশূন্য হইল, রায় মহাশয় সেই পদ লাভ করিলেন, হরচন্দ্র দাদা ডিক্রিজারির মহরের হইলেন। তাঁহার অবস্থার পরিবর্তন হইতে লাগিল। তিনি সর্ব প্রথমেই বাঘিলের মিত্র মহাশয়দের নিকট হইতে কাগমারী পরগণার অন্তর্গত নলসোঁধা গ্রাম পত্তনি গ্রহণ করিলেন, এবং জ্ঞাতি পুরোহিত ও পূর্বকালের অনুগত প্রজাদিগকে তথায় আনিয়া স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইলেন। জ্ঞাতিগণের মধ্যে রাজনাথ চন্দ অন্যত্র তালুক ক্রয় করিয়া বসতি করিতেছিলেন, কেবল আমরাই নিরাশ্রয় ছিলাম। হরচন্দ্র দাদা আমার পিতৃদেবকে সযত্নে আনয়ন করিয়া নিষ্কর ভোগোত্তর ভূমি দান করিলেন এবং জীবিকার জন্যও যথেষ্ট সহায়তা করিতে লাগিলেন। ফলত তিনি যেমন প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন, তেমনি দেবপূজা, অতিথিসেবা, স্বজনপালন প্রভৃতি কার্যে মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন।

হরচন্দ্র চন্দ মহাশয়ের বিধবা ভগিনী আমার "বড়দিদি" আমাকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন। আমি তাঁহার কাছেই থাকিতাম, তাঁহাদের গৃহকেই আপন গৃহ মনে করিতাম। এই পুণ্যবতী মহিলার আদর্শ জীবন, আমার ক্ষুদ্র জীবনে আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইনি শৈশবে বিধবা হইয়া চিরজীবন ভ্রাতৃ-গৃহে কর্তৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম কর্ম ও পরোপকার সাধনই ইহার জীবনের কার্য ছিল। ইনি বয়সে আমার মাতৃতুল্যা ছিলেন এবং স্নেহমমতায় আমাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; ইঁহার আদেশ পালনে আমার কতই অনুরাগ ও তৃপ্তি হইত; রোগশয্যায় ইঁহার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া কতই শান্তিলাভ করিতাম, তাহা স্মরণ করিলে এখনও অশ্রুপাত হয়। ঠাকুরপূজা, অতিথিসেবা ও নানাবিধ ব্রতাদিতে আমি তাঁহার সহচর ছিলাম; প্রত্যুষে উঠিয়া ফুল তুলিয়া দিতাম, আরতির সময় ধূপ ধুনা জ্বালাইয়া দিতাম; অতিথি-ঘরের সমস্ত সিধাপত্র তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বহন করিতাম।

গোবিন্দের আঙ্গিনায় নিত্য হরিসংকীর্ত্তন হইত। প্রজাগণ যে কেহ হরির লুট দিত, তাহা গোবিন্দের আঙ্গিনায় আনিয়া দিত, কাজেই আমাদের বাড়ীতে নিত্যোৎসব লাগিয়াই থাকিত। তদ্ভিন্ন দোল, দুর্গোৎসব, কালীপূজা প্রভৃতি মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। বালকদিগের মধ্যে আমি এই সকল কার্যে অতিশয় উৎসাহী ও অগ্রগণ্য ছিলাম।

জেঠাত ভ্রাতাদিগের মধ্যে মধ্যমদাদা ঈশানচন্দ্র চন্দ মহাশয় বাড়ীতে থাকিয়া সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ইনি অতিশয় ধর্মানুরাগী ও বিদ্যানুরক্ত ছিলেন। আমার পিতৃদেব এ সময়ে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি বৈষয়িক কার্যে ইঁহাদের যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। তাঁহার সাধুতায় লোকের অটল বিশ্বাস ও আস্থা ছিল। হরচন্দ্র দাদার ১০।১২ হাজার টাকা কর্জদাদন ছিল, ইহার সমস্ত ভারই পিতৃদেবের উপর ছিল। তিনি চিরদিন ঘোর দারিদ্রে জীবন কাটাইয়াছেন, তথাপি পরের অপচয় করিয়া কপর্দক গ্রহণ করেন নাই। মাতৃদেবীও সংসার বিষয়ে একরূপ উদাসীন ছিলেন; অল্পেই তুষ্ট থাকিতেন। তাঁহার দুইটি কন্যাই বাল-বিধবা; এই কষ্টে তিনি সর্বদা বিষণ্ণ ও নীরব থাকিতেন; কোন উৎসব আমোদে যোগ দিতেন না, কাহারও বাড়ীতে যাইতেন না।

দশ বৎসর বয়সে আমি রোগমুক্ত হইয়া লেখাপড়া রীতিমত আরম্ভ করিলাম। ঈশানচন্দ্র চন্দ মহাশয় পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্যে ও পারস্যভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; গ্রামস্থ অন্যান্য বালকদিগের সঙ্গে আমিও তাঁহার কাছে লেখাপড়া শিক্ষা করিতাম। দুই তিন বৎসরে বাঙ্গলা লেখাপড়া মোটামুটি শিক্ষা করিলাম এবং দুইখানি পারস্য পুস্তকও পাঠ করিলাম। সন্ধ্যাকালে পিতার নিকট বসিয়া চাণক্যশ্লোক ও অন্যান্য নীতি-কথা শিক্ষা করিতাম। আমাদের পরিবারে প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথি ও ধর্মগ্রন্থের যথেষ্ট আলোচনা হইত; রামায়ণ, মহাভারত, কাশীখণ্ড, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি সর্বদা পঠিত ও আলোচিত হইত; সমস্ত শ্রাবণ মাস ভরিয়া নারায়ণদেবের পদ্মপুরাণ পঠিত ও গীত হইত। এ সকল বিষয়ে আমার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল। যে বাড়ীতেই সত্যনারায়ণের পূজা হইত, আমি পুঁথি পড়িতাম। দাশুরায়ের পাঁচালির বহু স্থান আমার কণ্ঠস্থ ছিল। পাড়ার বিধবা ঠাকুরাণীরা সন্ধ্যার পর আমাদের গৃহে মিলিত হইতেন, তাঁহারা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কেহ

মালাজপ করিতেন, কেহ পইতা তুলিতেন, আর আমি তাঁহাদের কাছে বসিয়া রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ সুর করিয়া পড়িতাম। এজন্য তাঁহাদের নিকট আমার যথেষ্ট আদর ছিল। আমার বড়দিদি আমার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া ছাপার পুঁথি পড়িতে শিখিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গলায় নূতন গদ্য সাহিত্য বাহির হইয়াছে মাত্র; তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতি ও সীতার বনবাস শুনিতে বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন; এবং নিজে ঐ সকল পুস্তক পড়িতে পারিবেন বলিয়াই লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন।

আমাদের পরিবারে তৎকাল-প্রচলিত শিক্ষা ও ধর্মের বিলক্ষণ চর্চা ছিল। বাড়ীতে বিগ্রহ থাকাতে নিত্যই ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান হইত। একজন ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ ঠাকুরপূজা করিতেন। তিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ ও স্তোত্রাদি আবৃত্তি করিতেন; আমি না বুঝিলেও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিতাম। কীর্তন, যাত্রাগান, কথকতা প্রায়ই হইত। নটাখোলার কালী বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের কথকতার সুমধুর ধ্বনি এখনও যেন কর্ণে লাগিয়া রহিয়াছে। ওদিকে পারস্য ভাষার চর্চা সর্বদা শুনিতে শুনিতে হাফেজ প্রভৃতির অনেকগুলি কবিতা আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। পারস্য গ্রন্থের নীতিপূর্ণ গল্প শুনিতে বড়ই ভাল লাগিত। বাবা ছোট ছোট বাঙ্গলা শ্লোক মুখে মুখে আমাদিগকে শিখাইতেন। শ্লোকগুলি বড়ই মধুর; তাহার কয়েকটি আজও মনে পড়ে।*

* প্রাচীন সাহিত্য হিসাবে এ গুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। তাই দুই একটি লিপিবদ্ধ করিলাম। যথা—

(১)

বলরাম চলে, বনমালা গলে
শ্রুতি-শোভিত সুন্দর লাল ফুলে,
নম রোহিনী-নন্দন পদতলে।

(২)

নন্দের নন্দন, নীলমণি,
নব-নাগর সুন্দর, চন্দ্র জিনি;
গৃহকর্ম শতং সখি থাক ভবে, (?)
চল হেরি যেয়ে হরি কুঞ্জবনে।

হরচন্দ্র চন্দ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের অতি প্রিয় "ছোড়দাদা" মহেশচন্দ্র চন্দ তৎকালে ময়মনসিংহে থাকিতেন। তিনি আরবী ও পারসী-ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এই পাণ্ডিত্য তাঁহাকে সংসারে উদাসীন ও ধর্মে অনুরক্ত করিয়া তোলে। বিদ্যাচর্চা এবং বহুপ্রকার কঠোর ধর্মসাধন করিয়াই তিনি দিন কাটাইতেন। প্রত্যহ ৫।৬ ঘণ্টা আহ্নিক পূজায় অতিবাহিত হইত; পূজান্তে বুকের রক্ত দিয়া ১০৮ বার দুর্গানাম বিল্বপত্রে লিখিতেন; স্বহস্তে রন্ধন করিয়া হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। ময়মনসিংহের বাসায় একটি পঞ্চবটী ছিল, উহাই ছিল তাঁহার সাধনক্ষেত্র। তিনি পূজার বন্ধে বাড়ীতে আসিতেন, এবং আমাদিগকে নানারূপ শিক্ষা প্রদান করিতেন। তিনি প্রত্যহ ইষ্টপূজার পরে এক একটি মালসী গান রচনা করতেন, আমি অতিশয় আগ্রহে উহা গাহিতাম। তাঁহার স্নেহ ও দৃষ্টান্ত আমার পক্ষে পরম হিতজনক হইয়াছিল। মহেশচন্দ্র চন্দ মহাশয় পূর্ণবয়স্ক হইয়াও বিবাহ করিলেন না, বিষয়কর্ম করিলেন না; ক্রমে তাঁহার বৈরাগ্য এত বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে যাইয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলেন। কয়েক বৎসর পরে কোন পরমহংসের উপদেশে পুনরায় গৃহে আগমন করেন এবং দারপরিগ্রহ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে একটি কর্ম গ্রহণ করেন। তথায় কালীঘাট গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। ৭০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ঐ কার্য করিয়া পেনশন নিয়াছিলেন। অল্পদিন হইল প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। শেষ দিন পর্যন্তও তাঁহার সাধনভজনের বিরাম হয় নাই। আহারাদির কঠোর নিয়ম চিরকাল একরূপই ছিল।

এই সময়, বোধ হয় ১৮৬২ সালে, আমাদের গ্রামের নিকটবর্তী পাথরাইল

(৩)

আগে চলে বলরাম, পিছে হৃষিকেশ,
গোধূলি লেগেছে অঙ্গে, বেশ বেশ বেশ।

(৪)

গো-কোটী দানে গ্রহণে চ কাশী,
মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী;
সুমেরু সমতুল্য হিরণ্য দানে,
নহি তুল্য নহি তুল্য গোবিন্দ নামে।

নামক সমৃদ্ধ গ্রামে রায় মহাশয়দের বাটীতে একটী বাঙ্গলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন আমার বয়ক্রম ১২ বৎসর অতীত হইয়াছে। পিতা বলিলেন, এখন আর পুরাতন শিক্ষায় ফল নাই, স্কুলে শিক্ষা করাই উচিত। তদনুসারে আমি উক্ত স্কুলের সর্ব নিম্নশ্রেণীতে ভর্তি হইলাম। তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গলা লেখাপড়া আমি ভালই শিখিয়াছিলাম, কিন্তু স্কুলের ধরণে শিক্ষা হয় নাই বলিয়া বিদ্যাসাগর কৃত বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ আরম্ভ করিলাম। বিক্রমপুর মধ্যপাড়া নিবাসী ৺প্রসন্নকুমার গুপ্ত মহাশয় এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া আসিলেন; বাঙ্গলা ভাষায় তাঁহার বেশ অধিকার ছিল, ইংরাজী সংস্কৃতও কিছু কিছু জানিতেন, সুতরাং তৎকালীন গ্রাম্য স্কুল মধ্যে তাঁহার বেশ প্রতিপত্তি ও সম্মান হইয়াছিল। পাথরাইল নিবাসী কালীনাথ সরকার মহাশয় ঐ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার নিকটেই আমার প্রথম স্কুলশিক্ষা আরম্ভ হয়।* এক বৎসর মধ্যে আমি শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ, বোধোদয় ও চরিতাবলী শেষ করিয়া চারুপাঠের শ্রেণীতে প্রবেশ করিলাম। তৎপর আরও দুই বৎসরে ঐ স্কুলের ২য় শ্রেণীর পড়া শেষ করিয়া বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

প্রধান শিক্ষক গুপ্ত মহাশয় ছাত্রদিগকে বড়ই ভালবাসিতেন, দুরস্থ ছাত্রদিগকে নিজের বাসায় রাখিয়া শিক্ষা দিতেন। বর্তমানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ নবদ্বীপচন্দ্র দাস, টাঙ্গাইলের উকীল পরলোকগত কৃপানাথ চৌধুরী প্রভৃতি তখন পাথরাইল স্কুলে উচ্চশ্রেণীতে পাঠ করিতেন, তাঁহারা আমাকে খুব ভালবাসিতেন এবং নানারূপে সহায়তা করিতেন। পাথরাইল গ্রামের সকল বাড়ীতেই আমার বিলক্ষণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল; সকল পরিবারেই আমি আত্মীয় বালকের ন্যায় গৃহীত হইতাম। ঠাকুরাণীরা পেয়ারা কুল প্রভৃতির জন্য আমার যথেষ্ট খাতির করিতেন। এইরূপে পাথরাইল

* কালীনাথ সরকার মহাশয় স্কুলে পড়েন নাই; প্রচলিত বাঙ্গলা লেখাপড়া বেশ জানিতেন। চতুষ্পাঠীতে যেরূপ সংস্কৃত পড়াইতে দেখিয়াছিলেন, আমাদিগকেও সেই ধরণে পড়াইতেন। শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগের এইরূপ ব্যাখ্যা আমরা শিখিয়াছিলাম। যথা: সুশীল—সচ্চরিত্র, সুবোধ—জ্ঞানবান, বালক—শিশু, সর্বদা—সর্বক্ষণ, লেখা—লিপিকরা, পড়া—পাঠকরা, করে—কৃত হয়॥

স্কুলে আমার প্রাথমিক শিক্ষা এবং অতি সুখের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইল।

বাল্যকালে যেমন বিদ্যা ও ধর্মশিক্ষার উত্তম সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেইরূপ গ্রাম্য কুসংসর্গে কতকগুলি দুর্নীতি এবং কদভ্যাসও চরিত্রে প্রবেশ করিয়াছিল, যাহার জন্য ভাবী জীবনে বহু কষ্ট ও সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। আমার আকৃতি প্রকৃতিতে এমন একটু আকর্ষণ ছিল, যাহাতে আমি সহজেই লোকের প্রীতি ও ভালবাসা লাভ করিতে পারিতাম। ইহাতে আমার লাভ ক্ষতি উভয়ই হইয়াছিল।

৺দীননাথ সেনকৃত নীতিবিজ্ঞান তৎকালে (১৮৬৫) বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ছিল। ইহা একখানি সুস্পষ্ট ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপাদক উত্তম গ্রন্থ। আমি পাথরাইল স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঐ পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এক দিন ক্লাশে ঐ পুস্তক পড়া হইতেছে, এমন সময় স্কুলের সম্পাদক বাবু দ্বারকানাথ ঘটক মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়া স্বয়ং আমাদিগকে পড়াইতে লাগিলেন। সে দিন "ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ" নামক বিষয়টী পড়া হইতেছিল। দ্বারিকবাবু আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে একখানি নীতি-বিজ্ঞান গ্রন্থ পুরস্কার প্রদান করেন। আমার ঐ পুস্তক ছিল না, অন্যের পুস্তক দেখিয়া পড়িতাম। উক্ত ঘটক মহাশয় ময়মনসিংহে কর্ম করিতেন এবং ব্রহ্মসভার সভ্য ছিলেন। গ্রামে তাঁহাকে লোকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিত। তিনি আমাকে মধ্যে মধ্যে তাঁহার গৃহে ডাকিয়া নিতেন এবং নানা বিষয় উপদেশ দিতেন। একদিন তাঁহার মুখে "মন রে ভ্রান্তি তোমার, আবাহন বিসর্জন কর তুমি কার" এই গানটী শুনিয়াছিলাম। গানটী বেশ লাগিয়াছিল, বাড়ীতে যাইয়া ঐ গানটী গাহিতেছিলাম। বাবা শুনিয়া বলিলেন, উহা নাস্তিকের গান, ও গান গাহিতে নাই। এই হইতেই আমার মনে ধর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হইল। পূর্বে বলিয়াছি, আমার দেব-দেবীতে বিশেষত গৃহদেবতা গোবিন্দবিগ্রহে অতিশয় ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। শৈশবে যেমন বালক বালিকারা দুই এক জনকে অজ্ঞাতসারে প্রাণ দিয়া ভালবাসে, আমি ঐ মূর্তিকে তেমনি ভালবাসিতাম। বাড়ী হইতে কোথাও গেলে ঐ মূর্তির জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইত, গৃহে ফিরিয়া সর্বাগ্রে ঠাকুর আঙ্গিনায় যাইয়া ঐ মূর্তি দেখিতাম। আমার শৈশব জীবনে এই এক গূঢ় রহস্য

ছিল ; একথা কখনও কাহাকে বলিতাম না। যাহা হউক স্কুলে নীতিবিজ্ঞান পড়িয়া এবং দ্বারিকবাবুর মুখে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধ-যুক্তি শুনিয়া আমার মন সংশয় ও অশান্তিতে পূর্ণ হইল।

১৮৬৫ সালের আশ্বিন মাসে ঠাকুর দাদা হরচন্দ্র চন্দ মহাশয় বাড়ীতে আসিলেন। তিনি আমার শিক্ষোন্নতির সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সহরে নিয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পড়াইবেন বলিলেন। এ বিষয়ে বড় বধূঠাকুরাণী আমার প্রধান সহায় হইলেন। ইনি আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন, এবং আমার পাঠ্য পুস্তকাদি নিজে কিনিয়া দিতেন। যদিও ইঁহাদের কৃপায় আমার কোন বিষয়ে অভাব ছিল না, তথাপি আমি পার্যমানে পরের নিকট অভাব প্রকাশ করিতাম না। গোবিন্দ রায়ের ব্যাকরণসার, তারিণীচরণ-কৃত ভূগোলবিবরণ এবং সর্বাধিকারীর পাটীগণিত আমি স্বহস্তে লিখিয়া পাঠ করিয়াছি। যাহা হউক, আমার ময়মনসিংহে যাওয়াই স্থির হইল। তদনুসারে অগ্রহায়ণ মাসে বধূঠাকুরাণীর সঙ্গে নৌকাপথে ময়মনসিংহে যাত্রা করিলাম। মাণিকগঞ্জ, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ ঘুরিয়া ১৫ দিনে ময়মনসিংহে উপস্থিত হইলাম। এখন টাঙ্গাইল হইতে ময়মনসিংহে আসিতে ১৫ ঘণ্টাও লাগে না।

ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর

প্রথম অধ্যায়

সহরে আগমন ও ধর্ম্মের নূতন আলোক

১৮৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি ময়মনসিংহ নগরে আগমন করিলাম। এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে এই নগরে কৃষিপ্রদর্শনী নামে এক মহামেলা বসিয়াছিল। জেলার সমস্ত রাজা, জমিদার, তালুকদার ও নানা শ্রেণীর দর্শকগণে নগর পূর্ণ হইয়াছিল। কমিশনার সাহেবের সঙ্গে শিখ ও গোরা সৈন্য আসিয়াছিল; তাহারা জেলখানার চরে শিবির স্থাপন করিয়াছিল। প্রকাণ্ড ময়দান ঘিরিয়া প্রদর্শনীর ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল; বড় বড় চালা ঘরে বনগরু, মহিষ, ষাঁড়, হাতি ঘোড়া প্রভৃতি জন্তু বাঁধা থাকিত; স্থানে স্থানে কৃষিযন্ত্র ও বিবিধ কল প্রদর্শিত হইত। বৃহৎ দরবারগৃহে প্রত্যহ দরবার বসিত। তৎকালে এ জেলায় কেবল সুসঙ্গাধিপতিই রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন; তখনও তাঁহার রাজত্ব যায় নাই। মহারাজ প্রত্যহ সুদীর্ঘ মিছিল করিয়া হাতি ঘোড়া লোকলস্কর সহকারে দরবার-গৃহে গমন করিতেন; তাহা একটা প্রধান দর্শনীয় বিষয় ছিল। এই মেলা উপলক্ষে একটি অপ্রীতিজনক ঘটনা হয় তাহা বহুদিন এখানকার লোকমুখে প্রচলিত ছিল। মুক্তাগাছার শিক্ষিত জমিদার বাবু কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী অতিশয় তেজীয়ান ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে এই মেলার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ঢাকা নগরে ডন সাহেব নামক একজন ইংরেজকে তাহার বেয়াদবীর জন্য কষাঘাত করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই ডন সাহেবের প্রতি মেলা-দরবারের আসনাদি ব্যবস্থা করার ভার অর্পিত হয়, সাহেব তাহার পূর্ব্ব আক্রোশবশত কেশববাবুকে বসিতে আসন দেয় নাই। তিনি কিছুকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে জজ সাহেব উহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আদরপূর্ব্বক আসন প্রদান করেন। জমিদার ও শিক্ষিত লোকের মধ্যে এই বিষয়টী নিয়া বেশ আন্দোলন হইয়াছিল।

সহরে আসিয়া আমার নিকট সকলই নূতন বোধ হইতে লাগিল। জানুয়ারী মাসে স্কুলে ভর্তি হইব, একমাস গৃহে বসিয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং প্রদর্শনী দেখা এবং সহরে ঘুরিয়া বেড়ানই আমার প্রধান কার্য হইল। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এই নগরে আগমন করিলেন। স্কুলের মাঠে একটী তাঁবুতে তিনি অবস্থিতি করেন। সঙ্গীদের মুখে শুনিলাম, একজন ব্রহ্মজ্ঞানী (কেহ বলিল খ্রীষ্টান) আসিয়াছেন, তিনি বেশ বক্তৃতা করেন। একদিন সকলের সঙ্গে দেখিতে গেলাম। বহু লোক হইয়াছিল; বক্তৃতার ত কিছুই বুঝিলাম না। কিন্তু কেশবচন্দ্রের অপূর্ব মূর্তিতে আমার প্রাণ আকৃষ্ট হইল, আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার নিকটে আর একটী সৌম্যমূর্তি পুরুষ বসিয়াছিলেন, তাঁহাকেও খুব ভাল লাগিল। পরে জানিয়াছিলাম ইনি সাধু অঘোরনাথ। প্রত্যহ ইঁহাদিগকে দেখিবার জন্য তাঁবুর নিকটস্থ হইতাম, কিন্তু হাকিম প্রভৃতি বড় বড় লোকদিগকে দেখিয়া ভয়ে নিকটে যাইতাম না, দূর হইতে দেখিয়া আসিতাম।

১৮৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে আমি হার্ডিঞ্জ বঙ্গ বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণীতে প্রবেশ করিলাম। গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ১০১টী গভর্ণমেন্ট বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করেন; তন্মধ্যে ময়মনসিংহ হার্ডিঞ্জ-স্কুলই সর্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং বহুকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এ জেলার শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। আমি যখন এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম তখন ইহার অবস্থা বিলক্ষণ উন্নত ছিল। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানকীবাবু এবং জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার উমাচরণ বাবু জনসমাজে তুল্য সম্মান লাভ করিতেন। তৎকালে বাঙ্গলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন ৫০ টাকা আর কোথাও ছিল না। তৎকালপ্রসিদ্ধ "অবিদ্যার দশ আইন" নামক গ্রন্থে "জানকী উমার দায়, ঘাটে পথে চলা দায়" ইত্যাদি বাক্য অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে। যখন স্কুলে ভর্তি হইতে গেলাম, তখন জানকী বাবু পীড়িত ছিলেন, পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র সেন একটিং হেডমাষ্টার ছিলেন। কিছুদিন পরে জানকী বাবুর পরলোক হইল, তৎপদে সুপণ্ডিত ও সুশিক্ষক শ্রীযুক্ত দীননাথ ঘোষ মহাশয় নিযুক্ত হইয়া আসিলেন; গিরিশ বাবু দ্বিতীয় শিক্ষক রহিলেন। তৎকাল-

প্রসিদ্ধ গণিতবিৎ শিক্ষক গদাধর ঘোষ তৃতীয় শিক্ষক হইলেন, আমরা সৌভাগ্যক্রমে অতি উত্তম ও সাধুচরিত্র শিক্ষক প্রাপ্ত হইলাম।

"রচনাবলী" নামক অতি উৎকৃষ্ট গদ্য-সাহিত্য আমাদের পাঠ্য ছিল। ঐ পুস্তকের আত্মাবলম্বন ও উন্নতি, যৌবনের ইতিকর্তব্য, বন্ধুতা, বার্ধক্য ও মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়গুলি বড়ই শিক্ষাপ্রদ ও ধর্মভাবপূর্ণ ছিল। ঐ গ্রন্থের "দরিদ্র দশা দর্দুরকের ন্যায় যদিও কদাকার ও বিষাক্ত, তথাপি উহার মস্তকে মণি থাকে।" "নীতিপরতা বিলাসিজন-করলালিত ক্ষীণ যষ্টির ন্যায় সঙ্কটস্থলে কার্যকর নহে; কিন্তু ধর্মপরতা মৃত্যুঞ্জয়-মুষ্টি-নিপীড়িত মহাশূলের ন্যায়, সর্বত্রই অভেদ্য ও অব্যর্থ" প্রভৃতি বাক্য আজও হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে। অপর দিকে সদ্ভাবশতকের ঈশ্বরপ্রেম ও বৈরাগ্য বিষয়ক উন্মাদকর কবিতা এবং নীতিবিজ্ঞানের বিশুদ্ধ ধর্মশিক্ষা! দীনবাবু এই সকল পুস্তক পড়াইতে যেন প্রমত্ত হইয়া উঠিতেন, আমরাও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিতাম। তখন শিক্ষার জন্য প্রাণে কি অসীম উৎসাহ ও অনুরাগই ছিল! যাহা শুনিতাম তাহাই নূতন বোধ হইত, আরও জানিবার জন্য প্রাণে প্রবল তৃষ্ণা জন্মিত। গিরিশবাবু আমাদের ইতিহাস পড়াইতেন। মুসলমান রাজত্ব পড়াইবার সময় কত উপদেশপূর্ণ ও কৌতুকজনক উপাখ্যান বলিতেন—বীরবল ও আকবরের কত হাস্যজনক গল্প শুনাইতেন! গদাধরবাবু সুমধুর কৌতুক-জনক পদ্যে নূতন নূতন প্রশ্নের অঙ্ক লিখিয়া আনিতেন, আমরা উহার সমাধান করিয়া বিলক্ষণ আমোদ সম্ভোগ করিতাম। "গদাধর ঘোষ কহে শুন শিশুগণ, অনায়াসে হবে অঙ্ক বিনা ইকুইশন," ইত্যাদি কথা এখনও মনে আছে। ফলত তাঁহাদের শিক্ষা কেবল পুস্তকগত বা শুষ্ক বাক্যমাত্র ছিল না। জীবনের গঠন সময়ে এইরূপ সুশিক্ষক লাভ করা পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

দীনবাবু ছাত্রদিগকে বড় ভালবাসিতেন। আমি গ্রাম্য স্কুল হইতে আসিয়াছিলাম, আমার শিক্ষা তেমন ভাল হয় নাই, অনেক অভাব ছিল। তখন জেলার ভাল ভাল ছাত্রেরাই হার্ডিঞ্জস্কুলে পড়িত। প্রথম শ্রেণীতে ৪৫ জন ছাত্র ছিল; ইহার মধ্যে অনেকে পূর্ব বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও পুনরায় বৃত্তির জন্য পড়িতেছিল, ইহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হইল। কিন্তু দীনবাবুর উৎসাহে আমি ভীত হইলাম না।

তিনি আমাকে তাঁহার বাসায় যাইয়া পড়িতে বলিতেন, আমি প্রায়ই তথায় যাইয়া নানা বিষয় শিক্ষা করিতাম। ইহাতে আমার আরও একটী উপকার হইল। রচনাবলী, সম্ভাবশতক ও নীতিবিজ্ঞানেই আমার ধর্মের প্রাচীন সংস্কার অপগত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও নূতন কিছু ধরিতে পারি নাই। আমি পড়িবার জন্য প্রত্যুষে দীনবাবুর গৃহে যাইয়া দেখিতাম, তিনি ব্রহ্মোপাসনা করিতেছেন। তিনি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক পড়িয়া উপাসনা করিতেন, তাঁহার অশ্রুপাত হইত। এই দৃশ্যে আমার মনে এক নূতন ভাব ও নূতন আলোক প্রবেশ করিল।

হরচন্দ্র দাদা অতিশয় নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। বড় বধূঠাকুরাণীও ধর্মানুরক্তা ছিলেন। তিনি আমার নিকট বাঙ্গলা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন; সর্বদাই রামায়ণ মহাভারত পড়িতেন; ভীষ্মের দশ দিনের যুদ্ধ তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। যদিও আমার প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস বিচলিত ও নূতন ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেছিল, তথাপি ইঁহাদের ভয়ে বাহিরে কিছুই প্রকাশ পাইত না। এই সময়ে পূর্বোক্ত পদ্ম রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাধুচরিত্র হরমোহন বসু উকীল হইয়া এখানে আগমন করিলেন; তাঁহাদের পৈতৃক বাসা পতিত ছিল, তিনি আমাদের বাসাতেই পৃথক ঘর করিয়া ওকালতি কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহামনা আনন্দমোহন কলিকাতায় পড়িতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর মোহিনীমোহন আমাদের বাসায় থাকিয়া জেলাস্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। আমরা উভয়ে প্রায় সমবয়স্ক ছিলাম। হরমোহন বাবু ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন, হরচন্দ্র দাদার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তাঁহার ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক হইত। তিনি হরচন্দ্র দাদাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করিতেন, সুতরাং তাঁহার অনেক কঠোর বাক্য ও ব্রাহ্মদের নিন্দা নীরবে সহ্য করিতেন। ইটনা নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ কালীকিশোর বিশ্বাস মহাশয় মধ্যে মধ্যে হরমোহন বাবুর নিকটে আসিতেন, তাঁহারও সঙ্গে হরচন্দ্র দাদার তর্ক বিতর্ক চলিত, কিন্তু তিনি নীরবে সহ্য করিবার লোক ছিলেন না; এক এক দিন উভয়ের মধ্যে মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইত, আমরা অন্তরালে থাকিয়া শ্রবণ করিতাম। তখন আমি ব্রাহ্মসমাজে যাইতাম না, ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে বিশেষ পরিচয়ও হয় নাই, তথাপি ব্রাহ্মদের নিন্দা শুনিয়া প্রাণে কষ্ট হইত—তর্ক-সময়ে তাঁহাদেরই জয় কামনা করিতাম।

এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। শারদীয় অবকাশ নিকটবর্তী হইল। বন্ধের কয়েক দিন পূর্বে জানিতে পারিলাম, কোন পারিবারিক কারণে আমার এ বাসায় থাকা হইবে না, সুতরাং বাড়ীতে গেলে আর সহরে আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাতে মনে বড়ই কষ্ট হইল, বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িলাম। বন্ধের পূর্বে আমাদের একটি পরীক্ষা হইল। উহাতে গিরিশ বাবু "বিদ্যালয়ে প্রবেশ অবধি স্ব স্ব জীবনচরিত লিখ" এই ভাবের একটি রচনা লিখিতে দিলেন। আমি স্বীয় অবস্থা সবিস্তারে লিখিয়া বর্তমানে যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, আর পড়া চলিবে না, একথা করুণ ভাষায় লিখিলাম। গিরিশ বাবু রচনাটী পড়িয়া বড়ই ব্যস্ত হইলেন এবং উহা প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে দেখাইলেন। তাঁহারা আমাকে ডাকিয়া নিয়া সকল কথা শুনিলেন এবং আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তোমার এখানেই অন্ততঃ বাসায় থাকিবার ব্যবস্থা আমরা করিব, বন্ধে বাড়ীতে যাইও না। পূজার পরেই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা হইবে, ততদিনের ভার আমরা লইতেছি; তারপর তুমি নিশ্চয় বৃত্তি পাইবে।

এই সময়ে মুড়াপাড়ার জমিদার ৺কালীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ রামচন্দ্র বাবু কালেক্টরীর খাজাঞ্চি ছিলেন। সহরে ইঁহাদের প্রকাণ্ড বাসাবাড়ী ছিল, আত্মীয়-স্বজন, উমেদার ও ছাত্রে বাসা পূর্ণ ছিল। দুই ভ্রাতার সমস্ত উপার্জনেও ব্যয় কুলাইত না, বাড়ী হইতে জমিদারীর টাকা আসিত। কালীবাবু অতিশয় প্রখরবুদ্ধি, বিচক্ষণ ও পরোপকারী ছিলেন। রামবাবুর দুইটি কন্যাকে গিরিশবাবু প্রাতে পড়াইতেন, তদুপলক্ষে তাঁহাদের বাসায় এখানে প্রথম বালিকা স্কুল স্থাপিত হয়। গিরিশবাবুই এই স্কুলের প্রথম প্রবর্তক। কালে এই কালীবাবুর বাসাই বালিকা স্কুলের জন্য ক্রয় করা হয় এবং এখনও তথায় আলেকজাণ্ডার বালিকা স্কুল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই জমিদার-পরিবার অতি উদার ও ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। গিরিশবাবুর অনুরোধে পরোপকারী কালীবাবুর বাসায় আমার স্থান হইল। আমি গোপনে বধূঠাকুরাণীকে জানাইয়া ঐ বাসায় চলিয়া গেলাম। ইহাতে হরচন্দ্র দাদা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বেই একরূপ স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের প্রাথমিক ইতিবৃত্ত

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ নগরে গভর্ণমেণ্ট ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু ঐ স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। বঙ্গদেশের সর্বত্র যেমন ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নব ধর্মের প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল; এখানেও তাহাই ঘটিল। এখন যেখানে করটীয়ার জমিদার খাঁ সাহেবের বাসা হইয়াছে, ঐ স্থানে কালী গাঙ্গুলী নামক একজন মোক্তার বাস করতেন; তাঁহার বাসায় ইংরেজী স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস ও বাঙ্গলা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র গুহ মহাশয়দিগের বিশেষ উদ্যোগে ১৮৫৪ সনের ৭ই জানুয়ারী প্রথম ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হয়। কিছু দিন পরেই ইংরেজী স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাসায় সমাজ উঠিয়া যায়। উক্ত ভগবানবাবু ঈশানবাবু, গোবিন্দবাবু এবং সুয়াপুর (মাণিকগঞ্জ) নিবাসী বাবু ত্রিপুরাশঙ্কর গুপ্ত সমাজের প্রথম সভ্য ছিলেন। ঢাকার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মিত্র কার্যোপলক্ষে এখানে আসিতেন এবং সমাজের কার্যে সহায়তা করিতেন। তৎকালে আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতিক্রমে ব্রহ্মোপাসনা হইত এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ ও রাজা রামমোহন রায়ের বৈরাগ্য সঙ্গীত গীত হইত।

প্রায় ১০ বৎসর কাল এইরূপে সমাজের কার্য নির্বাহ হয়। তৎকালে ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রচারের একটি সভা মাত্র ছিল, জীবনে ধর্মসাধন আরম্ভ হয় নাই, অনুষ্ঠানাদিরও সূত্রপাত হয় নাই। এই সময়মধ্যে যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র বসু, গোবিন্দচন্দ্র গুহ, পার্বতীচরণ রায়, ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস, জগদানন্দ সেন, পরমানন্দ সেন প্রভৃতি শিক্ষকবর্গ এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কালিকাদাস দত্ত, খাজাঞ্চি ও জমিদার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ, মহেশ চন্দ্র ঘোষ, জানকীনাথ কর, হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ দাস প্রভৃতি মহাত্মা-গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেরপুরের বিদ্যোৎসাহী জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গোবিন্দবাবু

বহুকাল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক থাকিয়া এ জেলায় জ্ঞানধর্ম প্রচার কার্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ব্যয়ে সেরপুর হইতে বিদ্যোন্নতিসাধিনী পত্রিকা বাহির হইত, গোবিন্দবাবু তাহার সম্পাদক ছিলেন। তত্ত্বোপদেশসংগ্রহ নামে তিনি একখানি সুন্দর নীতিগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোবিন্দবাবু অদ্যাপি জীবিত থাকিয়া প্রাচীন হিন্দু প্রণালীতে ধর্মসাধনে নিযুক্ত আছেন।

এতদিন ব্রাহ্মসমাজের কোন নিজস্ব গৃহ ছিল না, কোন কোন সভ্যের বৈঠকখানায় সমাজের কার্য নির্বাহ হইত। * তখন কাছারির সম্মুখবর্তী বাসাগুলি কেরাণীপাড়া নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজীনবিশ বাঙ্গালী কেরাণী মিলিত না, তজ্জন্য ফিরিঙ্গিদিগকে ঐ কর্মে নিযুক্ত করা হইত। উহারা কাছারীর সম্মুখবর্তী স্থানে বাসা করিয়া সপরিবারে বাস করিত। এই কেরাণীদের একখানি বাঙ্গলা ২০০৲ টাকা মূল্যে ব্রাহ্মসমাজের জন্য ক্রয় করা হইল। এখন সেই স্থানে ঢাকার নবাব সাহেবের বাসা হইয়াছে। ১৮৬৫ সালের ১২ই মাঘ হইতে ঐ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইতে থাকে।

এই ১৮৬৫ সালে এখানে অনেকগুলি স্মরণীয় ঘটনা হয়। বক্তা কালিকাদাস দত্ত, কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ ও পার্বতীচরণ রায়ের যত্নে একটি "লিটারেচার ক্লাব" স্থাপিত হয়; এই সভায় স্থানীয় শিক্ষিতগণ উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য, সমাজ ও

---

* শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন,—"তখন মুড়াপাড়ার জমিদার ময়মনসিংহের কালেক্টরীর খাজাঞ্চি রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ছোটদাদার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আমিও তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া সেই পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে বদ্ধ হই। তখন ব্রাহ্মসমাজের কার্য রামবাবুর বৈঠকখানায় হইতেছিল। রামবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হওয়াতে আমিও ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিতে লাগিলাম। আদি সমাজের উপাসনা প্রণালীর অনুকরণে ব্রহ্মোপাসনা হইত। উপাচার্য চেয়ারে বসিয়া উপাসনা করিতেন ও ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান পড়িতেন। * * * * একদিন উপাসনার সময় রামচন্দ্রবাবুর বৈঠকখানায় একজন পানবিহ্বল বৃদ্ধ পুরুষ আসিয়া "আত্রফলে ঈশ্বরের মহিমা" বিষয়ে বক্তৃতা দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উপাচার্য গাত্রোত্থান করিয়া বক্তৃতা দানের জন্য তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দেন। বক্তা দুইটি চারিটী কথা বলিয়াই চৈতন্যশূন্য হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। কয়েকজন সভ্য ধরাধরি করিয়া সেই আত্রফলের ভাবে মূর্চ্ছিত বক্তাকে শবাকারে বাহিরে লইয়া যান। সেই বক্তা কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন।"

নীতি বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। ইতিপূর্বে কালী কেরাণী নামে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এ জেলায় প্রথম ইংরেজীনবিশ আগমন করেন; তাঁহার ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী শুনিবার জন্য লোকে কত আগ্রহ করিত। সেইস্থলে উক্ত সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের অনর্গল ইংরেজী বক্তৃতা লোকের বিস্ময় জন্মাইত। এই সনের ৭ই মে এখানে একটী প্রথম শ্রেণীর নর্মালস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রদ্ধাস্পদ রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার প্রধান শিক্ষক হইয়া আসিলেন। গোবিন্দবাবু দ্বিতীয় শিক্ষক হইলেন। এই সনেই রামচন্দ্র-বাবুর বাসায় প্রথম বালিকাস্কুল স্থাপিত হয়, তদ্বিবরণ পূর্বে লিখিত হইয়াছে। সেরপুরের "বিদ্যোন্নতি সাধিনী" সভা এবং তাহার মুখপত্র "বিদ্যোন্নতিসাধিনী পত্রিকা"ও এই বর্ষেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বর্ষের আর একটী স্মরণীয় ঘটনা কৃষি-প্রদর্শনী মেলা, তদ্বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে।

এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে কৃষি-প্রদর্শনী মেলার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নব-জীবনদাতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রচারার্থ পূর্ববঙ্গে আগমন করেন। তিনি ঢাকা নগরে বক্তৃতাদি দ্বারা ধর্ম প্রচার ও অভিনব আন্দোলন উপস্থিত করিয়া ময়মনসিংহে উপস্থিত হইলেন। তদ্বিবরণ "আচার্য কেশবচন্দ্র" গ্রন্থে শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রহণ করিলাম।

"এই সময়ে ময়মনসিংহ হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ তথায় যাইবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করেন। তখন ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে ৫।৬ দিনে নৌকাপথে যাইতে হইত। আচার্য কেশবচন্দ্র সাধু অঘোরনাথকে সঙ্গে করিয়া একটি এক দাঁড়ের ক্ষুদ্র নৌকায় ময়মনসিংহ যাত্রা করেন। রন্ধনকালে ধূমে বড় কষ্ট পাইতেন। সঙ্গে বিছানাপত্র ছিল না, একখানি লেপ ছিল, তদ্বারাই দুইজনে পৌষ মাসের শীত নিবারণ করিতেন। আচার্য যখন ময়মনসিংহে উপনীত হন, তখন তথায় মহা ঘটায় কৃষি-প্রদর্শনী মেলা হইতেছিল। কিশোরগঞ্জের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর সেন মেলার কার্য নির্বাহের জন্য নিযুক্ত ছিলেন। আচার্য পঁহুছিবামাত্র তিনি যাইয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। পথে কোন কারণে নৌকা পরিবর্তন করিতে হয়, তাঁহারা ভ্রমক্রমে পূর্ব নৌকায় বিনামা ফেলিয়া আইসেন। উভয়কে শূন্যপদ দেখিয়া রামশঙ্করবাবু তাড়াতাড়ি বাজার হইতে জুতা

আনাইয়া দিলেন। তাঁহারা উভয়ে নব পাদুকা পরিধান করিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন।"

"জাতিচ্যুতির ভয়ে এখানকার কোন ব্রাহ্ম কেশববাবুকে স্বীয় গৃহে স্থান দিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার জন্য সমাজ-গৃহের পার্শ্বে একটি তাঁবু স্থাপিত হইয়াছিল। রন্ধনের জন্য একটি ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছিল, সে খুব ভাল রাঁধিত বলিয়া আচার্য প্রশংসা করিয়াছেন। তখন ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম-সমাজে অনেক বড় লোক যোগদান করিতেন। কাহারও জীবনের সঙ্গে ধর্মের তেমন সম্বন্ধ ছিল না। ইহার কিয়ৎকাল পূর্বে সমাজের জন্য নির্দিষ্ট গৃহ ছিল না। একজন সম্ভ্রান্ত লোকের বৈঠকখানায় প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে সমাজের কার্য হইত। অনেক সময় উপাচার্য সুরারক্তিম নেত্রে আদি সমাজের নিবন্ধ "উপাসনা পদ্ধতি" পুস্তক পাঠ করিতেন ও ব্যাখ্যান পড়িতেন। উপাসনার পর অনেকে মিলিয়া যথেচ্ছ পানভোজন করিতেন। আচার্য যখন ময়মনসিংহে উপস্থিত হন, তখন ব্রাহ্মসমাজের এরূপ যথেচ্ছাচারের অনেকটা তিরোভাব হইয়াছিল। কিন্তু উপাসনাশীলতা বা ধর্মস্পৃহা তখনও দেখা যাইত না। আচার্যের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া তাঁহারা ভদ্রতার আলাপ ও বিষয়প্রসঙ্গই করিতেন, ধর্ম বিষয়ে প্রায় কোন কথা উত্থাপন করিতেন না। সৎপ্রসঙ্গের মধ্যে কেবল এই হইয়াছিল যে, বক্তৃতা কেমন করিয়া দিতে হয়। তিনি উত্তর করেন, নির্লজ্জ হইলেই বক্তৃতা দেওয়া যায়।"

"তখন মেলা উপলক্ষে ঢাকা বিভাগের কমিশনার বাকলাণ্ড সাহেব ও নানা স্থান হইতে ধনী জমিদার ও ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ ময়মনসিংহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বক্তা কেশবচন্দ্র সেন আসিয়াছেন শুনিয়া সাহেব বিবিরা মেলাস্থলে তাঁহার বক্তৃতা হয় এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু মেলাক্ষেত্রে একজন সাহেব একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারকে অপমান করেন, তজ্জন্য হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত হয়; এই জন্য তথায় আর বক্তৃতা হইতে পারে নাই। একদিন সন্ধ্যার পর সমাজ-গৃহে ইংরেজী বক্তৃতা হয়। রবিবার প্রাতঃকালে অঘোর বাবু উপাসনা এবং আচার্য উপদেশ দান করেন। তাঁহারা ৪।৫ দিন মাত্র তথায় ছিলেন। ময়মনসিংহ হইতে ক্ষুদ্র নৌকায় ঢাকায় ফিরিয়া আসিতে আচার্য অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন।"

কেশববাবু এখানে আশানুরূপ কার্য করিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার জীবনের প্রভাবেই এখানকার ব্রাহ্মসমাজে নব জীবনের সূচনা হইয়াছিল। সমাজের কার্যে সভ্যগণের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল, অনেক নূতন লোক প্রবিষ্ট হইলেন। "আত্মোন্নতিসাধিনী" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কালিকাদাস দত্ত, মুন্‌সেফ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, জমিদার কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোক এই সভায় যোগদান করিলেন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন, গোপীকৃষ্ণ সেন, কালীকুমার গুহ, কালীকুমার বসু প্রভৃতি অনেক নূতন লোক সমাজের কার্যে যুক্ত হইতে আরম্ভ করিলেন। পার্বতীবাবু, ঈশানবাবু এবং গোবিন্দবাবুকে সর্বদাই সমাজের কার্যে ব্যস্ত দেখা যাইত। তখনও রবিবার প্রাতেই সমাজের উপাসনা হইত।

আত্মকথা

১৮৬৬ সালে ডিসেম্বর মাসে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া মাসিক ৪৲ টাকা বৃত্তি পাইলাম। মাথার উপর হইতে এক গুরুতর ভার দূর হইল; শিক্ষাপথে আরও অগ্রসর হইতে পারিব বলিয়া সাহস হইল। এখন আমার বয়স ১৬ বৎসর; এ সময়ে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করিলে হয়ত অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিব না, তিন বৎসরে নর্মাল স্কুলের পড়া শেষ করিতে পারিব; এই ভাবিয়া অতি দুঃখের সহিত প্রিয় সহপাঠীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নর্মাল স্কুলেই প্রবেশ করিলাম। তৎকালে ময়মনসিংহ নর্মাল স্কুল একটী প্রথম শ্রেণীর স্কুল ছিল; হুগলী, কলিকাতা, ঢাকা ও পাবনা নর্মাল স্কুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত। আমি ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নর্মাল স্কুলের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইলাম।

তৎকালে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অধিকাংশ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপাতী ছিলেন। রামকুমারবাবু, গোবিন্দবাবু, তৎপর ভারতবাবু নর্মাল স্কুলের শিক্ষকগণ ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন এবং ছাত্রদিগকে অতি উদার ভাবে ধর্ম ও নীতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। ওদিকে জেলা স্কুলের পার্বতীবাবু, কালীকুমারবাবু, জগদানন্দ বাবু, শিবকিশোর মজুমদার প্রভৃতি শিক্ষকগণ ব্রাহ্মধর্মের

অনুরাগী ছিলেন। এই সকল সুশিক্ষকের দৃষ্টান্ত ও উপদেশে ছাত্রদিগের মহা কল্যাণ সাধিত হইত। ময়মনসিংহ নর্মাল স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই ব্রাহ্মধর্মানুরক্ত এবং নীতিপরায়ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা দেশে সুশিক্ষা বিস্তারের অনেক সহায়তা হইয়াছে। এই নর্মাল স্কুলটী বেশী দিন এখানে থাকে নাই, কিন্তু এই কয়েক বৎসর মধ্যেই অনেকগুলি ছাত্র ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া পরবর্তী জীবনে ব্রাহ্মসমাজের কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রচারক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন কর্মকার, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত। নর্মাল স্কুলে প্রবেশ করিয়াই আমি সৌভাগ্যক্রমে কয়েকটী সচ্চরিত্র ও সাধুপ্রকৃতি যুবকের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলাম। বাল্যবন্ধু কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রিয়সুহৃদ অনাথবন্ধু গুহ, ঈশ্বরচন্দ্র সেন, প্রসন্নকুমার সেন ও রমাপ্রসাদ বিষ্ণু প্রভৃতির সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল। ইঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া নানা সদ্‌বিষয়ের আলোচনা করিতাম এবং সভা সমিতিতে গমন করিতাম।

মনোরঞ্জিকা সভা

এই সময়ে জেলা স্কুলে মনোরঞ্জিকা নামে ছাত্রদিগের একটী সভা ছিল। এই সভা দ্বারা এখানকার ছাত্রমণ্ডলীর মহোপকার সাধিত হইয়াছিল। ভক্তিভাজন বঙ্গচন্দ্র রায়, চিরস্মরণীয় আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি বহু কৃতী ছাত্র এই সভার জীবনস্বরূপ ছিলেন। তখন মনোরঞ্জিকার অতুল প্রভাব ছিল। শিক্ষকগণ কোন ছাত্রের দোষ দেখিলে স্বয়ং শাসন না করিয়া মনোরঞ্জিকার সম্পাদকের নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন। নিম্নশ্রেণীর ছাত্র যদি কোন অন্যায় করিত, তবে শিক্ষক বলিতেন, তুমি বুঝি মনোরঞ্জিকার সভ্য নও? ইহা তৎকালে ছাত্রের পক্ষে অতিশয় অপমান ও লজ্জার বিষয় ছিল। এই সভার সভ্যগণ পরস্পরের চরিত্রগঠন ও শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা করিতেন। জেলা স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র অনাথ বাবুর অনুরোধে আমরাও মনোরঞ্জিকার সভ্য হইলাম। তখন এই সভার একরূপ চরম সময়; তথাপি ইহার দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইলাম। এই সভার কার্যারম্ভে ঈশ্বরস্তোত্র ও প্রার্থনা

পঠিত হইত। সকলকেই প্রবন্ধ লিখিতে এবং উপস্থিত বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইত। কেবল সভার নির্দিষ্ট সময়ে উহার কার্য আবদ্ধ থাকিত না ; সভ্যদের স্বভাব চরিত্র, রীতি নীতি এবং পড়াশুনা সম্বন্ধে গৃহেও অনুসন্ধান করা হইত।

মনোরঞ্জিকার অনুকরণে বাঙ্গলা স্কুলেও একটী ছাত্রসভা ছিল। আমরা উহাতে রচনাদি পাঠ করিতাম। উহাতে যেমন নীতি ও চরিত্র বিষয়ে আলোচনা হইত, তেমনি সমাজ ও ধর্মসম্বন্ধেও তর্কবিতর্ক হইত। ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি বিষয়েও রচনা পাঠ ও তর্কবিতর্ক হইত। আমি সর্বদাই অত্যুদারবাদের সমর্থন করিতাম। ভৈরবচন্দ্র রায় নামক একজন কৃতী ছাত্র প্রায়ই বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করিতেন। স্কুলের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণ প্রায় সকলেই আমাকে সমর্থন করিতেন। পরিশেষে শিক্ষক মহাশয়ও প্রায়ই আমার মতের অনুমোদন করিতেন। ইহাতে আমাদের মধ্যে বেশ দুইটী দল দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তদ্বারা পরস্পরে কোন মনোমালিন্য ঘটিত না।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রচার

১৮৬৫ সালে কেশবচন্দ্র এখানে ব্রাহ্মধর্মের যে অগ্নি প্রধূমিত রাখিয়া যান, ১৮৬৭ সালের প্রথম ভাগে মহাতেজস্বী প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ এখানে সেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় যেন অগ্নিবৃষ্টি হইত। উহাতে মৃতজীবনে নবচেতনার সঞ্চার হইত। স্থানীয় 'বিজ্ঞাপনী' নামক সংবাদপত্রিকায় তাঁহার প্রচারকার্যের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি নগরের নানাস্থানে ৩০শে মাঘ "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ", ৫ই ফাল্গুন "উপাসনা", ৭ই "মুক্তি", ১১ই "পবিত্রতা", ১৪ই "সংসার", ১৮ই "পৌত্তলিকতা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতার শ্রুতিসুখ উৎপাদন করিয়া বিরত হইত না, হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিত। সত্য সত্যই বিজয়কৃষ্ণের বিজয়-ভেরীতে নগর কম্পিত হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস, জমিদার রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ওভারসিয়ার গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজ্ঞাপনী-সম্পাদক জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী উপবীত পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ রায়, গোবিন্দচন্দ্র গুহ, গোপীকৃষ্ণ

সেন, গিরিশচন্দ্র সেন এবং দুর্গাশঙ্কর গুপ্ত প্রভৃতি উৎসাহী ব্যক্তিগণ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আহারাদি করিয়া প্রকাশ্যে মিলিত হইলেন।*

আন্দোলন ও নিপীড়ন

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থানে হিন্দুসমাজে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। যাঁহারা প্রকাশ্যে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, উপবীত পরিত্যাগ করিয়া জাতিভেদের মস্তকে কঠোর আঘাত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হইল। বিজয়বাবু যাইতে না যাইতেই দুর্গাবাড়ীতে হিন্দুসভা বসিল, ব্রাহ্মদিগকে শাসন করিবার বিবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইল। জেলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত পার্বতীচরণ তর্করত্ন এই আন্দোলনের নেতা হইলেন। বিজয়বাবু ১১ই ফাল্গুন পবিত্রতা বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন; তাহাতে স্থানীয় অনেক সম্ভ্রান্ত লোক মহাবিরক্ত হইয়া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করা হইয়াছে মনে করিয়া, ১৩ই ফাল্গুন দুর্গাবাড়ীতে হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। উদীয়মান ব্রাহ্মদিগকে শাসন করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সেরূপ ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য আর কতদিন থাকিবে? পরে ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সময়ে এই সভার নাম "হিন্দুধর্ম-জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা" হয়। পরবর্তী সময়ে এই সভাদ্বারা হিন্দুসমাজের অনেক কল্যাণ হইয়াছে।

দুর্বলচিত্ত ব্রাহ্মগণ অনেকেই সে পরীক্ষার অগ্নিতে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। কয়েক দিন পরেই রামচন্দ্র বাবু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিলেন; অগ্নিহোত্রী মহাশয় উপবীত ত্যাগ করা অস্বীকার করিলেন। ঢাকা-প্রকাশে তাঁহাদের নাম বাহির হইয়াছিল—'বিজ্ঞাপনী'তে অগ্নিহোত্রী

* শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশ বাবু ব্রহ্মময়ী-চরিতে লিখিয়াছেন, "মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমার ন্যায় পতিত সন্তানকে পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে ময়মনসিংহে প্রেরণ করেন। তখন আমি তাঁহার সংসর্গে থাকিয়া জীবন্ত ধর্মের উপদেশ গ্রহণ করিয়া নিজের পাপ ও অভাব অনেক বুঝিতে পারিলাম ও তাহা মোচন করিয়া আত্মাকে পরিশুদ্ধ করিতে যত্নবান হইলাম। ইতিপূর্বে আমি উপাসনাতে প্রায় কিছুই মনঃসংযোগ করিতাম না; এইক্ষণ উপাসনা ব্যতীত পাপী বাঁচিতে পারে না বুঝিতে পারিলাম।

মহাশয় লিখিলেন, "গোলযোগের মধ্যে আমরাও জিহ্বাপরম্পরায় আরূঢ় হইয়াছি ; আমাদিগকে কেহ নিরুপবীত দেখেন নাই।"

রামচন্দ্র শর্ম্মা, কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ, জগদানন্দ সেন, কমলাপ্রসন্ন বল, অন্নদাপ্রসাদ দাস ও গোবিন্দচন্দ্র বসু স্বাক্ষরিত আর একখানি পত্র 'বিজ্ঞাপনী'তে প্রকাশিত হইল। উহাতে স্বাক্ষরকারীগণ বিজয়বাবুর সহিত আহারাদি করেন নাই বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অবশিষ্ট ব্রাহ্মগণও সমাজভয়ে ভীত হইলেন। সমাজের প্রাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস পাবনা জেলা স্কুলে বদলি হইয়া গেলেন। গোপাল বাবুও স্থানান্তরিত হইলেন। পারিবারিক নিপীড়ন ও সামাজিক শাসনের ভয়ে শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ রায়, গোবিন্দচন্দ্র গুহ এবং গোপীকৃষ্ণ সেন প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইলেন।

ময়মনসিংহের এই দুর্দিনে ব্রাহ্মসমাজের প্রিয় সেবক গোস্বামী মহাশয় স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি পুনরায় এখানে আগমন করিলেন। কালেক্টরীর সেরেস্তাদার রামকৃষ্ণ মুন্সি হিন্দুসমাজের প্রধান রক্ষক ও অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। গোপীবাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় যখন ময়মনসিংহ স্কুলে পাঠ করেন, তখন তিনি রামকৃষ্ণ মুন্সি মহাশয়ের বাসায় থাকিতেন। তদবধি গোপীবাবুর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ প্রীতি জন্মিয়াছিল। তাঁহার প্রভাবেই গোপীবাবুর জীবনে পরিবর্তন ঘটে। যখন বিজয়বাবু দ্বিতীয়বার আগমন করিলেন, তখন রামকৃষ্ণ মুন্সি পেনশন নিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন। গোপীবাবু কালেক্টরীর খাজাঞ্চি হইয়া পৈতৃকবাসায় অবস্থিতি করিতেছেন। হিন্দুসমাজের প্রধান ব্যক্তি রামকৃষ্ণ মুন্সির বাসাবাড়ীর সুবিস্তৃত আঙ্গিনায় চন্দ্রাতপতলে শান্তিপুরের গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ "শান্তি" বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। অন্যান্য ছাত্রগণের সহিত আমরাও সে বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। এই বক্তৃতার সুখ্যাতি প্রাচীনদের মুখে আজও শুনিতে পাওয়া যায়। এই বক্তৃতার মৃতসঞ্জীবনী গুণে ব্রাহ্মদের জীবনে নব শক্তি সঞ্চারিত হইল। অনেকে ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ সেন সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া চিরদিনের তরে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পার্বতী বাবু

সমাজের উপাচার্য ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আর সে ভার গ্রহণ করেন নাই। সমাজের সমস্ত ভার জেলা স্কুলের পণ্ডিত গিরিশ বাবুর মস্তকে পতিত হইল। তিনি তখন পার্বতীবাবুর বাসায় থাকিতেন; পার্বতীবাবু প্রায়শ্চিত্ত করাতে তাঁহাকে পৃথক ঘরে আহার করিতে হইত, স্বহস্তে আহার-পাত্র ধৌত করিতে হইত।* তিনি সকল উৎপীড়ন ও পরীক্ষার মধ্যে অটল ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। জেলা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীকুমার গুহ, কালেক্টরীর কেরাণী শ্রীযুক্ত কালীকুমার বসু, শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর গুপ্ত প্রভৃতি তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইলেন। গোবিন্দবাবুও ব্রাহ্ম সমাজের কার্যে পূর্ববৎ যুক্ত রহিলেন। হিন্দুসমাজের নিপীড়ন চলিতে লাগিল। কিন্তু জেলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত পার্বতীচরণ পাবনায় বদলি

* 'বিজয় বাবুর হৃদয়ার্দ্রকারিণী ও ওজস্বিনী বক্তৃতা অনেক ভ্রাতার চিত্তকে ধর্মের জন্য পিপাসিত, সত্যের জন্য লালায়িত করিয়াছিল। কপটভাবে, শুষ্কভাবে ব্রাহ্মধর্মকে রক্ষা করা যায় না বলিয়া ব্রাহ্মমণ্ডলীর অন্তঃকরণে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তখন অনেক ব্রাহ্মবন্ধু ধর্মকে জীবনের প্রিয় সামগ্রী করিবার জন্য অনেক প্রকার ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এদিকে ব্রাহ্মধর্মের বিরোধী প্রাচীন হিন্দুসমাজ ক্রুদ্ধ ও উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া মহাড়ম্বরে এক সভা স্থাপনপূর্বক কতিপয় ব্রাহ্মকে হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। তাঁহাদের হস্তে উৎপীড়নের যে যে উপায় ছিল, তাঁহারা ক্রমশ তাহা ব্রাহ্মদিগের উপর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মনুষ্যের কোন বিষয়ের মত্ততা চিরকাল থাকে না। শান্তভাবে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্থিতি করিতে না পারিলে মত্ততা নির্জীবতায় পরিণত হয়। এখানেও তাহাই হইল, অনেকের ধর্মোন্মত্ততা চলিয়া গেল। তাঁহারা নানাবিধ বিভীষিকা দেখিয়া হিন্দুসমাজের চরণে আত্মার মহত্ব বিক্রয় করিলেন। সেই সময়ে প্রায় সকল ভ্রাতাই আমার সহিত প্রকাশ্য যোগ ছাড়িয়া দিলেন। আমি যে ব্রাহ্মবন্ধুর গৃহে স্থিতি করিতাম, তখন তথায় থাকাও দুষ্কর হইল।

আমি বহির্ভবনের একটী প্রকোষ্ঠে স্বয়ং রন্ধন করিয়া ভোজন করিতাম, ভৃত্যাভাবে নিজে খাদ্যসামগ্রী বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া আসিতাম, স্কুলের সন্নিহিত পুষ্করিণী হইতে জল বহন করিয়া আনিতাম, উচ্ছিষ্ট পাত্র স্বয়ং মার্জন করিতাম। এদিকে ব্রাহ্মভ্রাতা পণ্ডিত মহাশয় ও মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি রাত্রিতে জমিদারবাবুর বোটে আনওয়ার খাঁর পরিবেশিত অখাদ্য বস্তুতে উদর পরিপূর্ণ করিয়া হিন্দুসমাজে গৃহীত ও আদৃত থাকেন, তাঁহাদের জাত বাঁচিয়া যায়, আর আমি উপবীতত্যাগী ব্রাহ্মণের সঙ্গে পংক্তি ভোজন করিয়াছি বলিয়া আমার জাত মারা যায়!!" গিরিশ বাবুর লিখিত ব্রহ্মময়ী-চরিত।

হওয়াতে গালাগালির বেগ হ্রাস হইয়া গেল। তৎপদে সুপণ্ডিত ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন আগমন করিলেন ; ইনিও হিন্দু সভার "সভোপাচার্য" হইলেন বটে কিন্তু অতিশয় মিষ্টভাষী, উদারপ্রকৃতি ও লোকপ্রিয় হইতে ইচ্ছুক ছিলেন বলিয়া পার্বতী পণ্ডিতের দলভুক্ত হইতে পারিলেন না।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ—শাখাসমাজ স্থাপন

যখন ব্রাহ্মসমাজে মহাসংগ্রাম চলিতেছিল, তখন জেলা স্কুলের ছাত্র রামসুন্দর গুপ্ত, অনাথবন্ধু গুহ, প্রসন্নকুমার সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন। রামসুন্দর বাবু একটু ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আহার করিয়াছেন বলিয়া জনরব উঠিয়াছিল। পার্ব্বতী পণ্ডিত মহাশয়ের আজ্ঞাক্রমে তিনি তুলসীতলায় গড়াগড়ি দিয়া শুদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক অনাথবাবুদের সঙ্গে সঙ্গে আমি ও কৃষ্ণকুমার সমাজে যাইতাম; গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত হইতাম। সমাজে যাইয়া দেখিতাম, জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার পার্ব্বতী বাবু চেয়ারে বসিয়া উপাসনা করিতেছেন, রামচন্দ্রবাবু তানপুরা বাজাইয়া সঙ্গীত করিতেছেন, একজন লোক তবলা বাজাইতেছে। আমরা কোনদিন বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতাম, কোনদিন বা এক কোণে বেঞ্চে বসিতাম। যে দিন আমাদের শিক্ষক গিরিশ বাবু দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেন বা পাঠ করিতেন, সে দিন একটু সাহস হইত। উপাসকগণের অনেকে চাহিয়া থাকিতেন, কেহ বা গানের সময় বাহবা দিতেন। একটী দীর্ঘাকার পুরুষ লংক্লথের চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নিমীলিতনেত্রে শান্তভাবে বসিয়া থাকিতেন; তাঁহাকে আমার বড় ভাল লাগিত। ইনিই আমাদের ভক্তিভাজন সুহৃদ গোপীকৃষ্ণ সেন।

বাল্যকাল হইতেই আমার সঙ্গীতে অনুরাগ ছিল, একটু একটু গাহিতেও পারিতাম। সমাজে যে দিন যে গানটী হইত, লিখিয়া আনিয়া বাসায় অভ্যাস করিতাম। একদিন শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ দাস "জননীর কোলে বসি কেন রে অবোধ মন, রোদন করিছ সদা মাতৃহীন শিশু প্রায়" এই গানটী গাহিয়াছিলেন। উহা আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। বহুদিন দুঃখবিপদের মধ্যে এই গানটী করিয়া প্রাণে আরাম ও সান্ত্বনা পাইয়াছি। নদীতীরে বেড়াইবার সময় আমি ও আমার সহপাঠী বন্ধু রমাপ্রসাদ বিষ্ণু একত্রে গান করিতাম, বহু ছাত্র জুটিয়া যাইত এবং ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজের বিষয়ে তর্কবিতর্ক হইত। কৃষ্ণকুমারের সহপাঠী কয়েকটী গোড়া হিন্দু ছাত্র ছিল, তাহারা বড়ই জ্বালাতন করিত। একদিন খুব তর্ক হইতেছে, এমন সময়

কৃষ্ণকুমার তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সর্বব্যাপী কি না? তাহারা স্বীকার করিল। তিনি কি এখানেও আছেন? উত্তর, অবশ্যই আছেন। আচ্ছা, ঈশ্বর নিরাকার না সাকার? উত্তর হইল, নিশ্চয়ই সাকার। তবে এই যে আমরা চলিতেছি, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ঢুষ (ধাক্কা) লাগে না কেন? তখন ছাত্রমণ্ডলীতে হাসির রোল পড়িয়া গেল। তদবধি ঐ ছাত্রগণ আমাদের কাছে বড় একটা আসিত না।

শাখাসমাজ স্থাপন

কয়েকদিন সমাজে যাতায়াত করিয়া বুঝিলাম, এরূপে আমাদের চলিবে না। বয়স্কদের সঙ্গে মিলিয়া কোন কার্য করিবার সুযোগ আমরা পাইতাম না। ইহাতে আমাদের তৃপ্তি হইত না। একদিন আমি ও কৃষ্ণকুমার পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, আমরা ছাত্রেরা মিলিয়া একটী স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিব। আমরাই উহার সকল কার্য নির্বাহ করিব। তখন জেলাস্কুলের ছাত্র অনাথ বাবু ও প্রসন্নবাবু এবং নর্মাল স্কুলের ছাত্র ঈশ্বরবাবু আমাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন; তাঁহাদের উপদেশক্রমেই আমরা চলিতাম। আমাদের ইচ্ছা তাঁহাদিগকে জানাইলাম। তাঁহারাও এই কার্যে যোগ দিতে স্বীকৃত হইলেন। অতঃপর ১৮৬৭ সালের (বাঙ্গলা ১২৭৪) ২৩শে আষাঢ় রবিবার মধ্যাহ্ন সময়ে আমরা সমাজগৃহে মিলিত হইয়া "ময়মনসিংহ শাখা ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন করিলাম। সেদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে ছিল। বয়স্কেরা কেহ আসিলেন না। আমি একটী রচনা লিখিয়া নিয়াছিলাম, পাঠ করিলাম। রমাপ্রসাদ সঙ্গীত এবং কৃষ্ণকুমার প্রার্থনা করিলেন। প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময়ে সমাজগৃহে শাখাসমাজের অধিবেশন হইবে, স্থির হইল। এইরূপে অতি সামান্যভাবে ৩।৪টী বালকের মিলনে যে শাখাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, ভবিষ্যতে তাহার প্রভাবে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। বোধহয় সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ইহাই ছাত্রদের জন্য প্রথম সমাজ।

প্রসন্নবাবু ও ঈশ্বরবাবু শাখা সমাজের উপাচার্য হইলেন; আমি সম্পাদক হইলাম। কৃষ্ণকুমারের আত্মীয় শ্রীযুক্ত নিত্যহরি মিত্র তখন স্কুল ছাড়িয়া বিজ্ঞাপনী পত্রিকার কার্য করিতেন, তিনিও আমাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন, তাঁহাকে সহকারী সম্পাদক করা হইল। ইনি এখন টাঙ্গাইল মহকুমার

একজন প্রসিদ্ধ মোক্তার। প্রতি শনিবার সন্ধ্যার পর সমাজের কার্য হইতে লাগিল। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই, আমরা রাত্রিতে সমাজে আসিতে বড়ই কষ্ট বোধ করিতে লাগিলাম। একে বর্ষাকাল, রাত্রিতে একাকী বাসায় যাইতে হয় ; তার উপর অভিভাবকগণ অসন্তুষ্ট হন ; অনেক দিন বাসায় যাইয়া ভাত পাই নাই, উপবাসী থাকিতে হইয়াছে। এই সকল কারণে আমরা রবিবার প্রাতে সমাজের কার্য করিলাম। কিন্তু তাহার প্রধান অন্তরায়, মূল সমাজের কার্য তখন রবিবার প্রাতে হইত। আমাদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র তাঁহারা এ বিষয় লইয়া ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন না। আমি একখানি আবেদন পত্র লিখিলাম, উহাতে মূল সমাজের কার্য রবিবার রাত্রিতে নির্বাহ করিয়া আমাদিগকে প্রাতঃকাল দেওয়া হউক, এই প্রার্থনা ছিল। এক রবিবার সমাজের কার্যান্তে আমি ও কৃষ্ণকুমার ঐ আবেদনখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তখন কৃষ্ণকুমারের বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর, আমার বয়স ১৬ বৎসর। গিরিশবাবু উক্ত আবেদনপত্র পাঠ করিয়া সভ্যদিগকে শুনাইলেন। বড় লোকদের মধ্যে প্রায় সকলেই ঘোরতর আপত্তি উপস্থিত করিলেন। রবিবার রাত্রিতে তাঁহাদের সমাজে আসা কঠিন হইবে, এইরূপ কারণ বলা হইল। তখন সুবিজ্ঞ ও নীতিপরায়ণ উকীল শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া তেজস্বী ভাষায় একটী বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমরা সকলেই পদস্থ এবং স্বাধীন। আমাদের বেহারা আছে, পাল্কী আছে ; গাড়ীঘোড়াও আছে, আমরা যখন ইচ্ছা তখনই আসিতে পারি। এই অল্পবয়স্ক পরাধীন বালকগণের সুবিধার জন্য আমরা কি এই সামান্য স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে পারিব না ? তাহাদের জন্য সমাজ স্থাপন করা আমাদেরই কর্ত্তব্য ছিল, আমরা ত সেজন্য কিছুই করি নাই, তাহারা নিজে নিজে যাহা করিয়াছে, তাহার রক্ষার জন্য কি আমাদের সামান্য ত্যাগস্বীকার করা উচিত নয় ? তাঁহার যুক্তিপূর্ণ সতেজ বাক্যে সকলেই নীরব হইলেন, আমরা রবিবার সমাজের কার্য করিতে অনুমতি পাইলাম। সেই দিন হইতে ত্রিশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া রবিবার প্রাতে শাখাসমাজের এবং রাত্রিতে মূল সমাজের কার্য নির্বাহ হইয়াছে।

শাখা সমাজ প্রতিষ্ঠার অল্প দিন পরেই আমরা একটী আলোচনা সভা স্থাপন করিয়াছিলাম। প্রতি বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে উহার কার্য হইত। চরিত্রগঠন ও ধর্মমত সম্বন্ধেই আলোচনাদি হইত। তখন সঙ্গত-সভার নাম আমরা শুনিতে পাই নাই ; মূল সমাজের সভ্যগণ আত্মোন্নতি-সাধিনী সভায় বক্তৃতাদি করিতেন। আমার স্বগ্রামনিবাসী বাল্যবন্ধু আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী নামক একটী ছাত্র এই আলোচনা-সভার প্রথম সম্পাদক হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এই আলোচনা-সভা দ্বারা ছাত্রদের জীবন গঠন ও ধর্মসাধনের যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছিল।

প্রথম ধর্ম-সংগ্রাম

আশ্বিন মাস পর্যন্ত শাখাসমাজের কার্য বেশ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইল। অনেক ছাত্র সমাজে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। আমাদের দলটী ক্ষুদ্র হইলেও বেশ জমাট বাঁধিয়াছিল, ধর্মপথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। তখন ধর্মজীবনের প্রাথমিক অবস্থা ; চরিত্র গঠন করা, সত্যপরায়ণ হওয়া, বিশুদ্ধ ধর্মমতে বিশ্বাস করা, সপ্তাহান্তে প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া উপাসনা করা এবং পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়া, ইহাই তখনকার প্রধান কার্য ছিল। যাঁহারা এই সকল বিষয়ে অগ্রসর, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইতেন।

তৎকালে আমাদের কাগমারী অঞ্চল নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুহ, দ্বারকানাথ ঘটক ও গোবিন্দমোহন ঘোষ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন। জানকীনাথ বসাক নামক একটী ছাত্র সমাজে সঙ্গীত করিতেন। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ ছাত্রদের মধ্যে অগ্রবর্তী ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ কালীকুমার বসু মহাশয় তখন সমাজের সভ্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্ম বলিয়া চিহ্নিত হন নাই।

পূজার বন্ধের পূর্বে আমাদের আলোচনা-সভায় বাড়ীতে যাইয়া কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে কথাবার্তা হইতেছিল। সম্পূর্ণরূপে পৌত্তলিকতার সংস্রব বর্জন করিতে হইবে নিধারিত হইল। একটী প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিত হইয়া স্বাক্ষর করান হইল। উহাতে লিখিত ছিল "কোনরূপ পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগ দিব না।" কেহ বলিলেন, "যোগ না

দিতে সাধ্যতম চেষ্টা করিব," এইরূপ লেখা হউক আমরা এ কথার ঘোর বিরোধী হইলাম। কালীকুমারবাবু সেদিন দর্শকরূপে সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার পরামর্শে উভয় প্রকার প্রতিজ্ঞা-পত্রই লিখিত হইল। কৃষ্ণকুমার, ঈশ্বরবাবু, প্রসন্নবাবু এবং আমি প্রথম প্রকার প্রতিজ্ঞায় স্বাক্ষর করিলাম, কালীকুমারবাবুও স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সঙ্গে স্বাক্ষর করিলেন। অনাথবাবু, আনন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজনে অন্যতর স্বাক্ষর করিলেন। এই দিন হইতে কালীকুমারবাবুর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা ও প্রীতিবন্ধনের সূত্রপাত হইল।

কালীকুমারবাবু, অনাথবাবু, কৃষ্ণকুমার এবং আমি পরামর্শ করিলাম, পূজার বন্ধে স্বদেশে যাইয়া যতদূর সম্ভব সকলে একত্রে থাকিব এবং পরস্পরের সহায়তা করিব। আমাদের বাড়ীও অধিক দূরে দূরে নয়। কালীকুমার-বাবু ও কৃষ্ণকুমার এক গ্রামবাসী। আমি বাড়ীতে যাইয়া দুই তিন দিন মাত্র ছিলাম; তখন ধর্মবন্ধুদের এমনই আকর্ষণ ছিল যে, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গৃহে থাকিতে পারিলাম না। কৃষ্ণকুমারদের বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। তখন তাঁহাদের এবং কালীকুমারবাবুদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইতেছিল। আমরা পূজার কোন কাজে যোগ দিলাম না। প্রতিমা প্রণাম কি প্রসাদ গ্রহণ কিছুই করিলাম না। গ্রামে খুব আন্দোলন হইল। কালীকুমার বাবু সন্তোষের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺দ্বারকানাথ রায় চৌধুরীর সহোদর ভ্রাতা, তখন ঐ অঞ্চলে তাঁহাদের প্রবল প্রভাব। তাঁহাকে কেহ বড় কিছু বলিল না; অতিথি বলিয়া আমিও সহজেই মুক্তি পাইলাম, কৃষ্ণকুমারের উপর বেশ উৎপীড়ন হইল—তিনি স্থির ও অটলভাবে সহ্য করিলেন।

অনাথবাবুর কোন পুরুষ অভিভাবক ছিলেন না, তাঁহার মাতৃদেবী এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীই বাড়ীতে অভিভাবিকা ছিলেন, সুতরাং অনাথবাবু একরূপ স্বাধীন ছিলেন। পূজার পরে আমি ও কৃষ্ণকুমার অনাথবাবুর বাড়ীতে কয়েকদিন একত্রে বাস করিলাম। প্রত্যহ একত্রে উপাসনা, সঙ্গীত, ধর্মগ্রন্থ পাঠ এবং বিবিধ আলোচনা হইত। খুব উৎসাহ আনন্দে দিন কাটিতেছিল, এমন সময়ে একটী সঙ্কট উপস্থিত হইল। ময়মনসিংহ প্রবাসী বাবু তারকনাথ রায়ের কন্যা শ্রীমতী রাধাসুন্দরীর সঙ্গে অনাথবাবুর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল। ইঁহাদের বাড়ী মালুচি। বন্ধের মধ্যেই বিবাহ হইবে। এই পরিবারের

সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল; অনাথবাবুও ধর্মবন্ধু। এই বিবাহ হইবে শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলাম। হিন্দুমতে যে বিবাহ হইবে, তাহাতে কোন আপত্তি মনে হইল না; তখন ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু বিবাহ সময়ে কালীপূজা হইতে পারিবে না, অনাথবাবুকে বলিয়া রাখিলাম। আমাদের দেশে সাধারণত বর বিবাহার্থ যাত্রা করিবার পূর্বে কালীপূজা হইয়া থাকে। অনাথবাবুও পূজা হইবে না বলিয়া আশ্বাস দিলেন। আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। তিনি আমাদিগকে বিবাহে যাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু অভিভাবকগণের অনুমতি ভিন্ন যাওয়া উচিত নয় বলিয়া অস্বীকৃত হইলাম। যাহা হউক, যে দিন বরযাত্র চলিয়া যাইবে, তাহার পূর্বদিন ১১টার সময় আমরা স্নানান্তে উপাসনা হইতে উঠিয়াই দেখিলাম, কালী-প্রতিমা, পাঁঠা প্রভৃতি উপস্থিত; রাত্রিতে পূজা হইবে। শুনিলাম, আমাদের ভয়ে অন্যত্র পূজার আয়োজন হইয়াছিল, এখন গৃহে আনা হইল। আমরা খুব উত্তেজিত হইলাম, অনাথবাবুকে অন্বেষণ করিয়া পাইলাম না। তখনই আমরা দুইজনে কাপড় ও পুস্তকাদি লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। অনাথবাবুর মা ও দিদিঠাকুরাণী পিছে পিছে ডাকিতে লাগিলেন, ওরে রান্না হয়েছে, চারিটী খেয়ে যা, এত বেলায় না খেয়ে কোথায়ও যেতে নাই— ইত্যাদি কথায় কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু তখন আর কে কার ডাক শোনে! দুইজনে একবারে দুই মাইল দূরে কাগমারীর বন্দরে গিয়া উপস্থিত! তথায় দুইপয়সার চিড়াগুড় দিয়া জল খাইয়া নদীর কূলে কূলে ঘুরিয়া প্রায় ৩ টার সময়ে বাথিল গ্রামে কৃষ্ণকুমারের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কৃষ্ণকুমারের মা আমাদের মলিন ও ব্যথিত মুখ দেখিয়া কতই ব্যস্ত হইলেন, কতই আদরযত্নে কাছে বসাইয়া আহার করাইলেন। আহা, তাঁহার সেই স্নেহযত্ন ও মাতৃভাবের মধুর স্মৃতি আজিও প্রাণমন পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে! এইরূপে ঈশ্বরকৃপায় আমরা জীবনের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম; আমাদের দেহে বল, প্রাণে উৎসাহ ও মনে সাহস খুব বাড়িয়া গেল।

পূজার বন্ধের পর আবার নবোৎসাহে সহরে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু এবার আমাদের দলটীতে মহা পরিবর্তন ঘটিল। অনাথবাবু ও প্রসন্নবাবু প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে চলিয়া গেলেন, ঈশ্বরবাবু স্থানত্যাগ করিলেন। শাখা সমাজের সভ্যসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া পড়িল। ক্রমে এমন অবস্থা

ঘটিল যে, আমি ও কৃষ্ণকুমার দুইজন মাত্র অবশিষ্ট রহিলাম। কৃষ্ণকুমার উপাচার্য, আমি সম্পাদক ও গায়ক। কিন্তু অধিক দিন এ অবস্থা রহিল না। আমরা স্থির করিলাম, প্রত্যেকে এক জন করিয়া নূতন সভ্য সংগ্রহ করিব। আমি এক জনকে ধরিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, তাহা শুনিয়া কৃষ্ণকুমার বলিলেন, ওকে ত আমিই আগে বলিয়াছি, তুমি আর একজন দেখ! ইহা নিয়া দুজনে কতই আড়াআড়ি ও সপ্রেম কলহ হইত! ক্রমে ঈশ্বরকৃপায় শাখা সমাজের সভ্যসংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল। শ্রীমান রমাপ্রসাদ বিষ্ণু, কালীকুমার মিত্র, কৈলাসচন্দ্র মজুমদার, রুক্মিণীকান্ত মজুমদার প্রভৃতি এই সময়ের উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ

কেরাণীপাড়ার সেই পুরাতন বাঙ্গলাতেই ব্রাহ্মসমাজের কার্য চলিতেছিল। গৃহখানি জীর্ণ হইয়াছিল। তখন গোপীবাবু, কালীকুমারবাবু প্রভৃতি উৎসাহী কর্মিগণ সমাজে যুক্ত হইয়াছেন। আমরা নবোৎসাহী যুবকমণ্ডলী তাঁহাদের সহচর। ঐ স্থানে একটী ইষ্টকালয় করিতে সকলেরই ইচ্ছা হইল। তখন মহারাজ স্র্য্যকান্ত তরুণবয়স্ক যুবক, অল্পদিন হইল কলিকাতার রাজেন্দ্র মিত্রের "ওয়ার্ডস্কুল" হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন মাত্র। যে সকল কর্মচারীর উপর জমিদারীর ভার ছিল, তন্মধ্যে পূর্বোক্ত দ্বারকানাথ ঘটক মহাশয়ের পিতা কালীপ্রসাদ ঘটক মহাশয় প্রধান ছিলেন। নানা কারণে তিনি ব্রাহ্মদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না; তাঁহার পুত্রদ্বয় দ্বারকানাথ ও জানকীনাথ উভয়েই ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী হওয়াতে তাঁহার মন আরও বিরূপ হইয়াছিল। যে কারণেই হউক ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের অধিকৃত স্থানে দালান দিবার অনুমতি পাইলেন না। এই সময় প্রসিদ্ধ আলেকজাণ্ডার সাহেব এ জেলার কালেক্টার ছিলেন, খাজাঞ্চি গোপীবাবুর প্রতি তাঁহার সুদৃষ্টি ছিল। তাঁহার কৃপায় "তালুক বেয়ার্ড" নামক গবর্ণমেণ্টের জমিতে একটু স্থান পাওয়া গেল। এই স্থানে দালান তুলিবার উদ্যোগ হইল। সেরপুরের সুশিক্ষিত জমিদার বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী ব্রাহ্মসমাজের পরম হিতৈষী ছিলেন; সেরপুরেও তিনি একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কার্যের জন্য ৮০০ শত টাকা দান করিলেন। তাঁহার প্রদত্ত দানই এই কার্যের

প্রধান সম্বল হইল। সমাজের পূর্বগৃহ ও ভূমি ঢাকার গণি মিঞার (পরে নবাব আবদুল গণি, সি, এস, আই,) নিকট ৭৫৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হইল।

এই সময়ে জেলা স্কুলের শিক্ষক কালীকুমারবাবু এবং গিরিশবাবু একত্রে এক বাসায় থাকিতেন। এখন যে স্থানে মহারাজ সূর্য্যকান্তের প্রকাণ্ড প্রাসাদ হইয়াছে, তাহার পশ্চিম প্রান্তে এই বাসা ছিল। এই বাসার বাহিরবাড়ীতে একখানি দোচালা ঘরে ব্রাহ্মসমাজের কার্য নির্বাহ হইতে লাগিল। ঐ বাসার অন্তভাগে কালীচরণ ঘোষের দালানে হেডমাষ্টার পার্বতীবাবুর বাসায় কিছুদিন সমাজের কার্য হইয়াছিল। গিরিশবাবুর স্ত্রীবিয়োগ হইবার পরে তিনি এই বাসারই সম্মুখভাগে (জেলাস্কুলের পুষ্করিণীর দক্ষিণে) স্বতন্ত্র বাসা করিয়া বাস করিয়াছিলেন। আমরা বহু স্বজনত্যক্ত ব্রাহ্ম যুবক তথায় আশ্রয় পাইয়াছিলাম। সুতরাং এই স্থানটীর সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের বিশেষ যোগ আছে, উহার সঙ্গে আমাদের অনেক পুরাতন স্মৃতি জড়িত আছে।

গোস্বামী মহাশয়ের তৃতীয়বার আগমন

১৮৬৮ সালের শীত ঋতুতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পুনরায় এখানে আগমন করিলেন। তখন ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে। আমরা দূরে থাকিয়া ধর্মতত্ত্বে সে বিবরণ পাঠ করিতাম। আমাদেরও সংকীর্তন করিতে সাধ হইত।* গোস্বামী

* "ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্তন ও খোলের আগমন এক নূতন ব্যাপার। কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে যখন ভক্তিভাব সঞ্চারিত হইল তখন তাঁহার হৃদয় এই ভাবোপযোগী উপকরণের জন্য ব্যাকুল হইল। সংকীর্তন ও খোলের প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তাঁহার বন্ধুগণ এ বিষয়ে অনুকূল ছিলেন না; তাঁহাদের শান্তভাব-প্রধান জীবন খোল করতাল উপহাসের দৃষ্টিতে দর্শন করিত। ভগবৎ কৃপায় কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে যখন যে ভাবের সঞ্চার হইত, তখন সেই ভাব অলক্ষিত ভাবে বন্ধুগণের হৃদয়ে সংক্রামিত হইত। সুতরাং তিনি প্রতিকূলাবস্থার উপরে দৃষ্টি করিয়া ভাবানুরূপ কার্য করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। প্রথমত একজন সংকীর্তক বৈষ্ণবকে আনয়ন করিবার জন্য একজন বন্ধুকে (মহেন্দ্রনাথকে) নিয়োগ করিলেন। পটলডাঙ্গার প্রচারক-নিবাসে গোবিন্দ দাস নামা একজন কীর্তনীয়াকে আনা হইল। তিনি মৃদঙ্গ যোগে প্রথমত এই গানটী করিলেন, "প্রেম পরশমণি শ্রীশচীনন্দন।" এই গানে কেশবচন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হইল। আর দুই একবার বৈষ্ণব মুখে গান শ্রবণ করিয়াই, পূর্বোক্ত বন্ধুকে একটী মৃদঙ্গ ক্রয় করিয়া আনিতে বলিলেন। সাধু অঘোরনাথ এই বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইয়া

মহাশয়ের মুখে সংকীর্তন শুনিয়া আমাদের অনেকের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। আমরা তাঁহার নিকট সংকীর্তন শিক্ষা করিলাম। তখন অতি অল্প-সংখ্যক সংকীর্তন রচিত হইয়াছিল, তাহাই পুনঃ পুনঃ গান করা হইত। "শ্রীবাসের আঙ্গিনার মাঝে আমার গৌর নাচে" এই গানের সুরে, "অখিল-তারণ বলে একবার ডাক তাঁরে" এই সংকীর্তন রচনা করিয়া গোস্বামী মহাশয় গাহিলেন; আমরা আমাদের চির পরিচিত সুরে ব্রহ্ম সংকীর্তন করিয়া বড়ই তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিলাম। ব্রহ্মজ্ঞানীরা বৈষ্ণবদের ন্যায় খোল করতাল বাজাইয়া সংকীর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এ সংবাদে সহরে খুব আন্দোলন উপস্থিত হইল, লোকে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল, কেহ কেহ প্রশংসাও করিল। সমাজঘরে আর লোক ধরিত না। বস্তুত তখন বিজয়কৃষ্ণের অগ্নিময় বক্তৃতা, সুমধুর উপাসনা, ও ভক্তি-রস-পূর্ণ সংকীর্তনে এই নগর যেন টলমল করিতেছিল। তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রসঙ্গ ভিন্ন লোকের মুখে অন্য কথা ছিল না।

কিশোরীমোহন বক্সী নামে একজন মোক্তার কালীকুমারবাবুর বিশেষ অনুগত ছিলেন। ইনি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী এবং সংকীর্তনপ্রিয় ছিলেন।

মানিকতলায় মৃদঙ্গ ক্রয় করিতে গেলেন। তাঁহারা তখন কেশবচন্দ্রের ভাবে অন্তঃপ্রবিষ্ট হন নাই, অথচ গূঢ়রূপে তাঁহার ভাব তাড়িত সঞ্চারের ন্যায় তাঁহাদিগের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাই মৃদঙ্গ ক্রয় করিয়াই পথে বাজাইতে বাজাইতে প্রচারক-আবাসে উপস্থিত করিলেন। খোল আসিল, কিন্তু কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণের মন তখন খোলের জন্য প্রস্তুত নহে। উপাসনার কালে খোল বাজিলে কাহারও কাহারও উপাসনার ব্যাঘাত হইবে, এরূপ কথা হওয়াতে স্থির হইল যে, উপাসনা শেষ হইলে, যাঁহারা থাকিবার থাকিবেন, যাঁহারা ইচ্ছা হয় চলিয়া যাইবেন, তৎপর খোল বাজাইয়া কীর্তন হইবে। এই প্রস্তাব অনুসারেই কার্য হইতে লাগিল। ২০শে আশ্বিন কীর্তন প্রথম আরম্ভ হয়। গোস্বামী-সন্তান বিজয়কৃষ্ণের স্বভাবত বৈষ্ণব ভাব, তিনি তৎকালে সংকীর্তনের প্রধান সহায় হইলেন; এবং নিম্নলিখিত দুইটী সংকীর্তন প্রস্তুত করিয়া গান করিলেন। প্রথমটী গোবিন্দ দাস কর্তৃক গীত "প্রেম পরশমণি শ্রীশচীনন্দন" এই সুরে গ্রথিত।

১ম। পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই
পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে।

২য়। পতিতপাবন, ভকতজীবন, অখিলতারণ বল রে সবাই।"

আচার্য কেশবচন্দ্র, আদি বিবরণ।

কালীকুমারবাবুর অনুরোধে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া খোল বাজাইতেন। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গগুণে ইঁহার চিত্তে ব্যাকুলতার সঞ্চার হইয়াছিল— ভাবোচ্ছ্বাসে ক্রন্দন করিতেন। ইঁহার মুখে একটী প্রাচীন সংকীর্তন শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় একটী ব্যাকুল ভাবের নূতন সংকীর্তন রচনা করিয়াছিলেন; আমরা বহু বৎসর সেই কীর্তনটী গাহিয়াছিলাম। এই কীর্তনটী সঙ্গীতপুস্তকে উঠে নাই বলিয়া অন্যত্র প্রচারিত হয় নাই, কিন্তু উহা তৎকালের বিশেষ ভাব প্রকাশক বলিয়া এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম।

কীর্তন

সকল শূন্যময় হেরি, না হেরিয়ে বিভু নয়নে। আমার হৃদয় শুকায়ে গেল হে (এ)। শুনেছি সাধুসদনে, চায় যে তাঁরে, তাঁহারে দেখিতে পায়; নিজ অন্তরে, আমি ডাকিতে পারি না মোহে, পাইব কেমনে॥ পড়েছি অগাধ কূপে, না দেখি উপায়, বিনা সেই করুণা-সিন্ধু প্রভু দয়াময়; তাঁর নামের গুণে পাপী তরে শুনেছি শ্রবণে॥

এই সময়ে ছাত্রগণের মধ্যে যেরূপ ধর্মোৎসাহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা হয় না। শাখাসমাজের সভ্য সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। সমাজের সর্ববিধ মঙ্গলকার্যে তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময়ের একটী ঘটনা আজও বিশেষরূপে স্মরণ হয়। গোস্বামী মহাশয় এ স্থানে যে কয়দিন ছিলেন তিনিই মূল ও শাখাসমাজে উপাসনা করিতেন, সমাজ-ঘরে লোকারণ্য হইত। এক রবিবার প্রাতে শাখাসমাজের উপাসনা হইবে, বহুলোক আসিয়াছেন; এমন সময়ে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, আজ আর আমি উপাচার্যের কার্য করিব না; সমাজের কাজ সর্বদা যেমন হয়, সেইরূপ হউক, আমরা উপাসনায় যোগ দিব। তখন ছাত্রেরাই শাখাসমাজে উপাচার্যের কার্য করিতেন, কৃষ্ণকুমার নিয়োজিত উপাচার্য ছিলেন। তিনি ত আমার উপর ভার দিয়া নীরবে এক কোণে যাইয়া বসিলেন। আমার ত চক্ষু স্থির! বুকের ভিতর কম্প উপস্থিত হইল। নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক, জেলাস্কুলের হেড মাষ্টার প্রভৃতি লোক উপস্থিত, তার পর ভক্তিভাজন গোস্বামী মহাশয়, গিরিশবাবু, গোবিন্দবাবু, গোপীবাবু প্রভৃতি পূজনীয় লোক আছেন; কেমন করিয়া কি করা যায়! কিন্তু না করিলেও

নয়, গুরুজনের আদেশ পালন করিতেই হইবে। কম্পিতহৃদয়ে চেয়ারে বসিলাম, পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ বেঞ্চে বসিলেন। কাহারও দিকে না চাহিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যথারীতি উপাসনা করিলাম। এই ঘটনায় হৃদয়ে নূতন শক্তি ও সাহসের সঞ্চার হইল।

এই যাত্রায় গোস্বামী মহাশয় এখানকার ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গেলেন। সেদিন আমাদের কতই আনন্দ, কতই উৎসাহ! গোপী বাবুর অটল উৎসাহ ও পরিশ্রমে মন্দিরের নির্মাণ কার্য চলিতে লাগিল। আমরা যুবকগণ যথাসাধ্য তাঁহার সহকারিতা করিতে লাগিলাম।

ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত বাবু শরচ্চন্দ্র রায় ও বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ এই সময়ে শাখাসমাজের উপাসনায় উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। * বাবু

* ভাই বৈকুণ্ঠনাথ তাঁহার স্বরচিত জীবনীতে এই সময়ের যে বিবরণ দিয়াছেন, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। "১৮৬৯ সালের প্রথম ভাগে আমি ময়মনসিংহে যাইয়া জেলা স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে প্রবেশ করি। তখন আমার বয়স ১৩।১৪ বৎসর। একটী যুবক বন্ধু আমাকে ব্রাহ্মসমাজে যাইতে বলেন, আমারও ইচ্ছা হইত। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যাইতে সাহস হইত না। একদিন আমি একাকীই ব্রাহ্মসমাজে গেলাম। ভক্তিভাজন গিরিশবাবুর বাসায় ব্রাহ্মসমাজের একখানি ঘর ছিল, তথায় সমাজ হইত। এখন যেখানে মহারাজ সূর্য্যকান্তের রাজবাড়ী হইয়াছে, তাহার পশ্চিম দিকে সে গৃহ ছিল। প্রথম দিন গৃহের ভিতরে যাইতে সাহস হইল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া সংগীত ও প্রার্থনা শ্রবণ করিলাম। দ্বিতীয় দিনও বাহিরে দাঁড়াইয়াই শুনিতেছি, তখন জেলা স্কুলের মাষ্টার বাবু কালীকুমার গুহ মহাশয় আমাকে ভিতরে যাইয়া বসিতে বলিলেন। আমিও নিঃশঙ্কমনে ভিতরে যাইয়া বসিলাম। উপাসনা বড় কিছু বুঝিলাম না, সঙ্গীত বেশ বোধ হইল। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিস্থাপনের দিন তথায় গেলাম। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রার্থনা করিয়া ভিত্তি স্থাপন করিলেন। দুই এক দিন ব্রাহ্মসমাজে যাইতে দেখিয়া বাবু শ্রীনাথ চন্দ আমাকে দুই এক খানি ব্রাহ্মধর্মসংক্রান্ত বই পাঠাইয়া দেন। পৌত্তলিক প্রবোধ ও ধর্মশিক্ষা নামক পুস্তক পাঠ করিয়া আমার বড়ই উপকার হইল।

"চারুমিহির নামক সংবাদ পত্রে শরৎবাবুর যে সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে আগমনের প্রথম বিবরণ এইরূপ লিখিত ছিল—"জেলা স্কুলের পণ্ডিত গিরিশ বাবুর বাসায় ব্রহ্মোপাসনার জন্য একখানি তৃণ-কুটীর ছিল, এই গৃহের পশ্চিম পার্শ্বস্থিত একটী খর্জুর বৃক্ষের তলে ব্রাহ্মগণের সহিত শরৎ বাবুর প্রথম সাক্ষাৎ। শরৎচন্দ্র একটী হিন্দু মোক্তারের মোহরের ছিলেন, রাত্রিতে গোপনে এই খর্জুর বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মোপাসনা শুনিতেন। তখন ব্রাহ্মগণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় নাই; তিনি প্রকাশ্যে

মধুসূদন সেন তখন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র; তিনি ছাত্র না হইলেও ছাত্রদের সঙ্গেই মিশিতেন এবং শাখা সমাজের সভ্য হইয়াছিলেন।

আত্মকথা

আমি এতদিন জমিদার কালীবাবুর গৃহে থাকিয়া নর্মাল স্কুলে পড়াশুনা করিতেছিলাম। ১৮৬৮ সনের ৩রা চৈত্র আমার পূজনীয় পিতৃদেব সহসা পরলোক গমন করিলেন। বাড়ী হইতে একটী লোক আসিয়া তাঁহার পীড়ার সংবাদ জানাইল, আমি সেই দিনই গৃহে গমন করিলাম, কিন্তু যাইয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। আমি কনিষ্ঠ পুত্র, আমার উপর পিতার বড়ই স্নেহ ছিল; তাঁহার শোক হৃদয়ে বড় আঘাত করিল। তখনও ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠানাদির তেমন প্রচলন হয় নাই; কি করিতে হইবে, কিছুই জানিতাম না; কেবল কোনরূপ পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিব না এই ধারণা ছিল। যাহা হউক, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই শ্রাদ্ধাদি করিলেন, আমাকে বিশেষ কিছু করিতে হইল না। তখন আমি নিরামিষ আহার করিতাম; শ্রাদ্ধান্তে 'মৎস্যমুখীর' দিন সকলে বলিলেন, আমাকেও মাছ খাইতে হইবে, নতুবা অশৌচ যাইবে না। আমি বলিলাম, মা ত মাছ খাইবেন না। তবে তাঁর অশৌচ যাইবে কিরূপে? একথায় সকলে নীরব হইলেন, আমার প্রতি আর কোন পীড়াপীড়ি হইল না।

সহরে ফিরিয়া আসিবার কয়েক দিন পরেই আমার আশ্রয়দাতা কালীবাবু অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন; আমি দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইলাম। কালীবাবু নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁহার সহধর্মিণী আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, তাঁহার কথা এজীবনে ভুলিতে পারিব না। এই সময়ে

ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের শক্তি লাভও করেন নাই। এদিকে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁহার অন্তরে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে, তখন হইতেই তিনি উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন। হিন্দু বন্ধুগণের দিকে চাহিয়া প্রকাশ্যে উপাসনা করিতেন না; নদীতে স্নানের সময় ডুব দিয়া ভগবানকে প্রণাম করিতেন, প্রাণের গভীর প্রার্থনা জানাইতেন। অতঃপর তিনি শাখাসমাজের সভ্য হইয়া প্রতি রবিবারে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে আসিতে আরম্ভ করিলেন।

বিক্রমপুর মালখানগর নিবাসী বাবু জগৎচন্দ্র বসু মহাশয় এ জেলার আবকারীর দারোগা ছিলেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের স্থায় তৎকালে এই পদের গৌরব ছিল। তখন 'জগৎ দারোগা'র নাম সহরে সুপরিচিত ছিল। তিনি অতিশয় পরোপকারী ও দয়াবান লোক ছিলেন। কালীবাবু তাঁহাকে ভ্রাতৃবৎ প্রীতি ও বিশ্বাস করিতেন। তিনিও এই পরিবারের সর্বেসর্বা ছিলেন। কালীবাবুর শোকাতুরা সহধর্মিণী ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় দারোগা মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, শ্রীনাথ আমার অতিশয় স্নেহের পাত্র, ইহাকে আপনার কাছে রাখিয়া যাই ; ইহার সমস্ত ব্যয় আমি দিব। দারোগা মহাশয় আমাকে সস্নেহে নিজ পরিবারে স্থান দিলেন, এবং আমার সকল ভার তিনি গ্রহণ করিলেন। আমার জন্য কিছুই দিতে হইবে না, এই কথা জানাইয়া উক্ত পূজনীয়া মহিলাকে সন্তুষ্ট করিলেন। তদবধি প্রায় ৩ বৎসরকাল আমি তাঁহার পরিবারে পুত্র নির্বিশেষে বাস করিয়াছিলাম। একদিনের জন্যও কোন অভাব বা কষ্ট অনুভব করি নাই। তাঁহাদের সেই অকারণ স্নেহমমতা কি এজীবনে কখনও ভুলিতে পারি? পরের জন্য লোকে এরূপ করিতে পারে, পূর্বে ইহা জানিতাম না।

ব্রাহ্মসমাজে ভক্তিবিরোধী আন্দোলন

১৮৬৮ সালে অষ্টাত্রিংশ মাঘোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় প্রথম নগর-সংকীর্তন হয়। ধর্মতত্ত্বে সে বিবরণ পড়িয়া আমরা বড়ই উৎসাহ ও আনন্দ লাভ করিলাম। মাঘোৎসবের ভাব এই আমরা প্রথম পাইলাম। এখানেও আমরা সেই বিখ্যাত কীর্তনটি ঘরে ঘরে গাহিতে লাগিলাম। তখন হইতে প্রতি শনিবার ব্রাহ্মদের বাসায় বাসায় সংকীর্তন করিবার ব্যবস্থা হইল। শরৎচন্দ্র দত্ত নামক একটী ছাত্র খোল বাজাইত, আমরা কীর্তন করিতাম, কালীকুমারবাবু আমাদের অগ্রণী ছিলেন। ছাত্রটীকে সকলে 'খোলী শরৎ' বলিয়া ডাকিতাম।

ইহার কিছুদিন পরে কলিকাতা ও মুঙ্গেরে "ভক্তিবিরোধী আন্দোলন" উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাহা একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুবর্তী প্রচারকগণ ভক্তি-রসে প্রমত্ত হইয়া উপাসনা ও কীর্তনাদিতে এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন, এবং উপাসকদিগের মধ্যে

অনেকে এরূপ ব্যাকুল হৃদয়ে কেশব বাবুর চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতেন, যাহা দেখিয়া লোকের মনে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হইত। মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজেই ভক্তি ভাবের অতিশয় বাহ্যপ্রকাশ হইয়াছিল। বিজয় বাবু স্বয়ং ভক্তিধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াও এই নবভাবের মহাবিরোধী হইয়া উঠিলেন। তিনি এবং প্রচারক যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই ব্যাপারকে "নরপূজা" আখ্যা প্রদান করিয়া ব্রাহ্মসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। প্রসিদ্ধ প্রাচীন ব্রাহ্ম ঠাকুরদাস সেন কেশব বাবুর নির্দোষিতা প্রমাণ করিয়া "ভক্তিবিরোধীদিগের আপত্তিখণ্ডন" নামে এক পুস্তক প্রকাশ করিলেন। যাহা হউক ঈশ্বর কৃপায় অতি শীঘ্রই এই আন্দোলন থামিয়া গেল। বিজয়কৃষ্ণ পুনরায় কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন। কিন্তু যদুবাবু অতঃপর আর প্রচারক থাকিলেন না; বিষয়কর্ম গ্রহণ করিয়া গৃহস্থ ব্রাহ্ম হইয়া রহিলেন। আমরা দূরদেশে থাকিয়া অত্যন্ত আগ্রহ ও ভয়ের সহিত এই আন্দোলনের সমস্ত ঘটনা অবগত হইতাম; এবং আমাদের প্রিয়তম আচার্য্যের প্রতি যে সকল অসম্ভব দোষ আরোপিত হইতেছিল, তাহা যাহাতে অযথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ব্যাকুল অন্তরে তাহারই প্রতীক্ষা করিতাম। বিধাতার কৃপায় আমাদের আশা পূর্ণ হইল, আমাদের বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রহিল। ভক্তি-ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইয়া আচার্য কেশবচন্দ্রকে রাহুমুক্ত শশধরের ন্যায় দ্বিগুণ শোভায় সুশোভিত করিল।

প্রথম কলিকাতায় গমন

১৮৬৯ সালের আশ্বিন মাসে আমি নর্ম্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষা প্রদান করিলাম। পরীক্ষান্তে কলিকাতায় গমন করিতে ইচ্ছা হইল। কলিকাতা দেখিতে, বিশেষত দেবেন্দ্রবাবু, কেশববাবু ও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে বড়ই আগ্রহ জন্মিয়াছিল। ঈশ্বর কৃপায় তাহার উত্তম সুযোগও উপস্থিত হইল। আমার পরমহিতৈষী শ্রদ্ধাস্পদ কালীকুমারবাবু মহাশয় এই বন্ধে কলিকাতা যাইবেন শুনিয়া আমিও তাঁহার সঙ্গী হইলাম। তাঁহার সঙ্গে বাখিল যাইয়া তথা হইতে নৌকাপথে ঢাকায় গেলাম। এই সময়ে গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে ঢাকায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার যুবক বন্ধুদিগকে নিয়া বিশেষ ভাবে

ধর্মসাধনায় ও ব্রাহ্মসমাজের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। মুসলমান যুবক জালালউদ্দীন তখন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। ঢাকায় মহা হুলস্থূল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় জুতার দোকান দিয়াছেন; সুপরিচিত পরিবারের যুবকগণ ব্রাহ্ম হইয়া জাতিভেদ ও সমাজবন্ধন ছিন্ন করিতেছেন; প্রাচীন সমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকায় ক্রমাগত গালাগালি চলিয়াছে। এইরূপ সময়ে ঢাকায় যাইয়া যুবক ব্রাহ্মগণের উদ্যম ও নির্ভীকতা দেখিয়া হৃদয়ে নূতন বল ও উৎসাহের সঞ্চার হইল।

কয়েকদিন ঢাকায় থাকিয়া আমরা ষ্টীমারযোগে কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। তখন গোয়ালন্দ পর্যন্ত রেলপথ হয় নাই; কুষ্টিয়া যাইয়া রেলগাড়ি ধরিতে হইত। ঢাকা হইতে কুষ্টিয়া যাইতে ৫।৬ দিন লাগিত। বিক্রমপুরের নিকটবর্তী কোন ষ্টেসনে কয়েকটী কলেজের ছাত্র ষ্টীমারে উঠিলেন দেখিলাম। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই ব্রাহ্ম বলিয়া মনে হইল। পরে যখন জানিলাম তাঁহারা তৎকালপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম যুবক নিশিকান্ত, অঘোরনাথ, সারদাকান্ত এবং কালীপ্রসন্ন, তখন আর আনন্দের সীমা রহিল না। আহা, তখন একটি ব্রাহ্মের সঙ্গে দেখা হইলে মনে কতই আনন্দ হইত, কতই যেন নিকট-আত্মীয় পাইলাম বলিয়া হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিত! ইঁহাদিগকে পাইয়া ত সুখী হইবারই কথা। আমরা ৫।৬ দিন একত্রে উপাসনা, সঙ্গীত, সদালাপ, সৎগ্রন্থ পাঠ এবং স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহারাদি করিয়াছিলাম। এ কয়েকটা দিন যে কত সুখে কাটিয়াছিল তাহা বলা যায় না। পথের কষ্ট কিছুই মনে পড়ে নাই। কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্ম হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে অভিভাবকগণ গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি রাত্রিতে পলায়ন করিয়া একখানি ক্ষুদ্র নৌকা স্বয়ং বাহিয়া ষ্টীমার ধরিয়াছেন। তাঁহার মুখে সেই সকল কথা শুনিয়া প্রাণে কতই উৎসাহ লাভ করিলাম।

কলিকাতায় যাইয়া আমরা প্রচারক মহাশয়দিগের সঙ্গে রহিলাম। তখন কোন বাড়ীটীতে প্রচার-কার্যালয় ছিল মনে নাই। কলুটোলার বাড়ীতে প্রত্যহ উপাসনায় যাইতাম—কেশবচন্দ্রের সুমধুর উপাসনায় এবং উপাসনান্তে সংকীর্তনের মত্ততায় মনের ভিতরে এক নব রাজ্য

খুলিয়া গেল। ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহে তাঁহার চতুর্থ কন্যা বর্ণকুমারীর বিবাহ-সভায় তাঁহাকে দেখিলাম। এক বুধবার কলিকাতা সমাজে গিয়াছিলাম—দেবেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না—শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী উপাসনা করিলেন; বিষ্ণুর গান শুনিলাম। ময়মনসিংহনিবাসী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম কালীনাথ দে মহাশয় তখন বগুড়া জেলা-স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন, কলিকাতায় তাঁহার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হইল। তিনি বিধবা-বিবাহ করিয়াছিলেন; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল। এক দিন তাঁহার সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে গেলাম। তিনি কতই আদর ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন। কেন কলিকাতায় আসিয়াছি জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছিলাম, অধ্যয়ন শেষ করিয়া আপনাদিগকে দেখিতে আসিয়াছি। তিনি হাসিয়া বলিলেন, অধ্যয়ন শেষ করিয়া দেশ-পর্যটন করা ত কর্তব্যই বটে। কথায় কথায় বাল-বিধবাদের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সে দিন সেই পুণ্যতীর্থে বসিয়া প্রাণে যে সঙ্কল্পের উদয় হইয়াছিল, ঈশ্বর প্রসাদে তাহা একেবারে অপূর্ণ রহে নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা

আঘাত ব্যতীত শক্তির স্ফূর্তি হয় না ; অনুকূলতা প্রাপ্ত না হইলে অঙ্কুর শুকাইয়া যায়। ব্রাহ্মগণের প্রতি বাহিরের পীড়ন যতই প্রবল হইতেছিল, তাঁহাদের ঈশ্বরে নির্ভর ও বিশ্বাসের তেজ ততই বৃদ্ধি পাইতেছিল। পক্ষান্তরে সেই প্রাচীন সমাজের লোকদিগের মধ্যেই অনেকে প্রেমহস্ত প্রসারিত করিয়া ব্রাহ্মদিগকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। ব্রহ্মমন্দির নির্মাণে হিন্দুগণই অধিকাংশ অর্থ প্রদান করিলেন ; তাঁহাদের অর্থবলে এবং যুবক-মণ্ডলী-পরিবৃত গোপীকৃষ্ণের অক্লান্ত পরিশ্রমে সুবিস্তৃত ময়দান মধ্যে সুন্দর ব্রহ্মমন্দির মস্তকোত্তলন করিল। যে দিন হরিতক্ষেত্রে শ্বেত পক্ষীটীর ন্যায় ব্রহ্মমন্দির সুশোভিত হইয়া দাঁড়াইল, সে দিনের উৎসাহ আনন্দ কাহাকে বলিব ? আমরা বন্ধুগণ দলে দলে যাইয়া দিনে কত বার মন্দির দেখিয়া আসিতাম ; মন্দিরের বৃহৎ বৃহৎ বেঞ্চ মস্তকে বহন করিয়া নিয়া যাইতাম। কবে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে, সকলে মিলিয়া তথায় উপাসনা করিব, এই ভাবিয়া প্রাণ আকুল হইত, আর বিলম্ব সহিত না।

১৮৬৯ সালের মাঘ মাসে কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ সালের ৭ই ভাদ্র তথায় রীতিমত ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হয়। এই বৎসরই ২১শে অগ্রহায়ণ (বাঙ্গলা ১২৭৬ সাল) ঢাকায় পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠা হইল। স্বয়ং কেশবচন্দ্র সদলে ঢাকায় আসিয়া ঐ পবিত্র কার্য নির্বাহ করিলেন।* তখন আমাদের মন্দিরের নির্মাণকার্যও প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে। কেশব বাবু আসিয়া এই মন্দিরের

* ১৭৯১ শকের অগ্রহায়ণ মাসে পূর্ববাঙ্গলা ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভাই অমৃতলাল বসু, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র এবং শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবীশকে সঙ্গে করিয়া আচার্য কেশবচন্দ্র ২০শে অগ্রহায়ণ ঢাকা নগরে সমাগত হন। ২১শে অগ্রহায়ণ রবিবার মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাতঃকালে ব্রাহ্মগণ পুরাতন সমাজগৃহে সমবেত হইলে কেশবচন্দ্র ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে প্রার্থনা করেন। তৎপর "তোরা আয় রে ভাই" এই বিখ্যাত নগরকীর্তন গাহিতে গাহিতে সকলে ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। সকলে মন্দিরে আসন গ্রহণ করিলে গৃহ-নির্মাণ কমিটীর সভাপতি অভয়চন্দ্র দাস মহাশয় গৃহের উদ্দেশ্য বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। তৎপর আচার্য মহাশয় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলেন। ২২শে

প্রতিষ্ঠা করেন সকলের একান্ত ইচ্ছা হইল, কিন্তু কার্যানুরোধে তিনি আসিতে পারিলেন না। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র, বঙ্গচন্দ্র রায়, কালীনারায়ণ গুপ্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ এবং আনন্দকান্ত গুপ্ত, গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র সেন প্রভৃতি যুবকগণ ঢাকা হইতে এখানে আগমন করিলেন। ৫ই পৌষ আমাদের মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন স্থির হইল।

১৮৬৮ সালে মাঘ মাসে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন দিনে যে নগর-সংকীর্তন হইয়াছিল, ঢাকা এবং ময়মনসিংহেও সেই নগর-সংকীর্তন করিয়া ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইল। উহাই ব্রাহ্মসমাজের সর্বপ্রথম নগর-সংকীর্তন। ঐ সংকীর্তনে ব্রাহ্মধর্মের উদার ও বিশুদ্ধ ভাব এরূপ পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইয়াছিল যে, উহাকে একটী সহজ ও সংক্ষিপ্ত ধর্মশাস্ত্র বলা যাইতে পারে। এই স্থলে সেই সংকীর্তনটী উধৃত হইল।—

"তোরা আয়রে ভাই, এতদিনে দুঃখের নিশি হল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম।
কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্মসংকীর্তন, পাপ তাপ দূরে যাবে জুড়াবে জীবন।
দিতে পরিত্রাণ, করুণানিধান, ব্রাহ্মধর্ম করিলেন প্রেরণ;
খুলে মুক্তিদ্বার সকলেরে করেন আবাহন;
সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত
তথায় দুঃখী ধনী, মুর্খ জ্ঞানী সকলে সমান।
নরনারী সাধারণের, সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।
ভ্রম কুসংস্কার, পাপ অন্ধকার, বিনাশিতে স্বর্গের ধর্ম মর্তে আইল;
কে যাবি আয়, বিনামূল্যে ভবসিন্ধু পার, তোরা আয়রে ত্বরায়,
এবার নাহি কোন ভয়, তথায় পারের কর্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।

অগ্রহায়ণ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইল। আচার্য মহাশয় প্রাতঃকালে উপাসনা করেন এবং "সংসার ও ধর্ম" বিষয়ে উপদেশ দেন। পরদিন সন্ধ্যার সময়ে তিনি "প্রকৃত জীবন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ঢাকার নবাব এবং বহু সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ও দেশীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ২৩শে তারিখে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত প্রভৃতি ৩৬ জন ভদ্র যুবা প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।" আচার্য কেশবচন্দ্র, মধ্যবিবরণ, পূর্ববঙ্গে প্রচার।

একান্ত মনেতে কর ব্রহ্মপদ সার, সংসারের মিছে মায়ায় ভুল না রে আর ; চল সবে যাই, বিলম্বে কাজ নাই, দীননাথের লইগে শরণ ; হৃদয়মাঝে হৃদয়নাথে কর দরশন ; ঘুচিবে যন্ত্রণা, পাইবে সান্ত্বনা, প্রভুর কৃপাগুণে অনায়াসে যাবে ব্রহ্মধাম।"

৫ই পৌষ প্রত্যুষে আমরা সকলে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশ বাবুর বাসায় মিলিত হইলাম। ঢাকার যাত্রিকগণও তাঁহার বাসাতেই উঠিয়াছিলেন। অনেকগুলি খোল করতাল সহ কীর্তন আরম্ভ হইল। "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "সত্যমেব জয়তে", "ব্রহ্ম কৃপাহিকেবলম্" অঙ্কিত তিনটী নিশান উড়িতে লাগিল। গোপীবাবু স্বয়ং একটী নিশান স্কন্ধে বহন করিতে লাগিলেন। কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র পাণী তখন ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক বালক, সে করতাল বাজাইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল, তাহার সে সুন্দর ও সুদীর্ঘ আকৃতি এখনও চক্ষের উপরে সুস্পষ্ট ভাসিতেছে। সে দিন কান্তিবাবুর প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া শুষ্ক প্রাণেও ভক্তিতরঙ্গ উঠিয়াছিল। ভাবমত্ত কালীনারায়ণ ও কালীকুমারবাবুর এবং সুগায়ক আনন্দকান্ত ও রমাপ্রসাদের গম্ভীর কণ্ঠ এখনও যেন কর্ণে বাজিতেছে। কীর্তনের দল যখন সমাজবহিস্কৃত রমণীদিগের পল্লীর মধ্য দিয়া যাইতেছিল, তখন "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি নাহি জাত বিচার" এবং "ভ্রম কুসংস্কার, পাপ অন্ধকার ; বিনাশিতে স্বর্গের ধর্ম মর্ত্যে আইল" ইত্যাদি পদ গীত হইতেছিল, দুইদিকে দলে দলে উক্ত নারীগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছিল। তখন আমার হৃদয়ে এরূপ ভাবোচ্ছ্বাস হইয়াছিল যে, আমি অনেকক্ষণ ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলাম। সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিয়া কীর্তনের দল ব্রহ্মমন্দির দ্বারে উপনীত হইল ; তখন সকলে দাঁড়াইয়া আকুল প্রাণে এই সংগীত গাহিয়াছিলাম—

"পিতা খোল দ্বার, এসে দেখ হে কাঙ্গালের নিধি, অপরাধী সন্তানে। পিতা, আমি তোমার পাষণ্ড সন্তান, ক'রে অপমান, দগ্ধিয়াছি বারে বারে পিতা তোমার প্রাণ ; আমার অপরাধ সব যাও গো ভুলে, দয়া কর দুর্বল ব'লে, তোমার প্রসন্ন মুখ তোল পিতা, হেরি একবার নয়নে !"

শ্রদ্ধাস্পদ গোপীবাবুর সন্তপ্ত প্রাণের আকুল ক্রন্দনে ব্রহ্মমন্দির যেন কাঁপিতেছিল। এইরূপ অনুতপ্ত চিত্তের পবিত্র অশ্রুপাতেই স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত

হইয়া থাকে। আমাদের ন্যায় পাপী তাপীর পরিত্রাণের জন্যই সেদিন ভক্ত-জনের করস্পর্শে পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল। নূতন মন্দির শান্তিময় কক্ষ বিস্তার করিয়া দলে দলে সন্তপ্ত আত্মাদিগকে ধারণ করিল। ভক্তিভাজন কান্তিবাবু ও বঙ্গবাবু মিলিতভাবে বেদীতে বসিয়া উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করিলেন। সে দিনকার সে দৃশ্য চিরকাল হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে।

মন্দির প্রতিষ্ঠার দুই একদিন পরে আমরা গিরিশবাবুর বাসায় সমবেত হইয়াছি, এমন সময়ে কান্তিবাবুর নামে কেশববাবুর পত্র আসিল। ঐ পত্রে তাঁহার ইংলণ্ডে যাইবার সংবাদ ছিল। লিখিত ছিল, হাতে একটী পয়সা নাই কিন্তু ইংলণ্ডে যাইবার দিন স্থির হইয়াছে; তথায় যাইয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে হইবে, আদেশ হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দের স্বহস্তলিখিত পত্র এই আমরা প্রথম দেখিলাম। ঐ পত্রের প্রতি কথায় সকলের হৃদয়ে নবভাব জাগরিত হইল, মহোৎসাহের সঞ্চার হইল। কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় "ওঁ ব্রহ্ম" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং আপনার গায়ের শালখানি খুলিয়া এই কার্যে দান করিলেন। অন্যেরাও অর্থ সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন। আমি গোপীবাবুর সঙ্গে শালখানি লইয়া বড়বাজারে গেলাম; কেঁয়ে দোকানে ৬৫৲ টাকায় উহা বিক্রয় হইল; অতঃপর ব্রাহ্মধর্মানুরাগী ৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে কান্তিবাবু প্রভৃতি প্রচারার্থ সেরপুর গমন করিলেন। যুবকদিগের মধ্যে মধুবাবু তাঁহাদিগের সঙ্গী হইয়াছিলেন।

আত্মকথা

কান্তিবাবু সেরপুর যাওয়ার দুই এক দিন পরে আমার পরীক্ষার ফল বাহির হইল। বঙ্গদেশের নর্মাল স্কুলগুলির মধ্যে আমি ২য় স্থান অধিকার করিয়াছিলাম, হুগলি নর্মাল স্কুলের একটী ছাত্র প্রথম হইয়াছিলেন। এডুকেশন গেজেটে এই ফল দেখিয়া কান্তিবাবু সেরপুর হইতে আমাকে আনন্দসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন। যাহা হউক, পরীক্ষার ফল দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু আমি মহা দুশ্চিন্তায় পড়িলাম। অতঃপর কি করিব? পণ্ডিত হইলাম, এখন ত কোন স্কুলে কাজ লইতে হইবে, আর সহরে থাকিতে পারিব না; ব্রাহ্মদিগের সংসর্গ ছাড়িয়া একাকী কোন গ্রামে যাইতে হইবে; এই চিন্তা আমার নিকট বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় বোধ

হইতেছিল। এত শীঘ্র ছাত্র-জীবন শেষ করিতে হইবে, ইহা স্মরণ করিতেও মনে কষ্ট হইতে লাগিল।

জীবনের এই সঙ্কট সময়ে সরল ও ব্যাকুল প্রার্থনাই আমার পরম সহায় হইল। কয়েক দিন কিছুই স্থির হইল না—নির্জনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। বন্ধুদের মধ্যে কৃষ্ণকুমারকেই সকল সুখ দুঃখের ভাগী করিতাম; তাঁহাকে এই সঙ্কট জানাইলাম। তিনি কোন উপায় বলিতে পারিলেন না, কিন্তু গ্রাম্য স্কুলে যাইবার ঘোর বিরোধী হইলেন। যাহা হউক, করুণাময় পিতার মঙ্গল ইচ্ছা প্রকাশিত হইল; অতঃপর জেলা-স্কুলে ভর্তি হইয়া ইংরেজী শিক্ষা করিতে হইবে এই সঙ্কল্প প্রাণে উদিত হইল। কিন্তু কি উপায়ে উহা সংসিদ্ধ হইবে, বুঝিতে পারিলাম না। এতদিন স্কুলে বৃত্তি পাইতাম, তদ্দ্বারাই ব্যয় নির্বাহ হইত। পরের আশ্রয়ে আর কত দিন থাকিব? ব্রাহ্মসমাজের দিকে যেরূপ অগ্রসর হইতেছিলাম, তাহাতে তাঁহারাই বা আর বেশী দিন গৃহে রাখিতে পারিবেন কেন?

আমার পরমহিতৈষী শ্রদ্ধেয় কালীকুমার বসু মহাশয়কে এই সঙ্কল্পের কথা জানাইলাম। তিনি যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিলেন। তাঁহার সহোদর ভ্রাতা কাগমারির প্রসিদ্ধ জমিদার ৺ দ্বারকানাথ রায় গরিব ছাত্রদের সহায়তা করিতেন। কালীকুমারবাবুর হস্তেই সে ভার ছিল। তিনি ঐ তহবিল হইতে আমার স্কুলের বেতন ও পুস্তকাদির মূল্য দিবেন, বলিলেন। আমার প্রতিপালক জগৎ দারোগা মহাশয়ও যতদিন ইচ্ছা তাঁর গৃহে থাকিয়া পড়াশুনা করিতে পারিব, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। স্কুলের খরচ ও আহারের সংস্থান যখন হইল, তখন আর চিন্তা কি? বস্ত্রাদির কথা মনেই পড়িল না। ও সকল তখন আমাদের নিকট অতি তুচ্ছ ছিল। এমন সময় গিয়াছে যখন ৪ খানা ছোট থান কাপড় দিয়া ছয় মাস চালাইয়াছি, উহাই ধুতি এবং চাদর উভয়ের কাজ করিয়াছে। এক জোড়া চটিজুতায় এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এমন অনেক হিতৈষী ছিলেন, যাঁহারা জানিলে তৎক্ষণাৎ আমার অভাব পূরণ করিতেন, কিন্তু আমি পার্যমানে কখনও অভাবের কথা প্রকাশ করিতাম না। দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে আমার উৎসাহ বাড়িয়া যাইত।

আর এক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। আমাকে ত জেলাস্কুলের

নিম্নশ্রেণীতে প্রবেশ করিতে হইবে। নর্মাল স্কুলে পড়িবার সময় বঙ্গবিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্রকে পড়াইয়া আসিয়াছি, তাহারা অনেকে ঐ শ্রেণীতে এবং তদূর্দ্ধ শ্রেণীতে পড়িতেছে। এই বালকদিগের সঙ্গে পড়িতে লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। ইহা মনের সংগ্রাম। প্রার্থনা-বন্ধুর সহায়তায় এই লজ্জা-শত্রুকেও জয় করা গেল। যাহা কর্তব্য তাহা করিতেই হইবে, লজ্জা করিলে চলিবে কেন? অতঃপর ১৮৭০ সালের জানুয়ারী মাসে জেলা স্কুলের ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি হইলাম। শ্রীযুক্ত কালীনাথ সেন মহাশয় তখন ঐ শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। এখন তিনি ওকালতি কার্য করিতে করিতে বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন।

চত্বারিংশ মাঘোৎসব

তখনও মাঘোৎসব নাম সর্বত্র প্রচারিত হয় নাই। কলিকাতার উৎসবে প্রতিবর্ষে এক একটী নগরকীর্তন হইতেছিল, আমরা তাহাই মন্দিরে এবং গৃহে কীর্তন করিয়া সে বৎসরের নবভাব প্রাপ্ত হইতাম। এবার আমাদের নূতন মন্দির হইয়াছে, তজ্জন্য ১১ই মাঘ বিশেষভাবে কিছু করার কথা হইল। ঐ দিন দুইবেলা উপাসনা হইল, ধর্মতত্ত্ব পাঠ হইল এবং ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির হইতে সদ্যঃপ্রকাশিত আচার্যের উপদেশ পাঠ হইল। "দয়াময় নাম বল রসনা অবিশ্রাম" কান্তিবাবুর নিকট এই সংকীর্তনটী আমরা শিখিয়াছিলাম, উহা পুনঃ পুনঃ বিশেষভাবে কীর্তিত হইল। শ্রদ্ধেয় ধর্মবন্ধু ৺ হরমোহন বসু এই গানটী বড়ই ভালবাসিতেন, তিনি প্রায়ই তাঁহার গৃহে আমাদিগকে আহ্বান করিয়া এই কীর্তন শুনিতেন এবং নিজেও শ্রদ্ধাভরে গাহিতেন।

শাখা-সমাজের উৎসব ও দীক্ষা

২৩শে আষাঢ় শাখা-সমাজের জন্মদিন। সেই দিন বিশেষ উপাসনাদি হইয়া থাকে। এবার আমাদের নূতন মন্দির হইয়াছে, নূতন ধর্মোৎসাহ জন্মিয়াছে, আমাদের দলটীও বেশ জমাট বাঁধিয়াছে। ভক্তিভাজন গিরিশ বাবু মূলসমাজের উপাচার্য নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ গোপীকৃষ্ণ সেন, কালীকুমার বসু, প্রসন্নকুমার বসু, আনন্দনাথ ঘোষ প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ ইহোকাশুরূপে ব্রাহ্মসমাজের সর্ববিধ কার্যে যুক্ত হইয়া গিয়াছেন। শাখা-

সমাজের দলটীও বেশ পুষ্ট ও ঘনিষ্ঠভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণকুমার উপাচার্য ও আমি সম্পাদক আছি। বাবু মধুসূদন সেন, শরৎচন্দ্র রায়, রমাপ্রসাদ বিষ্ণু, বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, কালীকুমার মিত্র, অমরচন্দ্র দত্ত, রুক্মিণীকান্ত মজুমদার কৈলাসচন্দ্র গুহ, বিহারীকান্ত চন্দ প্রভৃতি শাখা-সমাজের নিয়মিত উপাসক হইয়াছেন। তখন আর আমাদের সমাজ-ভয় নাই; শরৎবাবু পূর্বতন আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্নবাবুর বাসায় আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা যদিও হিন্দু অভিভাবকদিগের আশ্রয়েই রহিয়াছি কিন্তু ব্রাহ্মসমাজই যে আমাদের চিরআশ্রয় স্থান, তাহা স্থিরতর হইয়া গিয়াছে। তবে বাধ্য না হইলে আমরা আপনা হইতে প্রাচীন সমাজ ও স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না, এই সঙ্কল্প সকলেরই ছিল।

পূর্ব-বাঙ্গলার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক ভক্তিভাজন বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় তখনও সম্পূর্ণরূপে প্রচারব্রত গ্রহণ করেন নাই; তখন তিনি বোধ হয় পোগোজ স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন, অবসর সময়ে প্রচার কার্যে বাহির হইতেন। বঙ্গবাবু ময়মনসিংহ জেলাস্কুলের ছাত্র ছিলেন, ময়মনসিংহেই তাঁহার ধর্মজীবনের আরম্ভ হয়। সুতরাং ময়মনসিংহ তাঁহার অতি প্রিয় স্থান; তিনি সুযোগ পাইলেই এখানে প্রচারার্থ আগমন করিতেন। এ বৎসর শাখা-সমাজের বার্ষিক উৎসবে তিনি তাঁহার কয়েকটী সহযোগী বন্ধুসহ এখানে আগমন করিলেন। এবার দীক্ষা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়, আমরা একদল যুবক এবং শ্রদ্ধেয় গিরিশবাবু, কালীকুমারবাবু প্রভৃতি দীক্ষার জন্য ইচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু নানা কারণে এই সময়ে সকলের মন প্রস্তুত হইল না।

২৩শে আষাঢ় শাখা-সমাজের উৎসব দিনে রাত্রির উপাসনার পরে শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশচন্দ্র সেন, প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু মধুসূদন সেন, বাবু অমরচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীমান রমাপ্রসাদ বিষ্ণু পবিত্র ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইলেন। ভক্তিভাজন বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় উপাচার্যের কার্য করিলেন। ময়মনসিংহে এই প্রথম দীক্ষা। গিরিশবাবু মহাশয় পূর্ব হইতেই প্রকাশ্য ব্রাহ্ম ছিলেন এবং হিন্দু সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়া একাকী বাস করিতেছিলেন, সুতরাং এই দীক্ষা গ্রহণে তাঁহার পক্ষে কোন নূতন পরীক্ষায় পড়িতে হইল না। অপর যুবকদিগের মধ্যে মধুবাবু তখন স্কুল ছাড়িয়া বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,

তিনি গোপীবাবুর আত্মীয়, তাঁহার গৃহেই থাকিতেন। কৃষ্ণকুমার, অমরচন্দ্র এবং রমাপ্রসাদ স্কুলের ছাত্র, তাঁহাদিগকে কিছু কিছু সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল। কৃষ্ণকুমারের আত্মীয় ও অভিভাবক তৎকালের প্রসিদ্ধ উকিল বাবু গঙ্গাদাস গুহ মহাশয় অতি উদারচেতা ও ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার বাসার ছাত্রদিগকে তিনি শাখা-ব্রাহ্মসমাজে যাইতে উপদেশ দিতেন, না গেলে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। কৃষ্ণকুমার তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও প্রেমাস্পদ ; তাঁহাকে পরিবর্জন করা অসম্ভব ; তথাপি হিন্দু সমাজের শাসন-ভয়ে তিনিও কিছু দিনের জন্য কৃষ্ণকুমারকে পৃথক ঘরে আহার করিবার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অমরচন্দ্র তাঁহার বাসা পরিত্যাগ করিয়া তদীয় ব্রাহ্ম আত্মীয় আনন্দবাবুর বাসায় চলিয়া গেলেন।

তৎকালের ধর্মভাব

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে ধর্মোৎসাহ ও ধর্ম-সাধনের আকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল হইয়াছিল। আমরা ৬।৭টী যুবক শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশবাবু, কালীকুমারবাবু ও গোপীবাবু মহাশয়দিগের সঙ্গে মিলিয়া নিয়ত ধর্মচর্চা ও উপাসনা কীর্তনাদি করিতাম। প্রতি শনিবারে শাখাসমাজের ছাত্রবৃন্দের উদ্যোগে বাসায় বাসায় সংকীর্তন হইত। সে কীর্তনে বিলক্ষণ মত্ততা ও ভক্তির উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হইত। এই সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আচার্যের উপদেশগুলি মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইতেছিল। আমরা কতই আগ্রহে তাহা পাঠ করিতাম, পড়িয়া কতই না বল ও শিক্ষা লাভ করিতাম। আজিও তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। প্রথম মুদ্রিত উপদেশ পাইলাম "ব্যাকুলতা।" ২০।২৫ খানি কাগজ আসিয়াছিল, একঘণ্টা মধ্যে সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া লইয়া গেলাম। তার পর "বিনয়" "ঈশ্বর পিতা" "ঈশ্বর রাজা" এইরূপ উপদেশগুলি আসিতে লাগিল ; আমরাও উহাদিগকে ধর্ম-পথের পরম সহায় জানিয়া আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলাম।

আমরা যতদূর জীবনে অনুভব করিয়াছিলাম, তাহাতে বলা যায়, তৎকালে ব্রাহ্মসমাজে এই চারিটী ভাবের বিকাশ হইতেছিল। (১) ধর্মোৎসাহ ; (২) ভ্রাতৃপ্রেম ; (৩) ঈশ্বরের পিতৃভাব ; (৪) ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করা। নিজ জীবনের কথা এই মাত্র বলিতে পারি

তখন উৎসাহে হৃদয় সর্বদাই পূর্ণ থাকিত, কিছুতেই নিরাশা জন্মিত না, কোন ভয়েই মন দমিয়া যাইত না। তখন ভ্রাতৃপ্রেমের এমনই আকর্ষণ ছিল যে, ব্রাহ্মের সঙ্গ ছাড়িলে মন যেন বারিহীন মীনের ন্যায় ছটফট করিত, বস্তুত তখন ধর্ম-বন্ধুদের আকর্ষণেই ব্রাহ্মসমাজ এত প্রিয় হইয়াছিল। তখন ঈশ্বরের সহিত পরিচয় অতি অল্পই হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে পিতা বলিয়া, দয়াময় বলিয়া ডাকিলে প্রাণে বড়ই আরাম পাইতাম। উপাসনার প্রকৃত আস্বাদন তখনও পাই নাই, কিন্তু প্রার্থনা করিলে মনে দুর্জয় বলের সঞ্চার হইত, কোন ভয় বা উৎপীড়নকে গ্রাহ্য করিতাম না—কিছুই অসম্ভব বলিয়া মনে হইত না।

কিন্তু তখনও ধর্ম-জীবন সুপ্রণালীসঙ্গত হয় নাই; ব্রহ্মজ্ঞান ও বিশ্বাস ভক্তির অটল ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অনেক নূতন ভাব, নূতন চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়াছিল বটে কিন্তু জীবনক্ষেত্রে তাহা বদ্ধমূল হয় নাই। ঈশ্বর লাভের জন্য অনেকের মনে ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি যে জল বায়ুর ন্যায় সহজ এবং স্বাভাবিক—প্রাণের প্রাণরূপে নিত্যসঙ্গী—সে ধারণা তখনও হয় নাই। উপাসনা প্রার্থনায় ভাবেরই প্রাবল্য ছিল, উহা অন্নজলের ন্যায় নিত্যসম্বল হয় নাই। যদিও আমরা তখন জীবনের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু সর্বদর্শী পরমেশ্বর সকলই জানিতেছিলেন; তাই আমাদের পক্ষে যাহা সর্বোত্তম, তিনি কৃপা করিয়া সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন।

সাধু অঘোরনাথের আগমন

(১৮৭০ খৃষ্টাব্দ, ভাদ্র মাস)

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রচারক-সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, প্রচারক মহাশয়দিগের জীবনে আশ্চর্য ত্যাগস্বীকার ও অসাধারণ প্রচারোদ্যম আরম্ভ হইল। সে অপূর্ব-কাহিনী ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।* ১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রাহ্মসমাজের

* আচার্য জীবনী হইতে ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের লিখিত বিবরণ এস্থলে সংক্ষেপে গ্রহণ করা গেল। [পরপৃষ্ঠায়]

প্রিয়তম আচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রচারার্থে ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। ইণ্ডিয়ান-মিরার পত্রে তাঁহার প্রচার বিবরণ বাহির হইত, তাহা পাঠ করিয়া চারিদিকে যেন উৎসাহ ও আনন্দের বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইত; আমরা এই সুদূর মফঃস্বলে থাকিয়াও সে তাড়িত সঞ্চার অনুভব করিতাম। এইবার বর্ষাকালে শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক অঘোরনাথ গুপ্ত আসামে প্রচারার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন। ফিরিবার সময় তিনি ময়মনসিংহ হইয়া যান, ব্রাহ্মগণের এই আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে জ্ঞাত করা হইল। তিনিও কৃপা করিয়া আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমরা কিছুদিন অত্যন্ত কষ্ট ও দুরবস্থায় সময় যাপন করি। কুলায়হীন পক্ষী অথবা গৃহহীন মনুষ্যের ন্যায় কিছুদিন আমাদিগের পথে পথে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। প্রতি রবিবারে সামাজিক উপাসনা করিবার স্থান ছিল না। প্রকাশ্য সভা করিতে হইলে প্রাঙ্গনে তাঁবু খাটাইয়া করিতে হইত। * * সে যাহা হউক, এই সকল দুরবস্থার মধ্যে কেশবচন্দ্র আমাদের সকলের আশা ও নির্ভরের স্থান ছিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা সকল পরীক্ষা দুঃখ ভুলিয়া যাইতাম। কেশবচন্দ্রেরও ভাব আমাদের প্রতি অত্যন্ত মনোহর ছিল। আদি সমাজের সহিত যোগ থাকিতে থাকিতে শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সংসারের কার্য ছাড়িয়া প্রচারব্রত অবলম্বন করেন। সে সময়ে সংসার ছাড়িয়া বৈরাগ্য লইয়া প্রচার ব্রত গ্রহণ করিবার এমন একটী উৎসাহঅগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল যে, প্রচারক জীবনের উপজীবিকা সম্বন্ধে বিশেষ অনিশ্চিয়তা দেখিয়াও ভাই উমানাথ ও আর একজন যুবক (ভাই মহেন্দ্রনাথ) ভগবানের আদেশে প্রচার ব্রত গ্রহণ করেন। এই দুই জন যুবা একদিনে তাঁহাদের সাংসারিক কার্য ত্যাগ করিয়া প্রচারব্রতে ব্রতী হইলেন। এই ঘটনাতে কেশবচন্দ্রের আনন্দের আর সীমা রহিল না। ঐ দুই জন প্রচারকের এক জনের মনে হইল যে, তিনি নিজে ব্রাহ্মসমাজের শরণাপন্ন হইয়া যে আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহার পত্নীকে তাঁহার সহভাগিনী না করা অত্যন্ত অন্যায়। তিনি অনেক সঙ্কটের মধ্যে তাঁহার পত্নীকে গৃহ হইতে আনিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে রক্ষা করিলেন। সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। * * আমাদের বন্ধু ভাই অমৃতলাল এই সময়ে গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া কয়েক জন ব্রাহ্মের সহিত বাস করিতেছিলেন। একটী বিশ্বাসী বন্ধু ধর্মের জন্য গৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছেন শুনিয়া কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে যেন বাণবিদ্ধ হইল, তিনি প্রতিদিন প্রত্যুষে সেই বাসায় আসিয়া নিপীড়িত বন্ধুর নিদ্রা ভঙ্গ করিতেন, তদবধি এমন প্রেমে তাঁহাকে আবদ্ধ করিলেন যে, ভ্রাতা অমৃতলাল আর সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলেন না। তখন প্রচারকগণের আগমনের জন্য সময় এমনই পূর্ণ হইয়াছিল যে, একজনের পর আর একজন প্রচারক ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত

১৮৭০ সালের ভাদ্র মাসে সাধু অঘোরনাথ নৌকাপথে এখানে আগমন করিলেন। গিরিশবাবুর বাসায় ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীরে তাঁহার স্থান হইল। তাঁহার আগমনে ব্রাহ্মদের মধ্যে যেন উৎসাহের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। প্রথম দিন দেখা সাক্ষাতের পর স্থির হইল যে, প্রত্যহ প্রাতে ৮ ঘটিকার সময়ে স্নানান্তে মিলিত হইয়া উপাসনা হইবে, সন্ধ্যার সময় আলোচনা হইবে। তখন আমরা স্কুলের ছাত্র, রাত্রি ৪ টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া স্কুলের পড়া শিক্ষা করিতাম; ৭॥০ টার সময় স্নান করিয়া অর্ধমাইল দূরবর্তী গিরিশবাবুর বাসায় যাইয়া উপাসনায় যোগ দিতাম। ৯॥০ টা পর্যন্ত উপাসনা হইত তখন উর্ধশ্বাসে বাসায় যাইয়া আহারান্তে ১১ টায় স্কুলে হাজির হইতাম।

হইয়া নানা স্থান হইতে প্রচার ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে লাগিলেন। ভাই প্রতাপচন্দ্র বেঙ্গল ব্যাঙ্কে সামান্য বেতনে কর্ম করিতেন। তিনি ঈশ্বর প্রেরণায় ঐ কার্য ছাড়িয়া আদি সমাজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন। প্রচারক জীবনের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি প্রথমে আপনাকে প্রচারক বলিতে কুণ্ঠিত ও অসম্মত হইতেন। ভাই অমৃতলাল কেশবচন্দ্রের কলিকাতা কলেজ নামক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার্য পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রচার ব্রতে ব্রতী হইলেন। এই সময়ে সাধু অঘোরনাথ, ভাই মহেন্দ্রনাথ, গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্তী প্রচারের দানের উপর নির্ভর করিতেন। তাঁহারা রাধানাথ মল্লিকের গলির একটী বাড়ীতে বাস করিতেন। বিদেশ হইতে কোন ব্রাহ্ম আসিলে এই স্থানেই আশ্রয় পাইতেন। সময়ে সময়ে এত জনতা হইত যে, উপরের একটী ঘরে স্ত্রীলোকেরা বাস করিতেন, অপর ঘরগুলি পুরুষদিগের আবাসস্থান হইত। বিশ্বাসীগণ সকলেই প্রায় সকল সময়ে কেশবচন্দ্রের গৃহে অবস্থিতি করিয়া সদালাপ সৎপ্রসঙ্গ ও উপাসনায় সময় ক্ষেপণ করিতেন। সময়ে সময়ে রাত্রি দুই তিনটা পর্যন্ত তথায় থাকিতেন। প্রায় রজনীর শেষ ভাগে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে আবার গাত্রোত্থান ও স্নানাদি করিয়া উপাসনার জন্য কেশবচন্দ্রের ভবনে গমন করিতেন। বাস্তবিক অন্ন অপেক্ষা ভগবদর্চনা, বস্ত্র অপেক্ষা পুণ্য এবং শরীর অপেক্ষা আত্মা যে অধিক মূল্যবান, এ সম্বন্ধে এদেশের নরনারী সকলের নিকট তাহা স্পষ্ট অনুভূত হইত। তখনকার বৈরাগ্য সাধনসাপেক্ষ ছিল না, আপনা আপনি বিকশিত হইয়াছিল। প্রতি দিনের আহারীয় সামগ্রী প্রায় কিছুমাত্র সঞ্চিত থাকিত না। কয়েকজন প্রচারকের জন্য চাঁদাদাতা ছিলেন; আমাদের বন্ধু আনন্দমোহন বাবু তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন। তিনি তখন কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। সময়ে সময়ে দুই তিন জন প্রচারক দলবদ্ধ হইয়া দাতার গৃহে গমন করিয়া তাঁহাদের দেয় দান চারি আনা কি আট আনা অগ্রিম ভিক্ষা করিয়া আনিতেন এবং তদ্দ্বারা প্রয়োজনীয় চাউল কাষ্ঠ প্রভৃতি বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইতেন। কখন কখন কেশবচন্দ্রের নিকট "অদ্য আমাদের

বয়স্কদিগের মধ্যে গিরিশবাবু, গোপীবাবু, কালীকুমারবাবু হরমোহনবাবু, আনন্দবাবু এবং প্রসন্নবাবু আর যুবকদিগের মধ্যে কৃষ্ণকুমার, মধুবাবু, শরৎবাবু, অমরচন্দ্র, রমাপ্রসাদ, বৈকুণ্ঠনাথ, বিহারীকান্ত এবং আমি নিয়মিত রূপে উপাসনা ও আলোচনায় উপস্থিত থাকিতাম। আরও অনেকে মধ্যে মধ্যে আসিতেন। আলোচনা সময়ে অনেক ছাত্র উপস্থিত হইতেন। তখন ব্রাহ্মসমাজ পুরুষদিগেরই সমাজ, নারীগণ তখনও সামাজিক উপাসনাদিতে যোগদান করেন নাই।

প্রতিদিনের উপাসনায় নূতন ভাব ও নূতন আলোক প্রকাশিত হইতে লাগিল। সাধু অঘোরনাথ এরূপ শান্ত ও তন্ময়ভাবে উপাসনা করিতেন, যাহা আমাদের জীবনে এক আশ্চর্য ও অভিনব বস্তু বলিয়া অনুভূত হইত।

আহারের কিছুই নাই" বলিয়া লিখিয়া পাঠাইতেন। তাঁহার একটি বাক্স ছিল, ইণ্ডিয়ান মিরার বা প্রচার বা অন্য কোন হিসাবে যাহা আসিত, ভিন্ন ভিন্ন মোড়কে তন্মধ্যে রাখিয়া দিতেন। কোন বিশেষ হিসাব থাকিত না। প্রচারকগণ একটী টাকা চাহিলে, হয় দুইটী না হয় তিনটী টাকা পাঠাইয়া দিতেন। কখন কখন এরূপ হইত যে, তাঁহারা কেশবচন্দ্রের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া গৃহ হইতে চলিয়া যাইতেন; কিন্তু তথায় উপনীত হইবামাত্র তথাকার ভাবে মুগ্ধ হইয়া আহারের কথা এককালে ভুলিয়া যাইতেন। রাত্রি দুই তিনটার সময় যখন ফিরিয়া আসিতেন, তখন বাজার হইতে চাউল কাঠ প্রভৃতি লইয়া গৃহে আসিয়া দেখিতেন যে, মহিলাগণ তাঁহাদের আশায় থাকিয়া থাকিয়া পরে নিরাশ মনে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। তখন আর সেই শেষ রাত্রিতে মহিলাদিগকে জাগরিত করিতেন না। নিকটস্থ গোলদীঘি হইতে তাঁহাদের একজন (সাধু অঘোরনাথ) স্কন্ধে করিয়া কলসী ভরিয়া জল আনিয়া রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিতেন। কোন প্রকারে সিদ্ধপক্ক করিয়া লইতেন, আহার কালে এক এক দিন প্রভাত হইয়া যাইত। অনেক সময়ে কেবল মাত্র অন্ন হইলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন। অন্নদাতাকে ধন্যবাদ দিয়া তাহাই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতেন। তখন এমনি প্রকৃত বৈরাগ্যের বায়ু বহিত যে, মহিলারাও কোন কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিতেন না। অনেক সময়ে কাঁটানোটের শাক—যাহা প্রাঙ্গণ মধ্যে বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হইত, তাহাই আহরণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে নারীগণ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেন। এমন দিনও হইয়াছে, অন্নের সঙ্গে কোন উপকরণ না থাকাতে শুধু হলুদ মিশাইয়া উহাকে খেচরান্ন করা হইয়াছে এবং উপকরণস্বরূপ প্রাঙ্গণস্থিত দোপাটিফুল ভাজিয়া লওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত বৈরাগ্যের অন্ন অতি সুমিষ্ট লাগিত, রাজভোগ অপেক্ষা তাহা উপাদেয় বোধ হইত। কেশবচন্দ্র সময়ে সময়ে এই পবিত্র অন্ন গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

উপাসনার এরূপ সরসতা এবং নিরাকার ব্রহ্মের এমন সহজ উপলব্ধি আমাদের নিকট কল্পনার বিষয় ছিল। প্রত্যহ উপাসনায় যে বিষয়ের জন্ত প্রার্থনা হইত, সন্ধ্যাকালে সেই বিষয়ের গভীর আলোচনা হইত। আমরা অনেকেই সে আলোচনা লিখিয়া রাখিতাম এবং পরদিন তাঁহাকে দেখাইয়া সংশোধন করিয়া লইতাম। (১) কিরূপে ধর্মজীবনে প্রবেশ করিতে হয়: (২) উপাসনা; (৩) উদ্বোধন; (৪) আরাধনা; (৫) ঈশ্বরের স্বরূপ; (এক এক দিন এক একটী স্বরূপের ব্যাখ্যা হইত); (৬) প্রার্থনা (এই বিষয়ে ৩।৪ দিন আলোচনা হয়); (৭) ইন্দ্রিয়সংযম; (৮) চিত্ত শুদ্ধি; (৯) ধর্ম দীক্ষা; (১০) ব্রহ্মোৎসব ইত্যাদি বিষয়ে এমন সহজ ও প্রাণস্পর্শী কথা হইত যে, আমাদের মধ্যে একজন সত্যই বলিয়াছিলেন, এবার অঘোর বাবু মায়ের ন্তায় আমাদিগকে ব্রহ্মোপাসনা খাওয়াইয়া দিতেছেন, আবার উহা হজম হইল কি না, তাহারও সংবাদ লইতেছেন।

প্রতি রবিবারে প্রাতে শাখা সমাজে এবং রাত্রিতে মূল সমাজে উপাসনা ও উপদেশ করিতেন; তখন আর মন্দিরে লোক ধরিত না। অতি বিরোধী লোকদিগের মুখেও তাঁহার কার্যের কোন নিন্দা শোনা যাইত না। পরবর্তী সময়ে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সাধু অঘোরনাথকে ব্রাহ্মযোগী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্মজীবনের সেই তরুণ সময়ে আমরা তাঁহাতে যোগভক্তির যেরূপ আশ্চর্য মিলন দেখিয়াছিলাম, আর কুত্রাপি সেরূপ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমরা কখন কখন ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছি এবং তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়াছি। তিনি কিন্তু তিলমাত্র বিচলিত না হইয়া মগ্ন গিরির ন্তায়, গভীর অমৃতসাগরে ডুবিয়া রহিয়াছেন। একদিন বলিয়াছিলেন, ভাবোচ্ছ্বাসকে বাহির হইয়া যাইতে দিতে নাই, মুষরিয়া মুষরিয়া প্রাণের ভিতরে উহাকে সম্ভোগ করিতে হয়।

প্রায় একমাস উপাসনা ও আলোচনাদি হইল। শেষদিনে "ব্রহ্মোৎসব কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে উৎসব সম্বন্ধে এরূপ চমৎকার আলোচনা হইল যে, তখনই একটী ব্রহ্মোৎসব করিবার প্রবল তৃষ্ণা সকলের প্রাণ আকুল করিয়া তুলিল। জলন্ত উৎসাহী গোপীবাবু এবং ধর্মোন্মত্ত কালীকুমারবাবু সেই রাত্রিতেই যুবকদিগকে উৎসবের কথা বলিলেন। এদিকে যুবকগণ ত উৎসাহের অগ্নি, একটু হাওয়া বহিলে আর রক্ষা নাই। তাঁহাদের নিকট

দিবা রাত্রির ভেদ ছিলনা, সম্ভব অসম্ভবের বিচার ছিল না। এক দিনেই উৎসবের আয়োজন হইল। ২৮শে ভাদ্র রবিবার ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই নব জীবনের নবতর মহোৎসব আরম্ভ হইল। সে দিনের উদ্বোধন ও উপাসনায় মৃতকে বাঁচাইল, নিরুৎসাহকে উন্মত্ত করিল, ভীরুকে অভয়দান করিল। উপাসনান্তে তিনজন বয়স্ক পদস্থ ব্যক্তি এবং আমরা ৪ জন তরুণবয়স্ক যুবক পবিত্র ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য বেদীর সমীপে দণ্ডায়মান হইলাম। সাধু অঘোরনাথ ভক্তিরসে নিমগ্ন ও যোগযুক্ত হইয়া সেদিন যে উদ্দীপনাপূর্ণ উপদেশ এবং প্রেমবিগলিত প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আজ ৪০ বৎসর পরেও সেই মর্মস্পর্শী গম্ভীর বাণী যেন কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

দীক্ষিতগণের পরিচয়

সে দিন যাঁহারা দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এস্থলে তাঁহাদের পরিচয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ রহিল :—

১। বাবু কালীকুমার বসু—নিবাস কাগমারি পরগণার অন্তর্গত বাঘিল গ্রাম, পিতা স্বর্গীয় জগৎরাম বসু। ইনি তৎকালে কালেক্টরীর তৃতীয় কেরাণী ছিলেন। পাঁচ আনির বাসায় সপরিবারে বাস করিতেন। কাগমারীর প্রসিদ্ধ জমিদার ৺দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী ইহার সহোদর ভ্রাতা ছিলেন, পাঁচ আনির ৺গৌরমণি চৌধুরাণী তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করেন। সর্বজ্যেষ্ঠ দুর্গাদাস বসু মহাশয় দেশে থাকিয়া বিষয় কর্ম করিতেন, তখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন নাই। পরবর্ত্তী সময়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া টাঙ্গাইল নববিধান সমাজের আচার্য রূপে বহুদিন কার্য করিয়া গিয়াছেন। কালীকুমার বসু মহাশয় অতিশয় সরল, সাহসী ও ধর্মোৎসাহী পুরুষ ছিলেন। এই পুস্তকে তাঁহার কথা বহুবার উক্ত হইবে, সুতরাং এখানে অধিক লেখা বাহুল্য।

২। বাবু হরমোহন বসু—ইনি জয়সিদ্ধি গ্রামের প্রসিদ্ধ পদ্মলোচন রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং বঙ্গকুলতিলক স্বনামধন্য আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ; তখন ময়মনসিংহে ওকালতি করিতেন। হরমোহন বাবু অতিশয় সদাত্মা ও ধর্মভীরু লোক ছিলেন। তাঁহার স্বভাব বালকের ন্যায় সরল, উদার ও সর্বজনপ্রিয় ছিল। ব্রহ্মোপাসনায় তাঁহার জীবনব্যাপী শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দেখা গিয়াছে। তাঁহার ন্যায় সত্যানুরাগী লোকের পক্ষে

ওকালতি ব্যবসায়ে উন্নতি করা অসম্ভব দেখিয়া, তিনি মুন্সেফী গ্রহণ করেন। উক্ত কর্ম উপলক্ষে তিনি নানা স্থানে গমন করিয়াছিলেন, সর্বত্রই তাঁহার চরিত্রে সকলে মুগ্ধ হইত এবং লোকে তাঁহাকে "ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির" বলিয়া উল্লেখ করিত।

৩। বাবু ললিত মোহন রায়—ইঁহার নিবাস বিক্রমপুর, তৎকালে মুক্তাগাছা স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন; পরে মহারাজ সূর্য্যকান্তের রাজ সরকারে কর্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্মে ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। মুক্তাগাছার নিজ বাসায় জ্যেষ্ঠপুত্রের নামকরণ ব্রাহ্মধর্ম মতে নির্বাহ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে গিরিশবাবু এবং আমরা কতিপয় যুবক তথায় গমন করিয়াছিলাম। মুক্তাগাছায় এই প্রথম এবং শেষ ব্রাহ্ম-অনুষ্ঠান। পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইঁহার আর তেমন সম্বন্ধ ছিল না।

৪। বাবু শরৎচন্দ্র রায়—ইনি চিরকুমার থাকিয়া এবং পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। কুমিল্লা জেলায় নাছিরনগর গ্রামে ইঁহার পৈতৃক নিবাস; ময়মনসিংহ ইঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল। অনেকে ইঁহাকে ময়মনসিংহের লোক বলিয়াই জানেন। ইনি কখনও স্কুলে লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই। সামান্য বাঙ্গলা শিক্ষা করিয়া এখানে একজন মোক্তারের মোহরের ছিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের প্রসাদে তাঁহার জীবনে জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের এমন আশ্চর্য বিকাশ হইয়াছিল যে, যিনি একদিন তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছেন, তিনিই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছেন। অটল সত্যানুরাগ, সুদৃঢ় ন্যায়পরতা, আশ্চর্য সরলতা এবং অসাধারণ চরিত্রবল, ইঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব ছিল। ইনি ছাত্রদিগের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন। এই গ্রন্থে ইঁহার অনেক পরিচয় থাকিবে, এস্থলে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

৫। বাবু বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ—ইনি তৎকালে জেলাস্কুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। এই জেলার পুখরিয়া পরগণার বীরসিংহ গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। পিতা স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ইনি অতি তরুণ বয়সে কিরূপে ব্রাহ্মসমাজে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, পূর্বে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। ইনি যেমন সকল পরীক্ষা প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া সরলচিত্তে ব্রহ্ম-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, দয়াময় পিতাও তেমনি চিরকাল তাঁহার পদাশ্রয়ে রক্ষা করিয়া ইঁহার জীবনে তাঁহার বিচিত্র লীলা

প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্মজীবনের উষাকালে ইঁহার সঙ্গে আমি যে সুমধুর প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, ব্রহ্মকৃপায় চিরজীবন তাহা তেমনি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

৬। দীননাথ চক্রবর্তী—ইনি তখন জেলাস্কুলের ১ম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। বাবু কিশোরীমোহন চক্রবর্তী নামে একজন ভদ্রলোক এখানকার পোষ্টাফিসে কর্ম করিতেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও ধর্মানুরাগী ছিলেন; দীননাথ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি দীক্ষার দিন উপবীত ছিঁড়িয়া বেদীর উপর রাখিয়া দেন। এই বিষয়ে ঢাকার "হিন্দু হিতৈষিণী" লিখিয়াছিলেন, একটী অত্যুৎসাহী যুবক 'ণ'কারের সহিত যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছেন।

এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক, ঢাকা জেলার তেঘরিয়া গ্রাম নিবাসী বাবু প্রসন্নকুমার বসু তৎকালে এখানকার পুলিশের হেডক্লার্ক ছিলেন, তিনিও এক-জন দীক্ষিত ও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। অঘোরবাবুর এস্থান পরি-ত্যাগের কয়েকদিন পরে তিনি ময়মনসিংহ ব্রহ্মমন্দিরে ভক্তিভাজন উপাচার্য গিরিশবাবুর নিকট দীক্ষিত হন। শ্রীমান বিহারীকান্ত চন্দও তৎকালে দীক্ষিত ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি ঢাকা নগরে পূর্ববাঙ্গলা-সমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।*

প্রথম ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান

এই ব্রহ্মোৎসব ও দীক্ষার পরে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যেমন নবোৎসাহ ও ধর্মবলের সঞ্চার হইল, বাহিরের উৎপীড়নও তেমনি প্রবল ও ভয়ানক হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মদের ধোপা নাপিত বন্ধ করা, চাকরবাকর তুলিয়া দেওয়া

* বিহারীকান্ত গোপীবাবুর আশ্রিত একটী দরিদ্র-সন্তান; অল্পবয়সে বিবাহ হয়, গোপী-বাবুর বাসায় থাকিয়া বাঙ্গলা স্কুলে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিক্ষা করেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করাতে সস্ত্রীক গৃহ-তাড়িত হইয়া গোপীবাবুর বাসায় থাকেন এবং একটী সামান্য চাকরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। পরে আমাদের প্রতিষ্ঠিত নাইট স্কুলে পড়িয়া বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১ বৎসর নর্মাল স্কুলে পড়েন। পরবর্তী জীবনে পাঠশালার শিক্ষকতা কর্ম করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে অর্থোপার্জন করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইঁহার জীবন অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও আত্মনির্ভরের দৃষ্টান্তস্থল।

ইত্যাদি উপদ্রব আরম্ভ হইল। এ সকল কথা শুনিয়া আমরা কেবল হাসিতাম; আমাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া যাইত। যে সকল প্রাচীন ও নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মদিগকে শাসনের চেষ্টা করিতেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের কোন রূপ অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ জন্মিত না; কেননা আমরা এ কথা বুঝিতাম যে, তাঁহারা স্বীয় ধর্ম রক্ষার জন্য এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করিয়াই এরূপ শাসন করিতেছেন।

তখন কালীকুমারবাবুর একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। অঘোর বাবু ব্রাহ্মপদ্ধতিতে তাহাদের নামকরণ করিবেন স্থির হইল। একদিনেই সকল আয়োজন করিতে হইবে। তাঁহার বাসার ভৃত্য আগেই পলায়ন করিয়াছিল, আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম। ব্রহ্মপুত্রের তীরে ঝাউ কাঠ বিক্রয় হইত, আমরা কয়েকজনে সন্ধ্যাকালে সেই কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া আনিতেছিলাম, কালীকুমারবাবু কাছারী হইতে আসিয়া শুনিলেন, আমরা কাঠ আনিতেছি; অমনি তিনি স্বয়ং তথায় যাইয়া তিনটী বোঝা মাথায় লইলেন এবং বলিলেন, আমার শরীরে খুব বল আছে, তোমাদের তিন গুণ আমি লইতে পারিব। বস্তুত তিনি তখন ডনগির বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সেই শারীরিক শক্তিও ব্রাহ্মসমাজের কাজে লাগিয়াছিল।

রাত্রিতেই সকল আয়োজন হইয়া গেল, প্রাতে স্নানান্তে ব্রহ্মোপাসনা ও শিশুদিগের নামকরণ হইল। পুত্রের নাম "বিনয়ভূষণ" কন্যার নাম "সুনীতি" রাখা হইল। ব্রাহ্মগণ মধ্যাহ্নে সাধু সঙ্গে প্রীতিভোজন করিলেন। তখন প্রায় সকলেই নিরামিষ আহার করিতেন, সুতরাং ভোজের আয়োজন সহজ ও সাত্ত্বিক ভাবেই নির্বাহ হইল। হিন্দু আত্মীয়গণ আসিলেন না, এবং স্ত্রীলোক প্রায় কেহই ছিলেন না বলিয়া বিনয়ের মাতৃদেবী কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার কৃপায় তাঁহার সে ক্ষোভ বেশী দিন রহে নাই।

অতঃপর অঘোরবাবু নৌকাপথে ঢাকায় গমন করেন। তখন স্কুল কাছারী বন্ধ হইল; গিরিশবাবু, শরৎবাবু এবং বৈকুণ্ঠনাথ প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গী হইলেন। আমরা সকলেই আপনাপন গৃহে গমন করিলাম।

তৎকালের ধর্মভাব

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ যেরূপ অসাধারণ ধর্মানুরাগ ও কঠোর

বৈরাগ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের সর্বত্র সেই মহাভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। বিষয়ী এবং ছাত্রগণও সর্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জন করিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস করিতেন। তখন ত্যাগস্বীকারের যুগ; যিনি ধর্মের জন্য যে পরিমাণে ত্যাগস্বীকার করিতে পারিতেন, তিনি সেই পরিমাণে লোকের সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিতেন। প্রসিদ্ধ ধনী রামকৃষ্ণ মুন্সীর পুত্র গোপী বাবু এবং সন্তোষের দ্বারকানাথ চৌধুরীর সহোদর কালীকুমারবাবু যেরূপ বেশভূষা করিতেন, গরিবদের সঙ্গে মিশিয়া যেরূপ দরিদ্রের ন্যায় জীবনযাপন করিতেন এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্যে যেরূপ অকাতরে ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতেন, তাহা স্মরণ করিলে এখন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়। অঘোরবাবু আসিয়া এই ভাব আরও প্রবল করিয়া দিলেন। তাঁহার জীবন ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রত্যক্ষ মূর্তি! তিনি পদব্রজে সমস্ত আসাম ভ্রমণ করিয়া এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে সে বর্ণনা শুনিয়া আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠিত! তাঁহার বৈরাগ্যের কথা আর কি বলিব? ব্যাগ হস্তে করিয়া ধর্মপ্রচারে যাওয়া তাঁহার নিকট বৈরাগ্যবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইত; এজন্য পৃষ্ঠদেশে পিঠবোচকা বাঁধিয়া খালি পায়ে প্রতিদিন ১০।১২ ক্রোশ পথ হাঁটিতেন। মধ্যাহ্ন রবির প্রখর তাপে মুখ তাম্রবর্ণ হইয়াছে, দেহ ঘর্মে প্লাবিত হইয়াছে, তথাচ দুস্তর প্রান্তর, অলঙ্ঘ্য পর্বত ও নদনদী অতিক্রম করিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইতেছেন। উদরে অন্ন নাই, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, ছিন্নবস্ত্র হাঁটুর উপর উঠিয়াছে, জানু পর্যন্ত ধূলিমগ্ন; কিন্তু প্রাণ ব্রহ্মরসে নিমজ্জিত, হৃদয়ে দুর্জয় উৎসাহ; ব্রাহ্মধর্মের সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য গভীর ব্যাকুলতা!

তিনি বলিয়াছিলেন, একদিন, বোধ হয় গৌহাটীর পথে, গভীর অরণ্যে চলিতেছিলাম, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল, পথের দুইদিক বড় বড় বৃক্ষে আচ্ছন্ন, মাথায় ছাতা নাই, বৃক্ষশাখা হইতে ঝুর ঝুর করিয়া বড় বড় জোঁক গায়ে পড়িতেছে, হাত দিয়া কাঁচিয়া ফেলিতেছি; কিন্তু প্রাণ মহাভাবে মগ্ন! চারিদিকে ব্রহ্মসত্তা যেন "গমগম" করিতেছে! এমন ব্রহ্ম দর্শন জীবনে আর বড় হয় নাই। এই কথা বলিবার সময় তাঁহার মুখে যে জ্যোতি এবং নয়নে যে অশ্রুধারা দেখিয়াছিলাম, তাহা চির দিনের তরে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

নূতন সংগ্রাম

যাঁহারা দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনে নূতন সংগ্রাম আরম্ভ হইল। আমি ও বৈকুণ্ঠনাথ হিন্দু অভিভাবকের আশ্রয়ে ছিলাম। দীক্ষার পরে বৈকুণ্ঠ পূর্বাশ্রয়-বিচ্যুত হইয়া গোপীবাবুর বাসায় স্থান প্রাপ্ত হইলেন। শরৎবাবুর কোন কর্ম ছিল না, গোপীবাবু তাঁহাকে কিঞ্চিৎ মূলধন দিয়া ষ্টাম্প বিক্রয়ের কার্যে নিযুক্ত করিলেন। তিনি যদিও ব্রাহ্ম প্রসন্নবাবুর বাসায় থাকিতেন, কিন্তু তথায় তাঁহার নানারূপ কষ্টে পড়িতে হইল। প্রসন্নবাবুর শ্বশুর বড় গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। একটা "জাতনাশা" ব্রাহ্ম সে গৃহে থাকে, ইহা তাঁহার সহ্য হইত না; প্রসন্নবাবুর ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিতেন না, কিন্তু পরোক্ষে শরৎবাবুর নানা অসুবিধা ঘটাইতেন।

দীক্ষার পরেও আমি পূর্ববৎ জগৎ দারোগা মহাশয়ের গৃহেই রহিলাম। অনেক সময় গোপীবাবু আমাকে ডাকিয়া নিয়া তাঁহার সঙ্গে আহার করাইতেন। তিনি আমাদিগকে এতই স্নেহ করিতেন যে, আহারে বসিয়া কোন ভাল বস্তু দেখিলেই আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন, আমি না যাওয়া পর্যন্ত আহার করিতেন না। প্রত্যহ স্নানান্তে গোপীবাবুর বাসায় উপাসনায় যাইতাম, একদিন উপাসনার পর তাড়াতাড়ি বাসায় যাইতেছি, গোপীবাবু বলিলেন, এখানেই খাইয়া স্কুলে যাও। প্রায়ই এরূপ বলেন, সুতরাং আমার মনে অন্য কিছু হইল না। স্কুলের পর গোপীবাবুর মুখে শুনিলাম, লোকের গঞ্জনায় দারোগা মহাশয় আমাকে বাসায় রাখিতে পারিতেছেন না, অথচ সে কথা আমাকে বলিতেও পারেন না। ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট যাদববাবু এক চিঠি লিখিয়া গোপীবাবুকে জানাইয়াছেন। সেই দিন হইতে আমিও গোপীবাবুর বাসায় রহিয়া গেলাম। ব্রাহ্মের গৃহে আসিয়া এক-দিকে আনন্দ হইল বটে, কিন্তু দারোগা মহাশয় এবং তাঁহার পত্নীর স্নেহ মমতা স্মরণ করিয়া বড়ই কষ্ট হইল, চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। শয্যায় পড়িয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। রাত্রিতে দারোগা মহাশয় ডাকিয়া নিলেন, তাঁর শয়নগৃহে শয্যাপার্শ্বে বসিতে বলিলেন। তাঁহার পত্নী আমার মাতৃতুল্য ছিলেন, তিনিও আসিয়া নিকটে বসিলেন। আমাকে গৃহে রাখিতে পারিলেন

না বলিয়া দারোগা মহাশয় অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মা-ও অতিশয় ব্যথিত হইয়া চক্ষুর জল ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই আশ্চর্য স্নেহ মমতা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম—কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। মা বলিলেন, যেখানেই থাক, প্রতিদিন একবার করিয়া দেখা দিয়া যেও। আজ তাঁহারা স্বর্গে, কিন্তু তাঁহাদের সেই মধুর স্মৃতি এবং অকারণ স্নেহ, এখনও জীবনকে যেন বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

পূজার বন্ধে বাড়ীতে গেলাম। পিতার মৃত্যুর পর বড়বাজু পরগণায় সল্লাগ্রামে আমাদের বাড়ী হইয়াছে। ঐ গ্রামবাসী স্বর্গীয় লক্ষ্মীকান্ত সরকার আমার মাতুল ছিলেন। তিনি বড়বাজুর সাত আনীর প্রধান কর্মচারী ছিলেন; ঐ অঞ্চলে তখন তাঁহার প্রবল প্রতাপ ছিল। আমার দীক্ষার কথা পূর্বেই গ্রামে রাষ্ট্র হইয়াছিল। আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া পৃথক ঘরে আহার করিলাম। মামা বলিলেন, "তুমি লোকের নিকট কিছু বলিও না, যেমন ছিলে তেমনি থাক, আমি থাকিতে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না।" মা আমাকে কিছুই বলিলেন না। এজন্য তাঁহাকে অনেকে অনুযোগ করিতে-ছিলেন। মা বলিলেন, ও যা ভাল বোঝে করুক; আমি ত কোন মন্দ কাজ করিতে দেখি না। আর আমার ত দিন ফুরাইল, এখন ওরা যাতে সুখে থাকে তাই করুক, আমি কোন বাধা দিব না। যাহা হউক, এ যাত্রায় বাড়ীতে যাইয়া কোন বিশেষ পরীক্ষায় পড়িতে হইল না। শ্রীমতী সারদাকে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য কয়েক দিন বাড়ীতে রহিলাম; কিন্তু কিছুতেই মন বসিল না, ৮।১০ দিন পরেই ময়মনসিংহে ফিরিয়া চলিলাম।

পথে গাবতলি নামক স্থানে বৈকুণ্ঠের দেখা পাইলাম। তিনি ঢাকা হইতে ফিরিয়া বাড়ীতে যাইতেছেন। তাঁর অনুরোধে আমিও তাঁহার সঙ্গী হইলাম। বৈকুণ্ঠের পিতা মধুপুরে বিষয়কর্ম করিতেন। তাঁহার বাসায় আহারাদি করা গেল। আমরা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছি বলাতেও তিনি একত্রে আহার করিলেন এবং ঐ রূপ কথা অন্য কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। আমাদিগকে বীরসিংহে পাঠাইয়া কয়েক দিন পরে তিনিও তথায় গেলেন। তাঁহাদের ভাবে বুঝিলাম, বৈকুণ্ঠকে কয়েক দিন বাড়ীতে থাকিতে হইবে। তজ্জন্য আমি সন্তোষ প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে গেলাম। তখন কার্তিক মাস, মাঠে জল কাদা, পথ পড়ে নাই, যাতায়াতে বিশেষ ক্লেশ

হইল। যা হউক, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, বৈকুণ্ঠ কঠিন পরীক্ষায় পড়িয়াছেন। এত দিন কান্নাকাটি ও সাধ্যসাধনা করিয়া সকলে পরাস্ত হইয়াছেন, এখন কঠিন শাসন আরম্ভ হইয়াছে; তাঁহারা একবার শেষ দেখা দেখিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন।*

ঘোষ মহাশয় আমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, বৈকুণ্ঠ আর ময়মনসিংহে যাইবে না, আপনি চলিয়া যাইতে পারেন। আমি বলিলাম, "হাঁ। আমি কল্যই যাইব।" বৈকুণ্ঠও আমার সঙ্গেই যাইবেন বলিয়া কোন কোন আত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করিলেন।

আমাদের যাত্রার দিন উপস্থিত হইল। দিনমান নীরবে কাটিয়া গেল।

* এই ঘটনার বিবরণ বৈকুণ্ঠবাবু যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে উধৃত করিতেছি:—"রীতিমত ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর এই প্রথম বাড়ী গেলাম। মা কাঁদিয়া আকুল, আত্মীয়স্বজন কেহ ভর্ৎসনা করেন, কেহ প্রবোধ দেন, এইরূপ চলিল। পিতা বাড়ীতে আসিতেই রীতিমত পরীক্ষা আরম্ভ হইল। তখন কেবল প্রার্থনাই সম্বল হইল। পিতা কখনও তিরস্কার করিতেন, কখনও ভয় প্রদর্শন করিতেন, কখনও মারিতে উদ্যত হইতেন। সে সকলকে বড় ভয় হইত না; কিন্তু মা আমাকে সম্মুখে বসাইয়া যেমন মৃত সন্তান সম্মুখে লইয়া বিলাপ করে সেইরূপ ক্রন্দন করিতেন, তখন ভারি বিপদ বোধ হইত। সে সময়ে করজোড়ে একান্ত নির্ভরের সহিত ভগবানের শরণ লইতাম। প্রাণে তাঁহার প্রকাশে আমার শরীরের ভাবান্তর হইত। তখন মা ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিতেন, বাবা তুই এমন করিস্ কেন? তোর কি হইল?

...একদিন মা বলিলেন, তুই প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আমি উপবাসে প্রাণত্যাগ করিব। আমি বলিলাম, তোমার সঙ্গে আমিও উপবাসী থাকিব। বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত অনাহারে রহিলাম, তিনি বার বার আমাকে খাইতে বলিলেন, আমি বলিলাম তুমি যদি খাও, আমিও খাইব। তিনি অগত্যা আহার করিতে স্বীকৃতা হইলেন, তখন আমি খাইলাম। প্রায়শ্চিত্তের জন্যই বড় পীড়াপীড়ি করিতেন।"

এই ঘটনা লিখিবার সময় বৈকুণ্ঠবাবুর ভগিনী (আমার সহধর্মিণী), বলিলেন, দাদাকে বশ করিবার জন্য লোকে নানারূপ ঔষধ ও প্রক্রিয়ার কথা বলিত, মাও তাহাই করিতেন। দাদার অজ্ঞাতসারে আহারের সঙ্গে কত গাছগাছরা দেওয়া হইত, নিদ্রার সময়ে কত মন্ত্রতন্ত্র পড়া হইত। এই কথা শুনিয়া আমার আর একটী দুঃখজনক ঘটনা মনে পড়িল, গোবিন্দ দাস নামে একটী ধোপাজাতীয় ছাত্র ঢাকায় ব্রাহ্ম হইয়াছিল, তাহাকে বশ করিবার জন্য আত্মীয়গণ ঔষধ খাওয়াইয়াছিল, তাহার ফলে গোবিন্দ পাগল হইয়া গেল, এবং কিছু দিন পরে মানবলীলা সম্বরণ করিল।

আমাদিগকে কেহ কিছু বলিলেন না; অথচ দেখিলাম সকলেই সতর্ক। আমরা কেবল ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিতেছিলাম, আপনাদিগকে নিরুপায় ও অসহায় জানিয়া যিনি দুর্বলের বল, তাঁহারই কাছে বল ভিক্ষা করিতেছিলাম। রজনী উপস্থিত হইল; সেটী জগদ্ধাত্রী পূজার নবমী রাত্রি। নিকটবর্তী তালুকদার বাড়ীতে যাত্রাগান হইতেছিল। বৈকুণ্ঠের পিতা আমাদের ঘরে জন কত চাকর পাহারায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং মণ্ডপ ঘরের বারেন্দায় মশারী খাটাইয়া শয়ন করিলেন। ঐ বারেন্দার পার্শ্ব দিয়াই বাহিরে যাইবার সঙ্কীর্ণ পথ। আমরা হিসাব করিয়া ঠিক করিলাম, রাত্রি ১৮ দণ্ডের পর চন্দ্র অস্ত গেলে অন্ধকার হইবে, তখন আমরা পলায়ন করিব; এ পর্য্যন্ত জাগিয়াই থাকিব। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বৈকুণ্ঠের মাতৃদেবী কি অন্য কেহ দুই তিনবার আসিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া আমাদের দেখিয়া গেলেন; আমরা নিদ্রিতের ন্যায় শয্যায় পড়িয়া রহিলাম। প্রাণের মধ্যে যে মহাঝড় বহিতেছিল, তাহাতে আর নিদ্রার সম্ভাবনা কোথায়?

আমাদের ঘরে যে কয়জন চাকর ছিল, তাহারা যখন বুঝিল আমরা ঘুমাইয়া গিয়াছি, তখম আর যাত্রাগান শোনার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না, নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল—দরজাটী খোলাই রহিল। আমরাও ইহাই শুভযোগ মনে করিয়া নীরবে উঠিয়া বসিলাম এবং কোমরে কাপড় বাঁধিয়া নগ্নগাত্রে শূন্যপদে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম। তখন পা কাঁপিতেছিল, বুকের ভিতর দুরুদুরু করিতেছিল। দ্বারের নিকট হাঁটু পাতিয়া বসিয়া উভয়ে প্রার্থনা করিলাম—সে প্রার্থনায় কোন ভাষা ছিল না—তখন কোন কথাও জানিতাম না—কেবল ডাকিলাম; দয়াময় পিতা, দয়াময় পিতা, বলিয়া শিশুর ন্যায় আকুল অন্তরে ডাকিলাম। ডাকিতে ডাকিতে প্রাণে দুর্জয় সাহস আসিল, দেহে নব বল সঞ্চারিত হইল; আর কোন ভয় ভাবনা রহিল না। কে যেন আমাদের হাত দুখানি ধরিয়া সেই অন্ধকার রজনীতে জলমগ্ন দুর্গম মাঠ পার করিয়া দিল। এখনও তাহা স্বপ্নদৃষ্ট অসম্ভব ব্যাপারের ন্যায় বোধ হয়।

আমরা অতি সন্তর্পণে বাড়ী অতিক্রম করিয়া জঙ্গলের পথে অগ্রসর হইলাম। তখন নবমীর চন্দ্র অস্তমিত হইয়াছে, অন্ধকারে পথ দেখা যায় না। একটী বড় তেঁতুলগাছের তলায় যাইয়া দেখিলাম, কয়েকটী লোক

যাত্রাগান শুনিয়া সেই পথে আসিতেছে। আমরা অন্ধকারে গাছের আড়ালে দাঁড়াইলাম—তাহারা চলিয়া গেল। তখন দ্রুতপদে গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠে যাইয়া পড়িলাম। কার্তিকমাস ; মাঠ জলকাদায় পূর্ণ। মাঠের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড বিল। উহার পার ঘুরিয়া দক্ষিণমুখে চলিলাম। ময়মনসিংহে আসিবার পথে না যাইয়া ঠিক তাহার বিপরীত দিকে চলিলাম। মনে হইল, যদি কোনরূপে সন্তোষ গ্রামে যাইতে পারি, তথা হইতে ময়মনসিংহে যাইবার সুযোগ পাইব। তখন সন্তোষ জাহ্নবীস্কুল নূতন স্থাপিত হইয়াছে। তাহার হেডমাষ্টার তারকবন্ধু চক্রবর্তী ব্রাহ্ম এবং আমাদের হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। যাহা হউক, আমরা কিছুদূর যাইয়াই পথভ্রষ্ট হইলাম। বিলের মধ্য দিয়াই যাইতে লাগিলাম, কোন স্থানে বুক জল কোথাও বা গলা জল হইতে লাগিল। মনে দুর্জয় উৎসাহ, কিছুতেই ভয় হইল না। অতিকষ্টে মাঠ অতিক্রম করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। এই গ্রামের অপর পার্শ্বে শিয়ালখোলের নদী ; নদীতট ধরিয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে। অন্ধকার রাত্রি, অজ্ঞাত পথ ; কোথাও লোকের বাড়ীর উপর দিয়া, কোথাও বা বাঁশবনের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে নদীতটে উপনীত হইলাম। নদী পাইয়া মনে আনন্দ হইল বটে, কিন্তু তখন দিক ভ্রম হইয়াছে ; কোন দিকে যাইব বুঝিতে পারিলাম না। ঐ সময়ে টাঙ্গাইল মহকুমার জন্ম স্থান নিরূপণ করিতে কালেক্টর সাহেব ঐ পথে অশ্বারোহণে গিয়াছিলেন ; তাঁহার পথ পরিচয়ের জন্ম ১০০। ১৫০ হাত দূরে দূরে কলাগাছ রোপণ করা হইয়াছিল, ইহা আমি সন্তোষ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিয়া গিয়াছিলাম। এখন সেই কলাগাছগুলিই পরম সুহৃদের ন্যায় আমাদের পথপ্রদর্শক হইল। একজনে একটী গাছ ধরিয়া দাঁড়াই, অপরে অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় গাছ খুঁজিয়া বাহির করি! এইরূপে যাইতে যাইতে এলাকার সমীপবর্ত্তী হইলে সেই ঘোর রজনী প্রভাত হইল। দিবসের প্রসন্নমুখ দেখিয়া আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। তখন শরীরের দিকে চাহিয়া দেখি, হাঁটু হইতে পদাঙ্গুলি পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে ; পাট ও তিলের গোঁজা পায় বিঁধিয়া রহিয়াছে! এতক্ষণ আর সে বিষয়ে কোন অনুভূতি ছিল না। এখন ভয়ানক বেদনা আরম্ভ হইল, পা ফুলিয়া উঠিল। যাহা হউক, অতি কষ্টে বেলা এক প্রহরের সময় সন্তোষ জাহ্নবী স্কুলের হেডমাষ্টার

বন্ধুবর তারকবন্ধুবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। দুইদিন পূর্বে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছি, পুনরায় আমাকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। আমি বৈকুণ্ঠকে দেখাইয়া দিয়া তাঁহার শয্যায় পড়িয়া সংজ্ঞাহীন হইলাম। দুইদিন ঘোরতর জ্বরে একপ্রকার অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। পিতার কৃপায় এবং পরমহিতৈষী বন্ধু তারকবাবুর সেবা শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করিলাম। ব্রাহ্মভ্রাতা শ্রদ্ধেয় আনন্দনাথ ঘোষ মহাশয় নৌকাপথে ময়মনসিংহে যাইতেছেন শুনিয়া অন্নপথ্য পাইবার পূর্বেই তাঁহার সঙ্গে ময়মনসিংহে চলিয়া আসিলাম।

অভাবনীয় পরীক্ষা ও বিপদ

বৈকুণ্ঠনাথের পিতা ৺গুরুপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় যখন প্রাতঃকালে মশারি তুলিয়া দেখিলেন, পাখী দুইটি আর সে পিঞ্জরে নাই—সকলকে ফাঁকি দিয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, পরিবার মধ্যে মহা শোককোলাহল ও ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। নিমাই-শোকে শচীমাতার ন্যায় জননীদেবী বার বার মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। বৈকুণ্ঠের জেঠীমা তাঁহাকে শিশুকালে পালন করিয়াছিলেন, মায়ের মতই ভালবাসিতেন; তিনি উঁহাকে "রাম" বলিয়া ডাকিতেন। রাম-শোকে কৌশল্যার মতই তাঁহার অবস্থা হইয়াছিল।

বৈকুণ্ঠের পিতা শোক সম্বরণ করিয়া আমাদের অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করিলেন; ময়মনসিংহ সহরে আসিবার ভিন্ন ভিন্ন পথে অশ্বারোহী আত্মীয়গণ প্রেরিত হইলেন। বৈকুণ্ঠের কাকা ময়মনসিংহ সহরে আসিয়া কয়েক দিন আমাদের অপেক্ষায় থাকিয়া নিরাশ মনে ফিরিয়া গেলেন। ঘোষ মহাশয় স্বয়ং মধুপুর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তথায় নিজ বাসায় পার্শ্ববেদনায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

হায়, তিনি আর সে দারুণ শোকের আঘাত সহিতে পারিলেন না! কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন; তথায় চিকিৎসাদি হইতে লাগিল। প্রায় একমাস পরে কোন হাতুড়ে বৈদ্য তাঁহাকে জোলাপ দিয়াছিল, তাহাতে এত দাস্ত হইতে লাগিল যে কিছুতেই নিবারণ করা গেল না। বৈদ্য পলায়ন করিল। সেই দিনই সন্ধ্যাকালে তাঁহার প্রাণবায়ু অনন্তধামে প্রস্থান করিল।

এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া আমাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইল তাহার

বর্ণনা নাই। বৈকুণ্ঠ পিতৃশোকে হতবুদ্ধি ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। এতদূর যে হইবে, তাহা কেহ কল্পনাও করি নাই। এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বৈকুণ্ঠবাবুর নিজের লেখা হইতে নিম্নে উধৃত করিতেছি :

"সেই নিদারুণ শোক সংবাদ পাইয়া আমার শরীরে এক প্রকার কম্প উপস্থিত হইল। বাহিরে চক্ষুর জল পড়িল না, কিন্তু মনে হইতে লাগিল, যেন হৃদয়ের একদিক ভাঙ্গিয়া গেল। সেই সময়ে বাড়ী যাইবার জন্য পত্র পাইলাম, ব্রাহ্মবন্ধুরাও বলিলেন যে বাড়ী যাওয়া উচিত। কিন্তু একাকী যাইতে সাহস হইল না; কোন ব্রাহ্মবন্ধুকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা হইল। তখন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় আমার সঙ্গী হইতে প্রস্তুত হইলেন।"

"তখন ব্রাহ্মসমাজে শোকচিহ্ন ধারণের কোন প্রণালী হয় নাই; আমি এক বেলা ভাতেভাত ও দুধ মাত্র খাইতাম, রাত্রিতে ফল দ্বারা জলযোগ করিতাম। আমি বাড়ীতে পৌঁছিবামাত্র পরিজনবর্গ ভয়ানক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। আমি সেই ক্রন্দনরোলের মধ্যে বসিয়া পড়িলাম, এবং অবনত মস্তকে সম্মুখস্থ ভগবানের প্রতি তাকাইলাম। তিনি আমার সম্মুখে প্রকাশিত থাকিয়া আমাকে এমন ভাবে রক্ষা করিলেন যে সেই মহা-ক্রন্দন ও বিলাপধ্বনি আমার অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারিল না। দুই তিন ঘণ্টা পরে বিলাপধ্বনির কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইলে আমি চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, কোথাও ভগিনী ধরাশায়িনী হইয়া কাঁদিতেছে, কোথাও অনেকে বসিয়া বিলাপ করিতেছে, কেহ কেহ আমাকে লক্ষ্য করিয়া নানা কথা বলিতেছে। আমার দুঃখিনী মাতা বাড়ীর পিছন দিকে বসিয়া কাঁদিয়া বসুন্ধরা সিক্ত করিতেছেন। আমি তাঁহার নিকটে যাইয়া মা মা বলিয়া ডাকিলাম, কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার বাক্‌রোধ হইয়া গেল।"

"পরিশেষে স্নানাদি করিয়া উপাসনা করিলাম। মা আমার জন্য যথারীতি হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। আমি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, শ্রাদ্ধের অধিকারী; আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার জন্য সকলে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি ব্রাহ্মপদ্ধতিক্রমে বাড়ীতে শ্রাদ্ধ করিতে চাহিলাম; প্রথমত তাঁহারা সম্মত হইয়াছিলেন, পরে যখন দেখিলেন যে আমি হিন্দু-পদ্ধতিমতে আর শ্রাদ্ধ করিব না, তখন আমার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া আমাকে বিদায় দিলেন।"

যুবকদিগের প্রথম অনুষ্ঠান

তখন গোপীবাবুর গৃহই স্বজনত্যক্ত যুবকগণের আশ্রয় স্থান হইল। আমি, মধুবাবু, বৈকুণ্ঠ, শরৎবাবু ও বিহারী প্রভৃতি গোপীবাবুর গৃহে বাস করিতে লাগিলাম। গোপীবাবু শৈশবে মাতৃহীন হন, তাঁহার বিধবা নিঃসন্তান খুড়ীমাতা তাঁহাকে পুত্রবৎ পালন করেন। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমতী, স্বধর্মানু-রাগিণী ও তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। আমরা সঙ্গত-সভা প্রভৃতি হইতে অনেক রাত্রিতে যাইয়া তাঁহাকে আহারের জন্য বিরক্ত করিতাম, কিন্তু তিনি বিরক্ত না হইয়া কতই স্নেহের সহিত আমাদিগকে আহার করাইতেন। হিন্দু আত্মীয়দিগের তুষ্টির জন্য সময়ে সময়ে কঠোর কথা বলিলেও আমাদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ যথেষ্ট ছিল। আমাদের মুখে ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন শুনিতে তিনি বড ভালবাসিতেন। কিন্তু আমরা যে কতদূর অগ্রসর হইব, আমাদের ধর্মোৎসাহ যে কোথায় যাইয়া শেষ হইবে, আমরাই তাহা বুঝিতাম না, তিনি আর কি বুঝিবেন! তিনি ভাবিতেন ইহারা তো ভদ্র ঘরের সন্তান, মা বাপ ছাড়িয়া আসিয়াছে, আহা! ওদের মুখের দিকে চাহিলে বড় মায়া হয়, আমার ক্ষেপুও ওদেরে বড় ভালবাসে, ওরা আর কোথায় যাবে?

কিন্তু বেশী দিন এ ভাব রহিল না। বৈকুণ্ঠ বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিলে স্থির হইল, গোপীবাবুর বাসাতেই ব্রাহ্মপদ্ধতিতে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ হইবে। গোপীবাবুকে সঙ্কটে ফেলিতে আমাদের ইচ্ছা ছিল না, গিরিশবাবুর বাসায় অনুষ্ঠান করার প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু গোপীবাবু বলিলেন, প্রাচীন সমাজ আমাকে কিছুতেই ছাড়িতেছে না, এইবার একটা পরিষ্কার মীমাংসা হইয়া যাক। তাহাই স্থির হইল। গোপীবাবুর খুড়ীমা ভয়ানক রাগিয়া গেলেন; তিনি কিছুতেই সে গৃহে এই অনুষ্ঠান হইতে দিবেন না, দৃঢ়তার সহিত এই কথা বলিতে লাগিলেন। আত্মীয়স্বজনও নানারূপ ভয় বিভীষিকা প্রদর্শন এবং অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলেন। গোপীবাবু অটল রহিলেন। শ্রাদ্ধের দিন প্রত্যুষে আমরা ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে যাইব, মধু বাবু তৈল আনিতে অন্দরে গেলেন; তখন খুড়ীমা মহাক্রোধে ঝাঁটা হাতে করিয়া মধুবাবুর পৃষ্ঠে আঘাত করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া পড়িলেন! মধুবাবু ত ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন, পরিজনেরা ঠাকুরাণীকে ভিতরে নিয়া

গেল। আমরা স্নান করিয়া আসিয়া শুনিলাম, তিনি চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, তোরা যেই উপাসনা আরম্ভ করিবি আর আমি ঘরে আগুন লাগাইয়া দিব। কিন্তু গোপীবাবুর আদেশে যেই আমি সঙ্গীত আরম্ভ করিলাম, অমনি জল-সিঞ্চিত অগ্নিশিখার ন্যায় ঠাকুরাণী একেবারে চুপ করিয়া গেলেন। শ্রদ্ধেয় গিরিশবাবু উপাসনা করিলেন, বৈকুণ্ঠ প্রার্থনা করিলেন। বিকালে গরিব দুঃখীদিগকে কিঞ্চিৎ দান করা হইল। সেদিন আর আমরা আহারের জন্য ভিতরে গেলাম না, বাহির বাড়ীতেই আহারের ব্যবস্থা হইল। গোপীবাবু আহারার্থ ভিতরে আহুত হইলেন, কিন্তু তিনি বাহিরে আমাদের সঙ্গে বসিয়াই আহার করিলেন। অতঃপর গোপীবাবুকে ঘোর পরীক্ষায় পড়িতে হইল; তাঁহার পিতৃদেব উইল করিয়া তাঁহাকে বিপুল পৈতৃকসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিলেন; আত্মীয়স্বজন এবং দেশস্থ লোকেরা নানারূপে উৎপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; গৃহেও তাঁহার শান্তি ছিল না! কিন্তু তিনি সকল ঝঞ্ঝাবাত ও দারিদ্র্যবিভীষিকা তুচ্ছ করিয়া বিশ্বাসের পথে অটল অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

গোপীবাবু আমাদিগকে কিছুই বলিলেন না, কিন্তু আমরা তাঁহার সঙ্কট দেখিয়া অন্যত্র যাওয়াই ভালো বোধ করিলাম। আমি, মধুবাবু ও শরৎবাবু, গিরিশবাবুর বাসায় চলিয়া গেলাম। কিন্তু গোপীবাবু স্বয়ং না বলিলে বৈকুণ্ঠ অন্যত্র যাইবেন না; তিনিও কিছু বলিবেন না। যা হউক, এমন সময় মাঘ মাস আসিল, বৈকুণ্ঠ মাঘোৎসবে কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

একচত্বারিংশ মাঘোৎসব

ইতিপূর্বে মাঘোৎসবের দিনে এখানে দুই বেলা উপাসনা মাত্র হইত। এবার আমরা বিশেষভাবে ব্রহ্মোৎসব করিতে সংকল্প করিলাম। সাধু অঘোরনাথ আমাদিগকে উৎসবের এক নূতন আস্বাদন দিয়াছিলেন। আমরা সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হইলাম। কলিকাতায় উনচত্বারিংশ মাঘোৎসবে যে নগরকীর্তন হইয়াছিল, এবার আমরাও সেই নগর সংকীর্তন করিব বলিয়া স্থির করিলাম। আমরা প্রায় ১ মাস পূর্ব হইতেই কীর্তনটি অভ্যাস করিতেছিলাম। হরমোহনবাবু এই কীর্তনটি বড় ভালবাসিতেন, তিনি প্রতিদিন উপস্থিত থাকিতেন। বস্তুত আমাদের

সেই দুঃখসন্তাপ ও পরীক্ষাবিপদের মধ্যে উক্ত নগরকীর্তনটী বড়ই উপকারী হইয়াছিল। ১০ই মাঘ অপরাহ্ণে শ্রদ্ধেয় গোপীবাবুর বাসা হইতে নগর কীর্ত্তন করিয়া মন্দিরে যাওয়া গেল। সে দিন মন্দিরে লোকারণ্য হইয়াছিল। সে দিনের উপাসনা ও উপদেশ দিবার ভার আমার প্রতি ছিল। এইবার হইতে বহুবর্ষ ওখানে ১০ই মাঘ নগরকীর্তন হইত এবং সেদিন আমাকেই উপাসনাদি করিতে হইত। নিম্নে সেই সুমধুর নগরকীর্তনটী লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

"দয়াময় নাম, বল রসনায় অবিশ্রাম,
জুড়াবে প্রাণ নামের গুণে।
জীবের ত্রাণ, সুখশান্তি-ধাম, তাঁর চরণে;
বল কে আছে আর, করিতে পার, সেই দীনকাণ্ডারী বিনে?
সেই দীননাথ, পাপীর গতি, কাঙ্গালের জীবন,
নিরুপায়ের উপায় তিনি, অধমতারণ;
দিনান্তে নিশান্তে কর, তাঁর নাম সঙ্কীর্তন,
নামে মুক্তি হবে, শান্তি পাবে, যাবে আনন্দধামে!
সুধামাখা দয়াল নাম কর রে গ্রহণ,
পাপীর দুঃখ দেখে, এ নাম পিতা করেছেন প্রেরণ;
থাক চিরদিন ভক্ত হয়ে, এ নাম রাখ হৃদয়ে (ছেড়ো না রে)
স্বর্গের সম্পত্তি এ নাম, রেখো অতি যতনে।
মুখে দয়াল বল, দীন দুঃখী ভাই সবে মিলে,
সেই মধুর নামে পাষাণ গলে, প্রেমসিন্ধু উথলে,
এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপীর অবলম্বন,
এ নাম নগরবাসীর ঘরে ঘরে গাও আনন্দমনে॥"

এই বৎসর (১৮৭১ সাল) আমাদের বিশেষ স্মরণীয়; একদিকে যুবকগণ একে একে আসিয়া শ্রদ্ধেয় গিরিশবাবুর বাসায় মিলিত হইলাম, আমাদের মধ্যে সাধনায় নিষ্ঠা, উপাসনায় অনুরাগ এবং পরস্পর মধ্যে প্রেমানুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছিল। অন্যদিকে বিবিধ উৎপীড়ন ও দারিদ্র্য সঙ্কট দিন দিন প্রবল হইয়া সকলকে পরীক্ষার অনলে দগ্ধ বিদগ্ধ করিতেছিল। কিন্তু ইহাতে যুবকমণ্ডলীর প্রভাব দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল; ব্রাহ্মসমাজে

নবশক্তির অভ্যুদয় হইল। কৃষ্ণকুমার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন, মধুবাবু শাখাসমাজের উপাচার্য মনোনীত হইলেন। এ সময়ে বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রগণ প্রায় সকলেই ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী ছিলেন, শিক্ষকগণও এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন।

উৎপীড়ন ও দারিদ্র্য

ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব যত বাড়িতে লাগিল, হিন্দুসমাজের উৎপীড়ন ততই প্রবল হইয়া উঠিল। আমরা ভৃত্যাদি পাইতাম না; অনেক সময়েই স্বহস্তে সমস্ত কার্য নির্বাহ করিতে হইত। শরৎবাবু পথের লোকদিগকে দেখাইয়া দেখাইয়া কলসী স্কন্ধে করিয়া পুষ্করিণী হইতে জল আনিতেন। বাজার হইতে জিনিসপত্র নিজেরা মাথায় করিয়া নিয়া আসিতাম। বরণ নামে একটি বিশালদেহ প্রশান্তস্বভাব পশ্চিমা ভৃত্য কিছুদিন ছিল, সে আমাদিগকে রন্ধনগৃহে যাইতে দিত না; সে রাঁধিত, আমরা খাইতাম। সে রান্না মুখে দেওয়া অসম্ভব, কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় তাহাই অমৃত বলিয়া খাইতাম। বরণ বাম হস্তে পরিবেশন করিত, শরৎ বাবু বুঝাইয়া দিলেন, ডান হাতে দিতে হয়। তখন সেই বুদ্ধিমান ডান হাতে তরকারি তুলিয়া বাঁ হাতের তলায় লইয়া "লে বাবু" বলিয়া আমাদের থালায় ফেলিয়া দিত!

তখন প্রায় সকলেই বার্ষিক বেতনভোগী নাপিত রাখিত। গোলক নাপিত এখানে একজন সর্বপরিচিত লোক ছিল। অনেক বাসায় সে ক্ষৌর কার্য করিত। ব্রাহ্মদের সকল বাসাই তাহার ছিল। তখন গোলক এখানকার সংবাদপত্রের কার্য করিত; আমাদের বিরুদ্ধে কোথায় কি হইতেছে তাহার মুখেই সে খবর পাইতাম। ব্রাহ্মদের প্রতি তাহার একটু ভালবাসাও ছিল। গোপীবাবুর পুত্র-কন্যার নামকরণে তাঁহার ভৃত্যগণ অধিকাংশই চলিয়া গিয়াছিল, গোলক দুর্গাবাড়ীর পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া বাজার করিয়া এবং অন্যান্যরূপে খাটিয়া সেই কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। প্রধান প্রধান হিন্দুগণ গোলককে ধরিয়া বসিলেন, সে ব্রাহ্মদিগের ক্ষৌর কার্য করিতে পারিবে না; যদি করে কোন হিন্দু তাহাকে কার্য দিবে না। গোলকও তেজস্বী এবং স্পষ্টবক্তা ছিল, সে কয়েকজন বৃদ্ধ হিন্দুর চরিত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিল, যদি জাত গিয়া থাকে ওঁদেরই গিয়াছে। ব্রাহ্মগণ

সাত্ত্বিক লোক, তাঁদের জাত যায় নাই। আমি তাঁদেরে নিয়াই থাকিব! বস্তুতই সে কতক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ব্রাহ্মদের অনুগত ছিল—গোপীবাবুও তাঁহার যথেষ্ট উপকার করিতেন।

ইহার উপর দারিদ্র। গিরিশবাবু মাসে ২০টী টাকা বেতন পাইতেন, টাকা কয়টী পাইয়াই আমাদের হাতে আনিয়া দিতেন। ব্রাহ্মেরাও কেহ কেহ কিছু সাহায্য করিতেন। শরৎবাবু ভেণ্ডারি করিয়া মাসে ৫।৬ টাকা পাইতেন। এই সম্বলে সকলের প্রাণ রক্ষা হইত। আমার ত কোন আয়ই ছিল না। কিন্তু তখন শত অভাবেও মন টলিত না, ভাবনা কাহাকে বলে আমরা তাহা জানিতাম না।*

এই সময়ে মহাত্মা কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পাশ্চাত্য কর্মজীবন দেখিয়া তাঁহার স্বাভাবিক কর্মশক্তি নবভাব পরিগ্রহ করিয়াছে। তিনি ভারত-সংস্কারক সভা স্থাপন করিয়া নানা বিভাগে বিবিধ কর্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সুলভ সাহিত্য প্রচার বিভাগ হইতে "সুলভ সমাচার" নামে একখানি এক পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র প্রচারিত হয়; ইহা হইতেই বাঙ্গালা সংবাদপত্রের নবযুগের সূচনা। ময়মনসিংহে আমি ঐ পত্রের এজেণ্ট হইয়াছিলাম। আমি ১০০ খানি কাগজ সপ্তাহে বিক্রয় করিতাম।

* তখনকার একটী প্রিয় সঙ্গীত আজও প্রাণে শক্তি সঞ্চার করে, এখানে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম :—

"কি ভয় ভাবনা রে মন, লয়েছি যাঁর আশ্রম
সর্বশক্তিমান তিনি অনন্ত করুণাময়।
একবার ব্যাকুল অন্তরে দয়াল বলে ডাকলে তাঁরে,
সেই দীনবন্ধু ভক্তবৎসল দেখা দিবেন তোমায়।
কি করিবে শত্রুগণে, অপমানে নির্যাতনে,
না হয় মরিব প্রাণে, গাইয়ে তাঁহার জয়।
শুনেছি আশা-বচন, মরিলেও পাব জীবন,
চিরকাল সুখে থাকিব এই তাঁর অভিপ্রায়।
নির্জন হৃদিকুটিরে, লয়ে সেই প্রাণেশ্বরে,
আনন্দ আহ্লাদে সদা করিব জীবন ক্ষয়।
তাঁর কাছে খাঁটি হয়ে, থাক হে তুমি নির্ভয়ে,
বিশ্বাসের দুর্গে বসে বল জয় জয় দয়াময়।

ইহাতে আমার মাসে প্রায় ৪ টাকা লাভ থাকিত। পত্রিকা বিক্রয়ের ভার কালীকুমার বাবু গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তিনি কাছারীতে উহা বিক্রয় করিয়া আমাকে পয়সাগুলি দিতেন। পরে শুনিয়াছিলাম, ইহাতে তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল, কারণ বাকী মূল্য কতক অনাদায় থাকিত, সকলগুলি কাগজ বিক্রয়ও হইত না।* ইহাতে মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল। কারণ কালীকুমার বাবুর অবস্থাও ভাল ছিল না; ৩০টী টাকা বেতন পাইতেন, পরিবার অনেক গুলি ছিল। ব্রাহ্ম হওয়াতে বাড়ীর সাহায্যে বঞ্চিত ছিলেন ; দ্বারিকানাথ চৌধুরীকেও কিছু জানাইতেন না ; ক্রমে ঋণ বাড়িতেছিল। যাহা হউক চৌধুরী মহাশয় পরে এ সংবাদ জানিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন।

নৈতিক প্রভাব

তখন ব্রাহ্মচরিত্রে কিরূপ নৈতিক বল ছিল, তাহার একটী দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিব। আমরা যুবকমণ্ডলী প্রায় প্রত্যহ নদীতটে ভ্রমণ করিতাম। পরস্পরের চরিত্র ও ব্যবহার সম্বন্ধেও কথাবার্তা হইত। ব্রাহ্মভাবাপন্ন বহু যুবক আমাদের দলভুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে একজনের তামাক খাওয়ার অভ্যাস ছিল। স্পষ্টভাষী শরৎবাবু সেই যুবকটীকে তামাক ছাড়িতে বলিলেন। তখন যুবক বলিল, "যাও যাও, তোমাদের যাঁরা পালের গোদা তাঁদের মধ্যেও ত তামাক চলে।" শরৎবাবু নীরব হইলেন। সে দিন

* ১৩০৯ সালের চারুমিহিরে শরৎবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়, উহাতে লিখিত ছিল :—

"এই সময়ে অর্থের অভাবে শরৎচন্দ্রকে অতি দীন বেশে জীবন যাপন করিতে হইত। একখানি উত্তরীয় ব্যতীত তাঁহার অন্য গাত্রাবরণ ছিল না, পাদুকা ছিল না, এই সময়ে সুলভ সমাচার নামে একখানি সংবাদপত্র প্রচারিত হয়, বাবু শ্রীনাথ চন্দ উহা বিক্রয় করিয়া যে কমিশন পাইতেন, তাহাতে সপ্তাহে প্রায় এক টাকা লাভ হইত। শ্রীনাথবাবু উহা দ্বারা আপন ব্যয় নির্বাহ করিয়া একটী টাকা বাঁচাইয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠ শরচ্চন্দ্রকে নগ্নপদ দেখিয়া তিনি অতিশয় ক্লিষ্ট হইলেন, জুতা ক্রয় করিবার জন্য শরৎবাবুকে সেই টাকাটী দিলেন। শরচ্চন্দ্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভ্রাতার তুষ্টির জন্য বাজারে জুতা কিনিতে গেলেন। কিন্তু শরচ্চন্দ্রের বিশালপদের উপযুক্ত জুতা নশিরাবাদ সহরে মিলিল না।"

আমাদের বাসায় সঙ্গত সভা ছিল, সকলে তথায় উপস্থিত হইলেন; সঙ্গত শেষ হওয়া মাত্র প্রবীণ ব্রাহ্ম বাবু প্রসন্নকুমার বসু বাহিরে যাইয়া বলিলেন, "সবরণ, তামাক লাও"; অমনি শরৎ বাবু সবিনয়ে বলিলেন, "মহাশয় আমাদের মধ্যে কেহ তামাক খায় বলিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিয়াছিলাম, তিনি আপনাদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাকে নীরব করিয়াছেন।" এই কথা শ্রবণমাত্র প্রসন্নবাবু সতেজে বলিলেন, "সবরণ, মৎ লাও।" অতঃপর আর তিনি কখনও জীবনে তামাক খান নাই! কি চরিত্র বল! এই এক 'মৎ লাও" হুঙ্কারে ত্রিশ বৎসরের অভ্যাস চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন!

কুসুমে কীট

এই সময়ে, জানি না কি জন্য বা কাহার অপরাধে, আমাদের ব্রাহ্ম অভিভাবকগণের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। শ্রদ্ধেয় গোপীকৃষ্ণ সেন আমাদের সর্ববিষয়ে নেতৃস্থানীয় এবং সর্বপ্রধান উৎসাহী ব্রাহ্ম; পক্ষান্তরে শ্রদ্ধেয় গিরিশবাবু জ্ঞান ধর্মের শিক্ষাদাতা, সাধুজীবনের আদর্শ, এবং আমাদের পরমহিতৈষী সুহৃদ। কিন্তু জানি না কোন্ গ্রহবৈগুণ্যে তাঁহাদের মধ্যে ভাববৈষম্য উপস্থিত হইল।* গিরিশবাবুর উপাসনা ও উপদেশ গোপী

* শ্রদ্ধেয় গিরিশবাবু আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :—

"এই সময়ে বন্ধুবর গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয় আমার ঘোরতর বিরোধী হয়। তিনি প্রায় প্রত্যেক সামাজিক উপাসনার সময় আমার প্রার্থনা ও উপদেশাদির প্রতিবাদসূচক উপদেশ দান ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে পরহিতৈষী উপকারী বন্ধু বলিয়া জানিতাম, তাঁহার এরূপ আচরণে অতিশয় ব্যথিত হই। অবশ্য আমার উপাসনাদি তাঁহার ভাল লাগিত না। কিন্তু ব্রহ্মমন্দিরে উপাচার্যের উপাসনা ও প্রার্থনাদির প্রতিবাদ করিয়া একজন উপাসকের উপদেশ দান বা প্রার্থনা করা যে অতিশয় নীতিবহির্ভূত ও অনিষ্টকর কার্য ইহা তিনি বুঝিতেন না। অন্য উপাসকদিগের পক্ষেও তাঁহার আচরণ অতিশয় ক্লেশজনক হইয়াছিল। কিন্তু তিনি একজন আত্মমত প্রতিপোষক দুর্নিবার তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, উপাসকদিগের কাহারও কথায় নিবৃত্ত হইবার লোক ছিলেন না। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী; তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা ও অর্থ সাহায্যে সেথাকার ব্রহ্মমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। আমি ঘোরতর অশান্তি দেখিয়া চিরজীবনের জন্য ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করাই স্থির করিলাম।"

বাবুর মনোমত হইত না। তিনি এ বিষয় পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিতেন, অনেক সময় উপাসনাদিতে উপস্থিত হইতেন না। ক্রমে এই ভাব গুরুতর হইয়া উঠিল। মণ্ডলী মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বলিতে লাগিল। কালীকুমারবাবু প্রভৃতি প্রবীণ ব্রাহ্মেরা সর্বশেষ যত্ন চেষ্টা করিয়াও সে অগ্নি নির্বাণ করিতে পারিলেন না।

এমন সময়ে ঢাকা সঙ্গতের উৎসাহী সভ্য শ্রদ্ধাস্পদ ভুবনমোহন সেন মহাশয় জেলাস্কুলের ২য় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া এখানে আগমন করিলেন। তিনি আমাদের কুটীরেই স্থান গ্রহণ করিলেন। আশা করিতে-ছিলাম, তাঁহার আগমনে উপস্থিত অন্তর্বিবাদ মিটিয়া যাইবে; কিন্তু সে আশা সফল হইল না। গিরিশবাবু আগামী মাঘোৎসবের পূর্বেই কার্য পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিবেন, আমাদিগকে এই সঙ্কল্প জানাইলেন। তাঁহার বিচ্ছেদ আমরা গুরুতর বোধ করিলাম।

আত্মকথা

এই সময়ে আমিও বর্তমান অবস্থায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; আর পরের উপর নির্ভর করিয়া দিন চলে না। শ্রীমতী সারদাকেও আর হিন্দুসমাজের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় ফেলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে না। শ্রদ্ধেয় কালীকুমারবাবুকে এই কথা জানাইলাম। তখন টাঙ্গাইলে নূতন মহকুমা স্থাপিত হইয়াছে, কালীকুমারবাবু কিছুদিন তথাকার হেড ক্লার্ক হইয়া গিয়াছিলেন। টাঙ্গাইল মাইনর স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদে লোক নিয়োগের ভার তাঁহার হস্তে ছিল। আমাকে ঐ পদ দিতে পারেন বলিলেন। আমিও একরূপ সম্মত হইয়া আসিলাম। কিন্তু মনে মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইল। জীবনের এই সন্ধি সময়ে কোন্ পথে যাইব, ভাবিয়া অস্থির হইলাম। ব্রাহ্মসমাজ ও প্রিয় ধর্মবন্ধুদিগকে কিরূপে ছাড়িয়া যাইব? উঃ, সে চিন্তা আমার পক্ষে তপ্ত অঙ্গারবৎ বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত রজনী অনিদ্রায় কাটাইয়া কেবলই প্রার্থনা করিলাম।

পরদিন স্নানান্তে উপাসনা হইল; গিরিশবাবু ময়মনসিংহ পরিত্যাগের কথা প্রকাশ করিয়া আকুল প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার গভীর ভাব যোগ হইল। সেই পবিত্র মুহূর্তে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল,

"ময়মনসিংহে থাকিয়া এই মণ্ডলীর সেবা কর; যথাশক্তি গিরিশবাবুর কার্যভার গ্রহণ কর।" মনে শান্তি ও বল পাইলাম। কিন্তু নিজে এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিতে সাহস হইল না। সন্ধ্যাকালে সঙ্গত সভায় গিরিশ বাবুর সম্বন্ধে কথা উঠিল, আমার টাঙ্গাইল যাওয়ার কথাও প্রকাশ পাইল। তখন গোপীবাবু বলিলেন, গিরিশবাবু কেন আপাতত কিছুদিনের বিদায় গ্রহণ করুন না, শ্রীনাথ আপনার কর্মে একটীং থাকিবেন, পরে স্থায়ী হইতে পারিবেন। গিরিশবাবু সন্তুষ্টচিত্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন গোপীবাবু এডুকেশন কমিটির সভ্য ছিলেন, তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল; সুতরাং আমি তাঁহার বাক্যে আশান্বিত হইলাম। যিনি প্রত্যাদেশ করিয়াছেন, তিনিই আবার তাহা পালনের উপায় করিয়া দিতেছেন, দেখিয়া অবাক হইলাম।

গিরিশবাবু ৬ মাসের বিদায় প্রার্থনা করিলেন। আমি তখন জেলাস্কুলের ৩য় শ্রেণীর ছাত্র; আমার পক্ষে সেই স্কুলের পণ্ডিতের পদ প্রাপ্তি সম্ভবপর হইবে কিনা সকলেরই সন্দেহ ছিল। উক্ত স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রত্নমণি গুপ্ত মহাশয় ব্রাহ্মদিগকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন, আমার প্রতিও তাঁহার বিলক্ষণ স্নেহ ও সদ্ভাব ছিল। প্রধানত তাঁহার অভিমতে এবং গোপীবাবুর চেষ্টায় আমি গিরিশবাবুর কর্মে একটীং নিযুক্ত হইলাম। গিরিশবাবুও এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৭১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর আমি প্রথম কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এইরূপে আমার ছাত্রজীবনের অবসান ও কর্মজীবনের আরম্ভ হইয়াছিল।

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

(১৮৭২—১৮৭৩ সাল)

শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশবাবু কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। আমরা দ্বিতীয় বার আশ্রয়চ্যুত হইলাম। এ সময়ে গোপীবাবু, কালীকুমারবাবু এবং আনন্দবাবু ব্রাহ্মসমাজের প্রধান পরিচালক ছিলেন। আমরা যুবকমণ্ডলী তাঁহাদের স্নেহ মমতায় আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্যে প্রাণমন সমর্পণ করিলাম।

ব্রাহ্ম-বাসা

আমরা এতদিন গিরিশবাবুর বাসায় ছিলাম, সে স্থানটী অন্যের ছিল। গিরিশবাবু তাঁহার কুটীর দুইখানি আমাদের দিয়া গেলেন। কিন্তু ঐ স্থানটী ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক হইল। ভুবনবাবুও একটী স্থান পাইলে নিজে গৃহাদি করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এখন যেখানে পুরাতন টাউন হল আছে, ঐ স্থানটী একজন নাপিতের ছিল, আমরা ২৫৲ টাকা মূল্যে ঐ স্থান ক্রয় করিলাম। তথায় যুবকদিগের জন্য বাহিরে দুইখানা ঘর হইল। ভিতরে ভুবনবাবু সপরিবারে থাকিবেন বলিয়া দুখানি ক্ষুদ্রগৃহ নির্মিত হইল। ১৮৭২ সাল হইতে ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত ১০ বৎসর কাল আমরা অনেক ব্রাহ্ম সপরিবারে ঐ স্থানে বাস করিয়াছি। উহার সঙ্গে আমাদের জীবনের অনেক সুখদুঃখের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করাতে যাঁহারা আশ্রয়চ্যুত হইতেন, তাঁহারা এখানে আশ্রয় পাইতেন।

ব্রাহ্ম দোকান

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, আমাদের শরৎবাবু ষ্ট্যাম্প বিক্রয় কার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি কর্মকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন, কোন কর্ম ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিতেন না। এই কর্মোপলক্ষে সহরের বহুলোকের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল; ব্যবসাবুদ্ধিও বিকাশ পাইল। ময়মনসিংহ সহরে তখন ভদ্রলোকের দোকান ছিল না; ভাল জিনিসপত্রও পাওয়া যাইত না। গোপীবাবুর বিশেষ সহায়তা ও উৎসাহে শরৎবাবু একটী মনোহারী দোকান

খুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন গোপীবাবু কালেক্টরীর খাজাঞ্চি; সর্বসাধারণের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভাব ছিল। তাঁহার নামে শরৎবাবুর দোকানের অংশী জুটিতে বিলম্ব হইল না। বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী শরৎবাবুর সহকারী হইলেন। ১৮৭২ সালে সীতারাম সাহার দালানে "রায়চৌধুরী এণ্ড কোং" নামে এই দোকান স্থাপিত হইল। এই দোকানে সময়ের উপযোগী নূতন নূতন দ্রব্যসামগ্রী কলিকাতা হইতে আনীত এবং নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল।

অচিরে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি এই দোকানের প্রতি আকৃষ্ট হইল। স্থানীয় সাহেব ও হাকিমগণ এবং মফঃস্বলের জমিদার তালুকদারগণ স্বয়ং এই দোকানে আসিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেন। শরৎবাবুর অসাধারণ পরিশ্রমে এবং লোকের প্রতি অমায়িক মধুর ব্যবহারে এই দোকানের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল। দোকান সীতারাম সাহার দালান হইতে মধু সাহার দালানে, তৎপর নদীতীরস্থ রামবক্স মিস্ত্রির বৃহৎ দালানে উঠিয়া গেল। বাবু শরৎচন্দ্র চৌধুরী দোকানের কার্য পরিত্যাগ করাতে ব্রাহ্ম ভ্রাতা ভগবানচন্দ্র সরকার তৎপদে নিযুক্ত হইলেন। ইঁহার নিবাস কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে ছিল, কোন গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন; ব্রাহ্মসমাজে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্ম বাসায় মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিতেন। ইঁহার চরিত্র গুণে আমরা সকলেই ইঁহাকে ভালবাসিতাম ও শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহার সঙ্গে যোগ হওয়াতে দোকানের নাম "রায় সরকার কোম্পানী" হইল; সাধারণে "ব্রাহ্ম দোকান" বলিত। কিছুদিন পরে এই দোকানে জুতা বিক্রয় করা হইবে এরূপ নির্ধারণ হইল। তখন বড় বাসার শশীবাবু ও বসন্ত বাবু এই দোকানের বড় অংশীদার ছিলেন। তাঁহারা এবং আরও কয়েকটী হিন্দু অংশীদার ছিলেন। তাঁহারা এবং আরও কয়েকটী হিন্দু অংশীদার এই দোকানের সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন; অংশের টাকা তুলিয়া নিতে নোটিস দিলেন। দোকানের পক্ষে মহা সঙ্কট উপস্থিত হইল। তখন গোপীবাবু টাকার তোড়া নিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আট মাসের লাভ না দিয়া আসল টাকা তুলিয়া দিলেন; আমরা অনেকে অগ্রিম লাভ সহ ঐ সকল অংশ ক্রয় করিলাম। দোকান রক্ষা পাইল; কিন্তু জুতায় ক্ষতি হওয়াতে অচিরে উহা পরিত্যাগ করিয়া ফার্ণিচার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইল।

প্রায় ১৮ বৎসর এই দোকান জীবিত থাকিয়া ময়মনসিংহে বহু বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। উহাই শিক্ষিতগণের স্বাধীন জীবিকা নির্বাহের সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। ব্রাহ্ম দোকান কেবল দোকান মাত্র ছিল না, সকল সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র ছিল। উহা বৃদ্ধের আরাম, যুবকের আনন্দ নিকেতন, বালকের শিক্ষামন্দির, রাজনীতিজ্ঞের মন্ত্রণাভবন ও ধর্মার্থীর সাধনক্ষেত্র ছিল। সমাজ সংস্কারের সর্ববিধ অস্ত্রশস্ত্র এখানেই শাণিত হইত; ময়মনসিংহের সর্ববিধ জনহিতকর কর্মের প্রথম চিন্তা এখানেই প্রসূত হইত।

তখন ঢাকা ময়মনসিংহে রেলপথ হয় নাই। গোয়ালন্দ পর্যন্ত রেলে মাল আনিয়া তথা হইতে নৌকা পথে ১০।১২ দিনে ময়মনসিংহে আনীত হইত। তদপেক্ষা বরাবর কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে সুন্দরবনের পথে মাল আনিলে অধিক লাভ হইত। শরৎবাবু বৎসরে দুইবার এই দুর্গম পথে একাকী হিন্দুস্থানী নৌকায় বহু টাকার দ্রব্যসামগ্রী আনয়ন করিতেন। যখন দীর্ঘকাল পরে শরৎবাবুর বৃহৎ নৌকা দোকানের ঘাটে উপস্থিত হইত, নৌকা হইতে রাশি রাশি অপূর্ব দ্রব্যসম্ভার উত্তোলিত হইত, দোকান লোকারণ্য হইয়া যাইত। বর্ষাকালে কত লক্ষপতির তরণী ব্রাহ্মদোকানের ঘাটে বাঁধা থাকিত, কত দূরাগত ধনবান ও পদস্থ লোক শরৎচন্দ্রের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া দোকানে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। এই উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রটী পাইয়া ব্রাহ্ম যুবকগণের যে কত বিষয়ে কত কল্যাণ-সাধিত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না।

নূতন কর্মক্ষেত্র

ছাত্র ছিলাম, শিক্ষক হইলাম। ব্রাহ্মসমাজের কর্মভার এই ক্ষুদ্র মস্তকে পতিত হইল। তখন শিক্ষা প্রদানের জন্য কি দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাই ছিল। স্কুলের নিয়মিত কার্য করিয়া তৃপ্তি হইত না, ছাত্রদের যে কোন অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিতাম, অল্পদিন মধ্যে তাহাদের সঙ্গে এরূপ একটা আকর্ষণ হইল যে, তাহারাও কোন কার্যেই আমাকে ছাড়িতে চাহিত না। এ সময়ে রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষার জন্য ব্রাহ্ম যুবকগণ সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। এ বিষয়ে আমাদের সকলের প্রেমাস্পদ "দাদা" শরৎচন্দ্রই অগ্রগণ্য

ছিলেন। তখন সহরে খুব কলেরা হইত; চৈত্র ও কার্তিক মাসে সহর একরূপ লোকশূন্য হইয়া পড়িত; কারণ কলেরার ভয়ে অধিকাংশ লোক পলায়ন করিত। পরোপকারী গোপীকৃষ্ণ এ সময়ে ধন প্রাণ দিয়া লোকের প্রাণ রক্ষা করিতেন। তখন ডাক্তার ছিল না বলিলেই হয়; গোপীবাবুর একটী এলোপ্যাথিক ঔষধের বাক্স ছিল, রোগীর খবর পাইলেই সেই বাক্স ও একমুষ্টি টাকা লইয়া তথায় উপস্থিত হইতেন। আমরা যুবকগণ এই কার্যে তাঁহার নিত্য সহচর ছিলাম। কিছুদিন পরে গোপীবাবুর আত্মীয় ডাক্তার সারদাকান্ত দাস মহাশয় এখানে আগমন করিলে তিনি ব্রাহ্মদের অবৈতনিক ডাক্তার হইয়াছিলেন। তখন যদিও লোকে ব্রাহ্মদিগকে নানারূপ নিন্দা ও উৎপীড়ন করিত, কিন্তু বিপদে দুঃখে সর্বাগ্রে ব্রাহ্মদিগকেই আহ্বান করিত। ব্রাহ্মদের হস্তে ধন প্রাণ অর্পণ করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইত না। তখন ব্রাহ্ম চরিত্রে লোকের এমনই অগাধ বিশ্বাস ছিল।

নাইট স্কুল

আমি দিনে ৫ ঘণ্টা স্কুলে পড়াইতাম, ৪ টার পরে আনন্দবাবুর সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া দয়াময়ী ঘোষ আমার কাছে লেখাপড়া শিক্ষা করিতেন। এমন সময়ে এখানে একটি নাইট স্কুল স্থাপন করা কর্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। তখন শ্রীমান বিহারীকান্ত চন্দ গোপীবাবুর বাসায় থাকিয়া জেলা স্কুলে একটি সামান্য কর্ম করিতেন, বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। অনেক সময়ে লাইব্রেরীতে বাঙ্গলা পুস্তক পড়িতেন। তাঁহাকে প্রথম ছাত্র-রূপে গ্রহণ করিয়া জেলা স্কুলের একটি ঘরে নাইট স্কুল স্থাপন করা হইল। পূর্বোক্ত গোলক নাপিতের ভ্রাতা নবকুমার এই স্কুলে ইংরাজী বিভাগের প্রথম ছাত্র হইল। মধুবাবু ইংরাজী ও অঙ্ক শিক্ষা দিতেন, আমি বাঙ্গলা সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়াইতাম। ক্রমে অনেকগুলি ছাত্র হইয়াছিল। এই স্কুল হইতে বিহারীকান্ত বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি ও নবকুমার মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

একদিন বড়বাজারের চট্কী দোকান হইতে একটি ছাত্র পড়িতে আসিল। তাহার হিন্দুর আকৃতি কিন্তু মাথায় টুপি। অনুসন্ধানে জানিলাম তাহার নাম হরিচরণ দে, কলিকাতা অঞ্চলে বাড়ী; কোনরূপে বিপন্ন হইয়া এখানে আসিয়া

পড়িয়াছে এবং মুসলমানের অন্ন গ্রহণ করিয়া তাহাদের দোকানে সরকার হইয়াছে; আমাদের স্কুলে ইংরাজী পড়িবে। ইহার ইংরাজী পাঠ শুনিয়া এবং চতুর চেহারা দেখিয়া ইহার শিক্ষার ভালো উপায় করিতে আমাদের ইচ্ছা হইল। পরদিন আমাদের বাসায় যাইতে বলিলাম। ভুবনবাবু ইহাকে বাসায় রাখিয়া জেলা স্কুলে পড়াইতে সম্মত হইলেন। অতঃপর সে দুই বৎসরকাল আমাদের বাসায় থাকিয়া ব্রাহ্মদের সাহায্যে স্কুলে পড়াশুনা করিয়াছিল। যে বৎসর খ্যাতনামা কালীশঙ্কর শুকুল ময়মনসিংহ জেলাস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হয় হরিচরণও সেই বৎসর উক্ত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া ১৫৲ টাকার বৃত্তি পায়। বহুদিন পরে একদিন কলিকাতায় তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তখন সে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া প্রচারক হইয়াছে। তারপর আর তাহার কোন সংবাদ পাই নাই।

এই সহরের শ্রমজীবিদিগের শিক্ষার জন্য সুতার পট্টীতে আমাদের নাইট স্কুলের একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। শরৎবাবু উহার শিক্ষাদানের ভার লইয়াছিলেন। শুভঙ্করী ও বাজার হিসাব এবং ছাপার পুস্তক পড়া, তথায় এইরূপ বিষয়ের শিক্ষা হইত। শরৎবাবু এই সকল বিষয় গৃহে নিজে অভ্যাস করিয়া ছাত্রদিগকে যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। এই উপলক্ষে সূত্রধর, কর্মকার, দোকানদার প্রভৃতি শ্রমজীবীদিগের উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল। সেই নাইট স্কুলের অনেক ছাত্র এখনও জীবিত আছে, তাহারা তাঁহার পুণ্য স্মৃতিতে অশ্রুপাত করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মবাসায় প্রথম ব্রাহ্মিকার আগমন

১৮৭২ সালের জ্যেষ্ঠমাসে কলিকাতা নগরে শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বালবিধবা ভগিনী হেমাঙ্গিনী দেবীর সহিত আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ভুবনবাবুর বিবাহ হইল। তাঁহারা আষাঢ়ের বৃষ্টি ধারার মধ্যে ক্ষুদ্র নৌকায় ময়মনসিংহের ঘাটে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের জন্য আমাদের ক্ষুদ্র বাসার অন্দর মহলে দুখানি ক্ষুদ্র কুটীর প্রস্তুত হইয়াছিল; ক্ষুদ্র ঘর, ভিজা মাটী, দরমার বেড়া! চারিদিকে জঙ্গল! ভগিনী তাঁহার জীবনে এমন ঘর, এমন জঙ্গল, এমন বৃষ্টি কাদা কদাপি চক্ষেও দেখেন নাই। বাসায় আমরা ৫।৬ টী

যুবক মাত্র, স্ত্রীলোক কেহ নাই ; ভুবন বাবু তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া জিনিস পত্রের সন্ধানে নৌকায় গেলেন ; আমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম, তখনও পরিচয় হয় নাই। তিনি ত বাড়ীঘরের ঐরূপ দুরবস্থা এবং চারিদিকে জঙ্গল দেখিয়া তপোবনে নির্বাসিতা সীতা দেবীর ন্যায় নিঝোরে কাঁদিতেছিলেন ! যাহা হউক, আমাদের সে দিন রহিল না, তাঁহারও সব সহিয়া গেল ! আহা, তখন ব্রাহ্মেরা কি মন্ত্রই জানিতেন ! দুদিনের মধ্যেই তিনি আমাদের আপনার ভগিনী হইয়া গেলেন, আমরা যেন তাঁর চিরপরিচিত সহোদর ভাই, এমনই মনে করিতেন। তখনকার কত কথাই স্মরণ হইতেছে ; আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধ চাকর ভোলাকে মনে পড়িতেছে। ভোলার সেই রান্না যে কিরূপে সকলে খাইতাম, এখন তাহা ধারণাও করিতে পারি না। অথচ তখন তাহাই অমৃত জ্ঞান হইত ! ভ্রাতৃপ্রেম এবং ব্রহ্মানন্দ এমনই বস্তু বটে !

আমাদের ভগিনী কলিকাতা যুবতী বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন, মেঘনাদ-বধ, নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িতেন। ভুবনবাবু তাঁহাকে গৃহে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুই একদিন পড়াইয়া বলিলেন, এ সকল বই পড়ান আমার কর্ম নয়। শ্রীনাথ বাড়ীতে পড়াও, আমি নাইট স্কুলে পড়াইব। তদবধি আমি প্রাতে ভগিনীকে পড়াইতে লাগিলাম, নাইট-স্কুলের কার্যভার ভুবনবাবু গ্রহণ করিলেন। তিনি ইংরেজী পড়াইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু মধুবাবু ইংরেজী ছাড়িয়া বাঙ্গলা পড়াইতে সম্মত হইলেন না, অগত্যা ভুবন বাবুই পণ্ডিতের কার্য করিতে লাগিলেন।

সারদা

আমার প্রিয়তমা কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সারদার কথা পূর্বে কিঞ্চিৎ বলিয়াছি। সারদার দুঃখময় জীবন স্মরণ করিয়া আমি সর্বদাই ম্রিয়মাণ থাকিতাম ; তাহার জন্য কি করিতে পারি, এ ভাবনা সর্বদাই মনে উদিত হইত। পূজার বন্ধে এবং গ্রীষ্মাবকাশে প্রায়ই বাড়ীতে যাইয়া সারদাকে কিছু কিছু লেখাপড়া শিক্ষা দিতাম। আমাদের পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার কোন বাধা ছিল না ; সারদারও শিক্ষার প্রতি আশ্চর্য অনুরাগ ছিল। প্রথমবারে তাহাকে কেবল অসংযুক্ত বর্ণমাত্র শিখাইয়াছিলাম। দ্বিতীয় বারে যাইয়া দেখিলাম, সে ঘরের প্রায় সকলগুলি ছাপার পুস্তক পড়িয়া ফেলিয়াছে ;

অর্থাৎ সেই সকল পুস্তকের যুক্তাক্ষর বাদ দিয়া সব পড়িয়াছে। এইরূপে অতি অল্প দিনেই সাধারণ বাঙ্গলা পড়িতে এবং বুঝিতে শিখিয়াছিল।

সারদা ইতিপূর্বে বাবার নিকট শিবপূজা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছিল এবং তাঁহার নিকট বসিয়া কালীবিষয়ক সঙ্গীত, বিশেষত রামপ্রসাদের মালসী, ভক্তিভরে গান করিত। এখন আমার মুখে ব্রাহ্মধর্মের কথা শুনিয়া এবং দুই একখানি সরল ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার ধর্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতেছিল। দীক্ষিত হইয়া যখন আশ্বিন মাসে বাড়ীতে গিয়াছিলাম, তখন দেখিলাম, সারদা আর শিবপূজা করে না, একাদশীও করে না। লোকে এজন্য নিন্দা গঞ্জনা যথেষ্টই করিত; তাহার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। আমার মা'র মন বড়ই উন্নত ও উদার ছিল, তিনি তাহাকে যেন পক্ষাবরণ দ্বারা রক্ষা করিতেন। * একদিন মা বলিলেন, তুমি যখন একেবারে ব্রাহ্ম হইয়া গেলে, তখন সারদাকেও তোমার কাছে নিয়া যাও। তাহারও মতিগতি তোমার মতই দেখিতেছি; এখানে থাকিলে তাহার পক্ষে ভাল হইবে না। মা'র এই কথা আমার নিকট দৈববাণীর ন্যায় বোধ হইল। কিন্তু আপনার আহারের সংস্থান নাই, আর একজনের গুরুতর ভার কিরূপে লইব; এই চিন্তায় তখন কিছু আর বলিতে পারি নাই।

---

* এখানে মা'র উন্নত মন ও স্বাভাবিক বুদ্ধির দুইটী দৃষ্টান্ত বলিব। একদিন একটী পাখী "চোক গেল, চোক গেল" বলিতেছিল—এই পাখীটিকে আমাদের দেশে "চোখ গেল পাখী" বলে। সারদা মাকে জিজ্ঞাসা করিল, মা, ও পাখীটা 'চোখ গেল চোখ গেল' বলে কেন? মা কিঞ্চিৎমাত্র না ভাবিয়া বলিলেন, দেখ না, চারিদিকে লোকে কত পাপ, অন্যায় ও অত্যাচার করিতেছে, মানুষ মানুষকে কত দুঃখ দিতেছে, পাখীটা তা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিতেছে "চোখ গেল, চোখ গেল।" আর একদিন পল্লীবাসিনী মহিলাগণ আমাদের আঙ্গিনায় বসিয়া নানাপ্রসঙ্গ করিতেছেন, আমি বাহিরের ঘরে বসিয়া শুনিতেছি। ভূতের গল্প হইতেছিল, পরিশেষে একজনে বলিলেন, এখন আর আগের মতন তেমন ভূত নাই, ঢের কমিয়া গিয়াছে। অন্য জনে বলিলেন, তা ঠিক, এখনকার লোকে কি না আর ভূত প্রেত তেমন মানে না, তাই ভূতও আর আগের মত নাই। মা হাসিয়া বলিলেন, "দেখ, যে জিনিসটা মানিলেই থাকে, না মানিলেই থাকে না, সেটা কিন্তু আসলে কিছুই নয়—ও কেবল মানুষের মনের ভাব।" আমি ত সেই নিরক্ষরা বৃদ্ধা জননীর কথা শুনিয়া অবাক হইলাম।

এখন কর্মগ্রহণ করিয়াই সর্বাগ্রে সারদার কথা মনে পড়িল ; তাহাকে ব্রাহ্মসমাজে আনিতে প্রাণ ব্যাকুল হইল। জ্যৈষ্ঠের বন্ধ আসিল, আমরা বাড়ীতে গেলাম। বৈকুণ্ঠ বন্ধের শেষভাগে আমাদের বাড়ীতে যাইবেন এরূপ কথা রহিল। একদিন মাকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম ; তিনি সম্মত হইলেন। কিন্তু সারদার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। দুঃখ কষ্টের সময় মার মুখে কোন কথা শুনা যাইত না, শয্যায় পড়িয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেন। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া বলিলাম, মা, তুমি যদি কষ্ট পাও, তবে সারদা না হয় আরও কিছুদিন তোমার কাছেই থাক ; মা বলিলেন, "না, ওকে এইবারই নিয়ে যাও।"

কৃষ্ণকুমার কলিকাতা হইতে বাড়ীতে আসিয়াছেন শুনিয়া আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। পরামর্শ স্থির হইল, সেই বন্ধেই সারদাকে ময়মনসিংহে নিতে হইবে। বাঘিল হইতে একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া কৃষ্ণকুমার আমাদের গ্রামে পাঠাইবেন ; আমরা ঐ নৌকায় ময়মনসিংহ যাইব। বৈকুণ্ঠ আসিলেন, নৌকাও আসিল। একদিন প্রাতঃকালে মার অনুমতি লইয়া ময়মনসিংহে যাত্রা করিলাম। সারদা এই যে মায়ের কোল ছাড়িয়া আসিল, দুঃখের বিষয় এ জীবনে আর সে ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইতে পারে নাই।

তখন দাদা বাড়ীতে ছিলেন না। সারদা প্রতিবেশীদিগের নিকট বিদায় নিয়া আসিল। তাঁহারা তখন এ বিষয়ে বড় একটা মনোযোগ করেন নাই ; ইহার কি ফল হইবে, তাহাও ভাবিয়া দেখেন নাই। কিন্তু আমরা চলিয়া আসিলে গ্রামবৃদ্ধেরা বিশেষত আমার মাতুলগণ যখন এ সংবাদ শুনিলেন, তখন তাঁহারা 'কি সর্বনাশ হইল' ভাবিয়া সকলে আসিয়া মাকে ধরিলেন, কেন খবর দেওয়া হয় নাই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তখন পরামর্শ হইল দ্রুতগামী নৌকাযোগে আমাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে মামা তখনই যাত্রা করিবেন। সকল স্থির করিয়া তিনি মা'র অনুমতি লইতে গেলেন ; মা অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া এই মাত্র বলিলেন, "তারা ত আমার অনুমতি নিয়াই গিয়াছে !" তখন সকলে বিরক্ত হইলেন, মামা মহাক্রোধে গৃহে চলিয়া গেলেন। ১৮৭২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সারদা ময়মনসিংহে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র ক্রোড়ে আশ্রয় পাইল ;

সারদা কিছুদিন আনন্দবাবুর গৃহে রহিল, পরে ব্রাহ্ম বাসায় ভুবনবাবুর পরিবারে পৃথক ঘরের ব্যবস্থা হইলে তথায় বাস করিতে লাগিল।

ব্রাহ্ম পরিবার গঠন

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে প্রেমপরিবার গঠনের মহা সাধনা আরম্ভ হইয়াছিল। ভক্ত কেশবচন্দ্রের জীবন অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মসমাজে যে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইল, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল প্রেম পরিবার। পিতাকে ভক্তি করিলে ভাইভগিনীকে প্রেম করিতেই হয়। এত দিন ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব সাধনের ভাবই প্রবল ছিল। তিনি পিতা, আমরা ভ্রাতা, এই পবিত্র প্রেমের আকর্ষণেই ব্রাহ্মগণ দলবদ্ধ হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃভাব সাধনের বিবিধ উপায়ও অবলম্বিত হইয়াছিল; তাহাতে অপূর্ব ফলও ফলিয়াছিল। তখন ভাই বলিতেই প্রাণ আকুল হইত। কিন্তু যখন নবভক্তির অভ্যুদয় হইল, যখন ব্রাহ্মগণ ঘোষণা করিলেন, "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাত বিচার।" তখনই পিতার প্রিয় কন্যাদিগের প্রতি সকলের দৃষ্টি পতিত হইল। নগর সংকীর্তনে উক্ত হইল, "ও ভাই শান্তিনিকেতনে যদি করবে গমন, কর সব বিবাদ ভঞ্জন; ভাইভগিনী সনে সরল মনে কর আগে সম্মিলন।" ইহা হইতেই প্রেম পরিবারের সূত্রপাত।

কলিকাতায় এই প্রেম পরিবার গঠনের বিপুল আয়োজন হইল। "ভারতাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হইল। স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হইল। ব্রাহ্মসমাজের সর্বত্র এই তরঙ্গ প্রবলবেগে আঘাত করিতে লাগিল। আমরাও সে তরঙ্গের প্রতি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এই সময়ে স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা ও পরিবারগঠনার্থ এখানে যে সকল কার্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, নিম্নে সংক্ষেপে তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে।

(১) পারিবারিক উপাসনা

এখন হইতে নরনারী সম্মিলিত হইয়া প্রত্যহ স্নানান্তে ব্রহ্মোপাসনা করিবেন নির্ধারিত হইল। ভুবনবাবুর গৃহেই এই পারিবারিক উপাসনার

সূত্রপাত হয়। ভগিনী হেমাঙ্গিনী দেবী এবং শ্রীমতী সারদা উপাসনায় যোগ দিতেন এবং তাঁহারাই সঙ্গীত করিতেন। কালীকুমারবাবু, গোপীবাবু প্রভৃতি বয়স্ক ব্রাহ্মগণও প্রত্যহ ৮টার সময় স্নান করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া আমাদের সঙ্গে উপাসনায় মিলিত হইতেন। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে মধ্যে মধ্যে উপাসনার ব্যবস্থা হইত। প্রতি শনিবার ভিন্ন ভিন্ন বাসায় সঙ্কীর্তন হইত। প্রত্যেক পরিবারের মহিলাদিগের শিক্ষার ও সদালোচনার ব্যবস্থা হইল। যুবকদিগের মধ্যে অনেকেই আত্মীয়া মহিলাদিগের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। এ সময়ে আমরা আর তিলার্ধ অবসর পাইতাম না। সঙ্গতের আলোচনায় এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে প্রতিদিনই অনেক রাত্রি হইয়া যাইত, তারপর নিজেরা রন্ধনাদি করিয়া আহার করিতাম। ফলত এ সময়ে যুবক ব্রাহ্মগণ যেরূপ পরিশ্রম, কষ্টস্বীকার ও প্রাণপাত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে বিস্ময় জন্মে। তাঁহারা অশ্রুপাত করিয়া যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজ চিরদিন তাহার ফলভোগ করিবে।

(২) স্ত্রীস্বাধীনতা

ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মিকাদিগকে প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া উপাসনা করিবার অধিকার দেওয়া হইল। এই বিষয় নিয়া প্রবীণ ও নবীনদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতদ্বৈত হইয়াছিল। ব্রাহ্মিকারা মন্দিরে যবনিকার অন্তরালে কি প্রকাশ্যে বসিবেন, এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। যুবকেরা প্রায় সকলেই স্ত্রীস্বাধীনতার দল; প্রবীণেরা ততদূর অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক না হইলেও আমাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিলেন না। শ্রদ্ধেয়া হেমাঙ্গিনী দেবী এবং শ্রীমতী সারদা প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া সামাজিক উপাসনা করিতে লাগিলেন। সে দিন মন্দিরে বহু জনতা হইয়াছিল। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও অধিকার বিষয়ে আমি একটী বক্তৃতা করিয়াছিলাম। তাহাতে এইরূপ একটি কথা ছিল, "যদি জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য নরনারীর মিলিত শক্তি প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক হয়, এই পবিত্র উপাসনা ক্ষেত্রেই সেই সম্মিলনের সূত্রপাত হওয়া উচিত ও মঙ্গলজনক।" ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ চিরদিন এই মত রক্ষা করিতেছেন। আমাদের বর্তমান ব্রহ্মমন্দিরের ট্রাষ্টডীডে লেখা আছে, অবরোধ প্রথার

অনুরোধে ব্রহ্মমন্দিরে পরদার ব্যবহার হইতে পারিবে না। বোধ হয় অন্ত কোনও ব্রহ্মমন্দিরের ট্রাষ্টডিডে এরূপ নিয়ম নাই।

চারুমিহির পত্রিকায় শরচ্চন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে এবিষয় যাহা লিখিত হইয়াছিল, এস্থলে তাহা উধৃত হইল। "এই সময়ে এক উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া হিন্দুসমাজকে পুনরায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অপ্রসন্ন করিয়া তুলিল। বাবু গিরিশচন্দ্র সেন কর্মত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, ব্রাহ্মগণ পৃথক স্থানে ব্রাহ্মবাসা নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। জেলা স্কুলের শিক্ষক বাবু ভুবনমোহন সেন ১৮৭২ সালে ব্রাহ্ম মতে বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক ঐ বাসায় অবস্থিতি করিলেন। বাবু শ্রীনাথ চন্দের বিধবা ভগিনী তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে ব্রাহ্মবাসায় আনীতা হইলেন। তাঁহারা উভয়ে ব্রহ্মমন্দিরে প্রকাশ্য স্থানে উপবেশন করিতেন, অনেক সময়ে পদব্রজে মন্দিরে যাইতেন। হিন্দু-সমাজের চক্ষে তাহা বিষম বাজিল। ব্রাহ্মগণের হিন্দু আত্মীয় স্বজন অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কতিপয় দুর্বৃত্ত মন্দিরে যাইবার সময় উহাদের প্রতি অভদ্র ব্যবহার করিত, কখনও লোষ্ট্রনিক্ষেপ, কখনও বা অন্যপ্রকারে ভয় প্রদর্শন করিত। হিন্দু বান্ধবগণ ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মদিগের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করিতেছিলেন, স্ত্রীস্বাধীনতার এই প্রত্যক্ষ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহাদের ভাবের বিপর্যয় উপস্থিত হইল। এই মহিলাদ্বয়কে ব্রাহ্মগণে বেষ্টিতা হইয়া সমাজে যাইতে হইত, প্রহরীগণ মধ্যে শরচ্চন্দ্র অগ্রগণ্য ছিলেন। পূর্বে যে পরামাণিকের কথা বলা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি প্রতি রবিবারে দুর্বৃত্তগণের নূতন অভিযানের তত্ত্ব ব্রাহ্মদিগকে বলিয়া যাইত।"

(৩) বালিকা বিদ্যালয়

পূর্বে উক্ত হইয়াছে বাবু গিরিশচন্দ্র সেন ১৮৬৫ সালে এখানে একটি বালিকা স্কুল স্থাপন করেন; রামচন্দ্রবাবুর কন্যাদ্বয় কাদু ও বিন্দু এবং বাবু তারকনাথ রায়ের কন্যা রাধাসুন্দরী সেই স্কুলের স্মরণীয়া ছাত্রী ছিলেন। কিছুদিন পরে সে স্কুল উঠিয়া যায়। এইক্ষণে যখন স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ব্রাহ্ম-গণের দৃষ্টি পড়িল, তখন পুনরায় বালিকা স্কুল স্থাপনের চেষ্টা হইল। বাবু শরচ্চন্দ্র রায় প্রভৃতির বিশেষ উদ্যোগে গোপীবাবুর বাসায় বালিকা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্রাহ্মদিগের সর্বপ্রকার সৎকার্যের সঙ্গী ও সহায় পণ্ডিত

শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বিনা বেতনে এই স্কুলে পড়াইতে লাগিলেন। প্রধানত তাঁহার দ্বারাই তৎকালে স্কুলটী রক্ষা পাইয়াছিল। এই স্কুলই ক্রমে উন্নত হইয়া বর্তমান আলেকজাণ্ডার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। এই বিদ্যালয় দ্বারা কেবল ময়মনসিংহে নহে, সমস্ত পূর্ববঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের যথেষ্ট সহায়তা হইতেছে।

(৪) অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা

তৎকালে দেশে যে সকল সদনুষ্ঠান হইত, প্রধানত ব্রাহ্মসমাজই তাহার প্রবর্তক ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে ব্রাহ্মসমাজের প্রচেষ্টা সর্বত্রই সুফল প্রসব করিয়াছিল। আজিও এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। উত্তরপাড়া হিতকরী সভার আদর্শে ১৮৭২ সালে এখানে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভার প্রতিষ্ঠা হয়। অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণ গৃহে বসিয়া যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারেন, তদুপায় বিধান করাই এই সভার উদ্দেশ্য। বৎসরের প্রথমে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করিয়া দেওয়া হইত, সম্বৎসর মহিলারা গৃহে বসিয়া সেই সকল পাঠ্য অধ্যয়ন করিতেন; বৎসরান্তে অভিভাবকদিগের নিকট মুদ্রিত প্রশ্ন প্রেরণ করিয়া পরীক্ষা গৃহীত ও যথাযোগ্য পুরস্কার বিতরণ করা হইত। গ্রাম্য শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী অভিভাবকগণ সভার কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। এই সভার যত্নে এ জেলায় বহু পরিবারে বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হইয়াছিল; এবং অনেক পুরমহিলা প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী সভ্য বাবু ভগবানচন্দ্র সেন (মুন্সেফ) এই সভার প্রথম সভাপতি, বাবু মধুসূদন সেন সম্পাদক এবং আমরা সভ্য ছিলাম। কয়েক মাস পরে মধুবাবু স্থানান্তরে গমন করাতে আমার প্রতি সম্পাদকের ভার অর্পিত হয়। জমিদার ও স্থানীয় শিক্ষিতগণের অর্থানুকূল্যে এই কার্য নির্বাহ হইত। পরিশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাডবেরি সাহেবের সহায়তায় ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হইতে বার্ষিক ২৫৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। মুক্তাগাছার শিক্ষিত জমিদার স্বর্গীয় কেশববাবু, অমৃতবাবু ও যোগেন্দ্রবাবু এই কার্যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কেশববাবুর পত্নী মাননীয়া শ্রীমতী দুর্গাসুন্দরী চৌধুরাণী এবং অনাথবাবুর পত্নী পুণ্যশীলা রাধাসুন্দরী ক্রমাগত

৫ বৎসর কাল পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহারা সর্বোচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য অধ্যয়ন ও বিশেষ পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। অন্যান্য সভা সমিতির ন্যায় এই সভারও সকল ভার পরিশেষে একমাত্র সম্পাদকের মস্তকেই পড়িয়াছিল। ১৮৭৭ সালে আমি পীড়িত হইয়া দীর্ঘকালের জন্য স্থানান্তরে যাওয়াতে এই সভার কার্য রহিত হইয়া যায়। কয়েক বৎসর পরে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি ময়মনসিংহবাসী ছাত্রগণ কলিকাতায় "ময়মনসিংহ সম্মিলনী সভা" স্থাপন করিয়া এই কার্যভার গ্রহণ করেন। ঐ সম্মিলনীর যত্নে বহুদিন এ জেলার অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এখন আর সেরূপ কোন সভা নাই, অথচ উহার প্রয়োজন তেমনই রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায়

অঘোরবাবুর পরে আর কলিকাতা হইতে কোন প্রচারক এখানে আগমন করেন নাই। ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় প্রতি বৎসরই আসিতেন; তাঁহার দ্বারা আমাদের যথেষ্ট উপকার হইত। ১৮৭২ সালের শীত ঋতুতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় প্রচারার্থ ময়মনসিংহে আগমন করেন। ইঁহার নিবাস পূর্ববঙ্গে, সিরাজগঞ্জের নিকটবর্তী কোন পল্লীগ্রামে। ইনি পূর্বে রংপুরে পুলিশের দারোগা ছিলেন—কলিকাতায় যাইয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্মজালে ধরা পড়েন। তদবধি ব্রহ্মচরণে আত্মবিক্রয় করিয়া জ্ঞান, বৈরাগ্য ও কর্মের জীবন্ত মূর্তিরূপে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতেছেন। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার নিকট যে কত ঋণী, সে বিবরণ পরে লিখিত হইবে। প্রথম বারে তিনি অতি অল্প কয়েক দিন মাত্র এখানে ছিলেন; কয়েকটি বক্তৃতা ও উপদেশ দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞানের উচ্চভাব এখানে প্রচার করেন এবং যুবকদিগের মনে জ্ঞানতৃষ্ণা বাড়াইয়া দেন। তদবধি বহু বৎসর কাল তিনি ময়মনসিংহকে আপনার প্রিয় কর্মক্ষেত্র জ্ঞান করিয়া ইহার কল্যাণের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

আত্মকথা

১। কর্মে স্থায়ী নিয়োগ—শ্রদ্ধেয় গিরিশবাবু প্রায় দুই বৎসর ছুটিতে থাকিয়া কর্মপরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে প্রতি জেলায় একটী শিক্ষা কমিটি ছিল, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার সভাপতি ও জেলাস্কুলের হেড্‌মাষ্টার সম্পাদক ছিলেন। তখন সুপ্রসিদ্ধ সি, বি, ক্লার্ক সাহেব স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। এই সময়ে সাহেব মহোদয় জেলাস্কুল দেখিতে আসিলেন। আমাদের ভুবনবাবু তাঁহার ছাত্র ছিলেন। সাহেব মহোদয় আমাদের বাসায় আসিয়া ভুবনবাবুর পত্নীকে দেখিয়া গেলেন। ব্রাহ্মদিগের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। ভুবনবাবু আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন, স্থায়ী পণ্ডিত কর্মত্যাগ করিয়াছেন, ইঁহাকে সেই পদে স্থায়ী করিলে আমরা সুখী হইব। সাহেব বলিলেন, ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর এই পদে একজন সিনিয়ার সার্কেল পণ্ডিতকে নিযুক্ত করিতে বলেন। তাহা হইলে ইঁহাকে সার্কেল স্কুলে দেওয়া যাইতে পারে। ভুবনবাবু বলিলেন, ইনি ব্রাহ্ম, গ্রামে যাইয়া কিরূপে থাকিবেন ? সাহেব বলিলেন, ইহা তোমাদের ভুল, ইঁহারা পৃথিবীর লবণস্বরূপ, ইঁহাদিগকে চারিদিকে ছড়াইয়া দিলেই দেশের কল্যাণ হইবে। পরে আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, যদি কমিটি আপনাকে মনোনীত করেন, আমি কোন বাধা দিব না।

কমিটিতেও ঐ তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত রত্নমণি গুপ্ত মহাশয়ের সুদৃঢ় অনুকূল মতে এবং আমার চিরহিতৈষী গোপী বাবুর চেষ্টায় কমিটি আমাকেই নিযুক্ত করিলেন। ১৮৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি ২৫৲ টাকা বেতনে জেলা স্কুলের ২য় পণ্ডিতের পদে স্থায়ী হইলাম। কর্মটী ক্ষুদ্র হইলেও আমার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান হইল। আমি সহরে থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র ক্রোড়ে স্থায়ী আশ্রয় লাভ করিলাম, আমার ক্ষুদ্র শক্তি ব্রাহ্মসমাজের সেবায় নিয়োগ করিবার সুযোগ পাইলাম; আর প্রায় চারিশত ছাত্রের শিক্ষা ও জীবনগঠনের সহায়তা করিতে পারিব বলিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলাম। বাহিরের দৃষ্টিতে ইহা সামান্য কর্ম মাত্র, কিন্তু এই নিয়োগে আমার ক্ষুদ্র জীবনে সম্মান, সৌভাগ্য ও সফলতা আনয়ন করিয়াছিল।

২। সারদার বিবাহ—ভুবনবাবু শীঘ্রই ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিবেন

স্থির হইয়াছিল। সারদাকে কোথায় রাখিব, এ চিন্তা মনে উদিত হইল। তখন সারদার বয়স ১৯ বৎসর, সৎপাত্রে পরিণীতা হইলেই তাহার জীবনের সুব্যবস্থা হইতে পারে। সারদার সঙ্গে কথা বলিয়া দেখিলাম, তাহার মনেও ঐরূপ চিন্তারই উদয় হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশবাবু মহাশয়কে পত্র লিখিয়া তাঁহাকেই পাত্র দেখিতে অনুরোধ করিলাম। চন্দননগর নিবাসী বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ তৎকালে এলাহাবাদে রেলওয়ে বিভাগে কর্ম করিতেন। তিনি বিপত্নীক ছিলেন; পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রিয় বন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপবাবু মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন। গিরিশবাবু সারদার সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, কথাবার্তা স্থির হইল। দেখাসাক্ষাতের কিরূপ ব্যবস্থা করা যায়, তাহাই চিন্তার বিষয় হইল। একজন ময়মনসিংহে, অন্যজন এলাহাবাদে। তখন ঢাকা ময়মনসিংহ রেলপথ হয় নাই। গোয়ালন্দ হইতে ঢাকায় আসিতেও ৩ দিন লাগিত। যাহা হউক, পূজার বন্ধে গোপালবাবু ঢাকায় আসিবেন, আমি ও বৈকুণ্ঠ, সারদাকে নিয়া তথায় যাইব, এইরূপ স্থির হইল। ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত কে, এন্, রায় তখন ঢাকা কলেজে পড়িতেন, লক্ষ্মীবাজারে বাসা করিয়া সপরিবারে বাস করিতেন। আমরা ঢাকায় যাইয়া তাঁহার বাসায় উঠিলাম। গোপালবাবু আসিয়া স্বর্গীয় রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ঈশ্বরকৃপায় সম্বন্ধ স্থির হইল; একমাস পরে কলিকাতায় বিবাহ হইবে নির্ধারিত হইল। গোপালবাবু এলাহাবাদ চলিয়া গেলেন; কয়েক দিন পরে আমরাও কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। তখন ১৩ নম্বর মির্জাপুর ষ্ট্রীটে ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল, সারদা তথায় রহিলেন; আমরা ১২ নম্বর বাড়ীতে ইণ্ডিয়ান মিরার আফিসে স্থানপ্রাপ্ত হইলাম।

তখন ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে মাত্র; কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি রচিত হয় নাই। আমি ও শ্রদ্ধাস্পদ অঘোরবাবু মিলিত হইয়া বিবাহ পদ্ধতি স্থির করিব, ভক্তিভাজন কেশববাবু এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মাসিক ধর্মতত্ত্বে শ্রীমতী দীনতারিণীর বিবাহপদ্ধতি মুদ্রিত ছিল। উহা অবলম্বন করিয়া একটি পদ্ধতি গঠিত হইল। এই কার্যে অঘোরবাবুর সঙ্গে আমার একটু মতদ্বৈধ হইয়াছিল। পদ্ধতিতে "কন্যাসম্প্রদান" কথা ছিল;

উহা আমার মনঃপূত হইল না। অঘোরবাবু একটু অসন্তুষ্ট হইয়া সে দিন কার্য স্থগিত রাখিলেন। পরদিন কলুটোলার বাড়ীতে প্রাতঃকালীন উপাসনার পর কেশববাবুকে আমার আপত্তির কথা জানাইলেন। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, তাই ত, শ্রীনাথ কোন্ কথা দিতে বলেন? অভিভাবকের ত একটা কার্য থাকা চাই? সম্প্রদান না বলিয়া কি বলা যায়? আমি অবনতমস্তকে ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "ভারার্পণ" কথা বলা যাইতে পারে। তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বেশ ত, ভারার্পণ কথাই লিখিয়া লও। তাহাই হইল। তদবধি বহুকাল ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতিতে ভারার্পণ শব্দই ব্যবহৃত হইত। আচার্য কেশবচন্দ্র কৃত ইংরেজী নবসংহিতাতেও "charge over" শব্দই লিখিত আছে।

১৮৭৩ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতা নগরে মহাসমারোহে বিবাহ-কার্য নির্বাহ হইল। নবপ্রকাশিত ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী হইল। ইহার কয়েক দিন পূর্বে আচার্য কেশবচন্দ্র সদলে পশ্চিমাঞ্চলে প্রচার যাত্রা করিয়াছিলেন; শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপবাবু বিবাহে আচার্যের কার্য করিলেন। ভোজের সময় সাধু যুবা স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী ও শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথবাবু প্রভৃতি গুরুভোক্তাগণ বিস্ময়জনক আহার করিয়া কর্মকর্তা কান্তিবাবু মহাশয়কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যখন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, তখন মনে হইয়াছিল যেন সর্বত্যাগী হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু আজ এই শুভানুষ্ঠানে দলে দলে ব্রাহ্ম নরনারীগণ আসিয়া গৃহ পূর্ণ করিয়াছেন, সকলেই আত্মপর ভুলিয়া আপন পারিবারিক অনুষ্ঠানের স্থায় বোধ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া হৃদয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া পড়িল। তখন কোন দলভেদ ছিল না, কাহারও মনে মানাভিমান ছিল না; ব্রাহ্মমাত্রেই ভাই ভাই, ভ্রাতার সম্পদ বিপদ সকলেই আপনার বলিয়া অনুভব করিতেন। আহা, সে আনন্দের দৃশ্য ব্রাহ্মসমাজে আবার দেখিব কি?

ময়মনসিংহের স্মৃতি

(ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত আমার শ্রদ্ধাস্পদ ধর্মবন্ধু বাবু মধুসূদন সেন মহাশয়ের লিখিত বিবরণ হইতে এই স্মৃতি-লিপি সঙ্কলিত হইল)

বার বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে আমি আমার খুড়া মহাশয়ের সঙ্গে ময়মনসিংহে

যাই। তিনি সেখানে ওকালতি করিতেন; আমি তাঁহার বাসায় থাকিয়া বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। দুই এক বৎসর পরেই তিনি পরলোক গমন করিলেন। পিতৃব্যের দেহ যখন চিতানলে ভস্মীভূত হইতেছিল, তখন আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। এই আমার প্রথম শ্মশান দর্শন; দেখিতে দেখিতে সেই সুন্দর দেহ ভস্ম হইয়া গেল, আমার তরুণ মন দুঃখ, শোক ও উদাসভাবে অভিভূত হইয়া পড়িল।

ইতিপূর্বে একদিন খুড়া মহাশয় কোথা হইতে আসিয়াই বলিতেছিলেন, "বড় সর্বনাশ হইয়াছে, বিজয় গোঁসাই আসিতেছে; ক্ষেপু (গোপীবাবু) আর লুকাইয়া কিছু করিবে না। এখন গোপনে অখাদ্য খাইতেছে, কিন্তু আর এরূপ করিবে না। রামকৃষ্ণ মুন্সীর মহা বিপদ! পুত্রকে ত্যাগ করিতে হইবে।" রামকৃষ্ণ মুন্সী আমার পিসামহাশয়। গোপীবাবু তাঁহার পূর্বপক্ষের সন্তান। গোপীবাবু জাতিচ্যুত হইলে খুড়া মহাশয়ের কিছু আসে যায় না; কিন্তু মুন্সী মহাশয় তাঁহার ভগ্নীপতি, কালেক্টরীর দেওয়ান। তাঁহাকে ছাড়া খুড়া মহাশয়ের পক্ষে কষ্টকর। তজ্জন্যই তাঁহার এরূপ ব্যস্ততা ও ভয়। যাহা হউক, গোপীবাবুর ব্যবহার ও আহারাদি সম্বন্ধে খুড়া মহাশয় যাহা যাহা বলিলেন, তাহাতে গোপীবাবুর প্রতি আমার শ্রদ্ধাই জন্মিল, তাঁহার কার্যে আমি কোন দোষ অনুভব করিলাম না।

পিতৃব্য মহাশয়ের পরলোক গমনের পরে আমাকে পিসামহাশয় রামকৃষ্ণ মুন্সীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল। আমি তাঁহারই বাসাতে থাকিয়া জেলা স্কুলে পড়িতে লাগিলাম। গোপীবাবুর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা থাকাতে আমি তাঁহার বসিবার ঘরে আশ্রয় নিলাম। ১৮৬৭ সালে পিসামহাশয় পেনসন গ্রহণ করিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। আমি কিছু দিন আমার আত্মীয় দুর্গাশঙ্কর গুপ্ত মহাশয়ের বাসায় রহিলাম; তৎপর দাদা গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। যখন স্কুলে পড়িতে-ছিলাম, তখন ব্রাহ্মসমাজে যাইতাম না, হিন্দুর অখাদ্য কিছু খাইতাম না; এ বিষয় পিতৃদেবের নিষেধ ছিল। তাঁহার কথা পাছে লঙ্ঘন করা হয়, এই জন্যই এরূপ করিতাম। তথাপি আমার মনে হয়, একবার যখন ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেন ময়মনসিংহে আসিয়াছিলেন, এবং তৎপর গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ

আসিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া ধর্মের জন্য কিঞ্চিৎ ব্যাকুলতাও অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। তথাপি ভবিষ্যৎ জীবনে যে ঐ সকল বক্তৃতা কোন কার্য করে নাই, এ কথা বলিতে পারি না। তখন জেলা স্কুলে মনোরঞ্জিকা নামে এক সভা ছিল। কোন বন্ধুর অনুরোধে আমি ঐ সভার সভ্য হই। অল্প বয়সেই সেই সভায় স্তোত্রাদি পাঠ করিতাম। স্তোত্রের অনেক কথাই বুঝিতে পারিতাম না, তথাপি পড়িতে পড়িতে মনে এক উচ্চভাবের উদয় হইত। বাল্যকালে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলে পাঠের ক্ষতি হয়, আর বাল্যকালের ভাব পরে স্থায়ী হয় না, এই সকল কথা আমার মনে উপস্থিত হইত। মনে পড়ে, একদিন কয়েকটী সমপাঠী বন্ধুর সহিত ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া আসিতেছিলাম, কথা প্রসঙ্গে কেহ বলিলেন, ব্রাহ্মধর্মটা ভাল, ঐ ধর্মমতে চলা উচিত। আমি বলিলাম, ধর্ম ভাল হইলে কি হইবে, তোমরা যদি এখন গণ্ডগোল কর, তবে পরে স্থির থাকিতে পারিবে না। আমি অধ্যয়ন শেষ করিয়া যখন ধর্ম করিব, তখন আর ছাড়িব না। ফলত আমার মনের অবস্থা ঐরূপই হইয়া উঠিতেছিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা কলেজে কয়েক মাস অধ্যয়ন করি। সেই সময়ে ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেন প্রচারার্থ ঢাকায় আগমন করেন। তিনি ষ্টিমারযোগে ঢাকার ঘাটে পঁহুছিলেন। কত লোক তাঁহাকে দেখিতে গেল, আমিও গেলাম। কি সুন্দর দৃশ্য! লোকের কি উৎসাহ! এখনও মনে আছে। তিনি ঢাকায় আসিলেন বটে কিন্তু তখনই আমাকে ঢাকা পরিত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার উপাসনা কিম্বা উপদেশ শুনিতে পারিলাম না। বৃদ্ধ পিতা সংসার পরিচালনে অসমর্থ, এজন্য পড়া ছাড়িয়া বিষয়কর্মের অনুসন্ধান করিতে হইল।

মাণিকগঞ্জ মহকুমায় আমাদের গ্রামের নিকটেই অন্য একটী গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলাম। নির্জন স্থান, সমবয়স্ক কেহই গ্রামে নাই। একাকী থাকিতাম এবং নিজ জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিতাম। ভাবিতাম জীবনের এক অধ্যায় শেষ হইল, এখন ধর্ম ও ঈশ্বরকে জানিতে হয়। কিন্তু পল্লীগ্রামে থাকিয়া এ সকল বিষয়ে সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই; এজন্য মনে হইত কোন ভাল স্থানে যাইতে পারিলে হয়। আমার মনে হয় এই সময়ে আমি রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বক্তৃতা

সকল পাঠ করিয়াছিলাম। তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া সংসারের অনিত্যতা বোধ কিঞ্চিৎ জন্মিয়াছিল। এই সময়ে আমার নিকট আত্মীয়া সুশীলাসুন্দরী * যৌবনের প্রারম্ভে বিধবা হইলেন, তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই। তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার হৃদয়বিদারক রোদন ধ্বনি শুনিয়া মনে হইল এরূপ বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত। এ ভাবনাও আমাকে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিল। যাহা হউক কোন ভাল স্থানে যাইবার ইচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল। ময়মনসিংহে যাইতেই প্রাণ ব্যাকুল হইত। কিন্তু তাহার ত কোন উপায় দেখিতাম না। কাহার সাহায্যে সেখানে যাইব? এক গোপীবাবু ভরসা; তিনিই বা কতদূর কি করিতে পারিবেন এবং আমার জন্য করিবেন কি না, এই সকল ভাবিতাম। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন পিতাঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। বর্ষাকাল, নৌকাযোগে আসিয়াছেন; পূর্বে কোন সংবাদ দেন নাই; কোন বিপদ ঘটিয়াছে মনে করিয়া ব্যস্ত হইলাম। তিনি বলিলেন, নশিরাবাদ হইতে গোপীকৃষ্ণ তাহার বাবাকে পত্র লিখিয়াছে, তাহার অধীনে একটী কর্ম খালি আছে, ঐ কাজের জন্য তোমাকে পাঠাইতে লিখিয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র আমার প্রাণ আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ হইল। আমি আর এক দিনও বিলম্ব করিলাম না; একাকী নৌকাপথে ময়মনসিংহে যাত্রা করিলাম। ৪।৫ দিনেই তথায় পঁহুছিয়া কার্যে নিযুক্ত হইলাম।

১৮৬৯ সালে অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের অধীনে ২০৲ টাকা বেতনে এক মহরেরগিরি কর্মে নিযুক্ত হইলাম। যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন এরূপ ক্ষুদ্র কর্মকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম, এখন সেই কর্ম পাইয়াই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজে যাইতে লাগিলাম, নিয়মিত রূপে ঈশ্বরোপাসনা আরম্ভ করিলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে কয়েকমাস পরেই ময়মনসিংহে ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইল। তখন কলিকাতা ও ঢাকা হইতে অনেক শ্রদ্ধেয় ও উৎসাহী

* ইনিই পরে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া আমার বন্ধু রামদুর্লভ মজুমদার মহাশয়কে বিবাহ করেন এবং দুই কন্যা রাখিয়া এখন পরলোকগমন করিয়াছেন। সুপরিচিতা ভারত-মহিলা সম্পাদিকা ইঁহারই কন্যা।

ব্রাহ্ম তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে উপাসনা প্রার্থনা ও সংকীর্তন ইত্যাদিতে যোগ দিলাম। উৎসব সুসম্পন্ন হইল এবং আমি যেন এক নূতন রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। উৎসবান্তে ভক্তিভাজন কান্তিবাবু প্রভৃতি সেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের আহ্বানে তথায় গমন করিলেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গী হইয়াছিলাম এবং এই ঘটনায় মনে সাহস ও ধর্মোৎসাহ বর্ধিত হইয়াছিল। তথায় দুইদিন ছিলাম, উপাসনা আলোচনা কীর্তন ও বক্তৃতাদি হইল। একদিন স্কুল দেখিতে গিয়াছিলাম। বাবু অমরচন্দ্র দত্ত তখন ঐ স্কুলের ছাত্র, তাঁহার সঙ্গে দুই একটী কথা ও পরিচয় হইল। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, ইনি ভবিষ্যতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিবেন। কিছুদিন পরেই আমরা তাঁহাকে পাইলাম। হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সেরপুরের একজন জমিদার, ব্রাহ্মধর্মে তখন তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল।

ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠার পর হইতেই ময়মনসিংহে ধর্মোৎসাহী একটী দলের সৃষ্টি হইল। আমি, আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়, বাবু শ্রীনাথ চন্দ, শ্রীমান কৃষ্ণকুমার মিত্র, বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, কালীকুমার মিত্র, শরৎচন্দ্র দত্ত (ইনি খোল বাজাইতেন), রমাপ্রসাদ বিষ্ণু, দীননাথ চক্রবর্তী, কেদারনাথ গুহ, বিহারীকান্ত চন্দ প্রভৃতি যুবকগণ, জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন, গোপীকৃষ্ণ সেন, কালীকুমার বসু, আনন্দনাথ ঘোষ, প্রসন্নকুমার বসু, হরমোহন বসু প্রভৃতি ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিয়া একটী অপূর্ব ধর্মমণ্ডলীতে আবদ্ধ হইলাম। এরূপ দল আর কোথাও দেখি নাই।

এখানে আমার বন্ধু এবং ব্রাহ্মসমাজের সেই চিরসুহৃদ শরৎবাবুর সঙ্গে আমার কিরূপে পরিচয় হয়, তাহার একটু উল্লেখ করিব। পূজার বন্ধের পরে যেই বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া নৌকা হইতে তীরে নামিয়াছি, তখনি একজন কৃষ্ণকায় দীর্ঘ পুরুষ আমাকে নমস্কার করিলেন। প্রথমে আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ; জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে ? তিনি বলিলেন, আপনি আমাকে চিনিবেন না ; আমি একজন মোক্তারের মুহুরী ; আপনি খাজনাখানার কেরাণী, আপনাকে আমি চিনি। আমি ভাবিলাম, কোন স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে ইনি আমার সঙ্গে পরিচয় করিতেছেন। স্বার্থ ছিল বই কি ? কিন্তু যেরূপ স্বার্থের কথা ভাবিতেছিলাম তাহা নয়। তিনি

বলিলেন, আমি আপনাকে চিনি, আপনি না ব্রাহ্মসমাজে যান? আপনাকে আমি মন্দিরে দেখিয়াছি। আমি বলিলাম, আপনাকে দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না। তিনি বলিলেন, আমি মধ্যে মধ্যে গোপনে গোপনে যাই, পাছে কেহ টের পায়, এজন্য সতর্ক হইয়া যাই। সমাজের ভয় পরিত্যাগ করিতে পারি নাই, কিন্তু বুঝিতেছি আর গোপন করা চলিবে না। আমি ভাবিলাম ইনি আমাদের পথেরই পথিক। দুইজনে কথা বলিতে বলিতে আমার বাসা পর্যন্ত আসিলাম। পরে যখন বিদায় হন, তখন পরদিন পুনরায় আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এইদিন হইতেই আমরা পরস্পরের সঙ্গী হইলাম। গৃহে ও অফিসে উভয়ের মধ্যে কেবলই ধর্মকথা—কিসে দেশের কুসংস্কার যাইবে, কিসে আত্মোন্নতি করিতে পারিব, কিসে জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা প্রকাশ্যরূপে পরিত্যাগ করিতে পারিব, কি করিলে দেশের উন্নতিসাধনে সহায় হইতে পারিব, কেবল এই সকল বিষয়েরই আলোচনা করিতাম। আমরা এতদূর মজিয়া গিয়াছিলাম যে, অনেক দিন অফিসের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছি, দিন কোথা দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিছুই বোধ নাই। পরে তাড়াতাড়ি অফিসের কার্য নির্বাহ করিয়া বাসায় আসিতাম। অফিসের কার্যে শিথিলতা দেখিয়া আমার উপরিতন কর্মচারী ও অভিভাবক গোপীবাবু মহাশয় কখনও কখনও কিছু কিছু বিরক্তিও প্রকাশ করিয়াছেন। ফলত তাঁহার যদি ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগ না থাকিত, তবে আমাকে কঠিন শাসনের অধীন হইতে হইত। এইরূপে শরৎবাবুর সঙ্গে আমার বন্ধুতা হইয়াছিল এবং আজীবন তিনি আমার একজন পরমহিতৈষী সুহৃদ মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন।

১৮৬৯ সালে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার একবৎসর পর শাখা সমাজের উৎসব সময়ে আমি, শ্রীমান কৃষ্ণকুমার মিত্র, রমাপ্রসাদ বিষ্ণু, শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়, আমরা একদিনে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্গবাবু মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত হই। ইহার কিছুদিন পরে সাধু অঘোরনাথ ময়মনসিংহে উপস্থিত হন এবং তাঁহার নিকটে অনেক ব্রাহ্ম ভ্রাতা দীক্ষিত হন। এই সময়ে ব্রাহ্ম যুবকদিগকে নানারূপ কঠিন পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের উৎসাহ ও ধর্মানুরাগ কিছুতেই খর্ব হয় নাই। ঢাকা ও কলিকাতা হইতে প্রচারকগণ আসিয়া আমাদিগকে উপদেশাদি দ্বারা উৎসাহিত ও উপকৃত

করিতেন। আমার স্মরণ হয় সাধু অঘোরনাথের পরে শ্রদ্ধাস্পদ গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় ময়মনসিংহে আসিয়া উপাসনা ও উপদেশ দ্বারা বহু উপকার করিয়াছিলেন। তাঁহারই সঙ্গে আমি এবং আমার বন্ধু শরৎচন্দ্র রায় প্রচারার্থে কিশোরগঞ্জে গিয়াছিলাম। সেখানে ভ্রাতা আনন্দচন্দ্র মিত্রের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখনও তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন নাই, স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার আকৃতি ও কথাবার্তায় ভাবিলাম, শীঘ্রই তাঁহাকে আমরা পাইব। আনন্দবাবু পরে একজন ব্রাহ্ম কবি রূপে বঙ্গদেশে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়া এখন পরলোকবাসী হইয়াছেন

আমি এ পর্যন্ত দাদা গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের বাসাতেই ছিলাম। দীক্ষার পর শ্রীনাথবাবু এবং শ্রীমান বৈকুণ্ঠনাথও গোপীবাবুর বাসায় আসিলেন। আমি এই সময়ে (১৮৭১) মাঘোৎসবে কলিকাতা গিয়াছিলাম, তথায় আমাদের স্বদেশীয় প্রকাশ্য ব্রাহ্ম বন্ধুবর অম্বিকাচরণ সেন মহাশয়ের সঙ্গে এবং পথে আসিবার সময় ঢাকার নবীন ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত জালালউদ্দীনের সহিত আহারাদি করিয়াছিলাম। সুতরাং আমরা জাতিচ্যুত হইলাম। ইতিমধ্যে বৈকুণ্ঠনাথ আবার তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মমতে করিলেন। কাজেই আমরা একেবারে দাগী ব্রাহ্ম হইয়া উঠিলাম। গোপীবাবুর বাসায় আমরা খুব সুখেই ছিলাম, তাঁহার স্ত্রী এবং খুড়ী ঠাকুরাণী আমাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। কিন্তু অতঃপর আর ইঁহারা ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না। বিশেষত গোপীবাবুর পিতার অতুল সম্পত্তি; গোপীবাবু আমাদের সঙ্গে জাতিচ্যুত হইলে, তাঁহার ঐ সম্পত্তির অংশ পাওয়া সম্বন্ধে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এই সকল বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে গোপীবাবুর আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত ও প্রফুল্ল। আমরা আনন্দের সহিত পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। গোপীবাবুর বাসা পরিত্যাগ করিলাম বটে কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে প্রকাশ্যরূপে যোগ দিতে লাগিলেন; তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁহার স্নেহ হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই।

এই সময়ে শ্রীমান কৃষ্ণকুমার মিত্র শাখা সমাজে এবং পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় মূল সমাজে উপাসনার কার্য করিতেন। কৃষ্ণকুমার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলে শাখা সমাজের কার্যভার

আমার উপর অর্পিত হইয়াছিল এবং আমি ময়মনসিংহ ছাড়িবার সময় ঐ কার্যভার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীনাথবাবু নর্মাল স্কুলের তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল ইংরেজী স্কুলে পাঠ করেন, তৎপরে শ্রদ্ধেয় গিরিশবাবু যখন বিষয়কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন শ্রীনাথবাবু তাঁহার কর্মে নিযুক্ত হন। গিরিশবাবুর স্থানান্তর গমনে আমরা কিছু অসহায় হইলাম সত্য, কিন্তু শ্রীনাথবাবু তাঁহার কর্ম পাইয়া কার্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ভুবনমোহন সেন জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া আসিলেন; এই সকল কারণে আমাদের উৎসাহে খর্বতা হয় নাই।

এই সময়ে আমরা প্রতিদিন নিয়মপূর্বক স্নানান্তে একত্রে উপাসনা করিতাম, সপ্তাহে দুইদিন ধর্মালোচনা ও একদিন সঙ্কীর্তনের জন্য নির্ধারিত ছিল। সন্ধ্যার পর আলোচনা কি সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইত, অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত আমরা ইহাতেই মজিয়া থাকিতাম। প্রচারক মহাশয়েরা কেহ কেহ আসিলে তো আর কথাই নাই। অনেক দিন আলোচনা ও সংকীর্তনের পর রান্না করিয়া আহার করিতে করিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু আমরা বিশেষ কোন ক্লেশ অনুভব করিতাম না। অফিসের কার্য করিয়া প্রাতে কিম্বা রাত্রিতে যে সময় পাইতাম, তাহার মধ্যে ৩।৪ ঘণ্টা নিদ্রা বাদে সমস্তই ধর্মচর্চা, উপাসনা প্রার্থনা এবং স্ত্রীশিক্ষা ও রুগ্নদিগের সহায়তায় ব্যয় করিতাম। আমি প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমার আত্মীয়া কয়েকটী ভদ্রমহিলাকে শিক্ষা দিতাম; বিকালে খৃষ্টানপাড়ায় দুই একজন মহিলাকে শিক্ষা দিতাম। সন্ধ্যার পরে নৈশ বিদ্যালয়ে কার্য করিতাম। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান হরিচরণ দে পরে ভুবনবাবুর সহায়তায় আমাদের বাসায় থাকিয়া জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। অন্য একজন ছাত্র শ্রীমান প্রসন্নকুমার বিশ্বাস আমার খুব অনুগত হইয়াছিলেন ক্রমে ইনি ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী হইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, এবং আমি যখন মালদহে চলিয়া যাই তখন গোপীবাবুর অনুগ্রহে আমার কাজ ইনিই পাইয়াছিলেন, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় সত্বরেই পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন।

শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশবাবুর স্থানান্তর গমনের পর শ্রদ্ধেয় ভুবনবাবু, শ্রীনাথবাবু,

শরৎবাবু, শ্রীমান বৈকুণ্ঠনাথ এবং আমি এক পরিবারভুক্তের ন্যায় হইয়া বাস করিতাম। ভৃত্য অভাবে অনেক সময়ে আমরা নিজেই গৃহের সকল কার্য করিতাম। কেহ জল আনিতেন, কেহ রান্না করিতেন, কেহ কাঠ ভাঙ্গিতেন ও বাজার করিতেন, কেহ বা বাসনকোষন মাজিতেন। ইহাতে আমাদের মনে মানাপমান জ্ঞান ছিল না, কাজকর্ম নিয়া কোনরূপ মতান্তর হইত না; যাঁহার যে কর্মে দক্ষতা, তিনি আপনা হইতেই তাহা করিয়া যাইতেন; কনিষ্ঠদিগের যাহাতে কষ্ট না হয়, জ্যেষ্ঠেরা সর্বদা সে দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। নিজের কাজ করিয়াও ভ্রাতার কাজ করিতে পারিলে আনন্দ বোধ করিতেন। পরসেবা সম্বন্ধে আমাদের যাহার যেরূপ উপযুক্ততা সেইরূপ কাজ করিতাম। রোগীর সেবা ও চিকিৎসা বিষয়ে ভক্তিভাজন গোপীবাবু এবং শরৎবাবু অগ্রগণ্য ছিলেন। এ বিষয়ে আমরা ডাক্তার সারদাকান্ত দাস মহাশয়ের যথেষ্ট সহায়তা পাইতাম।*

ভুবনবাবুর বিবাহের পর তাঁহার পত্নী হেমাঙ্গিনী দেবী আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া আমাদের উৎসাহ দ্বিগুণিত হইল।

* মধুবাবুর লিখিত এই বিবরণ পড়িয়া সারদাবাবুর কথা বার বার স্মরণ হইতেছে। যখন ভুবনবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান ললিতমোহন জন্মগ্রহণ করে, তখন ভুবনবাবু আমাদের বাসা ছাড়িয়া বাজারে একটী দালান ভাড়া করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। সারদাকেও তথায় থাকিতে হইল। আমরা কয়েকটী যুবক ব্রাহ্মবাসায় রহিলাম। এই সময়ে আমি কলেরা রোগে আক্রান্ত হইলাম। সারদাবাবু চিকিৎসার ভার লইলেন। ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ এবং আমার প্রিয় ছাত্রগণ সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এক দিবারাত্রি আমি অচেতন ছিলাম। সেই দিনই স্থানীয় পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর প্যারীবাবু ঐ রোগে আক্রান্ত হন। সারদাবাবু তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। দিনে দুজনকেই দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু রাত্রিতে তাঁহারা সারদাবাবুকে তথায় রাখিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। সারদাবাবু আমাকে ফেলিয়া তথায় থাকিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। ক্রমে তাঁহারা টাকা বাড়াইতে লাগিলেন; পরিশেষে ঐ রাত্রির জন্য ২০০ টাকা দিতে ইচ্ছুক হইলেন। সারদাবাবু বলিলেন, অর্থের লোভ দেখাইয়া আমাকে নিতে পারিবেন না; আমি এই অসহায় ব্রাহ্ম যুবককে ফেলিয়া কোথাও যাইব না। তবে আপনারা একখানি গাড়ী রাখিতে পারেন, রাত্রিতে ২।৩ বার যাইয়া দেখিয়া আসিব, নিয়মিত ভিজিট মাত্র দিলেই হইবে। আর বিনা পয়সায় নিজ হইতে ঔষধ দিয়া সমস্ত রাত্রি আমার শিয়রে বসিয়া ছিলেন। এ সকল অকারণ বন্ধুর ঋণ এ জীবনে আর পরিশোধ করিতে পারিলাম না।

তাঁহার সহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর ন্যায় ব্যবহার করিতাম ; তিনিও আমাদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিতেন। ইঁহার শিক্ষার ভার শ্রীনাথবাবু গ্রহণ করিলেন। আমরা তাঁহার জন্য মন্দিরে প্রকাশ্যে বসিবার স্থান করিয়া দিলাম। কোন কোন সময়ে বাসা হইতে মন্দিরে হাঁটিয়া যাইতেন। ইহাতে সহরে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। তখন স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের মধ্যেই কোন একটা পরিষ্কার মত জন্মে নাই। কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মাত্র দ্বিধা করি নাই। এই সময়ে শ্রীনাথবাবুর ভগিনী শ্রীমতী সারদা ব্রাহ্মসমাজে আনীত হন ; তিনি ভুবনবাবুর বাসায় থাকেন এবং হেমাঙ্গিনী দেবীর সঙ্গে একত্রে ব্রহ্মমন্দিরে যাতায়াত করেন। পরে এলাহাবাদের গোপালবাবুর সঙ্গে তাঁহার পরিণয় হয়। তাঁহারই পুত্র ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ বিলাতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের কত কাজ করিতেছেন, এবং তাঁহার এক কন্যা কুমারী ভক্তিসুধা ঘোষ বি, এ, পাস করিয়া এখন ময়মনসিংহে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কার্য করিতেছেন ; ইঁহাদের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইতেছে।

তখন ব্রাহ্মগণের চরিত্রবল ও কর্তব্যনিষ্ঠা আশ্চর্য ছিল। আমি যখন কর্মে প্রবেশ করি, তখন আমার বয়স ১৮ বৎসর মাত্র ; কিন্তু আফিসের লোকে আমাকে যে কত ভয় করিত, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। আফিসের সকল কর্মচারী আমার জন্য শশব্যস্ত। বিশেষত খাজনাখানার পোদ্দারগণ ও একজন বয়স্ক নকলনবীশ আমাকে এত ভয় করিত যে অনেক সময় তাহারা সে কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিত। আমি উৎকোচ গ্রহণের বিরোধী ; কেবল যে নিজে গ্রহণ করি না তা নয়, অপরে যে গ্রহণ করে, তাহাতে বাধা দেই। ইহাই তাহাদের ভয় ও বিরক্তির কারণ। ইহার পরে যখন আমি মালদহে উন্নতপদে চলিয়া যাই, তখন পূর্বোক্ত নকলনবীশ আমাকে বলিলেন, মধুবাবু, আপনার স্থানান্তর গমনে আমি বড় সুখী হইয়াছি! আমি বলিলাম, হবেন না কেন? আমার উন্নতি হইয়াছে। তিনি বলিলেন, না আপনি বুঝেন নাই ; আমি আপনার উন্নতিতে সন্তুষ্ট হই নাই। আমি সর্বদা ইষ্টদেবতার নিকটে প্রার্থনা করিতেছিলাম যে, আপনার মৃত্যু হউক! আপনি চলিয়া গেলেন, ভালই হইল। আপনি আমার স্ত্রীপুত্রের আহারের যেরূপ ব্যাঘাত জন্মাইতেছিলেন, তাহাতে এইরূপই

আমার মনের ভাব হইয়াছিল। ইহাদের কথা শুনিয়া অনেক সময় মনে দুঃখ হইত, কিন্তু অন্যায় উপার্জনের প্রশ্রয় দিব না, এই দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল। অতঃপর ১৮৭২ সালের নভেম্বর মাসে আমি মালদহের কালেক্‌টরীর খাজাঞ্চির পদ লাভ করিয়া সপরিবারে তথায় চলিয়া যাই। ময়মনসিংহেই আমার ধর্মজীবনের আরম্ভ ও সকল প্রকার উন্নতির সূচনা হয়। এই পরিণত বয়সেও ময়মনসিংহের সুমধুর স্মৃতিতে হৃদয়ে এক অপূর্বভাবের সঞ্চার হয়।

শ্রীমধুসূদন সেন

সপ্তম অধ্যায়

(১৮৭৩—১৮৭৫)

ব্রাহ্মদিগের পদোন্নতি ও প্রভাব

গোপীবাবু কালেক্‌টরীর খাজাঞ্চি, কালীকুমারবাবু তৃতীয় কেরাণী এবং আনন্দবাবু মহাফেজ ছিলেন। তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ রেণল্ড সাহেব এ জেলার কালেক্‌টর ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মদিগকে ভালবাসিতেন, ব্রাহ্মসমাজের কার্যে তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। এই সময়ে কালেক্‌টরীর কোন কোন উচ্চ কর্মচারীর গুরুতর দোষ প্রকাশ পায়, কেহ পদচ্যুত, কেহ বা স্থানান্তরিত হন। তদুপলক্ষে গোপীবাবু কালেক্‌টরীর সেরেস্তাদার, কালীকুমারবাবু হেড্‌ক্লার্ক এবং আনন্দবাবু পেস্কারের পদে উন্নীত হইলেন। ফৌজদারীর হেড্‌ক্লার্ক বাবু অন্নদাপ্রসাদ দাস মহাশয়ও ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন; তিনি বহুদিন আমাদের বালিকা স্কুলের সম্পাদক থাকিয়া এই স্কুলের যথেষ্ট হিত সাধন করেন। সুতরাং তৎকালে ব্রাহ্মেরাই আফিসের প্রধান পদগুলি লাভ করিয়া সহরে বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সন্তোষের জন্য অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের কার্যে যোগদান করিতেন। ও দিকে জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক রত্নমণিবাবু, দ্বিতীয় শিক্ষক কালীকুমার বাবু, তৃতীয় শিক্ষক বাবু মহিমচন্দ্র বসু, এবং নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভক্তিভাজন রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষকবর্গ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও নিয়মিত উপাসক ছিলেন। সুতরাং তৎকালে ছাত্রদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মভাব ও সৎকর্মে উৎসাহ বর্তমান ছিল। এই সময়ে ব্রাহ্মদিগের প্রতি লোকের বিদ্বেষ ও প্রকাশ্য নিপীড়ন অনেকটা কমিয়া গেল।

এই সময়ে শ্রীমান গগনচন্দ্র হোম, নবকুমার সমাদ্দার, শশিকুমার বসু, উমেশচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রভৃতি জেলাস্কুলের ছাত্রবর্গ এবং শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নর্মাল স্কুলের ছাত্রগণ শাখাসমাজের উৎসাহী সভ্য এবং সমাজের সকল কার্যে আমার প্রধান সহায় ছিলেন। এই সময়ে আমরা কয়েকটী অবিবাহিত যুবক

ব্রাহ্মবাসায় থাকিতাম। মধ্যে মধ্যে দুই একটী যুবক ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ জন্য গৃহতাড়িত হইয়া আমাদের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মবাসায় উপাসনাদির জন্য একখানি স্বতন্ত্র ঘর ছিল। শাখাসমাজের সঙ্গত-সভার কার্যও তথায় হইত। সঙ্গতে এত লোকের সমাগম হইত যে, অনেক দিন সে ঘরখানি একবারে পূর্ণ হইয়া যাইত। ব্রাহ্মধর্মের নব নব তত্ত্ব জানিবার জন্য তৎকালে ছাত্রদের মধ্যে কি প্রাণগত ইচ্ছা ও প্রবল অনুরাগই না ছিল! সঙ্গতে যে আলোচনা হইত, তাহা জীবনে পালন করিবার জন্য কতই চেষ্টা করা হইত। ছাত্রদের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ছিল: তাঁহারা নদী তটে বা কোন নির্জন স্থানে বসিয়া প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি করিতেন। ওদিকে ব্রাহ্ম দোকানে শরৎবাবু ছাত্রমণ্ডলীর "দাদা মহাশয়" ছিলেন; কত ছাত্র যে তাঁহার সহবাসে ও সৎ শিক্ষায় মানুষ হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

ব্রাহ্মপরিবার বৃদ্ধি

বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র তখন কিশোরগঞ্জ স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। ইনি অতিশয় তেজীয়ান পুরুষ ছিলেন; উক্ত স্কুলের সম্পাদক মহাশয়ের সহিত অকৌশল হওয়াতে কার্য পরিত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহে চলিয়া আসিলেন। তখনও তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন নাই; কিন্তু ব্রাহ্মদিগকেই শ্রদ্ধা করিতেন, আত্মীয় জ্ঞান করিতেন। এখানে আসিয়া আমাদেব বাসাতেই উঠিলেন। কি শুভক্ষণেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, একদিনেই যেন চিরপরিচিত বন্ধু হইয়া গেলাম। তিনি জেলাস্কুলে নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক হইলেন। আমরা অতি সুখে একই স্কুলে কর্ম করিতাম, এক গৃহে বাস করিতাম এবং একত্রে ব্রহ্মোপাসনা করিতাম। তখনও তাঁহার কবিত্ব শক্তি বিকশিত হয় নাই। কিন্তু সাহিত্যচর্চায় অতুল উৎসাহ ও প্রবল অনুরাগ ছিল।

বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে আনন্দের পৈতৃক নিবাস, তিনি তরুণ বয়সেই বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর সহোদরা ভগিনীর সহিত বাবু চন্দ্রকুমার ঘোষ নামক ঐ গ্রামবাসী এক যুবকের বিবাহ হয়। চন্দ্রকুমারও এখানে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইঁহাদের উভয়ের ইচ্ছা যে পত্নীদিগকে ব্রাহ্মসমাজে আনিয়া সম্পূর্ণ রূপে ব্রাহ্ম হইয়া যান। আনন্দের

শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণীও ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগিণী ছিলেন ; কিন্তু অন্যান্য আত্মীয়বর্গ কন্যাদিগকে আসিতে বাধা দিতেছিলেন।

আনন্দের উৎসাহ অদম্য ছিল, কোন কার্যে তাঁহার বিলম্ব সহিত না। লোকভয় কি, তিনি তাহা জানিতেন না। সর্ব বিষয়েই তাঁহার অত্যুদার মত ছিল ; সমাজ-বিপ্লবকারিণী বুদ্ধি অতিশয় প্রবল ছিল। আত্মীয়দের বাধা তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি রাজপুরুষদিগের সাহায্যে পত্নীদিগকে উদ্ধার করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। ১৮৭৪ সালের জ্যৈষ্ঠের বন্ধে আমাকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় গ্রামে যাত্রা করিলেন। তৎকালে আমাদের পরম হিতৈষী মহামনা পার্বতীচরণ রায় মুন্সিগঞ্জে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আমরা দুজনে প্রথমে তাঁহার নিকটে গেলাম। তিনি আমাদের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া আমাকে বলিলেন, তোমার তথায় যাইবার দরকার নাই, আনন্দবাবু নিজে যাইয়া পুনরায় চেষ্টা করুন। যদি নিতান্তই আবশ্যক হয়, আমি সহায়তা করিব। যাহা হউক তাঁহার সহায়তার আর প্রয়োজন হয় নাই। সহজেই মহিলাদিগকে উদ্ধার করিয়া আনন্দ ময়মনসিংহে চলিয়া গেলেন, আমি কয়েকদিন ঢাকায় থাকিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের বাসায় পুনরায় পরিবারের প্রতিষ্ঠা হইল। নিয়মিতরূপে পারিবারিক উপাসনা চলিতে লাগিল। আনন্দের শ্বশ্রূমাতা হিন্দুবিধবা হইলেও ব্রাহ্মধর্মে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল এবং ব্রহ্মোপাসনায় বিলক্ষণ নিষ্ঠা ছিল। শ্রীমান বিহারীকান্ত সস্ত্রীক গোপীবাবুর বাসায় ছিলেন, অতঃপর তিনিও আমাদের বাসায় আসিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন।

বাঙ্গালিমাসিকপত্র

বন্ধুবর আনন্দচন্দ্র মিত্রের সহিত মিলন হইতেই আমার জীবনে সাহিত্য-চর্চার আরম্ভ হয়। আমি ছাত্রজীবনে কবিতা ও গদ্য প্রবন্ধ লিখিতাম। তৎকালের লিখিত কতকগুলি খণ্ড কবিতা "সদ্ভাবকুসুম" ও "কাব্যকৌমুদী" নামে প্রচার করিয়াছিলাম। এ সময়ে গদ্যপ্রবন্ধ লিখিতেই অধিক চেষ্টা করিতাম, কবিতার প্রতি আর তেমন অনুরাগ ছিল না। আনন্দ মিত্র সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়া আমায় শুনাইতেন, এবং আমার অনুমোদন পাইয়া আরও উৎসাহী হইতেন। আমিও আমার লেখা তাঁহাকে শুনাইতাম।

বাঙ্গলা সাহিত্যে তখন বঙ্গদর্শনের যুগ। বঙ্কিমচন্দ্র তখন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সাহিত্যের আকাশ আলোকিত করিতেছিলেন। তখন কলিকাতায় আর্য্য-দর্শন, পূর্ববঙ্গে বান্ধব এবং উত্তরবঙ্গে জ্ঞানাঙ্কুর, বঙ্গদর্শনের সহকারীরূপে উদিত হইয়াছিল।* ময়মনসিংহ হইতে একখানি স্বল্পমূল্যের মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে আমাদের ইচ্ছা হইল। এবিষয়ে অনেক চিন্তা ও পরামর্শ করা গেল, আমরা দুজনে সর্বদাই ঐ বিষয়ে আলাপ করিতাম। যাহা হউক, নানারূপ বিঘ্ন বাধা সত্ত্বেও আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। সদুৎসাহী বাবু শরৎচন্দ্র রায় 'বাঙ্গালি' প্রচারে আমাদের প্রধান সহায় হইলেন। গ্রাহক সংগ্রহের সকল ভার তাঁহার হস্তে রহিল, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্মাধ্যক্ষ হইলেন। ঢাকায় মুদ্রিত হইয়া ময়মনসিংহ হইতে প্রচারিত হইল। ১৮৭৪ (১২৮১) সালের আশ্বিন মাসে 'বাঙ্গালি'র প্রথম সংখ্যা বাহির হইল। সাহিত্য বিষয়ে ইহাই ময়মনসিংহের প্রথম মাসিক পত্র। আনন্দচন্দ্রই ইহার প্রধান লেখক ছিলেন, সম্পাদকীয় ভার আমার উপর ছিল। কবিবর দীনেশচরণ বসু তখন এখানে কোন স্কুলে কার্য করিতেন, তাঁহার কবিতা নিয়মিতরূপে 'বাঙ্গালি'তে প্রকাশিত হইত। "তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা", "বাঙ্গালিরা ঘুমে রবে কি বঙ্গে ?" প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত কবিতা-গুলি 'বাঙ্গালি'তেই প্রথমে প্রকাশিত হয়। অল্পদিন মধ্যেই এই পত্রিকার বিশেষ আদর হইয়াছিল; বিশেষত ছাত্রমণ্ডলী হইতে আমরা আশাতীত সহায়তা পাইয়াছিলাম। আনন্দচন্দ্রের "সভ্যতার ভিন্ন মূর্তি" নামক গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ এবং আমার "বীরবালা" নামক উপন্যাস এই পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রখানি ৪ বৎসর কাল চলিয়াছিল; ইহাতে আমাদের কোন আর্থিক লাভ বা ক্ষতি হয় নাই।

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের প্রচার

এ সময়ে ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় প্রায় প্রতি বর্ষেই এখানে প্রচারার্থ আগমন করিতেন। ১৮৭৪ সালে শাখা

* ব্রাহ্মসমাজের কর্মাবতার স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত ও কালীনাথ দত্ত সম্পাদিত "ভারত-সংস্কারক" নামক সাপ্তাহিক পত্রে এই চারখানি মাসিকপত্রের বড় সুন্দর সমালোচনা বাহির

সমাজের উৎসবের সময় তিনি এখানে আসিয়া কিছুদিন আমাদের সঙ্গে একত্রে বাস করেন। তখন আমরা কয়েকটি অবিবাহিত যুবক ব্রাহ্মবাসার বহিরাঙ্গনে একত্রে বাস করিতাম এবং নিজ হস্তে রন্ধনাদি করিয়া আহার করিতাম। এই সময়ে নেত্রকোণা অঞ্চল নিবাসী প্রসন্নকুমার ঘোষ নামক একটী যুবক ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া আমাদের সঙ্গী হইলেন; এজন্য তাঁহাকে অনেক কষ্ট ও পরীক্ষায় পড়িতে হইল। গোপীবাবু তাঁহাকে ট্রেজারির কেরাণীর কর্মে নিযুক্ত করিলেন। প্রসন্ন আমাদের নাইট স্কুলে পড়িয়া অতি সামান্য ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু কর্মে নিযুক্ত হইয়া দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া কার্যোপযোগী ইংরেজী শিখিয়া লইল। তাহার ধর্মানুরাগও খুব প্রবল ছিল। গৌরবাবু আমাদের সঙ্গে কিছুদিন থাকিয়া আমাদিগকে বিবিধ প্রকারে ধর্মবিজ্ঞান শিক্ষা দিলেন। তাঁহার শিক্ষা, উপদেশ ও উপাসনায় আমাদের নিকট জ্ঞানরাজ্যের এক নূতন দ্বার খুলিয়া গেল। ময়মনসিংহ তাঁহার বড় প্রিয় কার্যক্ষেত্র ছিল। শাখা সমাজের যুবকবৃন্দকে তিনি বড়ই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তখন মূল সমাজে রাত্রির উপাসনায় লোকসমাগম অল্পই হইত, কিন্তু শাখা সমাজে লোক ধরিত না। একদা কেহ বলিয়াছিলেন, এখন আর মূল সমাজের অস্তিত্ব বড় একটা অনুভব করা যায় না, শাখাসমাজই সর্বেসর্বা হইয়া পড়িয়াছে; তাহা শুনিয়া গৌরবাবু বলিয়াছিলেন, ইহাই ত স্বাভাবিক, কালসহকারে মূল মৃত্তিকায় আবৃত হইয়া যায়, শাখাতেই ফল ধরে। বস্তুত তৎকালে ময়মনসিংহের "শাখাসমাজ" যে সকল অমৃত ফল প্রসব করিয়াছিল, এখনও ব্রাহ্মসমাজ তাহা ভোগ করিতেছেন।

গৌরবাবু কেবল ধর্মপ্রচার করিয়াই বিরত থাকিতেন না; তিনি ব্রাহ্মদের চরিত্র, রীতিনীতি, শিক্ষা ও সংসারিক সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেন এবং যথোচিত উপদেশ ও সৎপরামর্শ দ্বারা সহায়তা করিতেন। বস্তুত বিষয়কার্যে নীতিরক্ষা করা, ন্যায়পথে অর্থোপার্জন করা এবং নিঃস্বার্থভাবে পরের জন্য কার্য করা, ব্রাহ্ম জীবনের এই সকল উন্নত ভাব

হইয়াছিল, সে কথা এখনও মনে আছে—"মৌলিকতা বঙ্গদর্শনের বিশেষ গুণ, অনুকরণ জ্ঞানাঙ্কুরের ধর্ম, আর্য্যদর্শন অনুবাদে পূর্ণ, বান্ধব চিন্তাশীল"।

তিনি এখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চা বিষয়েও আমরা তাঁহার নিকট ঋণী। এ বিষয়েও তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন।

কোন প্রকার ভ্রম কুসংস্কার বা কল্পিত ধর্মভাব যাহাতে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ না করে, তজ্জন্য তিনি কতই সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। ব্রাহ্মগণ উপাসনা সময়ে ঈশ্বরের "চরণ" শব্দ ব্যবহার করেন, তিনি "তোমার সর্বব্যাপী অনন্ত চরণে প্রণাম করি" এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং আমাদিগকে উহার কারণ বুঝাইয়া দিতেন। তিনি উপস্থিত থাকিতে আমরা সমাজে উপাচার্যের কার্য করিতে চাহিতাম না, কিন্তু তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে উপাসনা করিতে বাধ্য করিতেন, এবং স্বয়ং তাহাতে যোগ দিতেন। তিনি বলিতেন, ব্রাহ্মসমাজে যেন পৌরোহিত্য প্রবেশ না করে, গুরু পুরোহিত বাড়ীতে আসিলে গৃহস্থের পক্ষে পূজাদি নাই, এ ভাব যেন কাহারও মনে স্থান না পায়।

কালীকচ্ছে শারদীয় উৎসব

কুমিল্লা জেলার সরাইল পরগণায় কালীকচ্ছ একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামে প্রসিদ্ধ কালীসাধক দেওয়ান রামদুলাল মুন্সি বাস করিতেন। তিনি আগরতলার রাজার দেওয়ান ছিলেন এবং ভক্তসাধক বলিয়া বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এই বংশের বাবু আনন্দচন্দ্র নন্দী ও কৈলাসচন্দ্র নন্দী ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছিলেন। যে বৎসর উক্ত পরিবারে দুর্গোৎসবের পরিবর্তে ব্রহ্মোৎসব আরম্ভ হইল, সে বার তথায় প্রাচীন সমাজের সহিত ব্রাহ্মদের ভয়ানক সংগ্রাম ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মদের প্রতি রীতিমত বল প্রয়োগ ও বিবিধ প্রকার অত্যাচার হইয়াছিল। কিন্তু ঐ উৎসাহী ভ্রাতাদ্বয় সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে ব্রহ্মোৎ-সব সম্পন্ন করিলেন। সেই বিশ্বাস-বিজয়বার্তা শুনিয়া আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ভাবুক ব্রাহ্ম কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় এই গানটী রচনা করিয়া প্রমত্তভাবে গাহিয়াছিলেন।—

"দয়াল নামের তোপ দাগিয়ে মহিম ফতে কর ভাই।
যত দেখ কেল্লাবন্দি পুড়ে ধুড়ে হবে ছাই।

বিশ্বাস বারুদ পুরিয়ে প্রেমের শলায় গাঁজ তায়,

নয়ন মুদে দেও রে আগুন, চেয়ে দেখ্‌বে কিছু নাই।"

১৮৭৪ সালের আশ্বিন মাসে আমরা এই শারদীয় উৎসবে কালীকচ্ছে গমন করিলাম। ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতি একদল তথায় যাইবেন শুনিয়া গোপীবাবু, শরৎবাবু প্রভৃতি ব্রাহ্মগণের সহিত ঢাকায় যাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইলাম, ভক্তিভাজন প্রচারক গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় কলিকাতা হইতে আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। আমাদের দলটী বেশ পরিপুষ্ট হইল; একখানি বৃহৎ নৌকায় সকলে যাত্রা করিলাম। একত্রে উপাসনা, কীর্ত্তন ও আহারাদি অতিশয় উৎসাহ ও আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। কালীকচ্ছে তিন দিন মহোৎসব হইল। প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপে দুইবেলা উপাসনা, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা প্রভৃতি হইত; প্রায় শতাধিক লোক প্রত্যহ একত্রে ভজন ভোজন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করা যাইত। আনন্দবাবুর ধর্মভাব, কৈলাসবাবুর জ্বলন্ত উৎসাহ এবং সমাগত ব্রাহ্মগণের পবিত্র সহবাসে মনের কতই উপকার হইয়াছিল বলা যায় না। আনন্দবাবুর সহধর্ম্মিণী প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত রন্ধনগৃহে ব্যস্ত থাকিতেন এবং স্বহস্তে রন্ধন করিয়া শত শত লোকের পরিতোষ সাধন করিতেন। এত পরিশ্রমেও তাঁহার ক্লান্তি ছিল না, মুখের প্রসন্নতার হ্রাস হইত না! তাঁহার সেই অন্নপূর্ণারূপ দর্শন করিলে হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইত।

আমরা কালীকচ্ছ হইতে নাছিরনগর গ্রামে আমাদের শরৎবাবুর বাড়ীতে গেলাম। সেখানেও দুইদিন গ্রামবাসীদিগের সহিত ধর্মালোচনা ও উপাসনাদি হইল। কাছাড় জেলাস্কুলের তদানীন্তন হেড্‌মাষ্টার এই গ্রামবাসী অভয়বাবুর সঙ্গে পরিচিত হইয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। তিনি অতিশয় সহৃদয় ও ধর্মোৎসাহী লোক ছিলেন। গোপীবাবুর মাত্র ১২ দিনের ছুটি ছিল, তিনি নাছিরনগর হইতেই স্বতন্ত্র নৌকা করিয়া ময়মনসিংহে চলিয়া গেলেন। আমরা একদল শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত সাজর গ্রামে গেলাম। এই গ্রামে প্রিয়ভ্রাতা শ্রীনাথ দত্ত ও সীতানাথ দত্তের পৈতৃক নিবাস। তথায় দুইদিন উপাসনা, ধর্মালোচনা ও কীর্ত্তনাদি হইল। পরিবারস্থ সকলে বিশেষত শ্রীনাথবাবুর খুড়ীমাতা উপস্থিত ব্রাহ্মদিগের

সেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। এখানে এত মাছির উপদ্রব ছিল যে, উপাসনার সময় চাদর দিয়া মুখ ঢাকিয়া বসিতে হইত, নতুবা মাছিগুলি মুখের ভিতরে প্রবেশ করিত! অতঃপর আমরা ঢাকায় কয়েকদিন থাকিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলাম।

একটী হিন্দুবিধবা বালিকার ব্রাহ্মসমাজে আগমন

প্রিয় সুহৃদ বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী বাল-বিধবা ছিলেন। তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে আনয়ন করা হয়। এই ঘটনায় প্রাচীন সমাজে পুনরায় নূতন আন্দোলন উপস্থিত হইল। এই বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত বৈকুণ্ঠবাবুর লেখা হইতে সঙ্কলিত হইল।

"আমার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী বাল্যকালে বিধবা হন। তাঁহার বৈধব্য যন্ত্রণা আমার প্রাণে বড়ই বেদনা দিত। স্কুল বন্ধ হইলে বাড়ীতে যাইতাম, তখন তাঁহাকে কিছু কিছু লেখা পড়া শিখাইতে যত্ন করিতাম। একবার বন্ধের সময় তাঁহার নানারূপ ক্লেশের কথা আমাকে বলেন। তাঁহাকে ময়মনসিংহে আনিতে প্রস্তাব করিলাম, তিনি সম্মত হইলেন। তখন বিবাহের কোন কথা হয় নাই। একবার পূজার বন্ধে নৌকা লইয়া বাড়ীতে গেলাম, ইচ্ছা যে তাঁহাকে নিয়া আসি। কিন্তু তখন তাঁহার সাহস হইল না। বলিলেন, গ্রীষ্মের বন্ধে আসিবেন। ১৭৯৬ শকের (১৮৭৪) গ্রীষ্মের বন্ধের সময় বাড়ী যাইয়া কথা বার্তা স্থির করিয়া ময়মনসিংহের ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে জানাইলাম। তাঁহারা একটী হাতীসহ দুইটী ব্রাহ্ম যুবককে পাঠাইলেন। নন্দনপুরের বাজারে হাতী রাখিয়া তাঁহারা আমাদের বাড়ীতে আসিয়া দেখা করিয়া গেলেন; কথা রহিল নিকটবর্তী নদীতে একখানি নৌকাতে তাঁহারা থাকিবেন, আমরা রাত্রিতে যাইয়া নৌকায় উঠিব। রাত্রিতে জাগিয়া দেখিলাম, আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, আমার মন নিরুৎসাহী ও অবসন্ন; কিছুতেই মন চলিল না; অন্তরে যেন কে নিবারণ করিতেছেন, মনে হইল। সেদিন আর যাওয়া হইল না। ওদিকে বন্ধুদ্বয় সমস্ত রাত্রি ক্ষুদ্র নৌকায় বসিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া প্রত্যুষে চলিয়া গেলেন। দুই একদিন পরে আমিও একাকী ময়মনসিংহে ফিরিয়া গেলাম। বন্ধুদের নিকট মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিলাম না। তাঁহারা ভাবিলেন যে, আমার

মনের দুর্বলতা হেতু ওরূপ ঘটিয়াছে। তখন আমি স্কুলের ছাত্র, যদি ভগবানের অভিপ্রায়ের কথা বলি, তবে কে বিশ্বাস করিবে? কিন্তু পরবর্তী ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝিলাম, সে বার ভগিনীকে আনিলে নানারূপ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা ছিল।

"১৭৯৭ শকের (১৮৭৫) ২৮শে বৈশাখ পুনরায় একজন ধর্মবন্ধুসহ মুক্তাগাছার ব্রাহ্ম-হিতৈষী জমিদার স্বর্গীয় অমৃতনারায়ণ আচার্য্য মহাশয়ের প্রদত্ত হস্তীতে আরোহণ করিয়া দেশে গেলাম। বাড়ী হইতে ৬ মাইল দূরবর্তী নন্দনপুরের বাজারে হাতীসহ বন্ধুকে রাখিয়া আমি বাড়ীতে গেলাম। কথা রহিল, বাড়ীর নিকটবর্তী শুষ্ক নদীগর্ভে হাতী লইয়া তিনি আমাদের অপেক্ষা করিবেন। সেই রাত্রিতেই বামাকে আমাদের অভিপ্রায় জানাইলাম; তিনিও প্রস্তুত হইলেন। সে রাত্রিতে অনেকগুলি অতিথি আসিয়াছিলেন, সুতরাং আহারাদি শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। আমরা সকল ভাই বোন মায়ের কাছে এক ঘরে শয়ন করিলাম। গভীর রাত্রিতে গাত্রোত্থান করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি অন্তরে বল ও উৎসাহ প্রেরণ করিলেন। তখন বামাকে জাগাইলাম এবং তাঁহার হাত ধরিয়া বনের ভিতর দিয়া মাঠে যাইয়া পড়িলাম। তথায় ভগিনীর গায়ে একটী পীরাণ পরাইলাম এবং দ্রুতপদে প্রায় এক মাইল পথ হাঁটিয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। যেখানে বন্ধুর থাকিবার কথা, তথায় জনমানব দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু নদীতে যেন কেহ জল নাড়িতেছে এরূপ শব্দ পাইলাম। জেলেরা মাছ ধরিতেছে মনে করিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছিলাম, কিন্তু উহার হাতীর কার্য হইতে পারে ভাবিয়া অগ্রসর হইলাম। আমাদিগকে দেখিয়া হাতী নদীর তটে উঠিল, আমরা সত্বর উহাতে আরোহণ করিয়া ময়মনসিংহের দিকে ধাবিত হইলাম। মাহুতকে কিঞ্চিৎ বকসিস দেওয়া গেল, সে বিলক্ষণ চতুরতার সহিত প্রকাশ্য পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে যাইতে লাগিল। আমরা কিরূপ যানে ময়মনসিংহে যাইব, ভগিনী তাহা জানিতেন না। হাতী দেখিয়া বিলক্ষণ ভয় পাইয়াছিলেন, কিন্তু আমি সঙ্গে আছি, আমার বন্ধুও তাঁহার পূর্বপরিচিত, আমাদের প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি সাহস ও বল লাভ করিয়াছিলেন। পরদিন প্রায় রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় আমরা ময়মনসিংহে পঁহুছিলাম। শ্রীযুক্ত গোপীবাবু মহাশয় শ্রীমতীকে তাঁহার পরিবারে আশ্রয় দান করিলেন।

"ইহার প্রায় এক বৎসর পূর্ব হইতে আমার জীবনের বিশেষ কার্য (Mission) বুঝিবার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থী হই। নানা দিকে মনের গতি হইতেছিল, কোন স্থির ভূমি লাভ করিতে পারি নাই। এবার ২৩শে আষাঢ়ের উৎসবে ঢাকা হইতে ভক্তিভাজন বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় সদলে আগমন করিলেন। উৎসব হইয়া গেল। এই উৎসব মধ্যে আমার জীবনের মিশন প্রকাশিত হইল! ঢাকাতে যাইয়া প্রচারকমণ্ডলীর সঙ্গে মিলিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায় জীবন যাপন করিতে হইবে, এই নির্দেশ বুঝিতে পারিলাম। রায় মহাশয়কে এবং ময়মনসিংহের বন্ধুদিগকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম। তখন অতি অল্পদিন হইল ভগিনীটী আসিয়াছেন, তাঁহাকে নিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় কিরূপে চলিবে, এই বলিয়া মণ্ডলীর অনেকেই আমাকে বিরত হইতে অনুরোধ করিলেন। কেবল উপাচার্য মহাশয় এবং গোপীবাবুর সহানুভূতি হইল। উপাচার্য মহাশয় ঢাকা যাইবার সময় আমি ভগিনীসহ তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। বামা অল্পদিন হইল গৃহ ছাড়িয়া আসিয়াছেন, দাদাই তাঁহার সর্বস্ব; কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া তিনি আমার সঙ্গে চলিলেন। রাস্তায় এক স্থানে আমি বাজারে গিয়াছি, তখন তিনি উপাচার্য মহাশয়কে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, আমরা যে আসিলাম, আমাদের কি ভাল হইবে?" তিনি তাঁহাকে যাহা ভাল, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার কথায় বামার মন শান্ত ও নিশ্চিন্ত হইল।"

ব্রাহ্মসমাজে নূতন চিন্তার সূত্রপাত

এই সময়ে অনেক সুশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্রাহ্ম, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের "একনায়কত্ব" সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয় বলিয়া মনে করিতেছিলেন। উক্ত সমাজের প্রচারক মহাশয়েরা কোনও নিয়মাধীন হইয়া কার্য করিতে সম্মত নহেন, অনেকের এরূপ ধারণা হইয়াছিল। এই ভাব ক্রমে পুষ্টি লাভ করিয়া ধীরে ধীরে সমাজ মধ্যে দুইটী দলের সৃষ্টি করিতেছিল। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার মতানুগত প্রচারকগণ অন্যান্য ব্রাহ্মদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমাজের কার্যে যথাসম্ভব সকলের মতাদি গ্রহণ করিলে বোধহয় সমাজ মধ্যে এইরূপ দলভেদ ঘটিত না। বস্তুত তৎকালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে কেশববাবু ও তাঁহার অনুগামী প্রচারক

গণ ভিন্ন, সমাজের কার্যে ব্রাহ্ম সাধারণের কোনও দায়িত্ব বা মতামত প্রকাশের সুবিধা ছিল না। এই জন্য তৎকালে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব, আনন্দ-মোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ ভট্টাচার্য্য, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ রায় ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজের "প্রতিনিধি সভা" স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন;

আর একটী কারণে ব্রাহ্মসমাজে অভিনব চিন্তা ও মতপার্থক্য প্রকাশ পাইতেছিল। তদানীন্তন ব্রাহ্ম প্রচারকগণের অবলম্বিত ও প্রচারিত মত এবং কার্যাদি সম্বন্ধেও নব্য ব্রাহ্মদিগের কিছু কিছু মতবৈষম্য ঘটিতেছিল। শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য (শাস্ত্রী) সম্পাদিত "সমদর্শী" পত্রে * এই সকল চিন্তা ও মতবৈষম্য প্রকাশ পাইতেছিল; মফঃস্বলেও সেই সকল ভাব সংক্রামিত হইতেছিল। আমার বন্ধু আনন্দচন্দ্র মিত্র অতিশয় স্বাধীনচিন্তাশীল ও সর্ববিধ বন্ধনমুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা কেশবচন্দ্র ও প্রচারক মহাশয়গণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও তাঁহাদের অনুগামী ছিলাম। আনন্দবাবু সমদর্শীর দলভুক্ত ছিলেন। তিনি ঐ পত্রে প্রার্থনা বিষয়ে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়া-ছিলেন, ক্রমে তিনি প্রার্থনা-বিরোধী হইলেন। আর মিলিত উপাসনায় বড় উপস্থিত হইতেন না; হইলেও আরাধনান্তে প্রার্থনার সময়ে উঠিয়া যাইতেন। একাকী গৃহে বসিয়া উপাসনা করিতেন এবং "না চাহিতে দিয়াছ সকল বিভু" এই সঙ্গীতটী সর্বদা গাহিতেন। ব্রাহ্মেরা প্রায় সকলেই এজন্য তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন এবং আমি কেন এ বিষয়ে তাঁহাকে কিছু বলি না, এই বলিয়া অনেকে আমাকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। আমরা সর্বদা এক গৃহে বাস ও একত্রে সাহিত্য চর্চা করিতাম, তাঁহার প্রণীত হেলেনা কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা ও ভূমিকা লিখিয়া আমিই প্রকাশ করিতেছিলাম; কিন্তু এত ঘনিষ্ঠতা ও প্রীতিবন্ধন সত্ত্বেও আমি তাঁহার এই মতবৈষম্য সম্বন্ধে একটী কথাও বলি নাই; এবিষয়ে কোন কথাই আমার মুখে আসিত না; আমার প্রাণের আবেগ কথায় বলিবার মত ছিল না। অনেক দিন এই মনোবেদনা প্রার্থনাযোগে প্রভুর চরণে নিবেদন করিয়াছি,

* কোন রহস্যপ্রিয় সম্পাদক এই পত্রের সমালোচনায় বলিয়াছিলেন, ইনি সমদর্শী অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের স্থাবর ও জঙ্গম উভয় দলকে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন।

তাহাতেই অন্তরে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি। যাহা হউক, আমার এই প্রার্থনা, প্রভুর চরণে অগ্রাহ্য হয় নাই ; পরবর্তী আষাঢ় মাসে শাখা সমাজের উৎসব সময়ে আমার পুনর্দীক্ষা দর্শন করিয়া আনন্দের মন একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গেল, তিনি সরল বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদবধি সরল ও ব্যাকুল প্রার্থনা তাঁহার জীবনের চির সম্বল হইয়া রহিল।

ব্রাহ্মসমাজে বৈরাগ্য সাধন

"আচার্য্য কেশবচন্দ্র" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, "প্রচার-কার্যালয় যখন বর্তমান অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে আইসে নাই, তখন প্রচারকগণের আহারাদি সম্বন্ধে কোনই স্থিরতর ব্যবস্থা ছিল না ; আহার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে তাঁহারা সর্বদা বিহঙ্গের ন্যায় ছিলেন। এখন সে সকল বিষয়ে ব্যবস্থা হইয়া সুখ-প্রিয়তার দিকে ইঁহাদের চিত্তের গতি হইল। কঠোর বৈরাগ্যের নিয়ম বিনা এ স্রোত অবরোধ করা নিতান্ত সুকঠিন। এ জন্য কেশবচন্দ্র সমুদয় বন্ধুবর্গকে লইয়া বিশেষ সাধনে প্রবৃত্ত হইবার জন্য যত্নশীল হইলেন। প্রচারকগণ যাহাতে বিনীত হন, উদ্ধতভাব পরিহার করেন, পরস্পর পরস্পরের অধীন হন, এই জন্য সাধন প্রবর্তিত হইল। বৈরাগ্য সাধনার প্রারম্ভ জুলাই মাস ১৮৭৫)। বৈরাগ্য দ্বারা আসক্তির বন্ধন ছেদনপূর্বক সকল প্রকার বিবাদ বিসংবাদ দূর করিবার জন্য প্রচারক সভার অধিবেশনে সাধনের নিয়ম সকল নির্ধারিত হইল। প্রচারকগণ রন্ধন, পরিবেশন, গৃহ পরিষ্কার প্রভৃতি যাবতীয় কার্য স্বহস্তে নির্বাহ করিবেন ; কে কি করিবেন তাহাও নির্দিষ্ট হইল। কেশবচন্দ্র আপনি স্বহস্তে রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতাপচন্দ্র অন্ন প্রস্তুত করিয়া লইবেন, ব্যঞ্জনাদি অন্যের রন্ধন হইতে গ্রহণ করিবেন, স্থির হইল।

"বিশেষরূপে বৈরাগ্য সাধন চলিতে পারে, এ জন্য বেলঘরিয়ার তপোবন মনোনীত হইল। উদ্যানের দক্ষিণ ভাগ লীচু বৃক্ষদ্বারা আবৃত ছিল, এই বৃক্ষের নিম্নে তপস্যা-ভূমি এবং তৎপার্শ্বে সাধকদিগের রন্ধনভূমি নির্দিষ্ট হয়; প্রতিদিন এই স্থানে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণসহ মিলিত উপাসনা করিতেন ; সে উপাসনার মধ্যে যোগ ও ভক্তি, প্রেম ও বৈরাগ্যের কি যে অদ্ভুত মিলন হইয়াছিল, যাঁহারা তাহা স্বয়ং সম্ভোগ করেন নাই, তাঁহাদিগকে তাহা জ্ঞাপন করা

অসম্ভব। উপাসনান্তে কেশবচন্দ্র স্বহস্তে আপনার জন্য রন্ধন করিতেন, বন্ধুবর্গ মিলিতভাবে রন্ধন কার্য নির্বাহ করিতেন। আহারান্তে সকলে উদ্যানস্থ গৃহে যাইয়া স্ব স্ব কর্তব্য কার্য সম্পন্ন করিয়া অপরাহ্নে নির্জন সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন। * * এই তপোবনেই পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। পরমহংস ও কেশবচন্দ্রের মিলন ধর্মরাজ্যে এক শুভ সংযোগ। পরমহংস তখন কেশবচন্দ্রকে "কেশবচন্দ্র" বলিয়া জানিতেন না, তাঁহাকে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, এই লোকটার ফাত্‌না ডুবেছে।

এই বৈরাগ্য সাধন উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের সর্বত্র বিলক্ষণ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। সুদূর ইংলণ্ডেও এই তরঙ্গ পঁহুছিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের চিরহিতৈষিনী মিস্ কলেট বৈরাগ্যের নামে ভীত হইয়া মিরার পত্রে একখানি প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজও বা পাছে অস্বাভাবিক বৈরাগ্যপথ আশ্রয় করেন, নিষ্ফল কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা অধ্যাত্মবল ক্ষয় করেন অথবা অপর সাধারণ হইতে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অভিমানে স্ফীত হন, এই সকল আশঙ্কা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। এদেশেও এক শ্রেণীর লোক এই বৈরাগ্য সাধন উপলক্ষে নানারূপ সমালোচনা ও বিদ্রূপ করিতেছিলেন। "তেতলায় বেঁধেছ খোলা" ইত্যাদি কথায় ব্রহ্মানন্দের বৈরাগ্যকে বিদ্রূপ করিয়া কবিতা বা গান প্রকাশিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে প্রচারকগণ ও তাঁহাদের প্রেমানুরক্ত ব্রাহ্মগণ অনেকে এই বৈরাগ্য সাধন অবলম্বন করিয়াছিলেন। অবশ্য কেশবচন্দ্রের এবং তাঁহার প্রচারক মণ্ডলীর উদ্দেশ্য অতিশয় মহৎ ছিল, কিন্তু সর্বত্রই উহাতে সুফল ফলিয়াছে, এমন বলা যায় না।

এই সময়ে ভক্তিভাজন গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় প্রচারার্থ ময়মনসিংহে আগমন করিলেন। তখন আমরা কতিপয় যুবক, ব্রাহ্ম বাসায় একত্রে বাস করিতেছিলাম, আমরা স্বহস্তেই রন্ধনাদি করিয়া আহার করিতাম। প্রচারক মহাশয়েরা তখন বৈরাগ্য সাধনের যে সকল বাহ্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমরা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াই সেই সকল কর্ম করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। যাহা হউক, গৌরবাবু আমাদের সঙ্গে একত্রে অবস্থিতি করিতেন বটে, কিন্তু স্বয়ং স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পৃথক আহারাদি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি প্রত্যহ ৩।৪ ঘণ্টাকাল নির্জনে বসিয়া ধ্যান

করিতেন। সেই শুষ্ক দেহ বৈরাগ্যের অনলে দগ্ধ হইয়া আরও কঠোর মূর্তি ধারণ করিয়াছিল।

তাঁহার দৃষ্টান্তে আমাদের মধ্যেও কেহ কেহ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন পরে প্রায় সকলেই সে ব্রত পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু ভ্রাতা প্রসন্নকুমার আর সে ব্রত ছাড়িলেন না। ইহার কয়েক মাস পরে প্রসন্ন পীড়িত হইয়া পড়িলেন, এবং রোগ ভয়ানক অবস্থায় পরিণত হইলে অনেকেই ইহাকে তাঁহার সেই কঠোর বৈরাগ্য সাধনের ফল মনে করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মিকা ভগিনী দয়াময়ী ঘোষ

এই শ্রদ্ধেয়া মহিলা আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ ঘোষ মহাশয়ের সহধর্মিনী। ইনি হিন্দু কুলবধু, পূর্বে কোনরূপ বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই, কিন্তু স্বামীর দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মধর্ম আচরণ করিয়া যথার্থ সহধর্মিনীর দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছিলেন। ইঁহার যেমন ধর্মানুরাগ তেমনি আত্মোন্নতি সাধনে প্রাণগত যত্ন ছিল। তৎকালে ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীজাতির আগমন অতি অল্পই হইয়াছিল; ইনি ত কোনরূপ দৃষ্টান্ত দেখেন নাই বলিলেই হয়। কিন্তু শুদ্ধ আত্মচেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া ইনি বিদ্যাশিক্ষায়, ধর্মসাধনে এবং সদাচারে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সুযোগ পাইলেই আমাদিগের নিকট হইতে শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা গ্রহণ করিতেন। আমরাও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতাম। পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কতই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এজন্য তাঁহাকে কতই লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ধর্মের জন্য কোনরূপ কষ্ট সহ্য করিতেই ভীত বা পশ্চাৎপদ হইতেন না। এমন কি ইঁহার ধর্মোৎসাহেই আনন্দবাবু "আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম" হইয়াছিলেন একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমার ভগিনী শ্রীমতী সারদা পিতৃগৃহ হইতে আসিয়া কিছুদিন ইঁহার আশ্রয়ে বাস করিয়াছিল। সারদার বিবাহের কিছুদিন পরেই ইনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। কোন চিকিৎসায় ফল না হওয়াতে আনন্দবাবু ইঁহাকে পুত্র কন্যাসহ এলাহাবাদে সারদার নিকটে রাখিয়া আইসেন। ভগিনী দয়াময়ী তথায় প্রায় ৬ মাস কাল থাকিয়া সুস্থদেহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু কয়েক

মাস পরে তাঁহার সন্তান সম্ভাবনা হইল এবং পূর্ব রোগ দেখা দিল। ১৮৭৫ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ একটী মৃত সন্তান প্রসব করিয়া তিনি অমরধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার পরলোক যাত্রা তৎকালের একটী প্রধান ঘটনা। ঐ সময়ে ভক্তিভাজন গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় এখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং ভগিনীর পারলৌকিক কার্যে তিনিই উপাসনাদি করিয়াছিলেন।

ভারত মিহির

১৮৬৬ সালে এখানে 'বিজ্ঞাপনী' নামে সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রচারিত হয়। বালিয়াটীর জমিদার গিরিশবাবু ঢাকাতে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই এখানে স্থানান্তরিত হয়। গিরিশবাবু ঐ পত্রিকা ও মুদ্রাযন্ত্রের অর্ধাংশের মালিক থাকেন, বাবু দেবিদাস সেন, গোবিন্দচন্দ্র গুহ, রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি স্থানীয় কতিপয় শিক্ষিত লোক অবশিষ্টাংশের অধিকারী হইলেন। ঢাকা নর্মাল স্কুলের ছাত্র সুলেখক পণ্ডিত জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার লিপি-দক্ষতায় পত্রিকাখানি বেশ সতেজে চলিতেছিল। সমাজদ্রোহী উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি শিক্ষিতগণের পক্ষে 'বিজ্ঞাপনী'র তীব্র লেখা মহৌষধরূপে কার্য করিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালির স্বভাবসিদ্ধ অনৈক্যগুণে পত্রিকাখানি অচিরেই উঠিয়া গেল। অগ্নিহোত্রী মহাশয় স্থানীয় অংশীদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য করিতে লাগিলেন; তাহার ফলে যন্ত্রালয়ে ডবল তালা পড়িল, পাহারা বসিল! এই গৃহবিবাদে 'বিজ্ঞাপনী' উঠিয়া গেল। গিরিশবাবু মুদ্রাযন্ত্রটী ঢাকায় নিয়া "গিরিশ যন্ত্র" নামে স্থাপন করিলেন। তৎপর বহুবর্ষ এখানে কোন সংবাদপত্র বা মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। শিক্ষিতগণ সর্বদাই এই অভাব অনুভব করিতেন। আমরা "বাঙ্গালি" পত্র প্রচার করিয়া এই অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছিলাম। ১৮৭৫ সালের কথা বলিতেছি; তখন বাবু অনাথবন্ধু গুহ, জানকীনাথ ঘটক এখানে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছেন, কবি দীনেশচরণ বসু ও আনন্দ চন্দ্র মিত্র কর্মোপলক্ষে এখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সকল লোক নিষ্কর্মা হইয়া দিন কাটাইতে পারেন না। তাঁহারাও একটী মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের জন্য ব্যাকুল হইলেন। বিধাতার কৃপায় শুভ সংযোগ উপস্থিত হইল।

রাজসাহী জেলার খেজুরা গ্রাম নিবাসী সদুৎসাহী যুবক বাবু কালী-নারায়ণ সান্যাল এখানে উপস্থিত হইলেন। মুক্তাগাছার জমিদারবংশের সহিত কুটুম্বিতাসূত্রে এ জেলায় তাঁহার কিছু পৈতৃক তালুক ছিল। কালী-নারায়ণ কোন কাজ কর্ম করিতেন না, ছায়াচিত্র দেখাইয়া অপরের এবং আপনার চিত্তরঞ্জন করিয়া বেড়াইতেন। কর্মবীর শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হইল। ক্রমে পূর্বোক্ত কর্মপ্রিয় শিক্ষিত মণ্ডলীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। এই শুভ সংযোগ হইতে সুপ্রসিদ্ধ "ভারত মিহিরে"র অভ্যুদয় হইল। সান্যাল মহাশয় উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন, পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে একটী প্রথম শ্রেণীর মুদ্রাযন্ত্র বিপুল আয়োজনে স্থাপন করিলেন। তখন কি কঠিন কালই ছিল; কলিকাতা হইতে একমাসে নৌকাপথে মুদ্রাযন্ত্র ময়মনসিংহের ব্রাহ্মদোকান ঘাটে উপনীত হইল। প্রেসম্যান, প্রিণ্টার এবং কম্পোজিটার প্রভৃতিও কলিকাতা হইতে আনিতে হইল। এইরূপে ১৮৭৫ সালের শ্রাবণ মাসে ভারতমিহির যন্ত্র স্থাপিত এবং কয়েক মাস পরে "ভারতমিহির" সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচারিত হইল। বাবু অনাথবন্ধু গুহ ইহার প্রথম সম্পাদক এবং বাবু জানকীনাথ ঘটক, আনন্দচন্দ্র মিত্র, দীনেশচরণ বসু ও আমি প্রথম লেখক শ্রেণীভুক্ত হইয়া-ছিলাম। তৎপরে বাবু অমরচন্দ্র দত্ত ও কালীকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি এই কার্যের বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন। বাবু শরচ্চন্দ্র রায় সান্যাল মহাশয়ের দক্ষিণ বাহুরূপে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রথমে ব্রাহ্ম দোকানেই যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের 'বাঙ্গালি' পত্রও এখানে মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইল। আমার প্রণীত সুখবোধ ব্যাকরণ ভারতমিহির প্রেসের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। তৎকালে সোমপ্রকাশ, ভারতসংস্কারক, ভারতমিহির ও সাধারণী বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ভারতমিহির পূর্ববঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল। ইতিপূর্বে কলিকাতার বাহিরে এরূপ উৎকৃষ্ট মুদ্রনকার্য আর কোথাও ছিল না। লর্ড লিটনের মুদ্রনবিধি যখন উদ্যত বজ্রের ন্যায় সংবাদপত্রের মহাভীতির কারণ হইয়াছিল, তখন সোম প্রকাশ ও ভারতমিহিরই সর্বাপেক্ষা অধিকতর সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন। সুচতুর অমৃতবাজার তো একরাত্রি মধ্যেই ইংরেজী পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আইনের জাল ছিন্ন করিয়াছিলেন।

আনন্দমোহনের শুভাগমন

ময়মনসিংহের কৃতীসন্তান ভারতের উজ্জ্বল রত্ন মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর প্রাথমিক শিক্ষা ময়মনসিংহে হইয়াছিল। তিনি এখানকার তৎকালপ্রসিদ্ধ হার্ডিঞ্জ বঙ্গবিদ্যালয় হইতে বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া জেলা স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের ইতিহাসে তাঁহার গৌরবান্বিত নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ১৮৬২ সালে পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে তিনি এই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে পরিগণিত হইয়া তিনি এল্ এ, বি এ, ও এম এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। তাঁহার এম এ পরীক্ষার ফল দর্শন করিয়া ময়মনসিংহের "বিজ্ঞাপনী" লিখিয়াছিলেন, "বাঙ্গাল দেশের গারো মুলুকের লোক বলিয়া প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজের অনেক ছাত্রের নিকট তিনি অবমানিত হন। বলিতে কি কোন অধ্যাপকের নিকটও তিনি অবজ্ঞাত হইয়াছিলেন। যাহা হউক অচিরেই আনন্দবাবুর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে লজ্জিত ও অনুতাপিত হইতে হইয়াছিল। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে সর্ববিষয়ে সমুদয় ছাত্রের অগ্রগণ্য হইয়া প্রিন্সিপাল ও অধ্যাপকদিগের প্রচুর প্রীতি আকর্ষণ করেন।" (বিজ্ঞাপনী, ২২শে ফেঃ ১৮৬৮)।

আনন্দমোহন যখন এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন তাঁহার বয়স ২১ বৎসর মাত্র। এই অল্প বয়সেই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতের অধ্যাপক পদে বৃত হইলেন। তৎপর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের প্রতিষ্ঠিত ষ্টুডেণ্টশিপ পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া দশ হাজার টাকার বৃত্তি পাইলেন। ইহাতেও তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল না। ১৮৭০ সালে তিনি উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। যাইবার পূর্বে ১৮৬৯ সালের ভাদ্র মাসে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে মহাত্মা কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্মধর্মের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন এবং তাঁহারই সঙ্গে এক জাহাজে বিলাত যাত্রা করিলেন। ইংলণ্ডেও তিনি ভারতের নাম গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে র‍্যাংলার উপাধি লাভ করিয়া এবং ব্যারিষ্টার হইয়া ১৮৭৪ সালে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

১৮৭৫ সালের আশ্বিন মাসে পূজার বন্ধের অব্যবহিত পূর্বে ময়মনসিংহের

প্রিয়তম সন্তান আনন্দমোহন ইউরোপ হইতে নানা বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া জননীর ক্রোড়ে আগমন করিলেন। এখানে তাঁহার অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন হইল। তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার বিনয় ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ময়মনসিংহবাসিগণ আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। জেলা স্কুল হলে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সভা হইল। মুক্তাগাছার সুশিক্ষিত ও সদুৎসাহী জমিদার স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র আচার্য্য মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া ময়মনসিংহের পক্ষ হইতে বসু মহাশয়কে সাদরে গ্রহণ করিলেন। রাশি রাশি পুষ্পমাল্যে আনন্দমোহনের শোভন দেহ সুশোভিত হইল। তাঁহার সেই হাস্যময় মধুর মূর্তি এখনও চক্ষে ভাসিতেছে। আমার বন্ধু আনন্দচন্দ্র মিত্র একটী অভ্যর্থনা কবিতা লিখিয়াছিলেন, আমি তাহা ঐ সভায় পাঠ করিলাম। সেই সুন্দর কবিতার দুই চারিটী পদ এখানে লিপিবদ্ধ থাকুক :—

আনন্দমোহনের প্রতি ময়মনসিংহের উক্তি

(১)

বহুদিন পরে বাছা এলি ঘরে,
আয় একবার দেখি প্রাণ ভরে,
তুই রে আমার এক অলঙ্কার,
তোরে ছেড়ে ভাসি দুঃখের সাগরে।

(২)

বাঙ্গালির ছেলে, এ কাঁচা বয়সে,
গিয়াছিলে বাছা, হেন দূর দেশে,
অকুল সাগর মকর হাঙ্গর,
সদা করে কেলি যাহার উরসে।

(৩)

এ হেন সাগরে ভাসিলে যখন,
পাঠনে পাঠালে শ্রীমন্তে যেমন,
খুল্লনার প্রায় অভাগিনী হায়,
দিবা বিভাবরী করেছি রোদন।

(৪)

কি আর কহিব না দেখে তোমায়,
শুকায়েছে ঐ ব্রহ্মপুত্র হায়,
গতি শক্তি নেই, যা দেখিছ এই,
শুধু অভাগীর নয়নধারায়।

(৫)

আয় যাদুমণি আয় করি কোলে,
ডাক একবার "জন্মভূমি" বলে,
মরমের কালী, ঘুচিবে সকলি,
তোমার জননী লোকে যদি বলে।

(১৭)

অসভ্য বলিয়া কভু গুণমণি,
অতঃপর যদি কেউ ডাকে শুনি,
উচু করি মাথা কব এই কথা,
"জান না কি আমি কাহার জননী ?"

(১৮)

বেঁচে থাক সুখে বাছারে আমার,
মা বলিয়া মনে থাকিবে তোমার,
সুপুত্র যে হয়, কভু সে ত নয়,
আত্মসুখে রত, দুষ্ট কুলাঙ্গার।

(১৯)

তোমার সুরবে ব্যাপ্ত আজ দেশ,
আঁধার ভারতে তুমি রে দিনেশ,
অমর হইয়া থাকিবে বাঁচিয়া,
ধন্য বঙ্গভূমি! জয় পরমেশ!!

ময়মনসিংহ সেই দিন যে আশাপূর্ণ হৃদয়ে বলিয়াছিলেন "মা বলিয়া মনে থাকিবে তোমার" সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। ময়মনসিংহের কল্যাণ চিন্তা তাঁহার সমস্ত জীবনকে আবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি আপনার জননীর প্রতি যেরূপ ভক্তি দেখাইয়াছেন, তাঁহার সেবার জন্য যেরূপ আকুল ছিলেন, জননী জন্মভূমি ময়মনসিংহের জন্যও সেইরূপ করিয়া গিয়াছেন।

এখানে তাঁহার অপূর্ব বিনয়মণ্ডিত মহৎ জীবনের একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। যে দিন তাঁহার অভ্যর্থনা সভা হইল সেই দিন স্কুলের সময়ে স্থানীয় স্কুলগুলি তিনি পরিদর্শন করিলেন। সর্বপ্রথমেই তাঁহার বাল্যলীলার প্রিয় নিকেতন সেই হার্ডিঞ্জ বঙ্গ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি শ্রেণীতে উপস্থিত হইলে শিক্ষকগণ শশব্যস্তে তাঁহাকে বসিবার জন্য চেয়ার টানিয়া দিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই বসিলেন না; পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে বলিলেন, "উহা যে আমার শিক্ষক মহাশয়ের আসন, আমি ও-আসনে বসিতে পারি না।" এই মহদুক্তি শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া রহিলেন। কোথায় ১৫৲ টাকা বেতনের সামান্য স্কুল পণ্ডিত, আর কোথায় ভারতপ্রদীপ শ্রেষ্ঠপুরুষ আনন্দমোহন! ধন্য তাঁহার আশ্চর্য গুরুভক্তি! ধন্য তাঁহার অলৌকিক বিনয়!

তখন এখানে ভারতমিহির প্রেস আসিয়াছে, কিন্তু তখনও ভারতমিহির পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই। পূজার বন্ধোপলক্ষে ভারতমিহিরের কর্মকর্তাগণ "ধূমকেতু" নামে একখানি অনিয়মিত পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন; উহাতে "আনন্দমোহনের প্রতি ময়মনসিংহের উক্তি" কবিতাটী প্রকাশিত হইয়াছিল।

আত্মকথা

১৮৭৪ সালের আগষ্ট মাসে সারদার প্রথম পুত্র শ্রীমান বিমলচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করে। তাহাদিগকে দেখিবার জন্য মনে যথেষ্ট আগ্রহ জন্মিয়াছিল। ১৮৭৫ সালের আশ্বিন মাসে স্কুল ছুটী হইলেই এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম। ব্রাহ্ম যুবক বাবু প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন নর্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পণ্ডিতি কার্য গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিও এই ছুটীতে আমার সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় ২।৩ দিন থাকিয়া আমি একাকী

এলাহাবাদ অভিমুখে চলিলাম। পশ্চিমে আর কখনও যাই নাই, কোন সঙ্গীও পাইলাম না, অগত্যা একাকীই ভয়ে ভয়ে যাত্রা করিলাম। গোপাল বাবুকে খবর দিলেই ষ্টেশনে সকল ব্যবস্থা থাকিত, কিন্তু সে বুদ্ধিও হয় নাই। রাত্রি ১০টার সময় মেলট্রেনে সেই অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হইলাম। ইংরেজী জানি না, হিন্দি ভাষাও ভালরূপে বলিতে পারি না; যাহা হউক ষ্টেশনের একটী বাঙ্গালি কর্মচারীকে পাইয়া সুবিধা হইল। তিনি গোপাল বাবুকে জানেন; তিনিই গাড়ী ঠিক করিয়া গোপালবাবুর ঠিকানা বলিয়া দিলেন, রাত্রি ১১টার সময় বাসায় উপস্থিত হইলাম। অসম্ভাবিতরূপে সহসা আমাকে পাইয়া সকলে বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। আমিও পুত্রবতী ভগিনীকে দেখিয়া যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করিলাম।

এবার ৭।৮ দিন মাত্র এলাহাবাদে ছিলাম। তথাকার প্রধান প্রধান দর্শনীয়গুলি দেখিয়া এবং ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে উপাসনাদি করিয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলাম। তথা হইতে বরাবর কলিকাতায় আসিলাম, একাকী বলিয়া আর কোথাও নামিতে সাহস হইল না। কলিকাতা হইতে প্রভাতবাবুকে সঙ্গে করিয়া গোয়ালন্দ গেলাম; তথা হইতে নৌকাপথে মাতৃদর্শনের জন্য বাড়ীতে গেলাম। আমার মুখে সারদার সংবাদ শুনিয়া মা আনন্দে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, এবং তাহাকে একবার দেখাইবার জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন। কিন্তু মা'র সেই সাধ আর পূর্ণ হয় নাই। আমার মা'র মন যে কত উন্নত ও উদার ছিল, এইবারের একটী ঘটনায় তাহা বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলাম। প্রভাতবাবু ব্রাহ্মণ সন্তান; তিনি আমাদের বাড়ীতে গেলে দাদা বলিলেন, অতিথির ঘরে তাঁহার পাকের আয়োজন করিয়া দাও। আমি বলিলাম, তিনি ব্রাহ্ম হইয়াছেন আমাদের ঘরে খাইতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। দাদা বলিলেন, তিনি যাহাই করুন, আমরা জানিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মণসন্তানকে ভাত দিতে পারিব না। আমাদের এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন "উঁহার কি যজ্ঞোপবীত আছে?" তাহা নাই শুনিয়া বলিলেন, "তবে ঘরেই খেতে দাও, বৃথা কেন ছেলেমানুষকে কষ্ট দিবে।" মা'র মুখে এই কথা শুনিয়া দাদা চুপ করিয়া গেলেন, আমরা দুজনে একত্রে বসিয়া আহার করিয়া সুখী হইলাম।

অষ্টম অধ্যায়

(১৮৭৬—১৮৭৭ সাল)

ষট্চত্বারিংশ মাঘোৎসব

১৮৭৬ সালের মাঘ মাসে ষট্চত্বারিংশ মাঘোৎসব অতি সমারোহপূর্বক সম্পন্ন হইল। পূর্ব বৎসর কলিকাতায় যে নগর সংকীর্তন হইয়াছিল, এবার এখানে তাহাই কীর্তিত হইল। "বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম, নামে দূরে যায় ভয় ভাবনা রে; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম নাম, যাতে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার হবে রে।" উক্ত সংকীর্তনের এই মহাবাণী এখনও যেন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। শ্রদ্ধেয় কালীকুমার বাবুর সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে বোধহয় এই শেষ নগর কীর্তন করিলাম। তিনি আমার গলা ধরিয়া প্রমত্তভাবে গভীরস্বরে এই মহাসঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। কীর্তনান্তে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যেরূপ প্রমত্তভাবে উপাসনা ও নাম মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছিল, তাহাতে নগরবাসিগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মন্দির এবং মন্দিরের চত্বর পূর্ণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। এত জনতা, এমন উৎসাহ এবং আমার দুর্বল কণ্ঠে এমন গভীর ধ্বনি আর কখনও হইয়াছে কি না বলা যায় না। সত্য সত্যই সেদিন যেন স্বর্গ হইতে অমৃত বৃষ্টি হইতেছিল। "উঠ উঠ ত্বরা করি, পরব্রহ্মে স্মরি, প্রেমলোক দেখ প্রেমনয়নে।" বিধাতার এই আহ্বান বাণী উপাসকদিগকে যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। উপাসনান্তে শ্রদ্ধেয় গোপীবাবু আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রায় অর্ধ ঘণ্টা কাল নয়ন জলে সিক্ত করিয়াছিলেন। আহা, সে স্বর্গের ছবি মনে পড়িলে এখনও প্রাণ আকুল হইয়া উঠে!

এই উৎসবে আমার জীবনে এক নূতন পরিবর্তন আরম্ভ হয়। ব্রাহ্ম সমাজের সেবার জন্য আপনাকে প্রদান করিতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। বিষয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা বা কলিকাতায় চলিয়া যাইব কি না, এইরূপ চিন্তায় চিত্ত আন্দোলিত হইতেছিল। এই সময়ে কলিকাতায় "সাধন কানন" প্রতিষ্ঠিত হয়। আচার্য কেশবচন্দ্র যোগ ও ভক্তি বিষয়ে অঘোর বাবু ও বিজয়বাবুকে শিক্ষা ও উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। সে বিবরণ ধর্মতত্ত্বে পাঠ করিয়া মনটা বড়ই ব্যাকুল হইত, তথায় যাইয়া তাঁহাদের

পবিত্র সঙ্গে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হইত। অনেক দিন পর্যন্ত জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি নাই। প্রতিদিন প্রার্থনা করিতাম, প্রভুর ইচ্ছা বুঝিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতাম। "শুনিব বিবেককর্ণে তোমার শ্রীমুখের বচন" এই ভাবের সঙ্গীতটী তখন বড় প্রিয় ছিল।

পুনর্দীক্ষা

আষাঢ় মাস আসিল। আমাদের প্রিয় শাখাসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব আরম্ভ হইল। ঢাকা হইতে ভক্তিভাজন বঙ্গবাবু এবং প্রিয় ভ্রাতা গণেশ বাবু ও বৈকুণ্ঠবাবু প্রভৃতি আসিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মদোকানে অবস্থিতি করিলেন। এই সময়ে শাখাসমাজের উৎসবই এখানকার প্রধান উৎসব ছিল, প্রায় একমাস ব্যাপিয়া উৎসব চলিত। এবার উৎসবের প্রথম কয়েক-দিন তেমন জমিল না; বয়স্ক ব্রাহ্মদের মধ্যে এমন কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাতে অনেকের মন উত্যক্ত ও চঞ্চল ছিল। আমার মন অতিশয় ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। ৩২শে আষাঢ় উৎসবের প্রকৃত দিন, সে দিন সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হইবে। ২২শে প্রাতের উপাসনাতেও যেন রায় মহাশয়কে ভারাক্রান্ত দেখিলাম—যেন উৎসব জমিতেছে না, কোথাও যেন কি বাধা রহিয়া গেছে, এমনই মনে হইতে লাগিল। এই দিন রাত্রিতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হইল; সেই উপাসনার মধ্যে আমার প্রাণে এক স্বর্গীয় জ্যোতি প্রকাশিত হইল, মনের অন্ধকার কাটিয়া গেল; জীবনের কর্তব্য পথ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া সংসারে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত কর, এখানেই আপনার কর্মস্থান স্থিরতর রাখিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্যে আপনাকে চির জীবনের জন্য সমর্পণ কর", এই অমৃতবাণী হৃদয়ে অবতীর্ণ হইল। তখনই যেন যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলাম, এবং উপাচার্য মহাশয়কে বলিলাম, আমি ভাইভগিনীর সেবায় আত্মসমর্পণ করিতেছি, এই পবিত্র ব্রত পালনের জন্য আমাকে দীক্ষিত করুন। তিনিও যেন স্বর্গীয় জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইয়া প্রসন্নমনে আমাকে দীক্ষিত করিলেন। তাঁহার সে দিনের উপদেশ ও প্রার্থনা এখনও হৃদয়ে অনুবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমার পুনর্দীক্ষার এই নবভাবে মণ্ডলী মধ্যে যেন তাড়িত সঞ্চার হইল, পুরাতন মৃতভাব চলিয়া গেল সকলের মুখেই উৎসাহ, আনন্দ ও প্রসন্নতা প্রকাশ

পাইল। উপাসনান্তে ভক্তিভাজন রায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, তুমি এবার রক্ষা করিলে; এবার ত কিছুই জমিতেছিল না, এই দীক্ষায় উৎসবের দ্বার খুলিয়া গেল।

এখন হইতে জীবনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হইল। প্রাণে নূতন বল ও শান্তি পাইলাম। রায় মহাশয় ঢাকায় ফিরিয়া যাইবার পূর্বে বিবাহ সম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইতিপূর্বে আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, কিন্তু একজনের প্রতি মনের একটা অব্যক্ত আকর্ষণ ছিল। এখন গৃহস্থ ব্রাহ্ম হইব স্থির হওয়াতে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হইল। রায় মহাশয় তাঁহার পরিচিতা কোন কন্যার কথা বলিলেন; আমিও সরলভাবে আমার মনের ভাব তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলাম।

প্রিয় ভ্রাতা প্রসন্নকুমার

পূর্ব অধ্যায়ে এই ব্রাহ্ম যুবকের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গিয়াছে; ইঁহার ধর্মোৎসাহ ও উপাসনায় অনুরাগ অতিশয় প্রবল ছিল। ইনি নেত্রকোণা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৭৪ সালে ইনি প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্ম মণ্ডলীতে প্রবেশ করিলেন, হিন্দু অভিভাবকের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মবাসায় আসিয়া স্থান গ্রহণ করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া ইঁহার পিতা মাতা উভয়ে নৌকাযোগে সহরে আগমন করেন এবং ইঁহাকে নৌকায় নিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন চার দিন রীতিমত চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রসন্ন কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। একদিন প্রসন্নকে নৌকার ভিতরে নিয়া মাতা নানা কথায় ভুলাইয়া রাখিলেন, পিতার ইঙ্গিতে মাঝিরা নীরবে নৌকা খুলিয়া দিল; তখন বর্ষাকাল, ব্রহ্মপুত্রের খরস্রোতে নৌকা বহুদূর চলিয়া গেলে প্রসন্ন বুঝিতে পারিলেন। এইরূপে তাঁহাকে কৌশলে ধৃত করিয়া গৃহে নিয়া আবদ্ধ করা হইল। প্রসন্নদের দেশ বড় নিম্ন ভূমি, বর্ষায় একবারে জলে প্লাবিত হইয়া যায়। নৌকা ভিন্ন কোথাও বাহির হইবার সাধ্য নাই। প্রসন্ন তাঁহার দৈনিক পুস্তকে লিখিয়াছিলেন, গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া কেবল ধ্যান ধারণা ও প্রার্থনা করিতাম; নির্জন বাসের বেশ সুবিধা হইয়াছিল। সুতরাং এই ঘটনায় পিতার মঙ্গল হস্ত দেখিয়া বড়ই উপকৃত হইলাম। কয়েক দিন পরে মণ্ডলীর জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল,

একদা রাত্রিতে জল সাঁতারিয়া অন্য গ্রামে যাইয়া একখানি ক্ষুদ্র নৌকা নিজে বাহিয়া নেত্রকোণায় গেলাম; তথা হইতে জল কাদা ভাঙ্গিয়া সমস্ত দিন রাত্রি চলিয়া ময়মনসিংহে উপস্থিত হইলাম। মনে হইল যেন জেলের কয়েদী মুক্তিলাভ করিয়া আপনার প্রিয় গৃহে আসিল!

প্রসন্নের কঠোর সাধন সম্বন্ধে পূর্বে লিখিত হইয়াছে। ১৮৭৬ সালের মাঘোৎসবের পর প্রসন্নের জ্বর হইল; আমরা যুবকগণ তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলাম। ব্রাহ্মদের পরম হিতৈষী ডাক্তার সারদাকান্ত দাস ও বরদাকান্ত বসু মহাশয়গণ বিনা পয়সায় প্রসন্নের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রোগ কঠিন হইল, ক্ষয়রোগের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া ডাক্তারগণ ভয় পাইলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত আমাদের বাসায় রাখিয়া চিকিৎসাদি করা গেল। আষাঢ়ের বৃষ্টি আরম্ভ হইলে আর সেই তৃণকুটীরে রাখা সঙ্গত নহে বলিয়া শরৎবাবু তাঁহার দোকানের দালানে স্থান দান করিলেন। তথায় অতি যত্নে সেবা শুশ্রূষা হইতে লাগিল কিন্তু সে ভীষণ পীড়া কিছুতেই প্রশমিত হইল না। ভাদ্র মাসে প্রিয় ভ্রাতা প্রসন্নকুমার মণ্ডলীর সকলের প্রাণে দারুণ আঘাত প্রদান করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন; একটী বিশ্বাসী নবযুবক অকালে ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন।

আত্মকথা

বৈকুণ্ঠবাবুর কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরীর সঙ্গে আমার বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত হইল। বৈকুণ্ঠবাবু উভয়ের ইচ্ছা জানিয়া এবং এই কার্যে বিধাতার অভিপ্রায় অনুভব করিয়া শুভানুষ্ঠানে উদ্যোগী হইলেন। আমার অভিভাবক কালীকুমারবাবু কন্যাপক্ষের অভিভাবক শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট রীতিমত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাব নির্ধারিত হইল। কথা রহিল পূজার বন্ধে আমি ঢাকায় যাইব, তথায় দেখা সাক্ষাতের পর সময়াদি স্থিরীকৃত হইবে।

আমি ছাত্রাবস্থায় ২।৩ বার বৈকুণ্ঠদের বাড়ীতে গিয়াছি। পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল! বামা আমাকে ভ্রাতৃবন্ধু জানিয়া শ্রদ্ধা করিতেন, আমিও কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিতাম; তখন উভয়ের জীবনগতি ভিন্নমুখী ছিল, সাধারণ শ্রদ্ধা প্রীতির ভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাবের

সম্ভাবনা ছিল না। ইনি যখন ময়মনসিংহে আমাদের মধ্যে আসিলেন, তখনও মনে কোন নূতন ভাবের সঞ্চার হয় নাই। তবে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ভাবের বৃদ্ধি হইয়াছিল। যখন বিবাহ চিন্তা প্রথম মনে আসিল, তখন জানি না কেন বামার কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়িল! কিন্তু অতিশয় ঘনিষ্ঠ স্থল বলিয়া মনে কেমন সঙ্কোচ আসিল। তজ্জন্য অন্য দুই একটী প্রস্তাব সম্বন্ধে কথাবার্তা চলিয়াছিল, কিন্তু কোথাও মন অগ্রসর হইল না। যাহা হউক বিধাতার মঙ্গল দৃষ্টিতে আমার পক্ষে যাহা সর্বোত্তম, তিনি সেই ব্যবস্থাই করিলেন।

ইটনা গ্রামে ব্রাহ্মবিবাহ

সুপ্রসিদ্ধ আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পৈতৃক নিবাস জয়সিদ্ধি গ্রামের সন্নিকটে ইটনা নামক একটী ভদ্র পল্লী আছে। এখানে ব্রাহ্মধর্মে অটল বিশ্বাসী স্বর্গীয় কালীকিশোর বিশ্বাস মহাশয় বাস করিতেন। তিনি তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গলা লেখা পড়া জানিতেন এবং উক্ত অঞ্চলবাসী মুসলমান জমিদারদিগের মধ্যে কর্ম করিতেন। তিনি অতিশয় সত্যপরায়ণ ও দৃঢ়চিত্ত লোক ছিলেন। স্বর্গত হরমোহন, আনন্দমোহন ও মোহিনীমোহন ভ্রাতৃত্রয় ইঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহাদের সহিত ইঁহার বিলক্ষণ আত্মীয়তা ছিল। সেই অন্ধকার যুগে ইনি একাকী সেই দূর পল্লীতে বাস করিয়াও স্বীয় বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে পরীক্ষা ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র শ্রীমান হরকিশোর, দেবেন্দ্রকিশোর ও নগেন্দ্রকিশোর এবং জামাতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস, প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। এখন সেই ক্ষুদ্র গ্রাম্য পরিবার বঙ্গের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃতুল্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দমোহন বিশ্বাস মহাশয় নর্মাল স্কুলের ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইটনা গ্রামের স্কুলে পণ্ডিত হইয়া যান। ওখানে তিনি প্রায় ৮ বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। শিক্ষানুরাগ ও চরিত্রগুণে ঐ অঞ্চলের লোকে তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা সম্মান করিত। তাঁহার ধর্মভাব ছাত্রদের জীবনে বিশেষ কার্য করিয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজে পরিচিত শ্রীমান গগনচন্দ্র হোম প্রভৃতি তদীয় ছাত্রগণ তাঁহারই দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মসমাজে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই চন্দ্রমোহনবাবুর সঙ্গে শ্রদ্ধেয় কালীকিশোর বিশ্বাস মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী দেবীর বিবাহ সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইল। আশ্বিনের বন্ধে বিবাহ হইবে। তখন ব্রাহ্ম বিবাহ এক নূতন ও গুরুতর ঘটনা। এই বিবাহে যোগ দিতে মনে খুব আগ্রহ জন্মিল। ঢাকা হইতে বঙ্গবাবু প্রভৃতি একদল বিবাহযাত্রী গমন করিলেন, আমরাও তাঁহাদের সঙ্গী হইলাম।

তখনকার বিবাহের অনুষ্ঠান এক দিনে শেষ হইত না; কয়েক দিন পূর্ব হইতেই প্রস্তুতির জন্য বিশেষ ভাবে উপাসনাদি হইত। তখন এক একটী বিবাহ এক একটী ব্রহ্মোৎসবের ন্যায় বোধ হইত। এখানেও প্রত্যহ স্নানান্তে উপাসনা ও উপদেশ এবং সন্ধ্যাকালে সংকীর্তন ও প্রসঙ্গাদি হইল। দুই বেলা একত্রে আহার আমোদপ্রমোদ ও গ্রাম পর্যটন করা গেল। ১৮৭৬ সালের ১৪ই আশ্বিন বিবাহ কার্য সুনির্বাহ হইল। শ্রদ্ধেয় বঙ্গবাবু আচার্যের কার্য করিলেন, আমি বরের বন্ধুরূপে মন্ত্রাদি উচ্চারণে তাঁহার সহায়তা করিলাম। বিবাহ সময়ে আমাদের শ্রদ্ধেয়া ভগিনী "শিবামুণ্ড" পীড়ার আক্রমণে চলৎশক্তি রহিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, বিধাতার আশীর্বাদে শুভ কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। আমরা কয়েক দিন পরে ঢাকায় প্রত্যাগমন করিলাম।

তখন কলিকাতার অনুকরণে ঢাকাতে ব্রজসুন্দরবাবুর হাবেলীতে "আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তথায় কয়েকটী ব্রাহ্ম সপরিবারে বাস করিয়া ধর্ম সাধন করিতেছিলেন। বৈকুণ্ঠবাবু তাঁহার ভগিনীর সহিত এই আশ্রমে থাকিতেন। আমি ইটনা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কয়েকদিন ঢাকার উক্ত আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তৎকালে আশ্রমবাসিনী সোহাগ-দল পরিবারের কুলীনকন্যা কুমারী বগলার সহিত বাবু কৈলাসচন্দ্র নন্দীর বিবাহ প্রস্তাব নির্ধারিত হইয়াছিল। প্রত্যহ স্নানান্তে মিলিত উপাসনা হইত, উপাসনা ও উপদেশে প্রেমপরিবার ও বিবাহ বিষয়ে অতিশয় উচ্চ ভাব ও আদর্শ প্রকাশিত হইত। আমাদের মধ্যে বাহিরে দেখা শুনা বড় একটা হইল না। কিন্তু আত্মার প্রস্তুতি বেশ হইল। উভয়ের মনই জীবনের এই গুরুতর ব্রত গ্রহণের জন্য ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাহিরে একটী

কথাও হইল না, কিন্তু উপাসনা প্রার্থনার মধ্য দিয়া পরস্পর খুব নিকট যোগে যুক্ত হইতে লাগিলাম। একদিন বামা তাঁহার দাদার সম্মুখে আমাকে কয়েকটী গোলাপ ফুল উপহার দিয়া নমস্কার করিলেন; এই দিন উভয়ে উভয়কে নূতন ভাবে দেখিলাম। আমরা যে এক মহা দায়িত্বপূর্ণ গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিতেছি, তাহা অনুভব করিয়া প্রভুর চরণে শরণাপন্ন হইলাম। আগামী ১৫ই কার্ত্তিক ময়মনসিংহে বিবাহের অনুষ্ঠান হইবে নির্ধারিত হইল।

ময়মনসিংহ নগরে প্রথম ব্রাহ্ম বিবাহ

পুনর্দীক্ষার পর হইতে ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য আমি বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। পরিণয়ই গার্হস্থ্যধর্ম্মে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ; এ কয় মাস তজ্জন্যই নানাভাবে প্রস্তুত হইতেছিলাম। ক্রমে সেই দিন নিকটবর্ত্তী হইল। আমার অভিভাবক কালীকুমারবাবু সকল ভার গ্রহণ করিলেন। প্রিয় ভ্রাতা প্রসন্নকুমারের মৃত্যুশোকে আমাদের মানসিক অবস্থা ভাল ছিল না; আমাদের বাসার যুবক ব্রাহ্ম শ্রীমান চন্দ্রকুমার ঘোষ গুরুতর পীড়ায় কাতর ছিলেন, আনন্দ তাঁহাকে নিয়া ব্যস্ত রহিলেন। পূজার বন্ধে তাঁহাকে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানান্তরে পাঠাইতে হইল। এই সকল কারণে বিবাহে যাহাতে বাহ্যাড়ম্বর কিছুই না হয়, বেশ সাত্ত্বিক ভাবে অনুষ্ঠানটী হয়, আমার গুরুজনদিগকে তাহাই জানাইলাম। আমার হাতে কিছু টাকা ছিল, তাহা কালীকুমারবাবুকে দিতে চাহিলাম; তিনি হাসিয়া বলিলেন. তোমার কোন খরচ দিতে হইবে না, এই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার অন্য একজনে বহন করিবেন; এখন তাঁহার নাম গোপন থাকিবে। পরে জানিয়াছিলাম, স্বর্গীয়া ভগিনী দয়াময়ী ঘোষের স্মরণার্থ তাঁহার স্বামী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃকল্প শ্রদ্ধেয় আনন্দনাথ ঘোষ মহাশয় এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বাহিরের আয়োজন তেমন হইল না বটে, কিন্তু মনের প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট আয়োজন হইল। যুবকদিগের চিরহিতৈষী বন্ধু ভক্তিভাজন গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় কলিকাতা হইতে আসিয়া আমাদের বাসায় উঠিলেন এবং যুবকদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিত্য উপাসনাদি করিতে লাগিলেন। ঢাকা হইতে ভক্তিভাজন বঙ্গবাবু সদলে কন্যাসহ আসিয়া কালীকুমারবাবুর

বাসায় রহিলেন। কয়েক দিন পূর্ব হইতেই যেন একটী ব্রহ্মোৎসবের আয়োজন হইতেছে, এমনই বোধ হইতে লাগিল।

কালীকুমারবাবুর বাসায় (পাঁচ আনির বাসায়) ১৮৭৬ সালের ১৫ই কার্তিক বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইল। ময়মনসিংহে এই নূতন ব্রাহ্ম বিবাহ, এই প্রথম বিধবা বিবাহ। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই মফঃস্বল হইতে লোক সমাগম হইতেছিল। পাঁচ আনির বাসার সেই সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, গাছে গাছে লোক উঠিয়া বিবাহ দেখিতে সচেষ্ট হইল; রাজপথের অনেক দূর পর্যন্ত এরূপ লোকারণ্য হইয়াছিল যে, নিমন্ত্রিত লোকের প্রবেশ করা দূরে থাক, বরযাত্রীগণ আমাকে লইয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাল রাজপথে অপেক্ষা করিয়া বহুকষ্টে বিবাহসভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, প্রতি বাসায় এক এক জন প্রহরী রাখিয়া নগরবাসিগণ সকলেই বিবাহ দেখিতে আসিয়াছিল। মুক্তাগাছার জমিদার আমাদের চিরহিতৈষী অমৃতবাবু ও যোগেন্দ্রবাবু এবং আঠারবাড়ীর প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী দলবল সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তিভাজন বঙ্গবাবু উপাসনা ও উপদেশ প্রদানের ভার গ্রহণ করিলেন, গৌরবাবু বর কন্যাকে প্রতিজ্ঞাদি পড়াইবার ভার লইলেন। জনকোলাহলে প্রথমে কোন কথাই শোনা যায় নাই, পরে গোপীবাবু ও কালীকুমারবাবুর অনুনয় বিনয়ে এবং ভগবানবাবু প্রভৃতি যুবকগণের অসাধারণ পরিশ্রমে শেষ ভাগের কার্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। রাত্রিতে ব্রাহ্ম ও সহানুভূতিকারীগণের ভোজ হইল। পরদিন উকীল বাবু শ্যামচরণ চক্রবর্তীর বাসায় হিন্দু বন্ধুগণের জন্য ভোজের আয়োজন হইল। আমার পরমহিতৈষী শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাক্তার বরদাকান্ত বসু মহাশয় এই কার্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ১৫ই কার্তিক বরিশাল ও নোয়াখালিতে সেই মহাঝড় ও জলপ্লাবন ঘটিয়াছিল। বিবাহান্তে শেষ রাত্রিতে সকলে শয়ন করিয়াছেন, এমন সময়ে একজন ভদ্র-লোক লোকজনসহ উপস্থিত হইয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন; তাঁহার "সামিয়ানা" বিবাহ সভায় খাটান হইয়াছিল, এখন ঝড় বৃষ্টির মহা আয়োজন দেখিয়া তিনি উহা নামাইতে আসিয়াছেন।

বিবাহের পর দুই দিন কালীকুমারবাবুর বাসায় থাকিয়া সকলের সঙ্গে উপাসনাদি করা হইল; তৎপর ব্রাহ্ম বাসায় যাইয়া আমাদের জন্য নবনির্মিত

কুটীরে অভিনব জীবন আরম্ভ করা গেল। প্রিয়বন্ধু আনন্দচন্দ্র আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া গৃহধর্মের সকল আয়োজন করিয়া দিলেন। আমাদের গৃহস্থালী আরম্ভ হইলে একদিন গোপীবাবুর সহধর্মিনী আমাদের ঘরকন্না দেখিতে আসিলেন। তিনি আমাদের উভয়কে বড় স্নেহ করিতেন। তিনি কয়েক ঘণ্টা আমাদের কাছে থাকিয়া সকল বিষয়ের তত্ত্ব লইয়া এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া গৃহে গমন করিলেন। আমাদের স্বাভাবিক মুক্তভাব ও ব্যবহার দেখিয়া তিনি গৃহে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "ওদের ত স্বামী স্ত্রী বলিয়া মনে হইল না, ভাই বোনের মত বোধ হইল।" তাঁহার এই উক্তি গোপীবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম। ঐ কথাটী আমার কাছে এমন নূতন ও মিষ্ট বোধ হইয়াছিল যে উহা আজিও মনে আছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অস্বাভাবিক সঙ্কোচ ও অযথা লজ্জা আসিয়া তাঁহাদের পবিত্র ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধকে যেন ম্লান করিয়া দেয়। উহা আত্মার স্বাভাবিক সুস্থাবস্থা বলিয়া মনে হয় না।

ব্রাহ্ম ভ্রাতা ভগবানচন্দ্র সরকার

ভগবানবাবু বড় ভাল লোক ছিলেন। তিনি শরৎবাবুর সহকারী রূপে ব্রাহ্ম দোকানে কর্ম করিতেন। তিনি "নাথ" বা "যুগী" বংশ হইতে আসিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার চরিত্র ধর্মনিষ্ঠা ও বিনীত ব্যবহারে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। আমরা তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতাম, তাঁহার বংশের কথা কেহ মনেও করিতাম না। কিন্তু একদিন তিনি এভাব বুঝিতে না পারিয়া মনে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলেন। আমার বিবাহদিনে তিনি ত সমস্ত দিবারাত্রি অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু পরদিন প্রাতে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। সকলেই ব্যস্ত ও চিন্তিত হইলাম। দুই দিন পরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন, কেন কোথায় ছিলেন কাহাকেও বলেন নাই। পরে শুনিয়াছিলাম, বিবাহদিনে কোন ব্রাহ্মের ব্যবহারে তাঁহার মনে হইয়াছিল, তাঁহাকে হীনবংশ বলিয়া অবজ্ঞা করা হইতেছে। তিনি মনের কষ্টে দুই দিন বনে বনে ঘুরিয়াছেন। যাহা হউক, পরে বোধ হয় তাঁহার সে ভ্রম দূর হইয়াছিল। ইঁহার নিবাস কিশোরগঞ্জের নিকটবর্তী কাতিয়ারচর গ্রামে ছিল। এই বৎসর অগ্রহায়ণ

মাসে ঐ অঞ্চলে দুরন্ত বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। ভগবানবাবুর পরিবারস্থ প্রায় সকলেই ঐ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। বাড়ীর এই দুঃসংবাদ পাইয়া ভগবানবাবু গৃহে গমন করিলেন। গোপীবাবু প্রভৃতি আমরা সকলেই তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু পরিবারের সেই ঘোর দুর্দিনে তিনি দূরে থাকিতে পারিলেন না। কয়েক দিন পরেই এখানে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু সপ্তাহ কাল অতীত হইতে না হইতেই তিনি ঐ সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন। ব্রাহ্ম দোকানে রীতিমত তাঁহার চিকিৎসাদি হইল। দেখিতে দেখিতে রোগ ভীষণ মূর্তি ধারণ করিল, তিনি সজ্ঞানে ব্রহ্মনাম করিতে করিতে স্বধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অভাবে ব্রাহ্মমণ্ডলীর গুরুতর ক্ষতি হইয়াছিল। এই রোগের কি ভীষণ শক্তি, এবার তাহা দেখা গেল। ভগবানবাবুর একটী সহোদর ভ্রাতা বহুকাল যাবৎ মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়া সেই সমাজে বিবাহাদি করিয়াছিলেন। তিনি সহরের নিকটস্থ ছত্রপুর নামক স্থানে বাস করিয়া মোক্তারি কার্য করিতেন। ভগবানবাবুর পীড়ার সংবাদ পাইয়া এক দিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তিনি উঁহাকে স্পর্শও করেন নাই; কিন্তু আশ্চর্য এই, কয়েক দিন পরে শুনিতে পাইলাম তিনিও ঐ দুরন্ত রোগে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। অনেকে বলেন, এক প্রকার বসন্ত আছে যাহা কোন পরিবারে প্রবেশ করিলে যেখানে সেই বংশের রক্তের সংশ্রব আছে, সেখানেই উহার প্রকোপ হইবে; এই ঘটনায় ঐ কথা সত্য বলিয়াই মনে হয়।

পীড়া ও পশ্চিম যাত্রা

১৮৭৬ সালের কার্তিক মাসে আমার পরিণয় কার্য সম্পন্ন হয়। তিন মাস সুস্থদেহে সংসারধর্ম প্রতিপালন করিলাম। ৫ই পৌষ ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন উপলক্ষে উৎসব হইল। সেই উৎসবে আমাকে কিছু কিছু কার্য করিতে হইল। উৎসবের পরদিন আমার কাসির সঙ্গে রক্তপাত হইল। প্রথম দুই তিন দিন উহা অগ্রাহ্য করিলাম। কিন্তু প্রত্যহই কিছু কিছু রক্ত পড়িতে লাগিল, শরীর দুর্বল ও মধ্যে মধ্যে জ্বরানুভব হইতেছিল। বন্ধুবর ডাক্তার সারদাবাবুকে দেখাইলাম, তিনি ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন। ২৬শে পৌষ ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইল; আমাকে

রাত্রিতে উপাসনার কার্য করিতে হইল ; উপদেশের শেষ ভাগে অনেকগুলি রক্তপাত হইল। কিন্তু সে কথা কাহাকেও বলিলাম না ; নবপরিণীতা পত্নী এ সংবাদে অতিশয় ব্যাকুল হইবেন মনে করিয়া তাঁহাকেও জানাইলাম না। কেবল চিরহিতৈষী অভিভাবক শ্রদ্ধাস্পদ গোপীবাবু ও কালীকুমার-বাবুকে বলিলাম। গোপীবাবু সেই দিনই আমাকে লইয়া সিবিল সার্জন ডাঃ শ সাহেবের কাছে গেলেন। সাহেব অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, রোগ সামান্য কিন্তু কর্ম হইতে অবসর লইয়া পশ্চিমে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে হইবে। ডাক্তার সাহেব তখনই আমাকে তিন-মাসের ছুটির জন্য সার্টিফিকেট দিলেন। আমি এলাহাবাদে যাইয়া ভগিনীর নিকট থাকিব, বামা পূর্ববৎ ঢাকায় থাকিবেন, এই কল্পনা করিয়া নৌকা পথে ঢাকায় যাত্রা করিলাম। শ্রীমান গোবিন্দচন্দ্র দাস ঢাকা পর্যন্ত আমাদিগের সঙ্গী হইলেন। গোবিন্দের বাড়ী টাঙ্গাইল অঞ্চলে বেলতা গ্রামে ছিল ; সে আমার পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র ছিল এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছিল। সে ঢাকা হইতে রাজসাহী যাইয়া আমাদের মধুবাবুর অধীনে একটী কর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই অকৃতদার অবস্থায় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

ঢাকায় যাইয়া দেখিলাম অনেকে মাঘোৎসবে কলিকাতা যাইতেছেন। এই সময়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "এম্প্রেস" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীতে দরবার হইতেছিল। ১২ দিনের জন্য স্কুল কলেজ প্রভৃতি বন্ধ হইয়াছিল। সুতরাং কলিকাতাযাত্রীর সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। যাহা হউক আমরা নৌকাপথে গোয়ালন্দ যাইবার সময় মানিকগঞ্জের মত্ত গ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺অমৃতানন্দ গুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে আমার পীড়ার ঔষধাদি লইয়া মাঘোৎসবের কিঞ্চিৎ পূর্বে কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। ঢাকার মাঘোৎসবের যাত্রীদিগের সঙ্গে বৈকুণ্ঠবাবুও বামাকে নিয়া কলিকাতায় গেলেন। তাঁহারা আশ্রমে রহিলেন ; আমার ভগিনীপতি গোপালবাবুও সপরিবারে আসিয়া আশ্রমে স্থান গ্রহণ করিলেন। আমি ৩৫নং কালিদাস সিংহ লেনে আমার প্রিয় বন্ধু কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি ময়মনসিংহের ছাত্রগণের বাসায় অবস্থিতি করিলাম।

কলিকাতায় মাঘোৎসব

১৮৭৭ সাল—সপ্তচত্বারিংশ মাঘোৎসব

ইতিপূর্বে আর কখনও কলিকাতায় মাঘোৎসবে উপস্থিত হইতে পারি নাই; এবার এই রোগই আমার পরমবন্ধুর কায করিল, বহুদিনের সাধ পূর্ণ হইল। আমি যে দিন কলিকাতায় পৌঁছিলাম, সেই দিনই বোধ হয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র দিল্লি দরবার হইতে দলসহ ফিরিয়া আসিলেন। কলুটোলার বাড়ীতে আচার্যগৃহে প্রত্যহ প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হইল; আমরা সেই অপূর্ব প্রেমভক্তিপূর্ণ ব্রহ্মোপাসনা সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলাম। প্রতিদিনের উপাসনায় নব নব সত্য প্রকাশিত হইত; ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত-কবি ত্রৈলোক্যনাথ সেই নবভাবের নবসঙ্গীত উপাসনা সময়েই মুখে মুখে রচনা করিয়া সুমধুর স্বরে গান করিতেন, তদ্দারা সেই দিনের সেই মহাভাব উপাসকগণের চিত্তে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া থাকিত।

৭ই হইতে ১৩ই মাঘ পর্যন্ত সপ্তাহ কাল ব্যাপিয়া মাঘোৎসব হইল। সে উৎসব নয়, যেন পৃথিবীতে স্বর্গের অবতরণ, যেন মানব হৃদয়ে প্রেম ভক্তির মহাপ্লাবন। আমার রোগ যন্ত্রণা কোথায় যেন চলিয়া গেল। সপ্তাহ কাল দিবারাত্রির ভেদ রহিল না, আহার নিদ্রার নিয়ম রহিল না! প্রাণে নবপ্রেম, হৃদয়ে নবোৎসাহ এবং শরীরে যেন নব বলের সঞ্চার হইল। আচার্যগৃহ হইতে নগর সংকীর্তনে, টাউনহলের ইংরেজী বক্তৃতায় এবং ১১ই মাঘ প্রাতঃকালের উপাসনায় যে অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, আজিও তাহা স্মৃতিপটে চিত্রিত রহিয়াছে।

১১ই মাঘের প্রাতঃকালের উপাসনায় ব্রহ্মপ্রেমের মহাপ্লাবন আসিয়া সংসারজ্বালায় দগ্ধ, রোগ শোকে কাতর, পাপীতাপী নরনারীর শুষ্ক প্রাণ ভাসাইয়া দিল। তারপর সেই হৃদয়ভেদী উপদেশ! সে ত উপদেশ নয়, যেন পাপী ধরিবার এক মহাজাল! এক একটী কথা তীক্ষ্ণবাণের ন্যায় প্রাণে বিদ্ধ হইতে লাগিল। পাপী জন্মের মত সেই প্রেমপিঞ্জরে ধরা পড়িল! সে প্রসিদ্ধ উপদেশ আমার ন্যায় অনেকের প্রাণেই মুদ্রিত আছে। ছাপার পুস্তকে যাহা মুদ্রিত আছে, তাহা ত কিছুই নয়; সে ধ্বনি যে এখনও প্রাণে বাজিতেছে এবং অনন্তকাল বাজিবে। পলাতক পাপী সন্তানকে পিতা

কেমন করিয়া তাঁর প্রেমজালে ধরিয়া থাকেন, সেই মহালীলার মহাবর্ণনা সেই মহাকবি কেশবচন্দ্রের অমৃতকণ্ঠে যাঁহারা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন। পিতার কি করুণা, আমার ন্যায় রুগ্ন ও ভগ্নপ্রাণ পতিত সন্তানকে অপূর্ব কৌশলে সেই উৎসবক্ষেত্রে নিয়া চিরকালের জন্য তাঁহার প্রেমপিঞ্জরে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। জীবনে কত ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রপাত হইয়া গেল, রোগশোক পাপপ্রলোভনের কত মহাপ্লাবন মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল, কিন্তু সে প্রেমজাল ত আর ছিঁড়িতে পারিলাম না। সকল সুখদুঃখ বিবাদবিসম্বাদ অতিক্রম করিয়া আজিও সেই অমৃতবাণী হৃদয়ে ধ্বনিত হইতেছে—"ওহে ভাই, ওগো ভগিনী, ঐ দেখ সংসারে প্রেমের ডাকাতি হচ্ছে; ঐ যে ফুল, ঐ যে ফল, ঐ নদী, ঐ পাখী, ওরা কে জান? ওরা আমার পিতার প্রেমের দূত। তোমাদের ধরিবার জন্য সুযোগে সুযোগে ফিরিতেছে। ধরা ত দিতেই হবে, তবে আর কেন? হে আমার পাপী ভাই, তুমি মরিবে, তুমি ধরা পড়িবে। একটী ফল, একটী পাখীর হাতে যদি না মর, তবে ঈশ্বর মিথ্যা, ব্রাহ্মধর্ম মিথ্যা।"

ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা

এবার মাঘোৎসবের সময়ে একটী নূতন ভাব ও আন্দোলন দেখিলাম। কয়েক জন পদস্থ ও উৎসাহী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজে প্রতিনিধি প্রণালী প্রতিষ্ঠার জন্য অতিশয় আগ্রহ ও পরিশ্রম করিতেছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ট্রাষ্টী নিয়োগ ও ব্রাহ্ম প্রতিনিধিসভা গঠনের জন্য চেষ্টা হয়। ট্রাষ্টী নিয়োগের প্রস্তাব আপাতত বিবেচনাধীন থাকে; প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হয়। কিছুদিন এই সভার কার্য চলিয়াছিল। আচার্য কেশবচন্দ্র উহার সভাপতি এবং মহামনা আনন্দমোহন সম্পাদকরূপে কার্য করিয়াছিলেন। প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে এই কার্যের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহারা ইহাকে অনুকূল দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। তখন হইতেই দেখা গিয়াছিল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ উক্ত সমাজের কর্মী ব্রাহ্মদিগের প্রভাব সহ্য করিতে পারেন নাই, এবং তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু তাঁহাদের নেতা কেশবচন্দ্রের মনোভাব সেরূপ ছিল না। স্ত্রী স্বাধীনতার আন্দোলন

সময়ে এবং এই সভা স্থাপনের সময়ে দেখা গিয়াছে, তিনি কর্মী ব্রাহ্মদিগের অগ্রসরনীতি সমর্থন করিয়াছেন, উহাকে প্রকৃত পথে পরিচালনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রতিনিধি ব্যবস্থার মূলতত্ত্ব বিষয়ে কেশবচন্দ্র যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহা উধৃত করিতেছি। পাঠকগণ দেখিবেন, এই মূলতত্ত্বকে ভিত্তিভূমি করিয়াই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ঈশ্বরকৃপায় দিন দিন উহার বিকাশ হইতেছে ; শত ক্রটী অভাবসত্ত্বেও একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, এইরূপ উদার ও বিশুদ্ধ প্রণালী ভিন্ন কোনও ধর্মসমাজ বর্তমানযুগে চলিতে পারে না ; যে আকারেই হউক, এই সাধারণতন্ত্র ব্যবস্থা সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে। Representative Government বর্তমান যুগের মূলমন্ত্র।

"একজনেরই হউক বা পাঁচ জনেরই হউক, অযথা কর্তৃত্বের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে, ইহা বিধিসিদ্ধ হইতে পারে না। আর একদিকে প্রচারক, আচার্য, উপাচার্য প্রভৃতি কাহারও অধীনতা (বাধ্যতা ?) স্বীকার না করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন, উহাও দূষণীয়। এ দুইয়ের সামঞ্জস্য হইবে কি প্রকারে ? প্রথমত যাঁহারা সমাজের নেতা হইবেন, তাঁহারা সকলের মনোনীত লোক হইবেন, তাঁহাদিগের কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন ; এবং তাঁহারা সেই মনোনীত ব্যক্তিগণের মধ্যে আপনাদিগকে দেখিতে পাইবেন, এবং ইঁহারা ভাবেতে এক হইবেন। তাঁহাদিগকে সম্মান করিতে গিয়া অপর সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া হইবে না, কেন না ইঁহাদিগকে সম্মান করিয়া ইঁহাদিগের ভিতর দিয়া সকলকে সম্মান করা হইবে, সকলের প্রতি বাধ্যতা স্বীকার করা হইবে। অন্যদিকে এইরূপ করিতে গিয়া ব্যক্তিত্বের বিনাশ হইবে না, বরং ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা লাভ হইবে। কেন না, বাধ্যতা স্বীকার এবং অপরের সেবা করিতে গিয়া আমাদিগের ভিতরকার যে সকল সামর্থ আছে, গুণ আছে, জীবনের লক্ষ্য আছে, তাহার পূর্ণ পরিমাণে পরিচালনা হইবে।" "আচার্য কেশবচন্দ্র" ৮৭৮ পৃষ্ঠা।

এলাহাবাদে তিন মাস

উৎসবান্তে আমার ভগিনীপতি গোপালবাবু সপরিবারে এলাহাবাদে গমন করিবেন। আমিও তাঁহাদিগের সঙ্গে অতিযত্নে সস্ত্রীক তথায় নীত

হইলাম। আমি তথায় তিন মাস কাল বাস করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসাদি দ্বারা আরোগ্য লাভ করিলাম। এলাহাবাদের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার যথেষ্ট সহায়তা করিল। তথাকার ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়া উপাসনাদি করিয়া সেই রোগসময় একরূপ সুখেই অতিবাহিত হইল। তখন এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের বেশ ভাল অবস্থা ছিল। আমার ভগিনীপতি গোপালবাবু, শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা যদুনাথ ঘোষ ও বিহারীলাল ঘোষ* তথাকার পদস্থ উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন, আরও অনেকে তাঁহাদের সহকারিতা করিতেন। প্রচারক মহাশয়েরাও প্রায়ই ওদিকে গমন করিতেন।

১লা বৈশাখ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। ইহার কয়েক দিন পূর্বে বিহারীবাবু আরাতে বদলি হইয়াছিলেন ; আমরা পথে তাঁহার গৃহে অবতরণ করিলাম। সেদিন তাঁহাদের গৃহে কত যত্নে কত আদরেই ছিলাম। ভগিনী রাজলক্ষ্মীর সেই স্নেহমাখা মুখখানি আজিও মনে পড়িতেছে। এখন তাঁহারা দুজনেই স্বর্গে ; তাঁহাদের সেই অকারণ স্নেহ কখনও ভুলিব না। আমার প্রিয় সুহৃদ বৈকুণ্ঠনাথ এ কয় মাস মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এই সময়ে তিনিও কলিকাতায় আসিলেন। আমরা তিনজনে গোয়ালন্দ আসিয়া তথা হইতে একখানি বড় নৌকায় তিন দিনে ঢাকায় আসিলাম। ভক্তিভাজন বঙ্গবাবু প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ আমাকে রোগমুক্ত দেখিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমরা অতি আনন্দে কয়েকদিন আশ্রমে বাস করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে নৌকাপথে ময়মনসিংহে যাত্রা

* গোস্বামী মহাশয়ের ভাগিনেয়ী শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবীর সহিত এই বিহারী বাবুর পরিণয় হইয়াছিল। মহালক্ষ্মী দেবী আমাকে ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করিতেন, আমার সহধর্মিনীর সঙ্গেও তাঁহার বেশ ভাব হইয়াছিল। তদুপলক্ষে বিহারীবাবু আমাকে অনেক সময়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন। কিন্তু তিনি বড় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তামাসা করিতে যাইয়া অনেক সময় নিজেই ঠকিতেন। একদিন আমরা সকলে একত্রে আহার করিতে বসিয়াছি, একটা তরকারী ঝাল হইয়াছিল, উহা আমার ভগিনীর বাঁধা বলিয়া বাঙ্গালের প্রতি কিঞ্চিৎ শ্লেষ হইতেছিল। বিহারীবাবু আমাকে বলিলেন, আচ্ছা, আপনারা লঙ্কাপ্রিয় কত দিন ? আমি বলিলাম, আপনারা লঙ্কার শত্রু যত দিন। সকলে হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু বিহারী বাবু তখন কিছু বুঝিতে পারেন নাই। পরে আচমন সময়ে তাঁর জ্ঞান হইল, তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "ও যদু, বাঙ্গাল ত আমাদের বাঁদর বলেছে।"

করিলাম। তখন ঢাকা হইতে এখানে আসিতে ৬।৭ দিন লাগিত। লক্ষ্যা নদীর উভয় পার্শ্বের দৃশ্য বড় মনোহর ; পথে হাটবাজারে বেশ খাদ্য বস্তু পাওয়া যায়। আমরা উভয়ে স্বহস্তে রন্ধন করিতাম, নদীতটে উঠিয়া বন্য শাকতরকারী সংগ্রহ করিতাম, কখনও বা কৃষকদের বাড়ীতে যাইয়া দুগ্ধ চাহিয়া আনিতাম ; এ অঞ্চলের কৃষকেরা দুগ্ধ বিক্রয় করিত না। একত্রে উপাসনা, সঙ্গীত ও সৎপ্রসঙ্গ করিতাম। স্বামী স্ত্রীর এরূপ মুক্ত ব্যবহার ও ধর্মচর্চা দেখিয়া নৌকাবাহকগণ অবাক হইয়া থাকিত। কয়েকদিন মধ্যে তাহাদের সঙ্গে এরূপ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল যে, তাহারা বিদায় হইবার সময়ে চক্ষুর জল ফেলিয়া বলিয়াছিল, বাবু আপনাদের ধর্মই সত্য, এমন মানুষ আর আমরা দেখি নাই।

যথা সময়ে ময়মনসিংহে আসিয়া কর্মভার গ্রহণ করিলাম, শাখা সমাজ ও সঙ্গতের কার্য নূতন উৎসাহে চলিতে লাগিল। শ্রীমান গগনচন্দ্র হোম ও গুরুদাস চক্রবর্তী প্রভৃতি তখন শাখা সমাজের উৎসাহী সভ্য, তাঁহারা আমাকে পাইয়া অধিকতর উৎসাহিত হইলেন ; ব্রাহ্মবাসা পুনরায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। পূর্বে লিখিত হইয়াছে, বাবু চন্দ্রমোহন বিশ্বাস ইটনা স্কুলে কার্য করিতেন। এই বৎসর বৈশাখ মাসে তিনি আমাদের বালিকা স্কুলের পণ্ডিত হইয়া এখানে চলিয়া আসিলেন। তখন বালিকা স্কুল গোপীবাবুর বাসায় একখানি স্বতন্ত্র ঘরে ছিল, উহাতে প্রাইমারী পরীক্ষার পাঠ্য পড়ান হইত। কিছুদিন পরে চন্দ্রমোহনবাবু সপরিবারে ব্রাহ্মবাসায় আসিয়া আমাদের সঙ্গে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। এই বৎসর ভাদ্র মাসে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা চন্দ্রপ্রভা জন্মগ্রহণ করে। আমাদের সমবয়স্কদের মধ্যে চন্দ্রপ্রভাই প্রথম সন্তান এবং সকলেরই আদরের পাত্রী ছিল।

শাখাসমাজের উৎসব—গৌরবাবুর আগমন

২৩শে আষাঢ় আমাদের প্রিয় শাখাসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইল। ছাত্রগণ আমাকে পাইয়া নবোৎসাহে উৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। ঢাকা হইতে প্রচারকগণ আসিলেন। কলিকাতা হইতে ভক্তিভাজন গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় আসিলেন। প্রায় ৩ সপ্তাহ ব্যাপিয়া উৎসব হইল। উৎসবান্তে ঢাকার প্রচারকগণ চলিয়া গেলেন। কিন্তু গৌরবাবু আরও মাসাধিক

কাল এখানে অবস্থিতি করিলেন। ব্রাহ্মসমাজে সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক শাসন বিষয়ে এবার বিশেষ ভাবে আলোচনাদি হইয়াছিল। এবারও তিনি ব্রাহ্ম বাসায় ছিলেন এবং আমার গৃহে আহারাদি করিতেন। সত্যের প্রতি তাঁহার কি গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল, তাঁহার একটী ব্যবহারে তাহা প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যা সময়ে আমাদের বাসায় আলোচনাদি হইত, তাহাতে ব্রাহ্মগণ সকলেই উপস্থিত হইতেন। একদিন সঙ্গতের পর আমরা অন্দরে আহার করিতে গেলাম, কালীকুমারবাবু, গোপীবাবু, আনন্দবাবু প্রভৃতি কথা বলিতে বলিতে তথায় যাইয়া বসিলেন। বামা স্বহস্তে রন্ধনাদি করিতেন, সেদিন তাঁহার শরীর ভাল ছিল না, আহারের ভাল আয়োজন হয় নাই, সামান্য ডাল তরকারী মাত্র উপকরণ ছিল। আহারান্তে প্রচারক মহাশয় কালীকুমারবাবুদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখুন, আমি কিন্তু প্রত্যহ এরূপ আহার করি না, উনি যথেষ্ট আয়োজন করিয়া আহার করান, আজ শরীর ভাল নাই বলিয়া বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই।" অতঃপর আমাকে বলিয়াছিলেন, হয়ত উঁহারা মনে করিতেন, প্রতিদিনই বুঝি এইরূপ খাওয়া হয়; তা হ'লে ত এঁর প্রতি বড়ই অন্যায় করা হইত! এজন্যই এ বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে হইল।

পারিবারিক

আমার পীড়ার সংবাদে মাতৃদেবী অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন পূজার বন্ধে তাঁহাকে দেখিতে বাড়ীতে যাইতে হইল। এদিকে পত্নীর শরীর অচল, ওদিকে মাতৃদর্শনের প্রবল ইচ্ছা, বাসায় এমন কেহ রহিলেন না, যিনি পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে পারেন। অগত্যা তাঁহাকে কালীকুমারবাবুর বাসায় রাখিয়া অল্প কয়েক দিনের জন্য মা'র কাছে গেলাম। তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিন পরেই ১৮৭৭ সলের ২৭শে কার্তিক আমার প্রথম পুত্র (শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ) ভূমিষ্ঠ হইল। প্রসবসময়ে প্রসূতির জীবন-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, হিতৈষী বন্ধু ডাক্তার সারদাবাবু সেই সঙ্কট সময়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

শীতকালে শ্রদ্ধেয় কালীকুমারবাবু স্বাস্থ্য লাভের জন্য ৩ মাসের ছুটী লইয়া

পশ্চিমে চলিয়া গেলেন। তখন মূল সমাজের উপাচার্য ও সম্পাদক উভয় কার্যের ভারই তাঁহার উপর ছিল। তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমার প্রতি উপাচার্যের ভার রহিল, আনন্দবাবু সম্পাদক হইলেন; মন্দিরের সমস্ত বৈষয়িক কার্যভার পূর্ববৎ আদিনাথ বাবুর হস্তেই রহিল।

কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র

আমার বন্ধু আনন্দচন্দ্রের কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। ময়মনসিংহেই তাঁহার কবি-জীবন আরম্ভ হয়। প্রথমে তিনি "মিত্র কাব্য" নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। জেলা স্কুলে কার্য করিবার সময় তিনি তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "হেলেনা কাব্য" রচনা করেন। আমি উহার টীকা ও ভূমিকা লিখিয়াছিলাম। এই কাব্য রচনার সময়ে তাঁহার মনে বিলাত গমনের আকাঙ্ক্ষা হইল। এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি একদিকে গ্রন্থ রচনা করিয়া অর্থ সংগ্রহে যত্নবান হইলেন, অন্যদিকে ধনবান লোকদিকের সহায়তা লাভের জন্যও নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন প্রসিদ্ধ প্র্যাট্ সাহেব (পরে যিনি হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন) এখানকার জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার সহিত আনন্দবাবুর বিশেষ পরিচয় ও খাতির ছিল। আনন্দ তাঁহাকে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা দিতেন। প্র্যাট্ সাহেব জমিদারদিগকে এজন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় সহস্রাধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। তিনি আনন্দবাবুকে পুস্তক মুদ্রণের জন্য অল্প কিছু টাকা দিয়াছিলেন, অবশিষ্ট তাঁহার হাতেই রাখিয়াছিলেন। সমস্ত টাকা সংগৃহীত হইলে সাহেব বিলাতে যাইবার সময়ে আনন্দবাবুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন এরূপ কথা রহিল। আনন্দ ১৮৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে ঢাকায় গেলেন। আমার পত্নী তখন স্মৃতিকারোগে পীড়িতা ছিলেন, তাঁহাকেও এই সঙ্গে চিকিৎসার্থ ঢাকায় প্রেরণ করিলাম।

আনন্দ কয়েক বৎসর ধরিয়া নানা স্থানে নানারূপ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু উপযুক্ত অর্থের সংস্থান করিতে পারিলেন না। লোকের সহায়তায় যখন কিছু হইল না, তখন ব্যবসায় দ্বারা অর্থলাভের চেষ্টা করিলেন। তাহাও নিষ্ফল হইল। এমন কি ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ঋণজালে জড়িত হইয়া

পড়িলেন। এদিকে প্র্যাট্ সাহেব বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার হস্তে রক্ষিত অর্থ দাতৃগণকে ফিরাইয়া দিলেন। আনন্দের বিলাত গমনের ইচ্ছা আর পূর্ণ হইল না।

ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি নানারূপ দারিদ্র্য কষ্ট ও লোকাপবাদ বহন করিয়া কলিকাতায় গেলেন। যে চাকুরী করার তিনি একান্ত বিরোধী ছিলেন, তাঁহাকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু কলিকাতা সহরে চাকুরী করিয়া পরিবার প্রতিপালন করাও কঠিন, ঋণ শোধের কোনও উপায় হইল না। ওদিকে মহাজনগণ তাঁহার নামে নালিশ করিয়া টাকার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। আনন্দের এই ঘোর বিপদ সময়ে আমাদের সহৃদয় শরচ্চন্দ্র তাঁহার জীবনের সমস্ত উপার্জন দ্বারা যে ৫০০ টাকা সংস্থান করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই আনন্দকে প্রদান করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার বিপদ কাটিল না; আরও ৫০০৲ টাকার প্রয়োজন। তখন তিনি নিরূপায় হইয়া বিপন্ন জনের চিরবান্ধব দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হইলেন।

তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানসিক অবস্থা ভাল ছিল না। অকৃতজ্ঞ লোকের দুর্ব্যবহারে তাঁহার মন তিক্ত হইয়া গিয়াছিল, কাহাকেও বড় একটা বিশ্বাস করিতেন না। আনন্দ ভয়ে ভয়ে তাঁহার নিকটে যাইয়া নিজের দুঃখ কাহিনী বর্ণন করিয়া দয়া প্রার্থনা করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি কঠোর কথায় তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। আনন্দের তখনকার মনের অবস্থা ভাবিলে চক্ষুর জল সম্বরণ করা যায় না। যাহা হউক, ইহার কয়েক দিন পরে ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি কথায় কথায় আনন্দের নাম বলিলেন এবং তাঁহাকে যে বিশ্বাস না করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করিলেন। তখন সেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আনন্দের প্রকৃত অবস্থা বলিয়া তাঁহার পক্ষে অনুকূল মত প্রকাশ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রকৃত অবস্থা জানিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তে ৫০০৲ টাকার নোট দিয়া আনন্দকে দিতে বলিলেন এবং তাঁহার জন্য দুঃখ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বাঙ্গলার কবি আনন্দচন্দ্র ঋণমুক্ত হইয়া পুনরায় মাতৃভাষার সেবায় মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইয়া-

ছিলেন। তাঁহার কথা মনে করিলে বাঙ্গলার মহাকবি মধুসূদনকে মনে পড়ে এবং হেমচন্দ্রের সঙ্গে একবাক্যে বলিতে ইচ্ছা হয়—

হায় মা ভারতী, চিরদিন তোর,
কেন এ অখ্যাতি নরে
যে জন সেবিল ও পদ যুগল,
সেই জন দুঃখে মরে !

পূর্বস্মৃতি

এই অধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সুবর্ণযুগেরও পরিসমাপ্তি হইবে ; এজন্যই এই অধ্যায়টী শেষ করিতে প্রাণে কেমন বেদনা অনুভব করিতেছি ! বাল্যের মধুময় স্মৃতিজড়িত পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অপরিচিত স্বামিগৃহে প্রবেশ করিতে বালিকার প্রাণ যেমন আকুল হইয়া উঠে, আনন্দময় ছাত্র জীবনের অবসানে কঠোর কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে যুবকের মন যেমন উদাস-ভাবে পূর্ণ হয়, অথবা জননী জন্মভূমির শীতল বক্ষ ছাড়িয়া অকূল সাগরে ভাসিলে বিদেশগামী বঙ্গ যুবকের অন্তরে যেমন বিচ্ছেদবেদনা উপস্থিত হয়, সত্য সত্যই ব্রাহ্মসমাজের সুতরাং আত্মজীবনের এই সঙ্কটপূর্ণ সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়া প্রাণ তেমনি আকুল হইয়া উঠিতেছে ! বহু দিনের লুপ্তপ্রায় বিচ্ছেদবেদনা আজ যেন নবীভূত হইয়া স্মৃতিকে অভিভূত করিতেছে ! হায়, সে আনন্দগৃহে কেন সহসা এ অগ্নি প্রজ্বলিত হইল ? সে প্রেমের বাজার কেন অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া গেল ? আহা, সে অমৃতে এ গরল কে ঢালিয়া দিল ! মানুষ ক্ষুদ্র, মানুষ অদূরদর্শী ; তাহার দৃষ্টি এখানে অবরুদ্ধ, তাহার বাক্য এখানে নীরব !

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

এই বিষয়টি ভ্রমক্রমে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হয় নাই; তজ্জন্য এখানে পরিশিষ্টরূপে লিখিত হইল। ১৮৭০ কি ৭১ সালে সন্তোষ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কাগমারী পরগণার প্রসিদ্ধ জমিদারগণ এই গ্রামে বাস করেন। তৎকালে পাঁচ আনির জমিদার দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী এবং ছয় আনির প্রসিদ্ধা জাহ্নবী চৌধুরাণী প্রবল প্রতাপে জমিদারী শাসন করিতেছিলেন। পূর্বে কথিত হইয়াছে, দ্বারকানাথবাবু আমাদের কালীকুমার বাবুর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন; তাঁহার প্রভাবেই হউক বা অন্যকারণেই হউক, চৌধুরী মহাশয় ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী ও সহানুভূতিকারী ছিলেন। সন্তোষের নিকটবর্তী বেলতা গ্রাম নিবাসী বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী, বিজয়সিংহ ও রণসিংহ নিয়োগী প্রভৃতি কলেজের যুবকগণ ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। জাহ্নবী স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু তারকবন্ধু চক্রবর্তী তৎকালে ব্রহ্মোপাসক ছিলেন। ইঁহাদের যত্নে সন্তোষ নগরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। আমরা যখন স্কুল বন্ধে স্বদেশে যাইতাম, তখন সন্তোষ ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া উপাসনাদি করিতাম। প্রথমে পাঁচ আনির রামসীতার বাড়ীর আমবাগানে একখানি ক্ষুদ্র গৃহে সমাজের কার্য হইত। একবার আশ্বিনের বন্ধে আমরা ঐ অঞ্চলের ব্রাহ্ম যুবকগণ মিলিয়া উক্ত গৃহে উপাসনাদি করিতেছিলাম; একদিন সন্ধ্যাকালে যাইয়া দেখি গৃহখানি মলমূত্রে পূর্ণ। মহোৎসাহী যুবক রণসিংহ স্বহস্তে গৃহ পরিষ্কার করিয়া স্নানান্তে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছুকাল পরে বোধ হয় ১৮৭৩ সালে গাজিয়বাড়ীর খালের ধারে একটী সুন্দর স্থানে একখানি বৃহৎ গৃহ নির্মিত হইল। মাননীয় দ্বারকানাথ-চৌধুরী মহাশয় অর্থ ও ভূমি দিয়া এবং অন্যান্যরূপে এই কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিলেন। গ্রীষ্মের বন্ধের সময় কাগমারী অঞ্চলের ব্রাহ্মগণ এবং ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী যুবকগণ মিলিত হইয়া মহাসমারোহে মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিলেন। কলিকাতা হইতে ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আগমন করিলেন। ময়মনসিংহ হইতে আমি, বৈকুণ্ঠনাথ ও রমাপ্রসাদ প্রভৃতি গমন করিলাম। কয়েক দিন পর্যন্ত উপাসনা, সংকীর্তন বক্তৃতাদি হইল। তখন ব্রাহ্মগণের কি জলন্ত ও নির্ভীক ধর্মবিশ্বাসই না ছিল! এই মন্দির প্রতিষ্ঠা সময়ে তাঁহাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার ও

উৎপীড়ন হইয়াছিল, তাঁহারা যেরূপ প্রসন্ন মনে সেই সকল বহন করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

উপাসনাগৃহে প্রবেশের পূর্বদিন আমরা সকলে মহোৎসাহে মন্দির সুসজ্জিত করিয়া রাখিলাম। পরদিন প্রত্যুষে যাইয়া দেখিলাম, গৃহ একেবারে শূন্য; বেঞ্চ বেদী প্রভৃতি সমস্ত গৃহসজ্জা অপহৃত হইয়াছে। তখন গোস্বামী মহাশয় সেই শূন্য গৃহে দাঁড়াইয়া হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা করিয়া নগর কীর্তনে বহির্গত হইলেন। প্রথমে বাহিরের লোক কেহ যোগ দিল না। আমরা কীর্তন করিতে করিতে সাকরাইল প্রভৃতি গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া কাগমারীর বাজারে উপনীত হইলাম। এখানে বহু লোক আমাদের সঙ্গে মিলিত হইল, এবং মহাজনগণ নিজ গৃহ হইতে খোল করতাল আনিয়া আমাদের কীর্তনে বাজাইতে লাগিলেন। গোস্বামী-মহাশয়ের প্রমত্ততা বাড়িয়া গেল, তাঁহার ভাব ভক্তি ও কীর্তনে প্রমত্ত ভাব দেখিয়া চারিদিকের লোক মাটিতে পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিল। অনেক বেলায় মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, সে গৃহে আর যাওয়া যায় না, গৃহখানি মলমূত্রে একেবারে পরিপূর্ণ! দিবাভাগে ধর্মমন্দিরে লোকের এইরূপ ব্যবহার। তখন একটী ভুঁইমালীকে যথেষ্ট পয়সা দিয়া গৃহ পরিষ্কার করান হইল! শুনিয়াছিলাম, এজন্য সে বেচারাকে অনেক শাসন করা হইয়াছিল। যাহা হউক, মন্দিরে উপাসনা আরম্ভ হইল; চারিদিকে লোকমণ্ডলী দণ্ডায়মান, কেহ গৃহে প্রবেশ করেন না! তখন গোস্বামী মহাশয়ের আদেশে গৃহের চারিদিকের বেড়া খুলিয়া দূরে রাখা হইল, তিনি মহাতেজে অগ্নিময় বাক্যে হৃদয়ভেদী উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করিলেন। চতুর্দিকে লোক সকল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বহু সময় দণ্ডায়মান রহিল।

উৎসবান্তে আমরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলাম। কয়েক দিন পরে শুনিতে পাইলাম, সন্তোষ গ্রামের স্বধর্মনিরত মহোদয়গণ ব্রহ্মোপাসনার গৃহখানি দগ্ধ করিয়া স্বধর্ম রক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন! ইংরেজ শাসনের ভয় না থাকিলে বোধহয় তাঁহারা আরও অগ্রসর হইতেন! যাহা হউক, সে ক্ষুদ্র গৃহ অগ্নিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সন্তোষ ব্রাহ্মসমাজের কথা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

১৮৭৮ সাল, মাঘ মাস। আমরা অষ্টচত্বারিংশ মাঘোৎসবে প্রবৃত্ত হইলাম। ধর্মতত্ত্ব কলিকাতার সুসমাচার বহন করিতে লাগিল। তখন ব্রাহ্মসমাজসমূহে এমন ভাবযোগ ছিল যে কলিকাতার তরঙ্গ সুদূর মফঃস্বলে আসিয়া উপস্থিত হইত। বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে যেমন শাখাপল্লব সঞ্জীবিত হইয়া নবশ্রী ধারণ করে, ব্রাহ্মসমাজের অবস্থাও তেমনি ছিল। আমরা মহোৎসাহে মাঘোৎসব সম্পন্ন করিলাম।

উৎসবের কিছু দিন পূর্বে আমরা কলিকাতার কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম, কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজকুমারের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ভক্তিভাজন আচার্য কেশববাবুর বালিকা কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছে। তখন আমরা এ কথায় কোন আস্থা স্থাপন করি নাই; ব্রাহ্মসমাজে যিনি সামাজিক সংস্কারের প্রবর্তক, তিনি বাল্যবিবাহ প্রদান করিবেন, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় নাই। আর এক কারণে উহা আমাদের কাছে ভাল লাগে নাই, কুচবিহারের রাজকুমার বা রাজ-পরিবার ব্রাহ্ম নহেন, কুচবিহারের অনেক অবস্থা আমাদের পরিজ্ঞাত ছিল, আমাদের আচার্য-কন্যা ওরূপ স্থলে পরিণীতা হইলে ব্রাহ্মসমাজের মান হানি হয়, আদর্শ হীন হয়। যাহা হউক মাঘোৎসবের সময়ে শুনিতে পাইলাম, গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় লোকে কন্যা মনোনীত করিয়াছেন বটে, কিন্তু পাত্র পাত্রীর বয়ঃপ্রাপ্তি না হইলে বিবাহ হইবে না। এই সংবাদে মনের ভার অনেকটা কমিয়া গেল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের যিনি আদর্শ তাঁহার পরিবারে এরূপ বিবাহ কিছুতেই আমাদের মনঃপূত হইল না।

কুচবিহার বিবাহ

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রতিবাদ ও আন্দোলন দ্বারাই নবজীবনের সূচনা হইয়াছে। সময়ের গতির বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়া এবং আবহমানকাল-প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিয়া ধর্মবীর রামমোহন ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৫ সালে যখন উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ সেনাপতি কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপুট পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, তখনও প্রতিবাদ ও আন্দোলন দ্বারাই নবজীবনের সূত্রপাত হয়। ১৮৭৮ সালে পুনরায় যে আন্দোলন-তরঙ্গ উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে বিকম্পিত ও ছিন্নভিন্ন করিয়াছিল, তাহা পূর্বোক্ত দুইটি অপেক্ষাও অধিক বিস্তৃত ও বেগবান। সকলেই জানেন, কুচবিহার রাজকুমারের সহিত আচার্য কেশবচন্দ্রের প্রথমা কন্যার বিবাহ উপলক্ষেই এই আন্দোলনের সূচনা হয়। মাঘোৎসবের পরেই কলিকাতা হইতে একখানি পত্র আসিল, রাজকুমার বিলাতে যাইবেন, এখনই বিবাহ হইবে। ঐ পত্রে এই বিবাহ যাহাতে স্থগিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে ব্রাহ্মদিগকে সবিশেষ অনুরোধ করা হইয়াছিল। স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এ বিষয়ে বিলক্ষণ আন্দোলন ও আলোচনা হইতে লাগিল। এখানে কাহাকেও বিবাহের সপক্ষে দেখিলাম না, কিন্তু কেহ কেহ ধৈর্য ধরিয়া নীরব রহিলেন, অনেকে বিশেষত যুবক মণ্ডলী, উত্তেজিত হইয়া ইহার প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করিলেন। আমাদের মধ্যে বাবু শরচ্চন্দ্র রায় অতিশয় তেজীয়ান ও ন্যায়নিষ্ঠ লোক ছিলেন, মানুষের দিকে চাহিয়া উচিত কথা বলিতে বিরত থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এদিকে তিনি কেশববাবু ও প্রচারক মহাশয়-দিগের প্রতিও অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। উপস্থিত ঘটনায় তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক বিচলিত হইলেন এবং তাড়াতাড়ি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

কলিকাতায় মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মগণ এই বিবাহের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থাপন করিলেন। প্রথমে কলিকাতার কতিপয় ব্রাহ্ম স্বাক্ষর করিয়া একখানি আবেদন পত্র আচার্য কেশবচন্দ্রের সমীপে প্রেরণ করেন। তৎপর তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া মফঃস্বল ব্রাহ্মসমাজের অভিমত সংগ্রহ করিলেন; এবং সংবাদপত্র প্রচার দ্বারা এই আন্দোলনকে প্রবল

করিয়া তুলিলেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা টাউন হলে ব্রাহ্মগণের এক অধিবেশন হয়, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি সূচনায় বলেন "এই বিষয়ে ৮৬টী ব্রাহ্মসমাজে লিপি প্রেরিত হইয়াছিল, ৫৭টী সমাজ উত্তর প্রদান করিয়াছেন; তন্মধ্যে ৫০টী সমাজ এই বিবাহের প্রতিবাদী, ৩টী অনুকূল এবং ৪টী নিরপেক্ষ।"

অতঃপর প্রত্যেক সমাজে মুদ্রিত প্রতিবাদ লিপি প্রেরিত হইল। সংবাদপত্রেও ঘোর আন্দোলন আরম্ভ হইল। প্রতিদিন আমাদের নিকট কলিকাতা হইতে পত্র আসিতে লাগিল। একজনে লিখিলেন, কেশববাবু কাহারও কথা শুনিতে প্রস্তুত নহেন, তিনি কোন প্রতিবাদলিপি গ্রহণ করিবেন না; বিবাহ হইবেই। এই সংবাদে আমাদের মনে মহা আতঙ্ক জন্মিল। তখনই মনে হইয়াছিল, ব্রাহ্মদিগের সমবেত প্রার্থনা যেরূপে তুচ্ছ অগ্রাহ্য করা হইতেছে, তাহাতেই এ অগ্নি দুর্জয় হইয়া উঠিবে। আমাদের নিকটও একখানি প্রতিবাদলিপি আসিল। আমরা ব্রাহ্মসমাজের গৌরব রক্ষার জন্যই একান্ত কর্তব্যবোধে উহাতে স্বাক্ষর করিলাম; তখনও মনে আশা ছিল, যিনি ব্রাহ্মদিগকে স্বাধীন বিবেকবুদ্ধিতে পরিচালিত হইতে চিরদিন যত্ন করিয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন, হয়ত তাঁহার নিকট আমাদের এই সঙ্গত প্রার্থনা একবারে অগ্রাহ্য হইবে না। আমাদের কালীকুমারবাবু তখন এখানে উপস্থিত ছিলেন না, আর গোপীবাবু বলিলেন, আমি ইহাতে স্বাক্ষর করিব না, এ বিষয়ে আমি কেশববাবুর বিবেচনার উপরই নির্ভর করিব। যাহা হউক, বাদপ্রতিবাদ আবেদন প্রার্থনা সকলই বিফল হইল; ৬ই মার্চ তারিখে কুচবিহারে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ সময়ে কুচবিহারে যে সকল ক্লেশকর ঘটনা ঘটিয়াছিল, ব্রাহ্মগণের পূজনীয় কেশবচন্দ্রের প্রতি যেরূপ অপমান ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা হইয়াছিল, এবং আমাদের প্রিয় আচার্য যেরূপ কঠোর মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সংবাদপত্রে তদ্বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারি নাই।

কুচবিহার বিবাহের সবিস্তার বিবরণ আমরা লিখিতে চেষ্টা করিব না। অনেক যোগ্য ব্যক্তি এ বিষয়ের আমূল বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে বহু কথাই লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। উভয় পক্ষ পরস্পরকে আক্রমণ ও ভর্ৎসনা করিতেও ক্রটী করেন নাই। আমাদের ভক্তিভাজন

উপকারী প্রচারক মহাশয়গণ এবং পরমাত্মীয় বন্ধু ও কুটুম্বগণ অনেকেই অপর পক্ষে রহিলেন তথাপি আমরা সরল বিবেকবুদ্ধিতে যাহা সত্য ও ন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, যথাসাধ্য শান্তভাবে তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এ বিষয়ে যে আমাদের পক্ষে কার্যত কোন ক্রটী বা অপরাধ হয় নাই, এ কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, কোনরূপ স্বার্থ বিদ্বেষবুদ্ধি বা দলাদলির ভাবে কখনও পরিচালিত হই নাই। সহজ ধর্মবুদ্ধি ও কর্তব্যজ্ঞানে যাহা উচিত বোধ হইয়াছে, তাহাই করিতে যত্ন করিয়াছি। একজন শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক লিখিয়া রাখিয়াছেন "কি ছোট কি বড় কি যুবক কি বালক সকলের নীতিজ্ঞান সেই সময়ে বিলুপ্ত হইয়াছিল।" আমরা যতদূর জানি, প্রতিবাদকারিগণের অধিকাংশের অবস্থা ওরূপ ছিল না। তাঁহারা অনেকেই প্রাণে গভীর বেদনা লইয়া কেবলই কর্তব্য ও বিবেকের অনুরোধে এই দুঃখজনক কার্যে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা হউক সাময়িক উত্তেজনা ও কল্পিত কথা লুপ্ত হইয়া যাইবে, যাহা সত্য, ইতিহাস তাহাই সাদরে বহন করিবে।

ঈশ্বরাদেশের কথা

কুচবিহার বিবাহের সূচনা হইতেই এই তিনটী কারণে ব্রাহ্মদের মন উহার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল : (১) পাত্রপাত্রী অপ্রাপ্ত-বয়স্ক সুতরাং ইহা বাল্যবিবাহ দোষে দূষিত ; (২) কেশববাবু স্বয়ং যে বিবাহ আইনের প্রবর্তক, যাহাকে তিনি ঈশ্বরাদেশ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, এই বিবাহে সেই আইনের মূলভাব (Principle) নষ্ট হইল ; (৩) রাজকুমার এবং রাজপরিবার ব্রাহ্ম নহেন, এরূপ স্থলে ব্রাহ্মসমাজের নেতার কন্যা পরিণীতা হইলে ব্রাহ্মসমাজের অপমান ও আদর্শ খর্ব হইবে। প্রথম সময়ে ঈশ্বরাদেশ সম্বন্ধে কোন কথা উঠে নাই এবং তদ্বিষয়ে কোন বাদ প্রতিবাদও হয় নাই। ৬ই মার্চ বিবাহ হইয়া গেলে মিরার ও ধর্মতত্ত্বে যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহাতেই ঈশ্বরাদেশের কথা প্রথমে শুনিতে পাই। তখন সকলের চিত্ত এরূপ বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল যে, সে সময়ে আর উক্ত বিষয়ের বিচার চলে না। তবে অনেকে তৎকালে সে সম্বন্ধে নীরব ছিলেন, কেহ কেহ বা এরূপ স্থলে ঈশ্বরাদেশ বলা সঙ্গত মনে করেন নাই, কেহ কেহ বা ঈশ্বরাদেশ যে সর্ববাদীসম্মত ও সহজ-

জ্ঞানমূলক নীতির বিরোধী হয় না, এরূপ যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু ফলকথা এই, তখন প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মদিগের মনে আচার্যের প্রতি পূর্ব-শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং এরূপ স্থলে ঈশ্বরাদেশে এই কার্য করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাদের মন আর তুষ্ট হইতে পারে নাই।

কুচবিহার বিবাহের পরে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় ৭ই চৈত্রের এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "যদ্যপিও এই বিবাহে পৌত্তলিকতার সংস্রব ও বাল্য বিবাহের দোষ ধরিয়াই প্রতিবাদ করা হইয়াছে ও হইতেছে, তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে, ঈশ্বরাদেশে আচার্য মহাশয় এই কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশিত হওয়াতেও, সেই কথার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয় নাই ; এই দেখিয়া আমি প্রতিবাদীদের সঙ্গে কিছুমাত্র আন্তরিক সহানুভূতি রাখিতে অক্ষম হইয়াছি।"

এদিকে কেশবচন্দ্রের একজন প্রধান অনুরাগী প্রচারক গোস্বামী মহাশয়, ১৯শে বৈশাখের এক পত্রে লিখিলেন, "ব্রাহ্মবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইলে কেশববাবু ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে উপদেশ দিলেন যে, ইহা কেবল রাজ-বিধি নহে, ইহা ঈশ্বরের আদেশে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এজন্য ঈশ্বরের বিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু কেশববাবু স্বীয় কন্যার বিবাহে ঈশ্বরের সেই বিধি প্রতিপালন করিতে অসম্মত হইলে চারিদিক হইতে প্রতিবাদ হইল, তিনি প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় প্রচারিত ঈশ্বরের বিধিকে লঙ্ঘন করিলেন।"

এই উভয় পত্র হইতে এ বিষয়ে উভয় পক্ষের তৎকালীন মনোভাব অনেকটা বুঝা যাইবে। আমরা এ বিষয়ে আর কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে এস্থলে এ কথা স্পষ্ট উল্লিখিত থাকা আবশ্যক যে, "কেশববাবু ঈশ্বরাদেশে এই কার্য করিয়াছেন শুনিয়াও যখন প্রতিবাদ তুলিয়া লওয়া হয় নাই, তখন প্রতিবাদকারিগণ ঈশ্বরাদেশে বিশ্বাসী নহেন" এরূপ কথা কখনও বলা যাইতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষের কোন এক বিষয়ের প্রত্যাদেশ গ্রহণ বা স্বীকার করিতে না পারিলেই সে ব্যক্তি "ঈশ্বরাদেশের বিরোধী" এরূপ বলা ধর্মানুগত নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন বিবেকবুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া সরল হৃদয়ে কর্তব্যের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাতে

আপাতত অনৈক্য বা অসম্মিলন হইলেও পরিণামে কল্যাণই হইবে। এই ভাবে জীবন পথে অগ্রসর হইলে শত ভিন্নতা সত্ত্বেও অপ্রেম ও শক্রভাব জন্মে না। যেখানে মত ও কার্য্যের বৈষম্যে অপ্রেম বা শক্রতা জন্মিয়াছে, তথায় ধর্মই রক্ষা পায় নাই; সেরূপ স্থলে "ঈশ্বরাদেশ" লইয়া বিচার করা বৃথা।

ময়মনসিংহে গৃহবিচ্ছেদ

ফাল্গুন মাসে কুচবিহার বিবাহ সম্পন্ন হইল। কলিকাতায় মহাসংগ্রাম ও গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। তাহার পরিণাম ফলে প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মগণ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির হইতে তাড়িত হইলেন। সে মহাসংগ্রামের প্রবল তরঙ্গ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ডে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। ক্রমে উহা প্রলয়াকার ধারণ করিয়া সমগ্র ব্রাহ্মমণ্ডলীকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। সে গভীর শোককাহিনী ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে রক্তাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ভাবী ইতিহাসে তাহার প্রকৃত তত্ত্ব লিখিত হইবে। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ এই গৃহবিবাদে যেরূপ আন্দোলিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল, আমরা অতি সংক্ষেপে সেই দুঃখকাহিনী লিপিবদ্ধ করিব। আমরা যেন অপক্ষপাতচিত্তে প্রকৃত ঘটনা লিখিয়া রাখিতে পারি, সাম্প্রদায়িক বন্ধনমুক্ত হইয়া যেন সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই সকল শক্তি নিয়োগ করিতে পারি, সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর আমাদিগকে সেই অধিকার প্রদান করুন।

যখন কুচবিহার বিবাহ সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিল, তখন ময়মনসিংহস্থ ব্রাহ্মগণ একখানি প্রতিবাদলিপি ভক্তিভাজন কেশববাবু মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। উহার অনুলিপি কলিকাতাস্থ "প্রবিশনাল ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর" নিকট প্রেরিত হইল। উহাতে ২২জন ব্রাহ্ম ও ৪ জন ব্রাহ্মিকার স্বাক্ষর ছিল। যতদূর স্মরণ হয়, তৎকালে সহরে উপস্থিত ব্রাহ্মদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ সেন ভিন্ন আর সকলেই উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তখন কালীকুমারবাবু পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। তিনি তখন মূল সমাজের উপাচার্য ও সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমার প্রতি উপাচার্য্যের কার্য্যভার ছিল, বাবু আনন্দ নাথ ঘোষ সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতার আন্দোলন এখানেও প্রবল

হইয়া উঠিল। প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মগণ উক্ত বিবাহ সম্বন্ধে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের অভিমত প্রকাশ ও কর্তব্য নির্ধারণ করিবার জন্য একটী সাধারণ সভা আহ্বান করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। স্থায়ী সম্পাদক কালীকুমার বাবু শীঘ্রই আসিবেন শুনিয়া আপাতত এই কার্য স্থগিত রাখা হইল। বিবাহের প্রায় ৩ মাস পরে কালীকুমারবাবু এখানে আগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়া বুঝা গেল, তিনি এবিষয়ে কোনও অভিমত প্রকাশ করিবেন না। তবে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যমণ্ডলী যদি কোন অভিমত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সভা ডাকিতে প্রস্তুত আছেন। তদনুসারে ১৮৭৮ সালের মে মাসের প্রথম ভাগে কালীকুমার বাবুর বাসায় ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের একটী বিশেষ সভা আহূত হইল। তাহাতে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কালীকুমার বসু, গোপীকৃষ্ণ সেন, আনন্দনাথ ঘোষ, শরচ্চন্দ্র রায়, শ্রীনাথ চন্দ, চন্দ্রমোহন বিশ্বাস, অমরচন্দ্র দত্ত, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিহারীকান্ত চন্দ, রত্নমণি গুপ্ত, কালীকুমার গুহ, মহিমচন্দ্র বসু, ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র রায়, দীননাথ রায়।

বাবু কালীকুমার বসু সভাপতির পদে বরিত হইলেন। প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য আরম্ভ হইল। সভাপতির অনুমতিক্রমে পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন :—

প্রথম প্রস্তাব। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজকুমারের সহিত তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার যে বিবাহ দিয়াছেন, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ ও গৌরব খর্ব হইয়াছে। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ এই বিবাহকে "ব্রাহ্মবিবাহ" বলিয়া অস্বীকার করিতেছেন।

এই প্রস্তাব লইয়া কিছুকাল তর্ক বিতর্ক হয়। কালীকুমারবাবু ও গোপীবাবু ভিন্ন আর সকলেই এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সুতরাং প্রস্তাব গৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইল। কালীকুমারবাবু ও গোপীবাবুর কি মত, তাহা জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা বলিলেন, ধর্মতত্ত্ব ও ইণ্ডিয়ান মিরারে যে মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই আমাদিগের মত। তাঁহাদের স্পষ্ট মত জানিতে অনেকে খুব আগ্রহ প্রকাশ করিলেন কিন্তু তাঁহারা আর কিছুই বলিতে সম্মত

হইলেন না। তখন শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয় নিম্নলিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বাধ্য হইলেন।

২য় প্রস্তাব। যাঁহারা উক্ত বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ অথবা ব্রাহ্মসমাজের অনুমোদিত বিবাহ বলিয়া স্বীকার ও সমর্থন করিবেন, অতঃপর আর তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, আচার্য বা প্রচারক রূপে গ্রহণ করা হইবে না।

এই প্রস্তাবে মতদ্বৈধ হইল। অনেক বাদানুবাদ ও আলোচনার পর অধিকাংশের মতানুসারে এই প্রস্তাবও গৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইল। কেহ কেহ এই প্রস্তাব অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে সভ্যদের যেরূপ মনের ভাব হইয়াছিল, তাহাতে এইরূপ প্রস্তাব করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না।

দুই এক দিন পরে ঐ ২য় প্রস্তাবের নকল দিয়া কালীকুমারবাবুকে পত্র লেখা হইল, এবং সভ্যগণের এইরূপ নির্ধারণের পরে তিনি সমাজের সম্পাদক ও উপাচার্য থাকিতে প্রস্তুত কিনা জিজ্ঞাসা করা হইল। আমরা ভাবিয়াছিলাম, যদি তিনি ঐ নির্ধারণ থাকা সত্ত্বেও স্বীয় পদে থাকিতে সম্মত হন, তবে প্রকারান্তরে তিনি আমাদের দলভুক্তই হইলেন। আর যদি তাঁহার অন্যরূপ মত হয়, তবে ত স্বীয় পদ পরিত্যাগ করাই তাঁহার পক্ষে উচিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কালীকুমার বাবু ঐ পত্রের কোনও প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। সমাজের প্রেসিডিং বুক আমাদের বাসায় থাকিত। কালীকুমারবাবু একদিন আমাদের অনুপস্থিতিকালে শ্রীমান বিহারীকান্ত চন্দের নিকট চাহিয়া ঐ পুস্তক নিজ বাসায় লইয়া গেলেন। বিহারী মনে করিয়াছিলেন, তিনি পুস্তক খানা দেখিতে চাহেন, উহা যে এইরূপে হস্তগত করিবেন, তাহা ভাবেন নাই।

অতঃপর আর একটী সভা ডাকিবার জন্য কালীকুমারবাবুকে অনুরোধ করা হইল। সে অনুরোধ রক্ষিত না হওয়াতে ৫ জন সভ্যের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপনদ্বারা ব্রাহ্মবাসায় একটী সভা ডাকা হইল। সচরাচর ব্রাহ্মবাসাতেই সভাদির অধিবেশন হইত। এই সভায় স্থির হইল যে, কালীকুমারবাবু যখন বিবাহ সম্বন্ধে কোন মত ব্যক্ত করিলেন না, এমন কি সমাজের ঐ নির্ধারণ মানিয়া তিনি উপাচার্য ও সম্পাদক থাকিতে প্রস্তুত কিনা তাহাও

যখন জানাইলেন না, তখন অতঃপর আর তাঁহার উপর সমাজের ঐ দুই গুরুতর কার্যভার থাকিতে পারে না। আপাতত বাবু আনন্দনাথ ঘোষ উপাচার্য এবং বাবু শরচ্চন্দ্র রায় সম্পাদক নিয়োজিত হইলেন।

এই সময়ে গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে স্কুল বন্ধ হইল। আমার সহধর্মিণী গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ঢাকায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইয়াছে, আমাকে যাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এই খবর পাইয়া আমি ঢাকায় চলিয়া গেলাম; বাবু চন্দ্রমোহন বিশ্বাসও ইটনাতে গমন করিলেন। এখানে ব্রহ্মমন্দির লইয়া যে কোন গুরুতর ঘটনা ঘটিবে, তখনও আমরা তাহা ভাবি নাই; সমুদয় সভ্যের বিরুদ্ধে দুই জন লোক যে মন্দির অধিকার করিয়া থাকিবেন, এইরূপ কল্পনাও আমাদের মনে উদিত হয় নাই। সেই জন্যই এরূপ সঙ্কট সময়ে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমাদের মনে কোনরূপ আশঙ্কাই জন্মে নাই।

পরবর্তী রবিবার উপস্থিত হইল। প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মগণ অনেকে ব্রাহ্মবাসায় মিলিত হইলেন; এই পরামর্শ হইল যে, নূতন আচার্য যদি সামাজিক উপাসনা করিতে বাধা প্রাপ্ত হন, কালীকুমারবাবু যদি সভ্যগণের নির্ধারণ অগ্রাহ্য করিয়া উপাসনা করিতে অগ্রসর হন, তবে কোনরূপ বিবাদ না করিয়া সকলে মন্দির পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন এবং ব্রাহ্মবাসায় উপাসনাগৃহে সামাজিক উপাসনা করিবেন। শুনিয়াছি, উক্ত গৃহ ক্ষুদ্র বলিয়া আঙ্গিনাতেও একখানি চাঁদোয়া খাটাইয়া রাখা হইল। এই দিনের ঘটনার সময়ে আমি অনুপস্থিত ছিলাম, তজ্জন্য সেই বিবরণ নিজের কথায় না লিখিয়া তৎকালে যাঁহার উপরে মন্দির সম্বন্ধীয় কাযভার ছিল, এবং এখন যিনি ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত ও কলিকাতা সাধনাশ্রমের ওয়ার্কার, আমার সেই শ্রদ্ধেয় ধর্মবন্ধু শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে গ্রহণ করিলাম।

"ময়মনসিংহে ঐ আন্দোলনতরঙ্গ বিশেষ আকার ধারণ করিল। ক্রমে ক্রমে উহা উভয় পক্ষের মনের উপর এমনভাবে কার্য করিতে লাগিল যে, অতঃপর আর একসঙ্গে উপাসনাদি করা সম্ভব রহিল না। তৎপর ব্রাহ্মগণের এক সভায় প্রতিবাদকারীদের মধ্যে একজন আচার্য ও একজন সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন; এবং তাঁহারা এই পরামর্শ করিলেন যে, পরবর্তী রবিবারে

নবনিযুক্ত আচার্য সামাজিক উপাসনার কার্য করিবেন। আরও স্থির হইল যে, যদি তিনি মন্দিরে উপাসনা করিতে বাধা প্রাপ্ত হন, তবে তাঁহারা মন্দির হইতে চলিয়া আসিয়া ব্রাহ্মবাসার উপাসনাগৃহে সামাজিক উপাসনা করিবেন। রবিবার উপস্থিত হইল; যথাসময়ে উপাসকগণ মন্দিরের দ্বারে সমবেত হইতে লাগিলেন। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে আর একটী কথার উল্লেখ করিতে হইল। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির সম্বন্ধীয় কার্য নির্বাহের জন্য বোধ হয় কখনও ভৃত্য ছিল না; তখনও ছিল না। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মগণই মন্দিরের দ্বার খোলা ও বন্ধ করা এবং আলো দেওয়া ও পরিষ্কার করা প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন করিতেন। এই সময়ে যাঁহার উপর উক্ত ভার পড়িয়াছিল, তিনি যথাসময়ে চাবি লইয়া মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, মন্দিরের সম্মুখস্থ বারান্দায় পুলিশ উপস্থিত! সঙ্গে বিবাহ সমর্থনকারী কেহ কেহ ছিলেন। তিনি অন্যান্য দিনের ন্যায় তালা খুলিয়া যেমন মন্দিরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, অমনি পুলিশ তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল, এবং মন্দিরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। তিনি পুলিশ-কর্তৃক বাধা পাইয়া কি করিবেন তাহা স্থির করিবার পূর্বেই বিবাহ সমর্থনকারী একজন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আলো জ্বালান প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত হইলেন। এদিকে মন্দিরের বারান্দায় লোক জমা হইতে লাগিল। প্রতিবাদকারিগণের কেহ কেহ পুলিশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন ইঁহাকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। তদুত্তরে পুলিশের লোকে বলিল, পূর্বে যে ভাবে মন্দিরের কার্য হইত, অর্থাৎ পূর্বে যিনি আচার্যের কার্য করিতেন, আজও যদি তিনিই আচার্যের কার্য করিতে পান, এবং প্রতিবাদ-কারী ব্রাহ্মগণ ইহাতে কোন গোলযোগ না করেন, তবেই তাঁহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে, নতুবা আজ আর তাঁহারা মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। তখন প্রতিবাদকারিগণের পক্ষ হইতে বলা হইল, অধিকাংশ সভ্যের মতে যিনি আচার্য নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনিই আজ উপাসনা করিবেন; ইহাই বিধি। পুলিশ তাহাতে সম্মত হইল না। তখন মন্দিরদ্বারে বহু জনতা হইতেছিল, প্রতিবাদকারিগণ কোনরূপ বাদবিতণ্ডা করিয়া উপাসনার সময়ে শান্তিভঙ্গ করা অন্যায় মনে করিয়া সকলে চলিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। তখন বাবু অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয়

সময়োচিত সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিলে সকলে মন্দির পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মবাসায় যাইয়া সামাজিক উপাসনা করিলেন।"

১৮৭৮ সালের ২৩শে মে তারিখের ভারত-মিহিরে শরৎবাবুর স্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশিত হয়; উহাতে এই আন্দোলনের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছিল। আমরা সেই পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"শুনিতে পাইলাম, গোপীবাবু কর্তৃপক্ষের নিকট যাইয়া মন্দিরের দ্বারে পুলিশ নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, বাস্তবিকও তাহাই। আমাদের নিকট মন্দিরের চাবি ছিল, মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, অনেক লোক সমবেত হইয়াছে। কতকটী কনেষ্টবলসহ ইন্‌স্পেক্টর ও কোর্টইন্‌স্পেক্টর রক্ষক নিযুক্ত আছেন। আমরা গৃহে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, পুলিশ তাহা দিল না। আমরা যেই তালা খুলিয়া দিলাম, অমনি কয়েক জন পুলিশ দ্বারের মুখে দাঁড়াইল। আমরা বলিলাম, আমরা উপাসনা করিতে আসিয়াছি, কেন মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাইব না। যদি আমরা না পাই, তবে তালা বন্ধ করিয়া যাই, পরে যাহা হয় হইবে। গোপীবাবু মৃদুস্বরে ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন, You see that's opposition. পুলিশ আমাদের কথা শুনিল না। তবে কি আমরা চলিয়া যাইব, পুলিশকে বার বার এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। পুলিশ আমাদিগকে তাহাই আদেশ করিল। আমরা সাধারণকে কয়েকটী কথা বলিয়া চলিয়া আসিলাম। কোন হাঙ্গামা না করিয়া এরূপ অত্যাচারের সময়ে যে আমরা শান্তভাবে চলিয়া আসিতে পারিয়াছি, তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই। * * * প্রত্যেক হৃদয়ে ন্যায়ের স্থান হউক, আমরা ইহা ভিন্ন আর কিছুই চাহি না।"

১৯০১ খৃষ্টাব্দের চারুমিহিরে বাবু অমরচন্দ্র দত্ত বিরচিত শরচ্চন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, উহা হইতেও এই কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিলাম ;

"ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের মধ্যে প্রতিবাদকারী ১৫ জন এবং কেশববাবুর পক্ষে ৪ জন ছিলেন। চারি ব্যক্তি মন্দির হস্তগত করিয়া রহিলেন, অধিকাংশ সভ্য এবং বহু সংখ্যক নিয়মিত উপাসক মন্দির পরিত্যাগ করিলেন। একজন ভিন্ন শাখাসমাজের ছাত্রসভ্যগণ সকলেই চলিয়া গেলেন। ১৫ই মে তখন স্কুল বন্ধ, শরৎবাবুর অনুগত ছাত্রগণ এবং বাবু শ্রীনাথ চন্দ, চন্দ্রমোহন বিশ্বাস প্রভৃতি অনেকে স্থানান্তরে চলিয়া

গিয়াছেন। সূর্যাস্তের সময়ে এভিনিউ রোডের পশ্চিমে ব্রহ্মমন্দিরের বারান্দায় এই ব্যাপার ঘটিয়া গেল। শরৎবাবু ইহার গুরুত্ব চিন্তা করিয়া পথের পার্শ্বে এক বৃক্ষতলে বসিয়া একবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বিশাল দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন তাঁহার চিত্তের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, বর্ণনা করা অসাধ্য।"

এইরূপে আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মসমাজ গৃহবিবাদে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ব্রহ্মকৃপায় যে প্রেমের হাট জমিতেছিল, আমাদের কর্মফলে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। যাঁহারা মন্দির অধিকার করিয়া রহিলেন, প্রিয় ও উপযুক্ত সঙ্গীদিগের অভাবে বিশেষত শাখাসমাজের যুবক মণ্ডলী হারাইয়া তাঁহারাও নিস্তেজ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িলেন। রবিবার প্রাতে মন্দিরে যে শাখাসমাজের উপাসনা হইত, তাহা উঠিয়া গেল, কালীকুমারবাবু ২।৪টী সঙ্গী লইয়া সন্ধ্যা-কালে কোনরূপে মন্দিরের প্রদীপ রক্ষা করিতে লাগিলেন। গোপীবাবু পূর্ব হইতেই ময়মনসিংহ পরিত্যাগের চেষ্টায় ছিলেন, এখন তজ্জন্য বিশেষ-ভাবে উদ্যোগী হইলেন। এদিকে প্রতিবাদকারিগণ সংখ্যায় অধিক হইলেও নানারূপ বাদবিতণ্ডার তরঙ্গে ভাসিয়া বিবিধ পরীক্ষায় পড়িতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত যাঁহাদের সহানুভূতি ছিল, অনেকেই কেশব বাবুর কথা বলিয়া পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন; কেহ কেহ বা ব্রাহ্মসমাজ আর টিকিবে না বলিয়া সরিয়া পড়িতে লাগিলেন। গ্রীষ্মাবকাশের পর আমরা এখানে ফিরিয়া আসিয়া প্রাণতুল্য ব্রাহ্মসমাজের এই অবস্থা দেখিয়া মর্মাহত হইয়া পড়িলাম। যুবকদিগের মধ্যে শুষ্ক তর্ক ও পরনিন্দায় অত্যন্ত প্রাধান্য দেখিয়া বড়ই ভয় হইল। কয়েকটী ধর্মবন্ধু মিলিয়া দৈনিক উপাসনা ও সদালোচনা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম বাসায় রবিবার প্রাতে শাখাসমাজ ও রাত্রিতে মূল সমাজের কার্য হইতে লাগিল। সেই গৃহ-খানিতে আর লোক ধরিত না। ইহার কয়েকদিন পরে বাবু শরচ্চন্দ্র রায় মন্দির সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণ জন্য কলিকাতায় গমন করিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা

১৮৭৮ সালের মার্চমাসে কুচবিহার বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতায় যে গৃহ-বিবাদের আরম্ভ হয়, তাহার ফলে তিন মাস মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ

দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। ১৬ই মে ২রা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতার প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মগণ "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নাম দিয়া স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই নাম নির্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই সমাজের প্রথম আচার্য নিযুক্ত হইলেন। মফঃস্বলের ব্রাহ্মগণ দলে দলে এই সমাজের সভ্য হইতে লাগিলেন। আজ ৩১ বৎসর পরে সেইদিন স্মরণ করিয়া তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা যাহা বলিয়াছেন, এখানে সংক্ষেপে তাহা গ্রহণ করিতেছি, এতদ্দারাই উক্ত সমাজের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় অনেকটা বুঝা যাইবে।

"আজ সেইদিনের কথা মনে পড়িতেছে, যে দিন সত্যনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মগণ সত্যের অনুরোধে ব্রাহ্মসমাজের মতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য বিবেকবাণীর অনুগত হইয়া ধর্মবন্ধুগণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আজ সেইদিনের কথা মনে পড়ে, যে দিন তাঁহারা প্রিয়তম ব্রহ্মমন্দির হইতে বিতাড়িত হইয়া সমবেত উপসনার জন্য একটু স্থানের অন্বেষণে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছিলেন। আজ সেইদিনের কথা মনে হইতেছে, যে দিন তাঁহারা অনন্যগতি হইয়া ঈশ্বরের আদেশে এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সূত্রপাত করেন। তাঁহাদের ধনবল ছিল না, জনবল ছিল না, প্রতিভাসম্পন্ন নেতা কেহ ছিলেন না; একজন ব্যতীত আর কোন প্রচারক তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন না। সংসারের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহারা নিঃসহায় ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের একমাত্র এই আশা ছিল যে, তাঁহারা কোন সাংসারিক স্বার্থের জন্য এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন নাই; ঈশ্বরের আহ্বানে বিবেকের অনুরোধে ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁহারা এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; একমাত্র সত্যের জন্য হৃদয়ের প্রিয়জন যাঁহারা, তাঁহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য হইলেন। যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনে নানা প্রকার নির্যাতন, অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও বীরের ন্যায় কার্য করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের অনেকেই ইহলোকে নাই; যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও রুগ্ন দেহ ও ভগ্ন শরীর লইয়া বার্ধক্যের কম্পিত হস্তে ব্রাহ্মসমাজের পতাকা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। অটল কর্তব্যনিষ্ঠ বৃদ্ধ শিবচন্দ্র, উদারদাতা ও সরলহৃদয় দুর্গামোহন, সৎসাহসী ও তেজস্বী পুরুষ দ্বারকানাথ, প্রশান্তমূর্তি বিনয়ের অবতার বিদ্বানশ্রেষ্ঠ আনন্দমোহন,

কর্মপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ নির্বিরোধস্বভাব উমেশচন্দ্র প্রভৃতি যে সকল মহাত্মা আমাদের এই প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজ গঠনে প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতেছি।"

"সেই দিন কি শুভ দিন, যে দিন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মজ্ঞানের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া একমেবাদ্বিতীয়ম্ মহামন্ত্র ঘোষণা করিলেন: সেইদিন কি শুভদিন, যেদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার করিয়া জগতের নিকট ঘোষণা করিলেন, মানবাত্মা স্বাধীন, জগতে কোন অভ্রান্ত গুরু নাই, কোন অভ্রান্ত শাস্ত্র নাই, ঈশ্বরই একমাত্র অভ্রান্ত গুরু, তাঁহার বাণীই একমাত্র শাস্ত্র। আর সেইদিন কি শুভদিন যে দিন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বিশ্বাসীদলে মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্মের বিজয় পতাকা দেশদেশান্তরে লইয়া গেলেন, মহাসাগর অতিক্রম করিয়া জগতের দ্বারে দ্বারে এই মহাবাণী ঘোষণা করিলেন, "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।"

"কিন্তু বিধাতার আশ্চর্য লীলা কে বুঝিবে; এত বড় প্রতিভান্বিত ও শক্তিশালী লোককেও পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই কতিপয় অনুগামী ও ধর্মবন্ধু স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্মের বিশুদ্ধতা ও উদারভাব রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।"

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, কেশবচন্দ্রের এই মহাবাক্য কার্যে পরিণত করাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কার্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সমাজ পরিচালনে ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য স্বীকার করেন না। পুরুষ কিম্বা নারী, প্রচারক কিম্বা বিষয়ী, সকল ব্রাহ্মই সমাজ পরিচালনে নিজ নিজ শক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ। বর্তমান যুগ স্বাধীনতার যুগ; স্বাধীনতা ও উদারতা বর্তমান যুগের লক্ষণ। মূল বিষয়ে একতা, অবান্তর বিষয়ে স্বাধীনতা, সকল বিষয়ে উদারতা, আর পরমতে সম্মাননা, এই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ভূমিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। এ সমাজ ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের নয়, ইহা সার্বভৌমিক সমাজ, সকলেরই এখানে যথোপযুক্ত অধিকার ও কার্য করিবার সুবিধা আছে। অবশ্য যাঁহারা জ্ঞানে চরিত্রে ও ধর্মে উন্নত, তাঁহারা স্বভাবতই নেতা; অন্যেরা তাঁহাদের অভিজ্ঞতার নিশ্চয়ই সম্মান করিবেন; কিন্তু অন্যকে বঞ্চিত করিয়া বা

পরমতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া নিজমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এ সমাজে সম্ভব নয়।

জগতে দুই উপায়ে ধর্মসমাজ পরিচালিত হইতে পারে, একজনের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার থাকিলে এবং তিনি প্রকৃত নেতৃত্বগুণসম্পন্ন হইলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা চলিতে পারে; কিন্তু তাহাতে অন্তর্বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকে, তাহাতে লোকের স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কর্মক্ষমতার স্রোতও অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে, সুতরাং যথার্থ মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। আর এক প্রকারে ধর্মসমাজ পরিচালিত হইতে পারে; ইহা সর্বসাধারণের স্বাধীনতা ও অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে মানবের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হয় না; কিন্তু প্রেম উদারতা ও বিজ্ঞজনের অভিজ্ঞতার শাসন দ্বারা স্বাধীনতা নিয়মিত হয়। এইরূপে সমাজমধ্যে যে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকে, তাহাই বাঞ্ছনীয় এবং পরিণামে মঙ্গলজনক। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এইরূপ স্বাধীনতা-মূলক নিয়মতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে নরনারী উভয়েই এই স্বাধীনতা ও অধিকার লাভ করিয়া উহার নির্মুক্ত ভূমিতে আপনাদের সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য এই প্রণালীতে অনেক কাঠিন্য, অনেক বিপদ এবং অনেক সংগ্রাম আছে; কিন্তু ইহাই প্রকৃত পন্থা। জগতে একদিন এই স্বাধীনতন্ত্রই জয়যুক্ত হইয়া মানবসমাজের চিরকল্যাণ সাধন করিবে।

পুনর্মিলনের চেষ্টা

২৮শে আষাঢ় শাখাসমাজের বার্ষিক উৎসব আসিল। ব্রাহ্ম বাসায় অতিশয় সমারোহপূর্বক উৎসব হইল। গৃহ, বারান্দা এবং প্রাঙ্গন উপাসক ও দর্শক ছাত্রগণে পূর্ণ হইয়া গেল। ভক্তিভাজন বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় অন্যান্যবারের ন্যায় এবারেও শাখাসমাজের আকর্ষণে এখানে আগমন করিলেন। অল্পসংখ্যক কয়েকটী উপাসক লইয়া তিনি মন্দিরে উপাসনাদি করিলেন। শুনিয়াছি তিনি মন্দির শূন্য দেখিয়া অতিশয় আক্ষেপ করিয়াছিলেন। আমাদের সঙ্গেও একদিন তাঁহার কথাবার্তা হইল। তিনিও কুচবিহার বিবাহের অনুমোদন করিলেন না। কিন্তু যাহা হইবার

হইয়াছে, এজন্য আর বাদপ্রতিবাদ ও গৃহবিচ্ছেদ করা কর্তব্য নহে, আচার্য্য মহাশয় এজন্য যে দুঃখিত হইয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে; এই তাঁহার মত। আমাদের মধ্যে পুনর্মিলন হইতে পারে কি না এজন্যও তিনি কিছু কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শাখাসমাজের উৎসবের কয়েকদিন পরে ময়মনসিংহের অকৃত্রিম সুহৃদ মাননীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় কোন কার্যোপলক্ষে এখানে আগমন করিলেন। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের দুঃখকাহিনী সবিশেষ শুনিয়া তিনি অতিশয় মর্মাহত হইলেন। কলিকাতার গৃহবিরোধ যাহাতে মফঃস্বলের ক্ষুদ্র সমাজগুলিকে ছিন্নভিন্ন না করে, যতদূর সম্ভব মনের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া যাহাতে একত্রে কার্যাদি করা যায়, তজ্জন্য তিনি যত্নবান হইলেন। গোপীবাবু বলিলেন, আমি উপাচার্য্যও হইতে চাহি না, সম্পাদক পদেরও প্রত্যাশা নহি, কেবল কলিকাতার প্রচারকগণ আসিলে পূর্ববৎ মন্দিরে কার্যাদি করিতে পারিবেন, এই নিয়মে সম্মত হইলেই সভ্যগণের হস্তে মন্দির ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কালীকুমারবাবু এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। আমাদের মধ্যেও অনেকেই এরূপ কোন নিয়মে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন, সভ্যগণের অধিকাংশের মতে যখন যাহা নির্দ্ধারিত হইবে, তদনুসারে কার্য চলিবে, এই চিরন্তন প্রথার অন্যথা করা যাইতে পারে না। অতঃপর মিলনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। তবে এখন আমাদের কর্তব্য কি, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল। আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া মন্দিরে অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করা কর্তব্য কি না, বসু মহাশয়কে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইল। ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আলোচনা হইল। এখন এই উত্তেজনার সময়ে কিছু না করিয়া আরও চিন্তা ও বিবেচনার পর এ বিষয়ের কর্তব্য স্থির করা হইবে, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইল।

এইরূপে কয়েক মাস অতীত হইল। এই সময়ে ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় অবস্থিতি করিতেছিলেন; তাঁহার প্রিয় ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা শুনিয়া তিনি ব্যাকুল হইলেন। কার্তিকমাসে নৌকাপথে তিনি এখানে আগমন করিলেন। তিনি তাঁহার প্রচার বিবরণীতে লিখিয়াছিলেন, "১৫ই কার্তিক আমি ময়মনসিংহে উপস্থিত হইলে

গোপীবাবু বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহার বাসায় বাসস্থান প্রদান করিলেন। আমি গোপীবাবুকে অনেক প্রবোধ বাক্য দ্বারা বুঝাইয়া ব্রহ্মমন্দিরের গোলমাল মীমাংসা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, উভয় পক্ষ হইতে ট্রাস্টী নিযুক্ত করা হউক এবং পৃথক পৃথক দিনে উপাসনা করা হউক। মন্দির হইতে তাড়িত ব্রাহ্মগণ আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে গোপীবাবুদের মত না হওয়াতে কিছুই ফল লাভ করিতে পারিলাম না।"

গোস্বামী মহাশয় কয়েক দিন এখানে থাকিয়া আমাদিগকে লইয়া উপাসনা, কীর্তন ও আলোচনাদি করিলেন। তাঁহার এই আগমন সময়োচিত হইয়াছিল; আমাদের শুষ্ক ও ভগ্নপ্রাণে অনেকটা সরসতার সঞ্চার হইল, উত্তেজিত মন কিয়ৎ পরিমাণে প্রশান্ত হইল। এস্থলে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। গোস্বামী মহাশয় একদিন এখানকার পুরাতন নর্মাল স্কুলগৃহে ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে শ্রদ্ধেয় গোপীবাবু মহাশয় মহা উত্তেজনার সহিত বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের সমাজ, মানুষ ইহার কি করিবে", উত্তেজনাবশতঃ তাঁহার স্বর ভঙ্গ হইয়া গেল, তিনি আর বলিতে পারিলেন না। গোপীবাবু বাসায় চলিয়া গেলেন, গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মবাসায় যাইয়া বিশ্রাম করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, অতঃপর আর তাঁহার গোপীবাবুর বাসায় যাওয়া উচিত নহে। কিন্তু তিনি অম্লান বদনে বলিলেন, কেন, গোপীবাবু পূর্বে যেমন এখনও আমার তেমনি বন্ধু আছেন, আমি অবশ্য তথায় যাইব। শ্রীমান বিহারীকান্ত তাঁহাকে গোপীবাবুর বাসায় রাখিতে গেলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, গোপীবাবু ভাবিয়াছিলেন, গোস্বামী মহাশয় আর এখানে আসিবেন না, কিন্তু তখনই তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া তিনি দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁকে ধরিয়া তুলিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। বিহারী বলেন, সে অপূর্ব দৃশ্য এখনও চক্ষে ভাসিতেছে।

এইবার গোস্বামী মহাশয় আমার প্রথম পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন, পুত্রের নাম শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ রাখা হয়। শ্রদ্ধেয় কালীকুমারবাবু ও গোপীবাবু প্রভৃতিও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন উভয়

দলে ঘোর বিরোধ ও মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, কেহ কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন না। কিন্তু আমার প্রতি উঁহাদের যে অতুল স্নেহ ছিল, সে স্নেহের বন্ধন কিছুতেই কাটাইতে পারেন নাই। তাঁহারা সপরিবারে এই দানের গৃহে উপস্থিত হইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। তখন ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের উদার প্রেম সকলকেই স্পর্শ করিয়াছিল।

গোস্বামী মহাশয় এই আন্দোলন সময়ে যেভাবে ব্রাহ্মদিগকে পরিচালিত হইতে উপদেশ করিয়াছিলেন, যে অতুল সত্যনিষ্ঠা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহার লিখিত পত্রে তাহার আভাস আছে; তন্মধ্য হইতে নিম্নে তিনটী বাক্য গ্রহণ করিলাম:—

(১) "সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের অপূর্ব শোভা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি; চিরকাল তাঁহারই চরণ ধরিয়া থাকিব। কোন মনুষ্যের মতে অনুমোদন করিব না। এজন্য যদি অনাহারে সপরিবারে শুকাইয়া মরি তাহাও সুখের বিষয়।"

(২) "বিদ্বেষ, হিংসা, পরনিন্দা, কপটতা এই সকল পাপ হইতে দূরে থাকিয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পবিত্র সত্য প্রচার করিব।"

(৩) "সত্যের জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে হইবে; কিন্তু হিংসা, বিদ্বেষ, নিন্দা প্রভৃতি পাপে যেন ব্রাহ্মদের হৃদয় কলঙ্কিত না হয়।"

বিচারালয়ে অভিযোগ

পুনর্মিলনের সকল আশা নির্মূল হইল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা নির্বিরোধস্বভাব, তাঁহারা স্বতন্ত্র মন্দির নির্মাণ করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু মন্দিরের জন্য নহে, ব্রাহ্মসমাজের চিরন্তন বিশুদ্ধ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য, ব্রহ্মমন্দির যে ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়, ব্রাহ্মসাধারণেরই উহাতে অধিকার আছে, এই সত্য বজায় রাখার জন্য, রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করাই কর্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। আমরা সকলেই এবিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ ও দরিদ্র। ওদিকে কালীকুমারবাবু ও গোপীবাবুর স্থানীয় লোকের উপর অতুল প্রভাব, অর্থবিত্তেরও অভাব নাই। স্থানীয় প্রধান উকীল মহাশয়দিগের নিকটে যাওয়া গেল কিন্তু অনেকেই আমাদের

পক্ষাবলম্বনে সম্মত হইলেন না। সকলেরই এক কথা, মোকদ্দমায় আপনারাই জয় লাভ করিবেন ; কিন্তু আমি আপনাদের পক্ষ গ্রহণ করিতে পারি না। কেহ বলিলেন গোপীবাবু আগেই বলিয়া রাখিয়াছেন, কেহ বলিলেন কালীকুমারবাবু পাঁচআনির কর্তা, তাঁহার সঙ্গে অনেক বাধ্যবাধকতা আছে ইত্যাদি। যাহা হউক পরিশেষে এখানকার প্রবীণ উকীল হিন্দুসমাজের পরিচালক শ্রীযুক্ত বাবু বাণেশ্বর পত্রনবীস মহাশয় আমাদের পক্ষ সমর্থনে সম্মত হইলেন ; শ্রীযুক্ত মৌলবী হামিদউদ্দীন আহাম্মদ তাঁহার সহকারী হইলেন। এই সময়ে আর এক সঙ্কট দেখা যাইতেছিল। ধর্মপ্রাণা সহধর্মিনীর পরলোক গমনের পর হইতেই আনন্দবাবুর মনের পরিবর্তন হইতেছিল ; কুচবিহারের বিবাহ ঘটনায় তাঁহার হৃদয় অবিশ্বাসের অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়িল। মানুষের উপর আর তাঁহার আস্থা রহিল না। তিনি সমাজের উপাচার্যের পদে বৃত হইয়া ছিলেন বটে কিন্তু কার্যতঃ সে পদ গ্রহণ করেন নাই। উপাসনাদির ভার প্রধানত আমার উপরেই পতিত হইল ; বাবু অমরচন্দ্র দত্ত আমার প্রধান সহায়রূপে কার্যাদি করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমরা ত মামলা মোকদ্দমার কিছুই জানি না, আনন্দবাবুই এবিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মোকদ্দমা পরিচালনের ভার তাঁহার প্রতিই অর্পিত হইল। কিন্তু তাঁহার মনে আর পূর্বের ন্যায় উৎসাহ ছিল না, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আর তেমন অনুরাগ ছিল না। তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া কার্য আরম্ভ করা গেল বটে, কিন্তু আমরা সকলেই বুঝিতে পারিলাম, এ কার্যে আর তাঁহার মন নাই।

যাহা হউক, এ সকল বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কার্য চলিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়া গেল ; বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয় ১০০ টাকা পাঠাইলেন। ১৮৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে স্থানীয় প্রথম সবজজ আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। বিক্রমপুরনিবাসী সুবিজ্ঞ বিচারক স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তখন এখানে প্রথম সবজজ ছিলেন। কালীকুমারবাবু এবং গোপীবাবুই বিবাদী ছিলেন, কিন্তু প্রভাতবাবু ও ভগবানবাবু বাদী পক্ষে নাম দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে তাঁহাদিগকেও বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিতে হইল। এই অপ্রীতিকর ঘটনায় ব্রাহ্মসমাজের সেই দুর্বৎসর অতীত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অপবাদ খণ্ডন

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত "আচার্য কেশবচন্দ্র" নামক গ্রন্থে কুচবিহার বিবাহ ও তৎসম্বন্ধীয় আন্দোলনের আমূল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক ঘটনারই নানা দিক থাকে; তিনি যে দিক দিয়া দেখিয়াছেন এবং যে ভাবে বুঝিয়াছেন, তদনুরূপ সত্য যথাশক্তি লিখিতে যত্ন করিয়াছেন। সকল তত্ত্বের যথার্থ অনুসন্ধান করিয়া, ভাব ও উত্তেজনার অতীত হইয়া এবং ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত দৃষ্টিতে দেখিয়াই এরূপ মহৎ জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য। আমাদের মনে হয় এই গ্রন্থে তদ্বিষয়ে অনেক ত্রুটী আছে। কলিকাতা ও কুচবিহারের সকল তত্ত্ব আমরা জানি না, তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য নয়। কিন্তু ঐ গ্রন্থে শ্রদ্ধাস্পদ গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের স্মৃতিলিপি বলিয়া যে অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি অযথা বর্ণনা, অন্যায় দোষারোপ এবং নিরর্থক কটুবাক্য লিখিত হইয়াছে। গিরিশ বাবু আমার ভক্তিভাজন ও চির উপকারী শিক্ষক; আমি তাঁহার নিকট নানা-রূপে ঋণী ও কৃতজ্ঞ; কিন্তু যখন ধর্মরাজ্যের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও সত্যেরই অনুসরণ করিতে হইবে। তজ্জন্যই অতিশয় দুঃখিত অন্তরে তাঁহার কতকগুলি অযথা দোষারোপের খণ্ডনার্থ এই অধ্যায় লিখিতে বাধ্য হইলাম। এই সকল উক্তি যদি সাময়িক উত্তেজনার ফল মাত্র হইত, তবে উপস্থিত গ্রন্থে এসম্বন্ধে কোন কথা বলা আবশ্যক হইত না; কিন্তু ঘটনার অনেক পরে একজন প্রবীণ ধর্মপ্রচারক ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ব্যক্তির জীবনচরিতে উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আর সকলের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র উপাধ্যায় মহাশয় উহার অনুমোদন করিয়াছেন; সুতরাং ভাবী বংশ ঐ সকল উক্তিতে সহজেই বিশ্বাস করিবেন; অথচ তাহা সত্য হইবে না। এজন্যই আমি এ সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া রাখা গুরুতর কর্তব্য বলিয়া অনুভব করিতেছি।

(১)

উক্ত স্মৃতিলিপির এক স্থলে (আ: কে: ৯৩০ পৃ:) লিখিত হইয়াছে "আন্দোলনের স্রোতে পড়িয়া বহু সংখ্যক ব্রাহ্মের মন যেরূপ উষ্ণ ও উত্তেজিত হইয়াছিল, আচার্যের প্রতি তাঁহারা যেরূপ অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন, আচার্য কি ভাবে বিবাহ দিতেছেন, এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কিরূপ অঙ্গীকার, তখন তিনি তাহা সবিশেষ জ্ঞাপন করিলেও কোন ফলোদয় হইত না; তাহা প্রায় কেহই বিশ্বাস করিত না, বরং তাহাতে উপহাস ও বিদ্রূপ করিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একজন দস্যুকেও দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের পূর্বে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বক্তব্য আছে কিনা, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, * * আচার্যকে তাঁহার কন্যার বিবাহানুষ্ঠান ব্যাপারে তাঁহার প্রিয় অনুগামিগণ সেই পন্থায় বিন্দুমাত্র অনুসরণ করিলেন না। হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হইয়া সকলেই ভক্তবিচারে প্রবৃত্ত; যে ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের পাদুকা স্পর্শ করিবার উপযুক্ত নয়, সেও অহঙ্কারস্ফীত বক্ষে বিচারক হইয়া তাঁহাকে কুৎসিত নিন্দা করিয়াছে এবং জঘন্যরূপে গালি দিয়াছে।"

এস্থলে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা এই, তৎকালে কি ব্রাহ্মমণ্ডলীর এতই অধোগতি হইয়াছিল যে, আচার্য একটি সামাজিক নীতি ভঙ্গ করিলেন দেখিয়াই প্রায় সমস্ত ব্রাহ্ম তাঁহার প্রতি "অবিশ্বাসী" ও "হিতাহিতজ্ঞানশূন্য" হইয়া স্ফীতবক্ষে ভক্তবিচারে প্রবৃত্ত হইল? ইহা কি তখনকার ব্রাহ্মমণ্ডলীর প্রকৃত চিত্র? সত্যই কি ব্রাহ্মগণ কেশবচন্দ্রকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেন নাই? সত্যই কি "লোকে দস্যুর প্রতি যেরূপ আচরণ করে" আচার্যের "প্রিয় অনুগামিগণ" তাঁহার প্রতি তেমন আচরণও করেন নাই? এরূপ অতিরঞ্জিত উক্তিদ্বারা সমবিশ্বাসীদিগের চরিত্রে কলঙ্ক অর্পণ করা কি উচিত হইয়াছে?

একথা সত্য যে, যুবকগণ স্বভাবত সহজেই উষ্ণ ও উত্তেজিত হয়; এই আন্দোলন সময়ে অনেকেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু স্নেহ ও ক্ষমা দ্বারা সেই অনলে শান্তিজল নিক্ষেপ না করিয়া ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য দ্বারা উহাতে কি যথেষ্ট ঘৃতাহুতি দেওয়া হয় নাই? বিবেকের অনুরোধে অতি তুচ্ছ ব্যক্তিও মহতের কার্যে প্রতিবাদ করিতে পারে; তাহাতেই কি সে "অবিশ্বাসী" "হিতাহিতজ্ঞানশূন্য" "পাদুকা স্পর্শের

অযোগ্য" বলিয়া অভিশপ্ত হইবে? আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উপাধ্যায়রচিত কেশবচরিতে এরূপ অন্যায় ও অতিরঞ্জিত কথার স্থান হইয়াছে!

(২)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উক্ত স্মৃতিলিপিতে লিখিত হইয়াছে, "ক্রোধ, কুভাব, বিদ্বেষ, বিরোধ, অবিশ্বাস বশত প্রত্যাদেশের বিরুদ্ধে ধর্মের উচ্চ উচ্চ স্বর্গীয়ভাব ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিনব সমাজের সৃষ্টি; হস্তোত্তোলনকারী বিষয়ী ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশের সাধারণ মত ও সাধারণ বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে সাধারণ ভূমির উপর এই সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিষয়ী ব্রাহ্মদিগের কর্তৃত্বাধীনে ক্রমে কয়েকজন বেতনভোগী প্রচারক নিযুক্ত হন।"

ব্রাহ্মদিগের সাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ এবং "বিষয়ী" ও "প্রচারক" মধ্যে অনিষ্টকর পার্থক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেই ব্রাহ্মসমাজে সেই ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। সংসারে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করাই ত ব্রাহ্মসমাজের মহা শিক্ষা; সুতরাং "বিষয়ী" ব্রাহ্মগণ ত হেয় নহেন; আমরা সকলেই ত এক প্রেম পরিবারের লোক, কেবল শক্তিভেদে কার্য ভেদ মাত্র। আমার মনে হয়, আমরা সকলে যদি এই মহা শিক্ষা জীবনে পরিণত করিতে পারিতাম, তবে আর ব্রাহ্মসমাজের চিরপ্রত্যাশিত "প্রেম পরিবার" এরূপে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত না। গভীর দুঃখের বিষয় এই যে সকলের ধর্মমতে শ্রদ্ধা প্রকাশ ও "সর্বধর্মসমন্বয়" যাঁহার জীবনের চরম ফল, তাঁহার জীবনচরিতে অন্যের ধর্মমত ও প্রাণতুল্য প্রিয় সমাজের প্রতি এইরূপ ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অন্যায় উক্তি চিরস্থায়ী রূপে মুদ্রিত রহিল!

(৩)

উক্ত জীবনীর ৯৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "কলিকাতাস্থ কোন কোন প্রতিবাদকারীর উত্তেজনাপূর্ণ অনুরোধ পত্র পাইয়া ময়মনসিংহ নগরে পরিণত বয়স্ক অনেক হিন্দু পর্যন্ত ব্রাহ্ম সাজিয়া পৌত্তলিক ও বাল্য বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া আচার্যকে অপমানিত করিবার জন্য উৎসাহের সহিত তরুণ বয়স্ক যুবক প্রতিবাদকারীদিগের দলভুক্ত হন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ জেলা

স্কুলের প্রধান শিক্ষক * * * কোন যুগে কখন কখন সখ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন, তিনিও একজন প্রধান প্রতিবাদকারী হন।"

সকলেই জানেন, ব্রাহ্মসমাজে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দ্বিবিধ সভ্যই আছেন। যখন অনুষ্ঠানের বাহুল্য হয় নাই, তখন এই অনানুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণই সমাজের পরিচালনা করিতেন। ঢাকায় স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র, অভয়কুমার দাস, দীননাথ সেন এবং ময়মনসিংহে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুহ, স্বর্গীয় কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ, মহেশচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকুমার গুহ, অন্নদাপ্রসাদ দাস ও হরচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি ধর্মোৎসাহী ব্যক্তিগণ এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সঙ্কট সময়ে কত নিন্দা ও নিপীড়ন সহ্য করিয়া তাঁহারাই ব্রাহ্মধর্মের স্বর্গীয় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছিলেন। বর্ণিত সময়ে জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রত্নমণি গুপ্ত মহাশয় ব্রাহ্ম-সমাজের একজন উৎসাহী সভ্য ও নিয়মিত উপাসক ছিলেন। তিনি প্রায় ২০ বৎসর কাল এখানকার সমাজের সভ্য ছিলেন এবং সর্বদাই ব্রাহ্মসমাজের সকল শুভ কার্যে সহায়তা করিতেন। গিরিশবাবু যখন ঐ স্কুলে পণ্ডিত ছিলেন, তখন তিনিও বহু বিষয়ে রত্নমণিবাবুর সহায়তা পাইয়াছেন, তখনও রত্নমণিবাবুকে সমাজের বার্ষিক সভায় সভাপতি হইতে দেখিয়াছি। উপাধ্যায় মহাশয় গৃহ-বিচ্ছেদের পূর্বে বহুবার এখানে আসিয়াছেন, তিনি কি রত্নমণিবাবুকে জানেন না? তবে "তিনি কোন যুগে কখন কখন সখ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন" এরূপ অযথার্থ উক্তি আচার্যজীবনীতে কেন স্থান পাইল? আর ত কোন "পরিণত বয়স্ক হিন্দু" ব্রাহ্ম সাজিয়া আচার্যদেবকে অপমানিত করিতে আসেন নাই। যাঁহারা বরাবর সভ্য ছিলেন তাঁহারাই সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনানুষ্ঠানিক সভ্যগণ অতিশয় সঙ্কুচিত-ভাবে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ রক্ষার জন্য আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়া-ছিলেন মাত্র। আর কোন কার্যেই তাঁহারা অগ্রবর্তিতা গ্রহণ করেন নাই।*

* বাবু আনন্দ নাথ ঘোষ বহুকাল সপরিবারে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। গোপীবাবু কালীকুমারবাবু ও আনন্দবাবু এই তিন জনই তৎকালে পদস্থ আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আমাদের মিলিত অবস্থায় তিনি সময়ে সময়ে সমাজে উপাচার্যের কার্যও করিতেন। উপাধ্যায় মহাশয় এবং গিরিশবাবুও ইঁহাকে এক পরিবারভুক্তের ন্যায়ই ব্যবহার

(৪)

উক্ত স্মৃতিলিপিতে লিখিত হইয়াছে, "ময়মনসিংহের মন্দিরের অধিকার প্রাপ্তির জন্য তত্রত্য প্রতিবাদকারিগণ দলবদ্ধ হইয়া একদিন উপাসনার সময় বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিলেন। তখন সেই সমাজের উপাচার্য ও সম্পাদক পুলিশের সাহায্যে মন্দিরে শান্তি রক্ষা করেন।"

এখানে মন্দির লইয়া যে বিরোধ হয় আমরা যথাস্থানে তাহার বিবরণ লিখিয়াছি। কুচবিহার বিবাহ সময়ে কালীকুমারবাবু পশ্চিমে ছিলেন; নানা কারণে গোপীবাবু সামাজিক কার্যে কোন হস্তক্ষেপ করিতেন না। সমাজের যাবতীয় কার্যভার আমাদের হস্তেই ছিল। বিরোধের দিনেও মন্দিরের চাবি আমাদের হস্তেই ছিল। সুতরাং "মন্দিরের অধিকার প্রাপ্তির জন্য" আমাদের কিছুই করিতে হয় নাই। কালীকুমারবাবু ও গোপীবাবু মনে করিয়াছিলেন তাঁহারা দুই জনে সকলের বিপক্ষে মন্দির অধিকার করিয়া থাকিতে পারিবেন না, সেই আশঙ্কাতে পূর্বেই মন্দিরদ্বারে পুলিশ নিয়োজিত করিয়াছিলেন; যাঁহাদের হস্তে মন্দিরের কার্যভার ছিল তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন যে মন্দিরে আর তাঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই—তাঁহারা মনের আক্ষেপে দুই একটী কথা বলিয়া উপাসনা আরম্ভের পূর্বেই চলিয়া আসিলেন। সুতরাং "প্রতিবাদকারিগণ একদিন উপাসনার সময়ে বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিলেন" এ কথা সম্পূর্ণ কল্পিত। যাঁহারা সেদিন উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৺শশিচন্দ্র রায় ও বাবু অমরচন্দ্র দত্তের লেখা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। এস্থলে আর দুই খানি চিঠি প্রকাশ করিলাম; ইঁহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং এক্ষণ নববিধান সমাজভুক্ত।

"মহাশয়, ১৫ই রবিবার সন্ধ্যার পূর্বেই আমি ব্রহ্মমন্দিরে উপনীত হইলাম। সেখানে যথাসময়ে ব্রাহ্মগণ ও দর্শকমণ্ডলী সমুপস্থিত হইলেন। পুলিশ-

---

করিতেন। প্রতিবাদ সময়ে তিনি আমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পরে তাঁহার জীবনের পরিবর্তন হয়, তিনি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করেন। এরূপ ঘটনা ত পূর্বাপর ব্রাহ্মসমাজে অনেক ঘটিয়াছে। তিনি প্রতিবাদকারী ছিলেন বলিয়াই এই দুঃখজনক ঘটনার কথা উক্ত স্মৃতিলিপিতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, "ময়মনসিংহের আর একজন বয়স্থ ঘোর অত্যাচারী প্রতিবাদকারী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দুমতে পুনর্বার বিবাহ করিয়াছিলেন এখন আর ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।"

কর্ম্মচারিগণ ইতিপূর্ব্বেই মন্দির প্রাঙ্গনে সমুপস্থিত ছিলেন; দিবাভাগেই কনেষ্টবলগণ মন্দির রক্ষা করিবার জন্য প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বার উন্মুক্ত করিলে পুলিশ কর্ম্মচারিগণ বলিলেন, আপনারা যে কেহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব রবিবারের ন্যায় কালীকুমারবাবু মহাশয়ের উপাসনায় যোগদান করিতে পারেন, কিন্তু যিনি উক্ত কার্য্যে বাধা জন্মাইবেন, তাঁহাকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিব না। প্রতিবাদকারিগণ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া নীরবে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন. এবং বাবু অমর চন্দ্র দত্ত মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া একটী উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া সদলে ব্রাহ্মবাসায় চলিয়া আসিলেন। সেখানে তাৎপূর্ব্বেই চন্দ্রাতপতলে উপাসনার স্থান করা হইয়াছিল। আমি ব্রহ্মমন্দিরে যাইবার সময়েও উপাসনার স্থান দেখিয়া গিয়াছিলাম। আমি সে দিন মন্দিরেই উপাসনা করিয়াছিলাম।

৯ই এপ্রিল। ১৯১১ } নিবেদক
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

"শ্রীচরণকমলেষু—

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের গোলযোগের সময় মন্দিরে কিরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমাকে লিখিয়া জানাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন হইয়া পড়াতে স্মৃতিশক্তিও অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনাই আমি জানিতাম, কিন্তু এখন অতি অল্পই স্মরণ হইতেছে।

"ব্রাহ্মবাসায় ব্রাহ্মগণ সমবেত হইলে পরামর্শ হইল যে কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদ করা না হয়। ব্রাহ্মগণ দলবদ্ধ হইয়া মন্দিরে রওয়ানা হইলেন। মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পুলিশ সব-ইন্‌স্পেক্‌টর ও কনেষ্টবল-সহ বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয় মন্দিরের দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বরাবর যে প্রকার মন্দিরের দরজা খুলিতেন, সেই প্রকারই দরজা খুলিয়া দিলেন, দরজা খুলিবামাত্র সব-ইনস্পেকটর বলিলেন, বরাবর যে প্রকার উপাসনা হইয়া থাকে এবং যিনি উপাসনা করিয়া থাকেন, তিনিই করিবেন, ইহার অন্যথা হইতে পারিবেক না। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মগণ একান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। এই সময়ে বাবু অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয়

সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলিয়া সদলে চলিয়া আসিলেন, এবং ব্রাহ্মবাসায় উপাসনার ঘরে উপাসনা করিলেন। প্রণত

শ্রীবিহারীকান্ত চন্দ
১৯ এ ফাল্গুন। ১৩১৫।”

পূর্বে উক্ত হইয়াছে শাখাসমাজের সভ্যগণ প্রায় সকলেই প্রতিবাদকারিগণের দলভুক্ত হইয়াছিলেন। এইক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত আমার প্রিয়তম ছাত্র শ্রীমান গগনচন্দ্র হোম তখন শাখাসমাজের অগ্রগণ্য সভ্য ও সঙ্গতের সম্পাদক ছিলেন। মন্দিরের ঘটনা সম্বন্ধে তিনি আমাকে যে বিবরণ লিখিয়া দিয়াছেন, নিম্নে তাহাও গ্রহণ করিলাম।—

“বাবু কালীকুমার বসু মহাশয় তৎকালে মূল-সমাজের আচার্য ছিলেন। কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদকারিগণ সভা করিয়া তাঁহার স্থানে বাবু আনন্দনাথ ঘোষ মহাশয়কে আচার্য মনোনীত করিলেন। তখন ময়মনসিংহ সহরে বাবু গোপীকৃষ্ণ সেনের প্রবল প্রভাব ছিল; তিনি স্বীয় দলের সংখ্যার অল্পতা দেখিয়া নৈতিক বলের পরিবর্তে পার্থিব শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা শ্রেয় মনে করিলেন। রবিবার প্রাতঃকালে আমরা নির্বিবাদে ব্রহ্মমন্দিরে শাখাসমাজের উপাসনা করিয়া আসিলাম। অপরাহ্নে জানিতে পারা গেল, গোপীবাবুরা পুলিশের সাহায্যে প্রতিবাদকারীদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিবেন না। বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট মন্দিরের চাবি থাকিত, তিনি উপাসনার আয়োজনাদি করিতেন, সেদিনও আদিনাথবাবু চাবি হস্তে মন্দিরের দ্বারে উপনীত হইলেন। অমরবাবু ও আমি তাঁহার অনুগামী হইলাম। আমরা যাইয়া দেখি পুলিশ কনেষ্টবলসহ গোপীবাবু ও কালীকুমার বাবু মন্দিরের দ্বারে দণ্ডায়মান। আদিনাথবাবু মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করা মাত্র তাঁহার হস্ত হইতে চাবি কাড়িয়া লওয়া হইল। আমাদের কাহাকেও মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া বাবু অমরচন্দ্র দত্ত প্রাণের আবেগে কুচবিহার বিবাহ সমর্থনকারীদিগের আচরণের প্রতিবাদ করিয়া একটী অতি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। তৎপর আমরা ব্রাহ্ম বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলাম।

শ্রীগগনচন্দ্র হোম
গিরিডি, ২৭ মে ১৯১১।”

মোকদ্দমার পরিণাম

প্রায় একবৎসর কাল এই মোকদ্দমা চলিয়াছিল। সে দুঃখ কাহিনী সবিস্তারে বলিবার ইচ্ছা নাই; বিবাদিগণ বহুবিধ বাধার আপত্তি তুলিয়া এই মোকদ্দমা উড়াইয়া দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কালীকুমার বাবুই আমাদের মানিত প্রধান সাক্ষী; কয়েকদিন পর্যন্ত তাঁহার "জবানবন্দি" গ্রহণ করা হয়। উকীলদিগের কুট প্রশ্নে তিনি অটল অচল রহিলেন, আমাদের উকীলগণই "হয়রাণ" হইয়া পড়িলেন। শেষ দিন আমি উপস্থিত ছিলাম। বাদিগণ যে সমাজের নিয়মানুসারে "সভ্য" নহেন, কালীকুমার বাবু এইকথা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। আমাদের কেহ বা নিয়মিত চাঁদা দেন নাই, কেহ রীতিমত সমাজে আসেন নাই, কেহ বা আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নহেন ইত্যাদি দোষ দেখাইয়া আমাদের মন্দিরে অধিকার নাই, বলিতেছিলেন। এমন সময়ে আমাদের উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি ও গোপীবাবু যেমন "ব্রাহ্ম" এবং ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, বাবু আনন্দনাথ ঘোষ, শ্রীনাথ চন্দ, শরচ্চন্দ্র রায়, অমরচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রমোহন বিশ্বাস, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বিহারীকান্ত চন্দকে সেইরূপ "ব্রাহ্ম" ও সমাজের "সভ্য" বলিয়া স্বীকার ও ব্যবহার করিয়াছেন কিনা?" এই প্রশ্ন শুনিয়া কালীকুমারবাবু একটু স্তাম্ভত হইলেন; পূর্বস্মৃতি যেন তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল। তখন তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, হাঁ, আমি ও গোপীবাবু যেমন ব্রাহ্ম ও সমাজের সভ্য, উঁহারাও ঠিক তেমান ব্রাহ্ম ও ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য। এই কথা বলিতে তাঁহার কণ্ঠ কম্পিত হইল, চক্ষু যেন আর্দ্র হইল; আমি তাড়াতাড়ি আদালত হইতে বাহির হইয়া গেলাম। শুনিলাম, এই কথার পর সুবিজ্ঞ সবজজ বাবু এই মোকদ্দমায় আর কোন সাক্ষী ডাকিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াছিলেন।

এই মোকদ্দমায় কয়েকদিন ধরিয়া উকীলদিগের বক্তৃতা হইয়াছিল। একাদন তৎকালের প্রসিদ্ধ সরকারী উকীল অমায়িক ও উদারপ্রকৃতি বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় বিবাদীপক্ষে বক্তৃতা করিতেছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্যই যে অধিকাংশের মতে নির্বাহ হয়, সভামাত্রেরই যে এই রীতি এবং ইহা ভিন্ন যে কোনরূপ সম্মিলিত দলের কার্যই চলিতে পারে না, বিবিধ হেতু যুক্তি ও নজিরাদি দেখাইয়া এই কথার সমর্থন করিতেছিলেন; পূর্ণবাবু

বলিতে বলিতে যেন আত্মহারা হইয়াছিলেন, তিনি কোন্ পক্ষের উকীল সে কথা আর স্মরণ ছিল না। সবজজ বাবু মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন; যখন কথা খুব জমিয়া উঠিল, তখন হাকিম উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, আপনি কোন্ পক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন? আমাদের উকীল বলিয়া উঠিলেন, উনি সত্যের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। তখন আদালতে মহাহাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। পূর্ণ বাবু তাড়াতাড়ি নজিরের বইগুলি কক্ষে লইয়া সেই বিশাল দেহ দোলাইতে দোলাইতে "এজলাস" পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

যাহা হউক বহুদিন পরে এই মোকদ্দমার পরিসমাপ্তি হইল। আমরা "তরমিম ডিগ্রী" পাইলাম; অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই এই ব্রহ্মমন্দিরে ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় সম্পত্তিতে তুল্য অধিকার বলিয়া নির্ধারিত হইল। এই অপ্রীতিকর মোকদ্দমায় এবং ধর্মবন্ধুদিগের সহিত বিচ্ছেদ হওয়াতে আমাদের সকলেরই মন এরূপ পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, মোকদ্দমায় "ডিগ্রী" পাইয়াও আমরা প্রায় তিন বৎসর কাল মন্দিরের অধিকার গ্রহণ করি নাই। যখন "ডিগ্রীর" মেয়াদ উত্তীর্ণ হইতে চলিল, তখন অগত্যা আদালতের সাহায্যে মন্দিরের অধিকার লইতে বাধ্য হইলাম। সে বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

বিচ্ছেদের তিন বৎসর

১৮৭৮ সাল কুচবিহার বিবাহ সংগ্রামে গত হইল; ১৮৭৯ সাল আমাদের মন্দিরের মোকদ্দমার হাঙ্গামায় অতীত হইয়া গেল। ১৮৮০ হইতে তিন বৎসর কাল আমরা মন্দিরচ্যুত অবস্থায় নিরাশ্রয়ে যাপন করিলাম। এই সময়ের প্রধান প্রধান কয়েকটী ঘটনা এস্থলে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ব্রাহ্মবাসা—১৮৭৮ সালের আশ্বিন মাসে বাবু চন্দ্রমোহন বিশ্বাস ব্রাহ্ম-বাসায় সপরিবারে বাস করিতে আরম্ভ করেন; আমাদের পারিবারিক উপাসনা-গৃহ বাহিরে তুলিয়া লওয়া হয়, সেই স্থানে চন্দ্রমোহনবাবুর গৃহ নির্মিত হয়। বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিয়া যান, ঢাকা হইতে আগত বাবু গোবিন্দবন্ধু গাঙ্গুলি ব্রাহ্মবাসায় আনন্দবাবুর গৃহে স্থান প্রাপ্ত হন। গোবিন্দবন্ধু বিক্রমপুরের সোহাগদল গ্রাম নিবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ যুবা, ইঁহার বিধবা মাতা, পত্নী ও দুইটী কুমারী ভগিনী ছিলেন। কৌলীন্য

প্রথানুসারে ভগিনীদিগের বিবাহের ঘর ছিল না ; বহুবিবাহকারী পাত্রের হস্তে উহাদিগকে সম্প্রদান করিতে হইত। বিধবা মাতা তদীয় ভ্রাতা পণ্ডিত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের এবং ঢাকার প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম ৺নবকান্তবাবুর সহায়তাতে পুত্র, পুত্রবধূ ও কুমারী কন্যাদ্বয় সহ ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গোবিন্দবন্ধু কিছুদিন কলিকাতায় ব্রাহ্মনিকেতনে বাস করিয়াছিলেন ; তৎপর এখানকার ব্রাহ্মদের সহায়তায় কালেক্টরীতে একটী কর্ম প্রাপ্ত হইয়া সস্ত্রীক ময়মনসিংহে আগমন করেন। মাতৃদেবী কন্যাদ্বয় সহ ঢাকার আশ্রমে অবস্থিতি করেন। কিছুকাল পরে জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ সেন মহাশয়ের এবং কনিষ্ঠার সহিত কালীকচ্ছ নিবাসী বাবু কৈলাস চন্দ্র নন্দীর পরিণয় হয়।

আমাদের সামাজিক উপাসনা, সঙ্গতসভা, শাখাসমাজ ও উৎসবাদির সকল কার্যই ব্রাহ্মবাসায় সম্পন্ন হইত। বাহিরের আঙ্গিনায় চন্দ্রাতপ তলে মাঘোৎসব হইত। তখন লোকে লোকারণ্য হইত। শাখাসমাজের উৎসব আষাঢ় মাসে, তখন আর বাহিরে স্থান করা সম্ভব হইত না, সুতরাং তখন এই ক্ষুদ্র গৃহেই কার্য নির্বাহ করিতে হইত ; ছাত্রমণ্ডলীতে গৃহ একবারে পূর্ণ হইয়া যাইত। অনেকেই বারেন্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন। ফলতঃ এই সময়ে ব্রাহ্মছাত্র ও যুবকগণের বিশেষ সহকারিতা লাভ করিয়াই আমরা সেই ঘোর আন্দোলন ও অগ্নিপরীক্ষার মধ্যেও দুর্বল বা শক্তিহীন হইয়া পড়ি নাই।*

* আমার প্রিয়তম ছাত্র শ্রীমান গগনচন্দ্র হোম, তৎকালের যে বিবরণ লিখিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নলিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি :

"কুচবিহার বিবাহ আন্দোলনে মূল সমাজের সভ্যদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাব ও মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল বটে, উভয় দলের ব্রাহ্মগণই আত্মকলহে ক্ষীণবল ও প্রভাবহীন হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু শাখা-সমাজের সভ্যদের মধ্যে ধর্মোৎসাহ, সদ্ভাব ও সম্প্রীতির কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই। ছাত্রমহলে বাবু শ্রীনাথচন্দ ও শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রভাব হ্রাস পায় নাই। আমি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসি। আমি যতদিন ময়মনসিংহে ছিলাম, ততদিন শাখা সমাজের সুখময় দিনই দেখিয়া আসিয়াছি। সেই সময়ের স্মৃতি এখনও নিরাশার মধ্যে আশার সঞ্চার করে, নিরানন্দের সময়ে আনন্দ দান করে। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে যে ধর্মভাব ও উৎসাহ লাভ করিয়াছিলাম, তাহার বল এখনও জীবনে অনুভব করিতেছি। ময়মনসিংহে যাঁহাদের সহিত ব্রাহ্মসমাজে যুক্ত হইয়াছিলাম, তাঁহাদের সুমধুর স্মৃতি চিরদিন জীবনে জড়িত হইয়া রহিয়াছে।"

নশিরাবাদ এন্‌ট্রান্স স্কুল—সুপরিচিত গ্রন্থকার বাবু শরৎচন্দ্র চৌধুরী এখানে একটি মাইনর স্কুল স্থাপন করেন। কবিবর দীনেশ চরণ বসু উহার হেডমাষ্টার ছিলেন; তিনি তৎকালে ভারতমিহির পত্রেরও সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এই স্কুল পরিচালনার জন্য একটী কমিটি ছিল, বাবু কালীকুমার বসু মহাশয় তাহার সম্পাদক ছিলেন। আমাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর কালীকুমারবাবুই এই স্কুলের কর্তৃত্ব লাভ করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা কাগমারির জমিদার ৺দ্বারকানাথ চৌধুরী মহাশয় এই স্কুলের সহায়তা করিতেন। কেহ কেহ বলেন, এই স্কুলটীকে "দ্বাকানাথ স্কুল" করিবার জন্য কালীকুমারবাবুর ইচ্ছা হইয়াছিল, শরৎবাবু তাহার বিরোধী হওয়াতে কালীকুমারবাবুর সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়; তখন কালীকুমার বাবু এই স্কুলটীকে এন্‌ট্রান্স স্কুলে পরিণত করেন, শরৎবাবুর সহিত স্কুলের সম্পর্ক রহিত হইয়া যায়। বাবু চন্দ্রকিশোর তরফদার বি, এ, এই স্কুলের হেডমাষ্টার এবং সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন হেডপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই স্কুল ব্যাপার লইয়াও তৎকালে এখানে অনেক আন্দোলন ও দলাদলি হইয়াছিল।

সঞ্জীবনী পত্রিকা—ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন সম্বন্ধে স্থানীয় সংবাদপত্র ভারতমিহির নিরপেক্ষ থাকিবেন ঘোষণা করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্যত তাহা হইত না। ভারতমিহিরের যিনি নেতা, তিনি নানা কারণে নব্য ব্রাহ্মদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। ওদিকে নশিরাবাদ স্কুলের লোকেরা জেলা স্কুল সম্বন্ধে নানারূপ অযথা নিন্দাবাদ ঘোষণা করিতেন; উক্ত স্কুলের শিক্ষক দীনেশবাবু ভারতমিহিরের সহকারী সম্পাদক থাকাতে তাঁহাদের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। এই সকল কারণে এখানে একখানি স্বতন্ত্র সংবাদপত্র প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়াছিল। আমার প্রতিই উহার সম্পাদকীয় ভার অর্পিত হইয়াছিল। বাবু শরৎচন্দ্র রায়, অমরচন্দ্র দত্ত, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, গগনচন্দ্র হোম প্রভৃতি যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। আমাদের সকল কার্যের চিরসহায় শ্রীযুক্ত রত্নমণি গুপ্ত মহাশয় এই কার্যের জন্য মাসিক ১০৲ টাকা অর্থ সাহায্য করিতেন; জেলাস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু কালীকুমার গুহ মহাশয় এই পত্রের নাম "সঞ্জীবনী" রাখিয়াছিলেন। দুই বৎসর কাল এই পত্র জীবিত ছিল; ইহা দ্বারা স্থানীয় অনেক অভাব

বিমোচিত হইয়াছিল। ইহার ২।৩ বৎসর পরে আমার প্রিয় সুহৃদ কৃষ্ণকুমার মিত্রের প্রধান উদ্যোগে কলিকাতায় সঞ্জীবনী নামে প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। অবশ্য কেবল নাম ভিন্ন পুরাতন সঞ্জীবনীর সহিত উহার অন্য কোন সম্বন্ধ ছিল না।

ঘোষ লাইব্রেরী—এই সময়ে আমার বাল্যসুহৃদ বাবু কালীকৃষ্ণ ঘোষ কলেজ পরিত্যাগ করিয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন জেলা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছাত্র জীবন হইতেই ব্রাহ্মধর্মানুরাগী, সমাজের নিয়মিত উপাসক এবং বিবিধ সৎকার্যে উৎসাহী ছিলেন। এই সময়ে তিনি ঘোষ লাইব্রেরী নাম দিয়া একটী পুস্তকের দোকান খুলিলেন, ইহাই ময়মনসিংহে প্রথম পুস্তকালয়। ব্রাহ্মদোকানের ন্যায় ইহাও ছাত্রগণের একটী মিলন ক্ষেত্র হইয়াছিল। ছাত্রদিগের মধ্যে রাজনীতি, ধর্মনীতি ও সুশিক্ষা বিস্তার পক্ষে এই লাইব্রেরী বহু সহায়তা করিয়াছিল। ১৮৭৪ সালে মহাত্মা আনন্দমোহন বসু কেম্ব্রিজ ও অক্স্ফোর্ডের অনুকরণে কলিকাতা নগরে "ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন" নাম দিয়া একটী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। ছাত্র জীবনে স্বদেশপ্রেম ও নীতিপরতা সঞ্চারিত করাই উহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কালীকৃষ্ণবাবুর উদ্যোগে ময়মনসিংহেও ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশনের একটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল। বাবু অমরচন্দ্র দত্ত এই বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। এই সভা কয়েক বৎসর জীবিত থাকিয়া ছাত্র সমাজের যথেষ্ট হিত সাধন করিয়াছিল। স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণকর কার্যে যে ছাত্রদিগের কর্তব্য আছে, এই সময়ে সে ভাবটি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ময়মনসিংহ সভা—কলিকাতার ভারত সভার দৃষ্টান্তে এখানকার শিক্ষিতগণ এই রাজনৈতিক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৭ সালের ২০ শে আগষ্ট তারিখে এই সভার প্রথম অধিবেশন হয়। বাবু অনাথবন্ধু গুহ, জানকীনাথ ঘটক, কালীনারায়ণ সান্যাল, দীনেশচরণ বসু, কালীকৃষ্ণ ঘোষ ও মৌলবী হামিদ উদ্দীন আহাম্মদ প্রভৃতি এই সভার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন; আমরা অনেকেই প্রথম সময়ে এই সভায় যুক্ত হইয়াছিলাম। এই সভা বহুদিন জীবিত থাকিয়া এ জেলার রাজনৈতিকক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্য করিয়াছিল। এ জেলায় রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ময়মনসিংহ সভার কার্য বিশেষ স্মরণীয়।

সারস্বত সমিতি—১৮৭৮ সালের মাঘ মাসে একদিন আমরা কতিপয় বন্ধু স্থানীয় সুশিক্ষিত জমিদার কেশববাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, এখন ত আমাদের এখানে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসমাজ আছে, রাজনৈতিক সভাও আছে; কিন্তু যাহাতে সকল শ্রেণীর লোকেই নিরাপত্তিতে যোগ দিয়া জ্ঞান ও আনন্দলাভ করিতে পারেন, এমন কোন সমিতি নাই। অনেকক্ষণ আলোচনার পর স্থির হইল, বসন্তপঞ্চমী দিনে সকল প্রকার বিদ্যার উৎসাহ উদ্দেশ্যে শিক্ষিতগণ মিলিত হইবেন। নিকটবর্তী সরস্বতীপূজার অবকাশ দিনেই এই সমিতির প্রথম অধিবেশন হইবে। দুই তিন দিনের আয়োজনে ১৮৭৮ সালের মাঘ মাসে বসন্ত-পঞ্চমী দিনে সরস্বতীর লীলাক্ষেত্র বালিকা বিদ্যালয়ের একটী প্রকোষ্ঠে "সারস্বত-সমিতির" প্রথম অধিবেশন হইল। দুইটী সঙ্গীত হইল, কেশববাবু সভাপতিরূপে সকলকে পান ও আতর বিতরণ করিলেন, আমি বঙ্গদর্শন হইতে "ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা" নামক প্রসিদ্ধ কবিতাটী পাঠ করিলাম। কালীকৃষ্ণবাবু কিছু বলিলেন, আর ময়মনসিংহের পুরাতন অধিবাসী ডাক্তার বরদাকান্ত বসু মহাশয় কয়েকটী রাসায়নিক প্রক্রিয়া দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিলেন। তৎপর আমরা সকল বান্ধবে মিলিয়া "বসন্তে ভ্রমণং-কুর্য্যাৎ" এই বাক্য সার্থক করিলাম। কয়েক বৎসর মধ্যে এই সমিতি ক্রমে বিপুল কলেবর ধারণ করিয়া ময়মনসিংহের কৃষি, শিল্প ও সর্ববিধ বিদ্যার উৎসাহ দান করিয়াছিল এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর শিক্ষিত ও শিক্ষার্থীগণের মিলনক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। যথাস্থলে তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

ছাত্রসমাজের অবস্থা—পূর্বে বলিয়াছি, এই সঙ্কট সময়ে ছাত্রসমাজই আমাদের প্রধান বল ও সহায় হইয়াছিল। আমার প্রিয় ছাত্র ধর্মোৎসাহী শ্রীমান রমণীকান্ত চন্দ ব্যতীত ব্রাহ্মধর্মানুরাগী প্রায় সমস্ত ছাত্রই আমাদের দলভুক্ত হইয়াছিলেন। আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান গগনচন্দ্র হোম তখন ছাত্রসমাজের উৎসাহী সভ্য ছিলেন; তিনি তাঁহার স্মৃতিলিপিতে তখনকার ছাত্রমণ্ডলীর অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবরণ লিখিয়া দিয়াছেন, এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত হইল।

"জেলা স্কুলের তৎকালীন শিক্ষকগণের মধ্যে প্রধান শিক্ষক বাবু রত্নমণি-

গুপ্ত, ২য় শিক্ষক বাবু কালীকুমার গুহ, ৩য় শিক্ষক বাবু মহিমচন্দ্র বসু এবং ২য় পণ্ডিত বাবু শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়গণ ব্রাহ্ম ছাত্রদের প্রধান সহায় ছিলেন। তাঁহাদের শিক্ষাদান ও চরিত্র প্রভাবে ছাত্র মণ্ডলীর মধ্যে নীতি ও ধর্মভাবের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বাবু শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় আমাদের সময়ে চতুর্থ-শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ও সংস্কৃত পড়াইতেন। অধ্যাপনকালে তিনি কখনও ব্রাহ্মধর্মের কোনও প্রসঙ্গ করিতেন না ; কিন্তু তিনি যে সকল পাঠ্য পুস্তক পড়াইতেন, তল্লিখিত নীতি ও উপদেশ অবলম্বনে বিশ্বজনীন ধর্মের সার্বজনীন ভাব এরূপে বিবৃত করিতেন যে, তাহাতে ছাত্রদিগের মনে ব্রাহ্মধর্মের সরল সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইত। তাঁহার শিক্ষা ও চরিত্র প্রভাবে আমরা অনেকে এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তন্মধ্যে বাবু নবকুমার সমাদ্দার, শশিকুমার বসু, অশ্বিনীকুমার গুহ, রোহিণীকুমার গুহ, উমেশচন্দ্র-ঘোষ, শ্রীনাথ ঘোষ, গুরুদাস চক্রবর্তী, শ্যামাচরণ দে, মথুরানাথ নন্দী, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণাচরণ নন্দী, গোবিন্দনাথ গুহ প্রভৃতির নাম স্মরণ হইতেছে। বস্তুত তখন জেলা স্কুলের প্রথম শ্রেণী হইতে নিম্নতম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীর খ্যাতনামা ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্যে ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন, কেহ কেহ বা অভিভাবকগণের ভয়ে প্রকাশ্যে যোগ না দিলেও ব্রাহ্মধর্মের সবিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন। শেষোক্তগণের মধ্যে বাবু গগনচন্দ্র দাস, মহেশ্বর চক্রবর্তী, তারিণীচরণ নন্দী, বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য।

"তখনকার ছাত্র মহলে পরলোকগত শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয়ের স্নেহশীল উদার হৃদয়ের প্রভাব বিশেষ রূপে কার্য করিয়াছিল। শরৎবাবু দূরবর্তী সম্পর্কে আমার পূজনীয়া মাতৃদেবীর খুড়া মহাশয় হইতেন, এজন্য আমি তাঁহাকে "দাদামহাশয়" বলিয়া ডাকিতাম। সেই সূত্রেই তিনি ছাত্রগণের "দাদামহাশয়" হইয়াছিলেন। তাহার ন্যায় ছাত্রবন্ধু আমি আর দেখি নাই। ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশ্যে যোগদান জন্য যখন আমি স্বজনকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া-ছিলাম, তখন তিনিই আমাকে বস্ত্রহীন দেখিয়া বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন এবং জেলাস্কুলের হেডমাষ্টার পিতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত রত্নমণি গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে আশ্রয় দিয়া আমার শিক্ষা লাভ ও জীবনধারণের সদুপায় করিয়া দিয়া-ছিলেন। জীবনে তাঁহার ন্যায় অকৃত্রিম আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ী গুরুজন অতি

অন্নই লাভ করিয়াছি। স্বজনকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে তাঁহার ব্রাহ্মদোকানই আমাদের অনেকের আপনার গৃহ হইয়াছিল। কোন দিন কোন ভাল দ্রব্য থাকিলে তিনি স্কুলে সংবাদ দিতেন এবং আমাদিগকে আহার করাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন। তিনি অবসর পাইলেই তাঁহার প্রিয় ছাত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম ও দেশহিতৈষণা সম্বন্ধে আলোচনাদি করিতেন। তিনি চালান লইয়া কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে ছাত্র মহলে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া যাইত। কলিকাতা হইতে যে সকল নূতন ভাব ও চিন্তা লইয়া আসিতেন, আমাদিগকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতেন। ফলতঃ তাঁহার বাক্য ও জীবন দ্বারা ছাত্র সমাজে সর্বদাই নব ভাব ও নব আশার সঞ্চার হইত। ছাত্রজীবনের সেই সুখময় স্মৃতি এই প্রৌঢ় বয়সেও হৃদয়ে অপূর্ব ভাবের সঞ্চার করে। আবার সেই সুখের দিন, সেই আনন্দের দিন ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সেই স্নেহাধার দাদামহাশয় আর নাই—তাঁহার সেই কর্মমন্দির "ব্রাহ্মদোকান" আর নাই।"

"শরৎবাবু আমাদিগকে লইয়া একটী দল করিয়াছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে কাহারও গুরুতর পীড়া হইলে তিনি তাঁহার সেই দলসহ যাইয়া রুগ্নের সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইতেন। একবার আমাদের দলস্থ একটী বন্ধু কঠিন জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার অভিভাবক ব্রাহ্মদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না, বরং তিনি আমাদের সঙ্গে মিশিতেন বলিয়া অভিভাবকের বিরাগভাজন ছিলেন; কিন্তু শরৎবাবুর তত্ত্বাবধানে আমরা সেই রুগ্ন বন্ধুর এরূপ সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলাম যে তদবধি সেই অভিভাবক মহাশয় ব্রাহ্ম-দিগের একান্ত অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। আর একবার একটী ছাত্রবন্ধু ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তখন বার্ষিক পরীক্ষার সময়; ওদিকে বন্ধুর জীবন সংশয়! আমাদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক, সুতরাং সকলেরই স্নেহের পাত্র; শরৎবাবু তাঁহার জন্য অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। আমরা ১০।১২ জনে পালা করিয়া রুগ্নের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। দিবসের অধিকাংশ সময়ে "দাদামহাশয়" মাতার ন্যায় রুগ্ন বালকের শিয়রে উপবিষ্ট! মাসাধিক কাল এইরূপ সেবাশুশ্রূষার পর বন্ধু নীরোগ হইলেন। ব্রাহ্ম বলিয়া যাঁহারা আমাদের বিদ্বেষী ছিলেন, এই ঘটনায় তাঁহাদের মনের ভাব একবারে পরিবর্তিত হইয়া গেল! অতঃপর

সহরে ওলাউঠা আরম্ভ হইলেই অনেক গৃহে "দাদামহাশয়" ও তাঁহার দলের আহ্বান হইত। ফলত তৎকালে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ্র এবং স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় এই দুই জনেই ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরে এবং জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সত্যের অনুরোধে একথা বলা প্রয়োজন যে, সেই সময়ে জেলাস্কুলের তিন জন উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষকই ব্রাহ্মসমাজের সভ্য এবং ব্রাহ্মদের সকল কার্যে উৎসাহদাতা ছিলেন বলিয়াই শ্রীনাথবাবুর ছাত্রমণ্ডলে প্রভাব বিস্তার করিতে বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা ঘটিয়াছিল; এবং তজ্জন্যই ব্রাহ্ম ছাত্রেরাও অন্য ছাত্রদের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।"

সঙ্গত সভা—মূল সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, মূল সঙ্গতের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া গেল; কিন্তু শাখাসমাজের উপাসনা ও সঙ্গতের আলোচনা যথারীতি উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল। শাখা সঙ্গতের কিঞ্চিৎ বর্ণনা শ্রীমান গগনের লেখা হইতেই গ্রহণ করিলাম। "আমাদের সঙ্গত সভায় যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইত, সাধারণত শ্রীনাথ বাবুই তাহার সমাধান করিতেন। প্রচারক মহাশয়েরা কেহ আগমন করিলে তিনিই সঙ্গতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্মের জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম ও সদাচার প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেন। সঙ্গতে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইত, আমরা জীবনে তাহা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিতাম। আমি যখন ঘনিষ্ঠভাবে সমাজের সহিত সংসৃষ্ট হইলাম, তখন সঙ্গতের সম্পাদকের কার্যভার আমার প্রতি অর্পিত হইল। আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া পরবর্তী সভাতে পঠিত হইত। সভ্যগণ সপ্তাহ মধ্যে কে কি পরিমাণে আলোচ্য বিষয়ের সাধনা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গতে ব্যক্ত করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে বাবু নবকুমার সমাদ্দার, গুরুদাস চক্রবর্তী এবং আমি কয়েক বৎসর একত্রে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রত্নমণি গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় পাইয়াছিলাম, তাহাতেই আমরা পরস্পরের সহায়তায় সঙ্গতের আদর্শানুরূপ জীবন লাভ করিতে বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলাম। যখন আমরা গ্রীষ্ম ও পূজার বন্ধে বাড়ী যাইতাম; তখন গৃহে যাইয়া কি ভাবে বিশ্বাসানুযায়ী জীবন যাপন করিতে পারি, সঙ্গতে তাহার আলোচনা হইত; এবং সেদিন বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনা হইত। তখন পণ্ডিত মহাশয় (শ্রীনাথবাবু) আমাদিগকে

দুইটী সঙ্গীত সর্বদা স্মরণ রাখিতে উপদেশ দিতেন ; তাহার একটী "তাঁহারি শরণ লয়ে রহিও" অপরটী "যদি দয়া করে এনেছ হে ধরে, আমায় ছেড় না হে পতিতপাবন" ইত্যাদি। আহা, তখন ব্রাহ্মসমাজের কি সৌভাগ্যের দিনই ছিল! তখনকার ব্রহ্মোপাসকগণের মধ্যে কি ধর্মানুরাগ, কি সৌহার্দ, কি স্বার্থত্যাগ, কি পরার্থপরতাই না দেখিয়াছি!"

নববিধান

যে বৎসর কুচবিহার বিবাহের আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজ আমূল বিকম্পিত হয়, তাহার পর বৎসর মাঘোৎসব সময়ে কেশবচন্দ্র নববিধান ঘোষণা করেন। ব্রাহ্মধর্ম নাম পরিত্যাগ করিয়া "নববিধান" নাম গ্রহণ করাতে দেশমধ্যে আবার এক নূতন আন্দোলন উপস্থিত হইল। এই নাম পরিবর্তন লইয়া উভয় দলে মৌখিক তর্ক এবং সংবাদপত্রাদিতে যথেষ্ট বাগবিতণ্ডা চলিতে লাগিল।

এই বার আষাঢ় মাসে শাখাসমাজের উৎসব সময়ে ভক্তিভাজন বঙ্গচন্দ্র রায় ময়মনসিংহে আগমন করিয়াছিলেন ; তাঁহার সঙ্গে এই বিষয়ে আমার যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা এখানে লিপিবন্ধ করিয়া রাখিলাম।

"নববিধান" কি? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, মহাত্মা রাজা রামমোহন জ্ঞানযোগে ব্রহ্মকে জানিয়া "ব্রহ্মজ্ঞান" প্রচার করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ "হিরণ্ময়ে পরে কোষে" ব্রহ্ম দর্শন করিয়া ব্রহ্মধ্যানে তন্ময় হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ভক্তি যোগে ভগবানকে গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণ ক্রিয়াশীল জীবন্ত ঈশ্বরকে জীবনের ও মানবসমাজের নেতা, আদেশ কর্তা ও পরিচালকরূপে দর্শন করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ বিধাতৃত্ব স্বীকার করিতেছেন ; সুতরাং এখন ব্রাহ্মধর্মে বিধাতার নব নব লীলা প্রকটিত হইতেছে ; তজ্জন্যই ইহার নাম "নববিধান" হইল।

আমি বলিলাম, ব্রাহ্মধর্মের যে বিভিন্ন অবস্থার কথা বলিলেন, তাহা সত্য ; কিন্তু এই ক্রমোন্নত ব্রাহ্মধর্মেরই ক্রমবিকাশের ফল। ক্ষুদ্র বটবীজে যেমন প্রকাণ্ড মহীরুহ লুক্কায়িত থাকে, ক্রমে তাহার বিকাশ হয়, সেইরূপ উন্নতিশীল ব্রাহ্মধর্মেরও ক্রমে বিকাশ হইতেছে, আরও কত হইবে, কিন্তু ইহা চিরকালই ব্রাহ্মধর্ম। যাঁহারা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসক তাঁহারাই ব্রাহ্ম।

কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্মধর্মে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত করিলেন, তখন যেমন ইহার নাম "ভক্তিধর্ম" বা তদ্রূপ অন্য কিছু রাখা আবশ্যক হয় নাই, সেই প্রকার যখন ইহাতে বিধানের প্রকাশ হইয়াছে, তখনই বা ইহার নাম কেন পরিবর্তন করিতে হইবে? ব্রহ্মস্বরূপেই "ব্রাহ্মধর্ম" প্রতিষ্ঠিত; মানবাত্মার উন্নতি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মেরও নব নব বিকাশ হইবে; সুতরাং এই ধর্ম চিরপুরাতন এবং নিত্য নূতন। আমার আশঙ্কা হয়, এই নামের ভিন্নতায় ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান বিচ্ছেদ বা চিরবিচ্ছেদে পরিণত হয়। এমন দিন আসিতে পারে, যখন ব্রাহ্মসমাজের এই সাময়িক বিচ্ছেদ আর থাকিবে না; কিন্তু আমরা যদি ব্রাহ্মধর্ম ও নববিধান নামে পৃথক হইয়া পড়ি, তবে আমাদের উপাসনা এবং অনুষ্ঠানপ্রণালীও ক্রমে পৃথক হইয়া পড়িবে, তখন আর মিলনের সম্ভাবনা থাকিবে না।

অনেক কথা হইল। রায় মহাশয় আমার যুক্তি অস্বীকার করিতে পারিলেন না। কিন্তু বলিলেন, দেখ বর্তমান সময়ে যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে নববিধান নাম গ্রহণ না করিলে আমাদের দল কেশববাবুর নামে পরিচিত হইয়া পড়িত। এখনই ত অনেকে কৈশব সম্প্রদায় বলিতেছে। নববিধান নাম সেই বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিল, ইহাও আমি মঙ্গলজনক মনে করি।

নববিধান ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কেশবচন্দ্র অনেকগুলি নূতন মত ও অনুষ্ঠান প্রবর্তিত করিলেন; যেমন নিশানবরণ, আরতি, হোম, নব নৃত্য ইত্যাদি। মফস্বলেও ঐ সকল মত ও অনুষ্ঠান কিছু কিছু বিকৃত হইয়া প্রচারিত হইতেছিল। সাধারণসমাজভুক্ত ব্রাহ্মগণ ইহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে যে অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, মিস্ কলেটের ইয়ার বুকে তাহা মুদ্রিত আছে; এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া উপস্থিত প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব।

"The members of the Mymensing Brahmo Samaj deeply regret the preaching of [the] superstitious and idolatrous doctrines of the so-called New Dispensation which are regarded by them as quite antagonistic to the true principles of Brahmoism.

অপর পক্ষের অবস্থা

মন্দিরের মোকদ্দমা লইয়া কালীকুমারবাবু প্রায় দুই বৎসর কাল অতিশয় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সহকারিগণের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস হইয়া পড়ে। গোপীবাবু পূর্ব হইতেই ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এইক্ষণে সুযোগ পাইয়া ঢাকায় চলিয়া গেলেন। শ্রদ্ধেয় কালীকুমারবাবুর তৎকালীন অবস্থা স্মরণ করিলে অতিশয় কষ্ট হয়। একে ত চিরজীবনের ধর্মবন্ধু ও পুত্রতুল্য ব্রাহ্ম যুবকদিগের সঙ্গে বিচ্ছেদ, ব্রহ্মমন্দির লইয়া অপ্রীতিকর ঘটনা, এবং স্বদলস্থ লোকদিগের তিরোধান, তদুপরি সাংসারিক ও বৈষয়িক বিষয়ে নানারূপ গুরুতর অগ্নিপরীক্ষা। নশিরাবাদ এনট্রান্স স্কুল উপলক্ষেও অনেকের সহিত মনান্তর ঘটিয়াছিল। এমন সময়ে তাঁহার সকল বিষয়ে প্রধান সহায় প্রিয়তম সহোদর ভ্রাতা কাগমারির প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী পরলোক গমন করিলেন। এই ভ্রাতৃশোক তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিয়াছিল। কেবল তাহা নহে, ভ্রাতৃপত্নী শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী চৌধুরাণীর সঙ্গেও আর তাঁহাদের সদ্ভাব রহিল না। নশিরাবাদ স্কুলে সেই জমিদার সরকারের অর্থব্যয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। যে কিশোরীমোহন বক্সীকে তিনিই ঐ জমিদার সরকারে মোক্তার নিযুক্ত করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন, সেই চিরানুগত ও আশ্রিত ব্যক্তি এখন তাঁহার প্রধান শত্রু হইয়া উঠিল। ঐ ব্যক্তি পাঁচ আনির ম্যানেজার হইয়া কালীকুমারবাবুকে নানারূপে অপদস্থ ও বিড়ম্বিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। এমন কি, যে পাঁচআনির বাসা কালীকুমারবাবুর স্বহস্তে কৃত এবং তাঁহারই জন্য চৌধুরী মহাশয় ঐ বাসায় দালান করিয়া দিয়াছিলেন, সেই বাসা হইতেও তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি নিরুপায় হইয়া একটী ক্ষুদ্র স্থানে তৃণকুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সকল ঘোর সঙ্কট ও অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যেও তিনি বিশ্বাসে অটল থাকিয়া স্বীয় জীবনের ব্রত পালনে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এখানকার নববিধান সমাজ তাঁহারই বিশ্বাস ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

সম্ভবত ১৮৮১ সালে কাগমারী নিবাসী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সেন নোয়াখালি জেলাস্কুল হইতে ময়মনসিংহ জেলাস্কুলে বদলি

হইয়া আসেন। তিনি নববিধান সমাজে যোগদান করিয়া কালীকুমার বাবুর সহকারী রূপে কার্য আরম্ভ করেন। পণ্ডিত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মহিমবাবু দ্বারা পুনরায় মন্দিরে শাখাসমাজের কার্য আরম্ভ হয়। প্রায় তিন বৎসর কাল মন্দিরে প্রাতঃকালে উপাসনা হয় নাই।

নববর্ষের উৎসব ও ধর্ম প্রচার

১৮৮২ সালের ১লা বৈশাখ ব্রাহ্ম দোকানে নববর্ষের উৎসব* প্রথম আরম্ভ হয়। তৎকালে নানা কারণে আমাদের মধ্যে ধর্মের সরস ভাব ও ভ্রাতৃপ্রীতির অভাব হইয়াছিল—এজন্য অনেকের প্রাণে বিলক্ষণ ক্লেশ ছিল। সকলেই একটা বিশেষ পরিবর্তনের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরকৃপায় এই নববর্ষ উৎসবে এক নব ভাবের সঞ্চার হইল। বাবু শরৎচন্দ্র রায় ও অমরচন্দ্র দত্তের বিশেষ উদ্যোগে এই উৎসবের প্রবর্তনা হয়। তদবধি নববর্ষোৎসব আমাদের সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

* আমার প্রিয়তম ছাত্র, ব্রজমোহন কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল শ্রীমান রজনীকান্ত গুহের স্মৃতিলিপি হইতে এই কয়েকটী কথা উদ্ধৃত হইল ;—

"আমি বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ১৮৮২ সালের ২রা জানুয়ারী ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হই। আপনি তখন ঐ স্কুলের ২য় পণ্ডিত ছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে একই সময়ে সারস্বত উৎসব ও মাঘোৎসব সম্পন্ন হয়। সে বার ১২ই মাঘ শ্রীপঞ্চমী ছিল। আমি তখন মাঘোৎসব কাহাকে বলে জানিতাম না। একদিন সন্ধ্যাকালে আমি সারস্বত-ক্ষেত্র হইতে মাঘোৎসবের স্থানে গমন করি। যাইয়া দেখি তথায় আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত গোবিন্দনাথ গুহ এবং অন্যান্য কতিপয় যুবক ছাত্র এবং স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র রায় প্রভৃতি বহুলোক চক্ষু মুদিয়া আছেন। আপনি এক উচ্চ মঞ্চ হইতে কি উপদেশ দিতেছেন। একটী কথা আমার প্রাণস্পর্শ করিল। তাহার মর্ম এই যে, ঈশ্বর আছেন কি না ইহা কেবল মতে বিচার করিলে চলিবে না, তাঁহাকে ডাকিলে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই কথা হইতে আমি উপাসনার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিলাম। বড় দাদা ইহার পূর্বেই ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন, আমার সহাধ্যায়ী মধ্যম দাদাও এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যাইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আমাকে ডাকিলেও আমি যাইতাম না।"

"১৮৮২ সালের ১লা বৈশাখ (আমি তখন ১৪ বৎসরের বালক, ময়মনসিংহে ছাত্রাবাসে বাস করিতাম) প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিলাম, ছাত্রগণ স্নান করিয়া কোথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আমিও স্নান করিয়া তাঁহাদের অনুবর্তী হইলাম, এবং ব্রাহ্ম দোকান গৃহে উপস্থিত হইলাম। সেখানে প্রাতঃ সন্ধ্যায় নববর্ষের উৎসব হইল। যতদূর মনে হয়

এই বৎসর আষাঢ় মাসে শাখাসমাজের উৎসব সময়ে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় এখানে আগমন করেন; মহাসমারোহে উৎসব সম্পন্ন হয়। মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ সৎসাহসী জমিদার মাননীয় অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার ময়মনসিংহস্থ বাসায় রামকুমারবাবু একটি বক্তৃতা করেন। "ধর্মের জন্য জীবন দান" বক্তৃতার বিষয় ছিল। বক্তৃতাস্থলে সহরের সকল শ্রেণীর ভদ্র ও শিক্ষিত লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তার সম্মুখে ল্যাডলী ও লিটিমারের প্রাণদানের ছবি টাঙ্গান ছিল, তিনি উহা দেখাইয়া যখন তাঁহাদের জীবনের লোমহর্ষজনক অপূর্ব কথা বিবৃত করিতেছিলেন, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী ভাবে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেছিলেন। এই উৎসব সময়ে বিদ্যারত্ন মহাশয় আমার প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন, প্রথমার নাম শান্তিলতা, দ্বিতীয়ার নাম পুণ্যলতা রাখা হয়। এই সময়ে জীবনে ও সমাজে শান্তি ও পুণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ সাধনার অবলম্বন করা হয়। শান্তি পুণ্য নাম জীবনের সেই অবস্থার স্মরণসূচক।

এই সময়ে আমাদের বন্ধু বাবু কালীকৃষ্ণ ঘোষ কার্য উপলক্ষে জামালপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি চিরজীবনই ব্রাহ্মসমাজের, বিশেষত ব্রহ্মোপাসনার একান্ত পক্ষপাতী ও অনুরাগী। জামালপুরে তিনি একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া নদীতটে একখানি সুন্দর উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেন; ঐ গৃহ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার আহ্বানে রামকুমারবাবু ও আমি

প্রাতঃকালে আপনি ও সায়ংকালে অমরবাবু আচার্যের কার্য করিয়াছিলেন। ১৫ই বৈশাখ আমি সঙ্গতের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হই এবং এই সময় হইতে একরূপ নিয়মিতরূপেই সঙ্গতে ও শাখাসমাজের উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করি। এই বৎসর আষাঢ় মাসে শাখাসমাজের উৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় ময়মনসিংহে আগমন করেন। সমারোহের সহিত উৎসব সম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষে তিনি জমিদার অমৃতবাবুর গৃহে এক বক্তৃতা করেন। এই সময়ে আপনার প্রথম ও দ্বিতীয় কন্যা শান্তিলতা ও পুণ্যলতার নামকরণ হয়। এই আমার প্রথম ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানে যোগদান। বিদ্যারত্ন মহাশয় শাখাসমাজের ছাত্র সভ্যদিগকে ব্রাহ্ম-দোকানে আহ্বান করিয়া ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায়, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।"

জামালপুরে গমন করিয়াছিলাম। ধর্মপ্রচার উদ্দেশে অন্যত্র গমন করা আমার জীবনে পূর্বে আর হয় নাই। তথায় আমরা নৌকাতেই বাস করিতাম, কালীকৃষ্ণবাবুর বাসা হইতে প্রচুর আহার্য আসিত। মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন বহু জনতা হইয়াছিল; কালীকৃষ্ণবাবুর বাসা হইতে কীর্তন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করা হয়, বহু জনতার মধ্যে প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া আমি কিছু বলিযাছিলাম। দুই দিন উপাসনা, আলোচনা, কীর্তন ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল; আমরা উভয়ে কার্য নির্বাহ করিয়াছিলাম। স্থানীয় লোকের বিলক্ষণ উৎসাহ ও অনুরাগ দৃষ্ট হইয়াছিল। আমার জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺রাজনাথ চন্দ মহাশয় তৎকালে জামালপুরে একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন; তিনি আমাদের উপাসনা ও বক্তৃতাদি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইযাছিলেন এবং আমাকে সমাদরে গৃহে নিয়া আহারাদি করাইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় কিছুদিন পর কালীকৃষ্ণবাবুর স্থানান্তর গমনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজটী উঠিয়া গেল।

পারিবারিক

সামাজিক সংগ্রামে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৮০ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে আমার প্রথমা কন্যা শান্তিলতা জন্মগ্রহণ করে; ইহার দুই বৎসর পরে ১৮৮২ সালের ফাল্গুন মাসে পুণ্যলতার জন্ম হয়। এতদিন ব্রাহ্ম-বাসাতেই ছিলাম। কিন্তু নানা কারণে আর একত্রে থাকা সুখের বিষয় ছিল না।* আমি একটী পৃথক স্থান ক্রয় করিয়া বাড়ী করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। পণ্ডিতপাড়া নামক স্থানে একটী স্থান ক্রয় করিয়া গৃহাদি নির্মাণ করিলাম। তখন পুণ্যলতা সূতিকাগৃহে ছিল বলিয়া কিছুদিন

* এই সময়ে আমি, বাবু গোবিন্দবন্ধু গাঙ্গুলী ও শ্রীমান বিহারীকান্ত চন্দ সপরিবারে ব্রাহ্মবাসায় ছিলাম, বহির্বাটীতে বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বাস করিতেন। একবার আষাঢ়ের উৎসব সময়ে শ্রীমান বিহারীকান্ত চন্দ নববিধান মত গ্রহণ করিয়া সেই সমাজভুক্ত হইলেন। তখন ব্রাহ্মবাসাতেই আমাদের শাখাসমাজের উৎসব হইতেছিল, এমন সময়ে ভিতরের আঙ্গিনায় বিহারীর ঘরের সম্মুখে একটী দীর্ঘ বংশদণ্ডে "নববিধান নিশান" উত্তোলিত হইল। এই ঘটনায় আমাদের সমাজের লোকেরা বিশেষত ছাত্রমণ্ডলী অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিলেন।

সে বাড়ীতে যাইতে পারি নাই: পরে জ্যৈষ্ঠমাসের বন্ধে নূতন গৃহে প্রবেশ করি। ইহাই আমার স্বোপার্জ্জিত অর্থে প্রথম সম্পত্তি হয়। তৎকালে সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও ভাষাবোধ নামক পুস্তক দুইখানি স্কুল সমূহে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে কিঞ্চিৎ আয় হইত; বেতনের ৩০৲ টাকা হইতেও কিছু সঞ্চিত হইত, তদ্দারাই ঐ বাড়ী হইয়াছিল, উহাতে প্রায় এক হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। আমার পত্নীর মিতব্যয়িতা ও অসাধারণ পরিশ্রম গুণেই অতি সামান্য আয়েও আমাদের সংসার একরূপ স্বচ্ছল ভাবেই চলিতেছিল, আমরা কখনও কোন অভাব বোধ করি নাই। পরবর্ত্তী সময়ে যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহার মূলেও তাঁহারই জীবনব্যাপী পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকারই প্রধানরূপে গণ্য হইতে পারে।

ব্রাহ্ম ইয়ার বুক

ইংলণ্ডের মাননীয়া কুমারী কলেট প্রতিবর্ষে "ব্রাহ্ম ইয়ার বুক" প্রকাশিত করিতেন; উহাতে ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক ইতিহাস বিস্তৃত রূপে লিখিত হইত। ১৮৮১ সালের পুস্তকে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছিল এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই অধ্যায় পরিসমাপ্ত করিতেছি।

The first Brahmo Samaj at Mymensing was founded by Babu Isan chandra Biswas in 1854 and a mandir was opened in 1869. A Branch Samaj was added in 1867 for the special purpose of giving religious teaching to youths under eighteen years of age ; and both these institutions were going on harmoniously, when the fatal Kuch Behar marriage threw its apple of discord into the little community. The Samaj sent a letter of protest to Mr Sen and also a note (dated Feb 16, 1878) to the same effect, signed by 22 Brahmos and 4 Brahmicas, to the Provisional B. S. Committee at Calcutta. Three months later, on the 14th of May 1878, a general meeting of the Samaj was held, at which the following resolutions were passed, with only two dissentient votes.

(1) That the premature and idolatrous marriage of the daughter of Babu K. C. Sen with the minor prince of Kuch Behar has lowered the high object and glory of the Brahmo Samaj ; the Mymensing Brahmo Samaj therefore declares it an un-Brahmic marriage.

(2) That those who defend or sympathize with this marriage as a Brahmo marriage, or a marriage allowable in the Brahmo Samaj shall not be any more received or acknowledged as ministers, missionaries, or Secretaries of the Brahmo Samaj.

But unfortunately one of the two dissentients, Babu Kalikumar Bose was himself the Minister and Secretary of the Samaj, and he stoutly refused to accept his deposition. His companion, Babu Gopi Krishna Sen, assisted him by applying to the secular arm, and next Sunday, when the congregation (numbering altogether about 30) arrived at the mandir, they found it guarded by policemen, who forbade their entrance. They retired calmly and held divine service elsewhere, but they did not cease to make efforts for the recovery of their rights,—first by private remonstrances, and when all these failed, by a public law-suit. The decision given by the Subjudge of Mymensing awarded equal rights to both parties in the possession of the Mandir.

A fresh misfortune befel them soon after the split, in the un-Brahmic conduct of their new minister, who married a young girl of only 11 or 12 years old with Hindu rites,—and of course forfeited his situation in consequence. But in spite of all discouragements, the Samaj held steadfastly on its way, in fellowship with its Branch Samaj previously mentioned, whose esteemed minister, Babu Srinath Chanda, has for several

years been a mainstay of Brahmoism in Mymensing. Of the present condition of these two Samajes I am enabled briefly to report, by the kindness of Babu Sarat Chandra Ray, Secretary to the main Samaj who wrote to me (Nov. 9, 1881) as follows :—

"There are 19 members of the Mymensing Brahmo Samaj, of whom seven are anusthanic. They hold their prayer meeting every Sunday evening at a Brahmo house, and meet on other days of the week for religious conversation and in meeting of boys. Besides this, every work of public utility is started by these Brahmos. The members of the Branch Brahmo Samaj meet every Sunday morning for prayer, and they have special meetings on other days of the week for exchange of thoughts with one another,—their special aim being the formation of character. They are 21 in number including 5 of the main Samaj, who are Anusthanic Brahmos."

Now for the other side of the picture, Babu Kalikumar Bose, who had refused, in May 1878, to accept his deposition from the double post of minister and secretary, has continued to hold possession of the Mymensing mandir ever since. His adherents appear to be very few but they still regard themselves as "the Mymensing B. S,"and Babu K. K. Bose duly furnished his report thereof to the Yearly Thiestic Record, of which report the following is a translation.

"Three years ago the young Brahmos of this place seceded from us, and established a new Samaj. Their youthful vigour and zeal were, to Mymensingh, something like unbloomed flowers, which, for a time, appear so beautiful and hopeful to the eye, but which before the approach of spring, wither away

and fall to the ground, making, the trees look barren. In this sweet spring of the New Dispensation, where are those who once formed the centre of all hope and trust, and who, in the name of religion, suffered persecution and made self sacrifices? Every good hearted man can understand how painful it is, in this blessed hour, not to see those whose energy, firmness and faith taught me several times how to acquire those qualities. It is all the more difficult to say how painful it has been to me to see these young men now walking in the crooked paths of this world. Really these brethren who, like ignorant and naughty boys, are defying and disowning their own Mother and elder brothers, are thereby gradually sinking deeper and deeper into the fathomless ocean of worldliness. * * * *"

The Mymensingh B S. had repeatedly and emphatically condemned the Kuch-Behar marriage as un-Brahmic, and had deposed their own minister-secretary from his double office, because his different views disabled him from performing its duties ; but "under the sweet shadow of the New Dispensation" all this counts for nothing. The ex-minister turns the congregation out of the church by main force, keeping the building for himself and one or two companions,—and then announces that "those who once formed the centre of all hope and trust, have "*seceded from us*" and are "defying and disowning their own Mother and elder brothers." Such representations clearly imply a belief in the divine right of ministers, which has never been adopted by the Brahmo community ; and the experience of the last three years is a sufficient guarantee if that belief ever had any chances of such adoption, they are now entirely lost.

প্রিয় ভ্রাতা গোবিন্দবন্ধু—১৮৮২ সালের কার্তিকমাসে এই প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মযুবক সান্নিপাতিক জ্বরে পরলোক গমন করেন। তাঁহার চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার ত্রুটী হয় নাই। ঢাকা হইতে তাঁহার দুঃখিনী মাতা ও ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়গণ আগমন করিলেন। ডাক্তার সাহেব স্বয়ং ভার লইলেন। সকলই বিফল হইল। মাতা পত্নী ও শিশু কন্যাদ্বয়কে অকূলে ভাসাইয়া গোবিন্দ চলিয়া গেলেন। এখানেই তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ হইল। মুক্তাগাছার কেশববাবু গোবিন্দকে বড় ভালবাসিতেন, তিনি স্বয়ং রোগশয্যায় ও শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

(১৮৮৩—১৮৮৪)

মন্দির অধিকার

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, আদালতের বিচারে আমরা ব্রহ্মমন্দিরে তুল্যাধিকার লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে এতদিন সে অধিকার গ্রহণ করা হয় নাই। এই দীর্ঘকাল আমরা নানাস্থানে নানারূপে ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিয়াছি, তথাপি আর সেই বিসম্বাদভূমিতে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। ওদিকে শ্রদ্ধেয় কালীকুমারবাবু সঙ্গীহীন ও নানারূপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আবার কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত করিতে কাহারও ইচ্ছা হয় নাই। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের মধ্যে কেবল মহিমবাবু ও বিহারীকান্ত তাঁহার সহচর ছিলেন। কালেক্টরীর কয়েক জন আমলা সমাজে যাতায়াত করিতেন; তন্মধ্যে বাবু বসন্তকুমার ঘোষ ব্রাহ্মধর্মে যথার্থ অনুরাগী ছিলেন। যদিও তিনি জীবনে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহাকে একজন যথার্থ বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে। ইঁহার নিবাস বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রামে। ইনি আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বর্গীয় কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা ব্রত পালন করিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন।

যখন মন্দিরে অধিকার গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হইতে চলিল, তখন দখল লওয়াই স্থির হইল। ১৮৮৩ সালের চৈত্র কি বৈশাখ মাসে কোন এক রবিবারে আমরা মন্দির অধিকার করিতে গেলাম। তখন বেলা প্রায় ১০টা হইয়াছে, অপর পক্ষ প্রাতে মন্দিরে উপাসনা করিয়াছেন, তারপর আমাদের আগমন প্রতীক্ষায় তথায় বসিয়া আছেন। আমরা আদালতের নাজির প্রভৃতির সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। তখন শ্রীমান বিহারীকান্ত বেদীতে বসিয়া শ্লোক-সংগ্রহ পাঠ করিতেছিলেন, কালীকুমারবাবু প্রভৃতি বেঞ্চে বসিয়া ছিলেন। নাজির মহাশয় আদালতের আদেশ পাঠ করিয়া আমাদিগকে বলিলেন এই মন্দির ও তৎস্থিত যাবতীয় সম্পত্তিতে আপনাদিগের তুল্যাধিকার হইল। আপনারা বেদীতে বসিয়া উপাসনাদি করিতে

পারেন। আমি বেদীর দিকে একটু অগ্রসর হইতেই বিহারী নামিয়া গেলেন। কিন্তু আমি বেদীতে না বসিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিলাম। তখন মন ভাবে পূর্ণ, পূর্বস্মৃতির প্রবল তরঙ্গে হৃদয় আলোড়িত হইতেছিল! সেই মর্মস্পর্শী প্রার্থনায় সকলেরই প্রাণ বিগলিত ও অশ্রুপাত হইতেছিল। প্রার্থনান্তে "দয়াল বল জুড়াক হিয়া রে" এই কীর্তন হইল; শ্রদ্ধেয় কালীকুমার বাবু প্রমত্তভাবে কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। কীর্তনান্তে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইতেই তিনি আমাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন এবং ভাবোচ্ছাসে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই পবিত্র অশ্রু-ধারায় সকলেরই প্রাণের মালিন্য ধৌত হইয়া গেল; ভস্মাচ্ছাদিত ভ্রাতৃ-প্রেমানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল!

ব্রহ্মকৃপাগুণে যখন ভ্রাতৃপ্রেমের পবিত্র স্পর্শে সকলের প্রাণে শান্তিলাভ হইল, তখন কালীকুমারবাবু বলিলেন, উভয় দলে সদ্ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মন্দিরে উপাসনাদি করা যাইতে পারে, এমন একটী ব্যবস্থা হউক। আমরা তাঁহার উপরই ভার দিলাম। তাঁহার ইচ্ছানুসারে তখনই আমার বাসায় যাইয়া সকলে মিলিত হইলেন। অনেক আলোচনা করিয়া উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে একটী নির্ধারণপত্র প্রস্তুত হইল। তখন বেলা প্রায় ২টা হইয়াছে, কাহারও স্নানাহার হয় নাই; কিন্তু সকলেই মনে করিলেন, মনের এই ভাব থাকিতে থাকিতে একটা মীমাংসা হইয়া যাক, আর যেন বিবাদের সুযোগ না থাকে। যাহা নির্ধারিত হইল, তাহার স্থূল মর্ম এই, প্রতি রবিবারে প্রাতে তাঁহারা এবং রাত্রিতে আমরা মন্দিরে সামাজিক উপাসনা করিব। অন্যান্য দিন কিছু করিতে হইলে অপর পক্ষকে জানাইয়া করিতে হইবে। মাঘোৎসবে ১১ই মাঘ আমাদের থাকিবে, নিকটবর্তী রবিবারে তাঁহারা উৎসব করিবেন। শাখাসমাজের ও নববর্ষের উৎসব আমরা করিব। ৫ই পৌষ মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব তাঁহারা করিবেন; ২৬শে পৌষ ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব আমরা করিব। যাহা হউক, সহজেই সকল বিষয়ের সুমীমাংসা হইয়া গেল। অতঃপর আমরা দুই বৎসর কাল সদ্ভাবে নির্বিবাদে মন্দির ব্যবহার করিয়াছিলাম। তবে উৎসবাদির সময়ে উভয় পক্ষই কিছু অসুবিধা বোধ করিতেন; যেন জমাট হইত না, ভাঙ্গা ভাঙ্গা লাগিত।

মণ্ডলী পুনর্গঠনের প্রয়াস

ব্রাহ্মসমাজের সেই গৃহবিবাদে আমরা বাহিরে যেমন গৃহচ্যুত হইয়া নিরাশ্রয়ে ঘুরিতেছিলাম. আমাদের ধর্মজীবনও সেই মহাসংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত ও ভগ্ন দশায় পতিত হইয়াছিল। এইক্ষণে, মহা ঝটিকার অবসানে ভগ্ন গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গৃহস্থের মনে যে ভাবের উদয় হয়, আমাদের মনেও সেই ভাবের সঞ্চার হইল ; যথাসাধ্য সেই ভগ্ন গৃহের সংস্কার করিতে আকাঙ্ক্ষা হইল।

মন্দিরে অধিকার পাইয়া আমাদের বিলক্ষণ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। রবিবার রাত্রিতে মন্দিরে লোকারণ্য হইত ; শাখা সমাজের ছাত্রগণ রবিবার প্রাতে আমার বাসায় উপাসনা করিতেন, রাত্রিতে সকলেই মন্দিরে মূল সমাজের উপাসনায় যোগ দিতেন। শাখা সমাজের সঙ্গত সভার কার্য যথেষ্ট উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও যুবকগণের তৃপ্তি হইল না। শ্রীমান রজনীকান্ত গুহ, অশ্বিনীকুমার বসু, দ্বারকানাথ সরকার, বঙ্কবিহারী দাস প্রভৃতি তৎকালে ছাত্র সমাজের উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ছাত্র মণ্ডলীর জন্য মন্দিরে কিছু করা হয়, তাঁহাদের বিশেষ ইচ্ছা হইল। তখন আমাদের প্রিয় ভ্রাতা অমরচন্দ্র দত্ত মযমনসিংহ ইনষ্টিটিউশন নামক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ ভাবে কার্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; ব্রাহ্ম ছাত্রদের ইচ্ছানুসারে তিনি প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্গীত ও বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার কৃত নব নব ভাবপূর্ণ সঙ্গীত ও কবিত্বপূর্ণ উপদেশ ছাত্রগণের বিলক্ষণ আকর্ষণের বস্তু হইয়াছিল।

সেই সঙ্গীতগুলির একটী এখানে গ্রহণ করিতেছি, এই সঙ্গীতে মানবাত্মার একতা ও বিশ্বপ্রেমের ভাব সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে :—

বিভাস—একতালা

বড় সাধ মনে, কোটী হৃদয় সনে,
সবে মিলে গ'লে জল হ'য়ে যাই।
কভু সিন্ধুরূপে, কভু থাকি কূপে,
নদী সরোবরে পিপাসা মিটাই ॥

প্রেম-সূর্য যবে উদিবে আকাশে,
বাষ্প হয়ে সবে উড়িব আবেশে,
কূপ সিন্ধুবারি একই মেঘে মিশে,
বিশ্বাস-বাতাসে দেশে দেশে যাই।
পাষাণ হয়ে আছে যে দেশের জমি,
তথায় হৃদয়রেণু বৃষ্টি হয়ে নামি,
গলাব সে দেশ হ'লে মরুভূমি,
ভাসিব ভাসাব বাসনা যে তাই॥
চন্দ্রমা গগনে উদয় হবে যবে,
শিশির হয়ে পড়ি পরাণ-পল্লবে,
ফুটাইয়ে ফুল ভরিয়ে সৌরভে,
মায়ের গৌরব বাড়াইতে চাই।
হৃদয়ের মা গো, তুমি পরশমণি,
ছুঁয়ে দাও সবায় গলুক এখনি,
ঘুচুক দেশের দুঃখের রজনী
নাচুক জগৎ বলি ভাই ভাই॥

শাখা সমাজের সঙ্গত সভায় একদিন আলোচনা ও একদিন সৎ-গ্রন্থ পাঠ করা হইত। এই সময়ে (১৮৮৩ সালের বর্ষাকালে) আমি কিছুদিন ধরিয়া 'প্রকৃত বিশ্বাস' নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিতাম। সেই ব্যাখ্যায় নব নব তত্ত্ব হৃদয়ে উদিত হইত; তাহাতে নিজের ও মণ্ডলীর যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল।

এই সময়ে ক্রমে ক্রমে আমাদের মণ্ডলীর জনবল বৃদ্ধি হইতেছিল। যদিও ইতিপূর্বে বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় ধর্মপ্রাণ সহযোগী স্থানান্তরে যাওয়াতে আমরা অনেক বিষয়ে অভাব বোধ করিতেছিলাম, তথাপি অন্যদিকে আবার নূতন নূতন উৎসাহী ব্রাহ্মদিগের সহযোগিতা লাভ করিয়া আমাদের মণ্ডলী বিলক্ষণ সবল হইয়া উঠিতেছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে টাঙ্গাইল অঞ্চলের ব্রাহ্মধর্মানুরাগী যুবা শ্রীমান গুরুগোবিন্দ চক্রবর্তী এখানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি হার্ডিঞ্জ বঙ্গবিদ্যালয়ে ও তৎপরে বালিকা স্কুলে কর্ম গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে

ব্রাহ্মমণ্ডলী ভুক্ত হইলেন। ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউশনে যে সকল ব্রাহ্ম শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদের দ্বারাও মণ্ডলীর যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি হইতেছিল। তন্মধ্যে আমার পূর্বতন ছাত্র ও শাখা-সমাজের উৎসাহী সভ্য শ্রীমান নবকুমার সমাদ্দার, শশিকুমার বসু, গুরুদাস চক্রবর্তী ও গোলকচন্দ্র দাস প্রভৃতি এখানে আগমন করিয়া আমাদের মণ্ডলীর শক্তি ও কার্যক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করিতেছিলেন। এখনও শুষ্ক তর্ক, বৃথা দলাদলি ও পরনিন্দার ভাব মণ্ডলীর মধ্যে প্রবল ছিল! যাহাতে সেই সকল দূর হইয়া মণ্ডলী মধ্যে উপাসনাশীলতা, ভ্রাতৃপ্রেম ও সৎকার্যে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা ও বিবিধ সাধনার সূত্রপাত করা হইতেছিল। ঈশ্বর কৃপায় সেই সকল যত্ন চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই।

মাতৃভাবের সাধনা

ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ ও মনস্তাপে যখন ব্রাহ্মগণের হৃদয় জ্বলিতেছিল, তখন সন্তানের দুঃখ দেখিয়াই যেন স্বর্গ হইতে মাতৃনামের অমৃতধারা অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগের সন্তপ্ত প্রাণ সুশীতল করিল। ব্রাহ্মধর্মের দ্বিতীয় যুগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে ঈশ্বরের মাতৃভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। "জননীর কোলে বসি কেন রে অবোধ মন, রোদন করিছ সদা মাতৃহীন শিশু প্রায়; দেখ রে মন আপনি, নিকটে তব জননী, মা বলে ডাকিয়ে তাঁরে শীতল কর হৃদয়।" ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া আমরা এই সঙ্গীতে ব্রহ্মের মাতৃভাবের পরিচয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু সে ভাব এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল; ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর রাজা, ঈশ্বর পরিত্রাতা এই সকল ভাবই সর্বত্র সাধনের বিষয় ছিল।

শুভক্ষণে মাতৃভক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের যোগ হইয়াছিল, সেই মণিকাঞ্চন যোগ হইতেই ব্রাহ্মসমাজে সুমধুর মাতৃভাবের অবতরণ হইল। যদিও তখন সাধারণ ও নববিধান সমাজে ঘোর বিরুদ্ধভাব বর্তমান ছিল, তথাপি বিধাতার আশ্চর্য কৌশলে এই মহাভাব সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত হইয়া পড়িল। কেশবচন্দ্রের সুমধুর কণ্ঠে উচ্চারিত "মা" নাম তাড়িতপ্রবাহের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ঢাকায় ভক্তশ্রেষ্ঠ কোমলপ্রাণ

বিজয়কৃষ্ণ "মা" নামে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। প্রেমিক সাধক বঙ্গচন্দ্র ও তদীয় সহচরগণ এই নামে এতদূর অগ্রসর হইয়া পড়িলেন, যে অনেকেই তাহা ভাবের আতিশয্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

এখানেও আমরা এই মাতৃনামের সাধনায় তৎকালে যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছিলাম। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজে মাতৃভাবের সাধনা অতি উপযুক্ত সময়েই আরম্ভ হইয়াছিল। মাতৃনামে সদ্ভাব প্রীতি বর্ধিত হইয়াছিল, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ও মনঃপীড়াজনিত দুঃখ দূর হইয়াছিল। ব্রহ্মমন্দিরে আমাদের অধিকার স্থাপিত হইলে বাবু অমরচন্দ্র দত্ত প্রতি শনিবার নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া বিতরণ করিতেন; উহার একটী সঙ্গীত এইস্থলে উধৃত করিতেছি; তৎকালে আমাদের মধ্যে মাতৃভাবের ও ভক্তিধর্মের জন্য কিরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, ইহাতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

সমন্বয় গীত

মা যদি আসিলে হৃদে কর বর দান;
চেয়ে আছি তব পানে মা গো, চাতক সমান।
"ধনং দেহি রূপং দেহি, যশো দেহি দ্বিষো দেহি"
মা তোর শ্রীপদে বর চাহি না এমন।
চাহি মাগো করযোড়ে সবে মিলে সমস্বরে
ভারতের ভক্তিধর্ম কর উদ্দীপন।
বিশ্বগ্রন্থে পত্রে পত্রে "মা মা মা মা" নাম মাত্রে
যেন বহে দু নয়নে অশ্রু-প্রস্রবণ।
স্নেহ-করে ধ'রে তু'লে প্রেমভক্তি শান্তি কোলে,
রাখ মাগো সন্তানের মলিন জীবন।
কোটি কণ্ঠে মা মা ধ্বনি কোটি কোটি কর্ণে শুনি,
কোটি আত্মা হয়ে যাক একে নিমগন,
আমরাও সেই সঙ্গে, মা তোর চরণে রঙ্গে,
ভূমিতে লুটায়ে করি প্রাণ সমর্পণ॥

ধর্মসাধনে নূতন ভাব

যদিও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও ঢাকার সাধক মণ্ডলীর সঙ্গে বাহ্যত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, কিন্তু ধর্মসাধনে পরস্পর হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন হই নাই। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার মণ্ডলীর জীবনে যে সকল নব নব সাধনতত্ত্ব ও ধর্মভাব বিকশিত হইতেছিল, বাহ্যানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া তাহার মূলভাবের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন করিতেছিলাম। এই সময়ে যোগ ভক্তি ও জ্ঞান কর্মের মিলিত সাধনা বিশেষ ভাবে গৃহীত হইয়াছিল। আমরা জীবনের প্রথম হইতেই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মিলিত ভাব জীবনে লাভ করিতে প্রয়াসী ছিলাম। এইক্ষণে ভক্ত সাধকদিগের মধ্যে সেই ভাবের বিশেষ বিকাশ দেখিয়া মনে যথেষ্ট আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইল; এবং জীবনে ও মণ্ডলী মধ্যে এই মহাভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তৎকালের উপাসনা, আলোচনা ও সঙ্গীতাদিতে যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্মের একত্রে সাধনার কথাই সর্বদা অভিব্যক্ত হইত। এই সাধনায় বিধানধর্মের প্রকৃত ভাব আমাদের মধ্যে কথঞ্চিৎ বিকাশ পাইতেছিল। ঢাকার বঙ্গবন্ধু পত্রের জন্য আমি তখন যে শ্লোকটী রচনা করিয়া দিয়াছিলাম, উহাতেই তৎকালীয় ধর্মভাবের গূঢ় পরিচয় আছে। এস্থলে সেই শ্লোকটী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম।

এক এব পরিত্রাতা একোধর্মস্তথৈবচ।
প্রত্যক্ষো ভগবান্ নিত্যং জীবানাং হৃদয়ে স্থিতঃ॥
পরিত্রাণায় দীনানাং প্রত্যাদিশতি সদ্গুরুঃ।
শ্রুত্বা শ্রীমুখতো বাক্যম্ অমরো জায়তে নরঃ॥
প্রার্থনা সাধনামূলং ভক্তির্হি পরমা গতিঃ।
ভক্তানাং দলমেকঞ্চ বিধানমিদমুচ্যতে॥

ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউশন

নশিরাবাদ এন্‌ট্রান্স স্কুলের চরম দশা উপস্থিত হইল। কালীকুমারবাবু আর উহার ভার বহনে সমর্থ হইলেন না। তখন আমাদের শরৎবাবুর অনুগত অনেক ব্রাহ্ম ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া কর্মক্ষেত্রে

প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। শরৎবাবুর ইচ্ছা ছিল তিনি ইঁহাদিগকে লইয়া এখানে একটী স্বাধীন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজের আদর্শ মতে ছাত্র-শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বাবু অমরচন্দ্র দত্ত এখানে আসিয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করাতে তাঁহার ঐ ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিবার সুযোগ হইল। তাঁহারা দুইজনে গোপন পরামর্শ করিয়া এই কার্যে অগ্রসর হইতেছিলেন; শরৎবাবু কলিকাতায় যাইয়া ময়মনসিংহের চিরহিতৈষী মহাত্মা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের উপদেশ ও সহকারিতা গ্রহণ পূর্বক স্কুল স্থাপনের আয়োজন করিতেছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৮৮২ সালের ভাদ্র মাসে সেই বিখ্যাত ছাত্র মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। সাধারণ্যে উহা "বাঘের মোকদ্দমা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। জেলা স্কুলের অতি নিকটে মে: কেলানোজ সাহেবের কুঠি ছিল। এই সাহেব তৎকালে অনেক জমিদারের ম্যানেজার ছিলেন; এখানে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। জেলাস্কুলের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ও সদ্ভাব ছিল; তিনি এই স্কুলের ছাত্রদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য প্রতি বর্ষে ৫০ টাকা দান করিতেন। যাহা হউক, ঐ সময়ে জেলা স্কুলের অতি সন্নিকটে সাহেবের একটী ব্যাঘ্র-শিশু রক্ষিত ছিল। ছাত্রেরা স্কুল বসিবার পূর্বে বাঘ দেখিতে যাইত, এবং মধ্যে মধ্যে উহাকে বিরক্ত করিত। ক্রমে এই বিষয় লইয়া সাহেবের লোকদিগের সহিত ছাত্রদের বিবাদ উপস্থিত হইল। একদিন ১১টার পূর্বে, আমরা তখনও স্কুল যাই নাই, ছাত্র ও ভৃত্যদিগের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অশ্বরক্ষক প্রভৃতি ভৃত্যগণ দীর্ঘ বংশদণ্ড হস্তে লইয়া ছাত্রদিগকে আক্রমণ করিল। ছাত্রগণ প্রথমে ইষ্টক নিক্ষেপে উহাদিগকে হটাইয়াছিল, কিন্তু পরে আর পারিল না, উহারা স্কুল গৃহে প্রবেশ করিয়া ছাত্রদিগকে প্রহার করিল ও স্কুলের দরজা প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দিল। এই বিষয় লইয়া সহরে তুমুল আন্দোলন হয়। উভয় পক্ষ হইতেই মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। তখন শরৎবাবু কলিকাতায় ছিলেন, তাঁহার প্রতি ব্যারিষ্টার নিয়োগের ভার অর্পিত হইল। মুক্তাগাছার শিক্ষিত জমিদার কেশববাবু তখন এখানে ওকালতি করিতেন। তিনি এবং উকীল বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষ এই মোকদ্দমায় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট গান সাহেব স্বয়ং মোকদ্দমার বিচার করেন। মোকদ্দমার ভাবে বোধ হইল বারিষ্টার নিয়োগ

করিলে সুফল হইবে না ; সেই রাত্রিতেই ৬০৲ টাকা ভাড়া ঠিক করিয়া এক দ্রুতগামী নৌকা যোগে নারায়ণগঞ্জ টেলিগ্রাফ আফিসে নিষেধ-বার্তা প্রেরিত হইল। তখন এখানে টেলিগ্রাফও হয় নাই। যাহা হউক এই মোকদ্দমায় বাঙ্গালী মহলে যেরূপ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, বিচারফল সেরূপ হয় নাই। পাঁচটী ছাত্রের ৫০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড ও অপর পক্ষের তিনজনের কারাদণ্ড হয়। সাহেবের লোকদিগকে ছাত্রেরা ভাল করিয়া চিনিতে না পারাতেই তাহাদের অধিকাংশ মুক্তি লাভ করে।

এই মোকদ্দমার সময়ে জেলা স্কুলের শিক্ষকগণ যেরূপ কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা শরৎবাবু প্রভৃতি ছাত্র-হিতৈষীগণের মনঃপূত হয় নাই। বস্তুত এই ঘটনা তাঁহাদের স্বাধীন স্কুল প্রতিষ্ঠার বিশেষ সহায় হইয়াছিল। পূর্বে বলিয়াছি, কালীকুমারবাবু আর নশিরাবাদ স্কুল চালাইতে পারিতেছিলেন না ; এই সময়ে একদিন শুনিলাম, তিনি ঐ স্কুলের সরঞ্জাম প্রভৃতি ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার গুহের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন ; শীঘ্রই আর একটী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু কে স্কুল করিতেছেন, তখনও তাহা অপ্রকাশিত ছিল। ১৮৮৩ সালের ১লা জানুয়ারী শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু প্রেসিডেণ্ট, বাবু কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট, বাবু পরেশনাথ সেন সম্পাদক, বাবু শরৎচন্দ্র রায় ও বাবু অমরচন্দ্র দত্তকে লইয়া এক সভার কর্তৃত্বাধীনে ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউশন নামে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। বাবু দক্ষিণাচরণ সেন এম, এ, প্রধান শিক্ষক এবং শরৎবাবুর গ্র্যাজুয়েট ও আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রগণ সহকারী শিক্ষক হইয়া আসিলেন। ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট কেশববাবু একটী সুললিত ও সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া প্রথম ছাত্রের নাম লিপিবদ্ধ করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা অবিলম্বে প্রায় ৩০০ শত হইয়া উঠিল।

সহসা এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করিতে দেখিয়া, বিশেষত উহা সম্পূর্ণ ব্রাহ্ম কর্তৃত্বে হইল দেখিয়া অনেকের চিত্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তৎকালে এখানে যে রাজনৈতিক কর্মীদল ছিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকেই এখানকার সকল কার্যের "কেন্দ্র" মনে করিতেন। এই স্কুল স্থাপন রূপ গুরুতর কার্যে তাঁহাদের কোন সংস্রব রহিল না, ইহাই বোধ হয় তাঁহাদের বিরক্তির কারণ। একমাস যাইতে না যাইতেই তাঁহারা কালী কুমারবাবুর নিকট হইতে

নশিরাবাদ স্কুলের নাম ক্রয় করিয়া ঐ স্কুল পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নশিরাবাদ স্কুলের যে দুই একজন শিক্ষক নূতন স্কুলে কর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও চলিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি ছাত্রও লইয়া গেলেন।

এই সঙ্কট সময়ে ময়মনসিংহের যাবতীয় সদনুষ্ঠানের চিরসহায় আনন্দমোহন অগ্রসর হইয়া স্কুলের সকল দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তিনি স্কুলের সেক্রেটারী ব্রজেন্দ্রবাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "ইঁহাদের সদিচ্ছা ও স্বার্থত্যাগ নিষ্ফল হইয়া যায়, ইহা আমি কখনও ইচ্ছা করি না। আমি স্কুলের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলাম। আপনি সহরের সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে লইয়া এক কার্যনির্বাহক সভা গঠন করিবেন।" বসু মহাশয় মাসিক দুই তিন শত টাকা ক্ষতি বহন করিয়া স্কুল পরিচালন করিতে লাগিলেন। তখন এই সহরে জেলাস্কুল ভিন্ন আর একটী স্কুলের বেশ প্রয়োজন ছিল কিন্তু তাহার স্থানে দুইটী হওয়াতে উভয় স্কুলই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল এবং অযথা প্রতিযোগিতাবশতঃ ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকগণের মধ্যে নানারূপ অপ্রীতি ও কলহের সঞ্চার হইতেছিল। সকলেই ইহার মন্দ ফল বুঝিতেছিলেন। যাহা হউক প্রায় দেড়বৎসর পরে নশিরাবাদ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাগণ স্কুলের যাবতীয় স্বত্ব বসু মহাশয়ের নিকট ১৭৫০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। এ সম্বন্ধে ১৮৮৪ সালের ২৩শে জুনের চারুবার্তা যাহা লিখিয়াছিলেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউশনের স্বত্বাধিকারী মিঃ আনন্দমোহন বসু ১৭৫০৲ টাকা মূল্যে নশিরাবাদ এন্‌ট্রান্স স্কুল ক্রয় করিয়াছেন। ময়মনসিংহে গত আঠার মাস স্কুলকাণ্ড লইয়া ছাত্রে ছাত্রে, অভিভাবকে অভিভাবকে মনোবাদ চলিয়া সহরের, সুতরাং জেলার, সর্বপ্রকার শক্তি বৃদ্ধির যেরূপ ক্ষতি হইতেছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ময়মনসিংহের উন্নতির অন্তরায় দূরীকরণ মানসেই মিঃ বসু অর্থ সম্বন্ধে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন। নশিরাবাদ স্কুলের অধ্যক্ষগণও কুফল দেখিয়া মিঃ বসুর নিকট স্কুল বিক্রয় করিয়া ময়মনসিংহের উন্নতির পথ প্রসার করিয়াছেন সন্দেহ নাই।"

উভয় স্কুল মিলিত হইল বটে কিন্তু ইন্‌ষ্টিটিউশনের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইল না। নশিরাবাদ স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই জেলা স্কুলে বা অন্যত্র চলিয়া গেল; তাহারা আত্মবিক্রয় স্বীকার করিয়া প্রতিযোগী স্কুলে যাইতে সম্মত

হইল না। যাহা হউক দুই বৎসর পরে এই স্কুল কলিকাতার সিটি স্কুলের শাখারূপে পরিণত হইল; ইহার সকল লাভ ক্ষতির ভার উক্ত কলেজ গ্রহণ করিলেন। এই কার্যে উক্ত কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপল শ্রদ্ধাস্পদ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ

১৮৭৮ সাল হইতে পাঁচ বৎসর কাল মহাত্মা কেশবচন্দ্রের জীবনে যে ধর্মসংগ্রাম চলিয়াছিল, আর সেই মহাসংগ্রামে তিনি যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। সমুদয় ভারতবর্ষ ও সুদূর ইয়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে তাঁহার বিপক্ষে যে মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, তিনি ধর্মবীরের ন্যায় একাকী তাহাতে আত্মসমর্থন করিয়াছিলেন। তৎপর স্বীয় মণ্ডলীতে নববিধানের আদর্শে জীবন গঠনের জন্য এবং পৃথিবীতে "সর্বধর্ম সমন্বয়" রূপ মহাকার্য সাধনের জন্য তিন বৎসর ব্যাপিয়া যে গুরুতর পরিশ্রম করিতেছিলেন, যেরূপ উত্তেজনা ও ভাবোন্মত্ততায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, মানুষের রক্ত মাংসের দেহ তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না।

একদিকে যেমন গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, অন্যদিকে আবার মানসিক কষ্টেও তাঁহার পরমায়ু হ্রাস হইতেছিল। একদিকে ভ্রাতৃবিচ্ছেদে তাঁহার কোমল হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, অন্যদিকে তিনি বহু যত্ন করিয়াও স্বীয় অনুগত প্রচারক মণ্ডলীতে শান্তিস্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার হিমালয়ের পত্রগুলি পড়িলে বুঝিতে পারা যায় তিনি কি মনঃকষ্টে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন! যাহা হউক, ১৮৮৩ সালে তাঁহার বহুমূত্র রোগ ধরা পড়িল এবং দেখিতে দেখিতে তাঁহার সেই সুন্দর বিশাল দেহ শয্যাশায়ী হইল। ক্রমে সেই দিন নিকটবর্তী হইল, যেদিনে ভারতাকাশের সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র চিরকালের জন্য অস্তমিত হইলেন! আমরা তাঁহার পীড়াবৃদ্ধির সংবাদে উৎকণ্ঠিত ছিলাম, ১৮৮৪ সালের ১০ই জানুয়ারী তাঁহার স্বর্গারোহণের সংবাদ এখানে উপস্থিত হইল। সেদিন আর দলভেদ ছিল না—সকল সম্প্রদায়ের লোকই সেই মহাশোকে কাতর ও অভিভূত হইল। ব্রাহ্মমাত্রেই সে শোকে দারুণ আঘাত পাইলেন। সেদিন কে

মিলিত উপাসনা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহারই মুখের অমৃততুল্য মা নামে সকলের প্রাণ সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল।

পঞ্চপঞ্চাশৎ মাঘোৎসব

ব্রহ্মমন্দিরে অধিকার লাভ করিয়া আমরা তথায় এই প্রথম মাঘোৎসব করিলাম। এবারের উৎসব খুব জমিয়াছিল—ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণে সকলেরই মন শোকে অভিভূত ছিল, তখন আর দলভেদ বা ভ্রাতৃবিরোধের ভাব কাহারও মনে ছিল না। মৃত্যু এমনই করিয়া মানুষের বিদ্বেষদগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিয়া থাকে।

আমরা ৭ দিন ব্যাপিয়া উৎসব করিলাম। উৎসবের কতক কার্য মন্দিরে এবং কতক আমার বাসায় চন্দ্রাতপতলে সম্পন্ন হইল। ৯ই মাঘ রাত্রিতে আমার গৃহে নির্জন সাধন হইল। গভীর রাত্রিতে প্রদীপ নির্বাণ করিয়া সকলে সাধনে নিবিষ্ট হইলেন। তখন কেশব-আত্মার মহাভাব অনেকের চিত্তে সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই দিন আমার ২য় পুত্র (৪র্থ সন্তান) জন্ম গ্রহণ করে। মাঘোৎসব মধ্যে জন্মিয়াছে বলিয়া পরে তাহার নাম "উৎসবানন্দ" রাখা হয়। ১০ই মাঘ নগর-সংকীর্তন হইল, আমরা কীর্তন করিয়া মন্দিরে গেলাম, তথায় বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। ৬ বৎসর পরে আবার মন্দিরে ১০ই মাঘের উপাসনা করিলাম। প্রাণে যে কত পুরাতন স্মৃতি ও কতপ্রকার ভাবোদয় হইল, বলিতে পারি না। এবারের মাঘোৎসবে সকলেরই প্রাণে নব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল।

হিন্দু ধর্মের অভিনব আন্দোলন এবং ময়মনসিংহে তাহার প্রভাব

১৮৮৩ সালে পণ্ডিতবর শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ ব্যক্তিগণ হিন্দুধর্ম প্রচার কার্যে ব্রতী হইয়া দেশ মধ্যে এক অভিনব আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম ও খৃষ্টধর্ম প্রচারকদিগের অনুকরণে তাঁহারা বক্তৃতা দ্বারা হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি অনেক সদ্বক্তা এই আন্দোলনটিকে দেশমধ্যে দাবানলবৎ বিস্তৃত করিয়াছিলেন। এদিকে বরিশালের কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি কয়েকটী দাম্ভিক লোক

ব্রাহ্মধর্মের নিন্দা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অকথ্য কটূক্তি করিতেছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মদিগকে "আলোকগত ভ্রাতা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং তাঁহাদের উপাসনার মন্ত্রাদি লইয়া নানারূপ উপহাস করিতেন। ইহা দেশের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। কেন না শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতির ন্যায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ যদি পরনিন্দার দিকে না যাইয়া হিন্দু-ধর্মের সংস্কার ও লোকসমাজে ধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যত্ন করিতেন, আপনারা স্বয়ং ধর্মের রসাস্বাদন করিয়া পরকে যদি সেই অমৃত বিতরণ করিতে পারিতেন, তবেই দেশের যথার্থ কল্যাণ হইত। লোকের সেই ধর্মোৎসাহও এত শীঘ্র নিভিয়া যাইত না।

১৮৮৪ সালে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ময়মনসিংহে আগমন করেন। তিনি স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।* তাঁহার বক্তৃতায় লোকের মনে এক অভিনব ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানাদির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদ্বারা তিনি নব্যসমাজে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি "বাল্যাশ্রম" নামে ছাত্রদিগের জন্য একটী সভা গঠন করেন। কয়েক বৎসর ছাত্রগণ অতিশয় উৎসাহের সহিত উহার পরিচালনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ও যুগধর্মের উপযোগী না হওয়াতে ক্রমে ক্রমে উহা নিস্তেজ হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল।

এই ধর্মান্দোলনে হিন্দুসমাজের মৃতভাব ও ধর্মের প্রতি উদাসীনতা অনেকটা দূর হইয়াছিল। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের লাভ ক্ষতি উভয়ই হইযাছিল। যাঁহারা ধর্মের প্রকৃত রস ও বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভূমি লাভ করিয়াছিলেন, চারিদিকের নিন্দা অপমানে এবং ধর্মকোলাহলে তাঁহারা ভীত না হইয়া আরও দৃঢ় ভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। বাহিরের দলাদলি হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া আত্মজীবন গঠনে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু নবাগতদিগের ও ব্রাহ্মসমাজে

* তখন "ব্যাকরণ-কেশরী" উপাধিধারী কোন পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ স্থানীয় হিন্দুসভার একজন বক্তা ছিলেন। একদিন তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার পর তিনি বলিলেন, ঈশ্বর যে নিরাকার নহেন, পণ্ডিত মহাশয় তাহা সপ্রমাণ করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে ঈশ্বর সাকার হইতে পারেন না। আচ্ছা, যদি ঈশ্বর সাকার ভি না হইলেন, নিরাকার ভি না হইলেন, তবে কি ঘণ্টা হইলেন?"

প্রবেশোন্মুখ যুবকদিগের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। বলিতে কি সেই সময় হইতেই ব্রাহ্মসমাজে নূতন লোকের প্রবেশ অনেকটা হ্রাস হইয়া যায়।*

উক্ত ধর্মান্দোলনের ফল

এই ধর্মান্দোলনে আমাদের জাতীয় জীবনে কোনও স্থায়ী সুফল ফলিয়াছে কিনা আমি তাহা বলিতে পারি না। পক্ষান্তরে উহাতে যে কতকগুলি মন্দ ফল উৎপন্ন হইয়াছিল, অনেকেই তাহা স্বীকার করেন। আমরা এবিষয়ে যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রধানত শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ছাত্রদিগের মধ্যেই এই আন্দোলন-স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। সুতরাং তাঁহাদের কথা স্মরণ রাখিয়াই আমরা এ বিষয়ের ফলাফল নির্দেশ করিব।

(১) এই আন্দোলনে প্রাচীন ভ্রান্তসংস্কার ও সামাজিক দুর্নীতি বহাল রাখিবার জন্য একটা অযথা যত্ন প্রযুক্ত হইতেছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অন্যায় দোষারোপ হইত। ফলত ব্রাহ্মসমাজ ৫০ বৎসর কাল সংগ্রাম করিয়া যে সকল ধর্মনৈতিক ও সামাজিক বিশুদ্ধ মত দেশমধ্যে—শিক্ষিত সমাজে—সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন, আর অর্ধ শতাব্দীর ইংরেজী শিক্ষা দ্বারা শিক্ষিতগণের হৃদয়ে যে সকল উদার ভাব বদ্ধমূল হইতেছিল, উপস্থিত ধর্মান্দোলন তাহার সাক্ষাৎ প্রতিবাদস্বরূপ! এমন কি বাল্যবিবাহ ও জাতিভেদের যে সকল কুফল শিক্ষিতগণের সর্ববাদিসম্মত ছিল, তাহারও সমর্থন এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হইতে লাগিল।†

* শ্রীমান রজনীকান্ত গুহ লিখিয়াছিলেন "১২৯১ সনে শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি ময়মনসিংহ আগমন করিয়া হিন্দুধর্মপ্রচার ও বাল্যাশ্রম প্রভৃতি গঠন করেন। আমি কিছু দিন বাল্যাশ্রম ও শাখা সমাজ উভয়ত্রই গমন করিতাম। যদিও ইহার পূর্বেই বড় দাদা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তথাপি এই সময়ে আমার ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। বরং মন আস্তে আস্তে আর্য ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল; কিন্তু আপনার নিকট অধ্যয়ন করিতাম বলিয়া আপনার স্নেহের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া আসিতে কখনও ইচ্ছা হয় নাই।"

† স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে জাতীয় জীবন গঠন করিতে যাইয়া অনেকেই এই পশ্চাৎগমনের ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং তর্কচূড়ামণির সেই ভীতিজনক বৈদ্যুতিক ব্যাখ্যা

(২) এই আন্দোলনে ছাত্রগণের শিক্ষার গুরুতর ক্ষতি হইতেছিল। আমাদের সকলই ভাল, পাশ্চাত্য সকলই হীন, এইভাব প্রবল হওয়াতে ছাত্রগণের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ হ্রাস হইল। ছাত্রেরা এতদূর পর্যন্ত বলিত যে, পৃথিবী ত ত্রিকোণই ঠিক, তবে পরীক্ষা পাশের জন্য 'গোলাকার' বলিতে হইবে। তাহারা স্থানে স্থানে বাল্যাশ্রম নাম দিয়া ধর্মালোচনার জন্য সমাজ স্থাপন করিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত ধর্মচর্চা ও চরিত্র শোধনের জন্য চেষ্টা না করিয়া পরনিন্দা, আত্মপ্রশংসা ও দলাদলিতেই অধিকাংশ সময় ও যত্ন নিয়োগ করিত। ইহার ফলস্বরূপ কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্রদিগের মধ্যে অবসাদ, নিরুৎসাহ ও সকল ধর্মেই বিতৃষ্ণা দৃষ্ট হইয়াছিল।

(৩) প্রাচীন ধর্মের আচরণই বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া সপ্রমাণ করার জন্য ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরম্ভ হওয়াতে লোকের প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস বিচলিত হইল; মূর্তিপূজা যখন রূপক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখন যে ভক্তিভাব হিন্দুর পরম সম্বল, তাহাতেই আঘাত পড়িল। কেবল কতকগুলি কথার পেঁচ ও তর্কের কৌশলই ধর্ম নামে প্রশংসিত হইতে লাগিল।

মহাত্মা রামমোহন রায় যখন পৌত্তলিকতা খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন, তখনও মূর্তিপূজা সম্বন্ধে এইরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল। রাজা তাহা খণ্ডন করিয়া পরিশেষে এই কথা বলেন, "প্রতিমাকে পরমেশ্বরের চিন্তার জন্য রূপক চিহ্ন বলিলে যদিও উহার প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় না, তথাচ লোকে যে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহা আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবে। কেন না ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে তাঁহারা পৌত্তলিকতাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই এই প্রকার ব্যাখ্যার অনুসরণে বাধ্য হইতেছেন।" (রাজা রাম-মোহন রায়ের জীবন-চরিত, ৮১ পৃষ্ঠা)

দুঃখের বিষয় এই যে, এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের যাহা কর্তব্য ছিল, তাহা সম্যক প্রতিপালিত হয় নাই। কেশবচন্দ্রের যে বজ্রগম্ভীর-

অগ্রাহ্য করিয়া মুসলমানের সহিত প্রেমালিঙ্গন ও বিদ্যাশিক্ষার্থ ম্লেচ্ছদেশে গমন করিতে প্রায় সকলেই অগ্রসর হইয়াছেন।

ধ্বনিতে ভারতের সর্ববিধ ভ্রান্ত মত ও সংস্কার বিকম্পিত হইতেছিল, এই সময়ে সেই মহাকণ্ঠ ধীরে ধীরে নীরব হইতেছিল, সপ্তবর্ষব্যাপী মহাসংগ্রামে সে বিশাল মস্তিষ্ক অবসন্ন, সে উন্নত হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। ১৮৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে সে মহাকণ্ঠ অনন্ত নীরবতায় লীন হইয়া গেল। তাঁহার শক্তিশালী অনুযাত্রীদল মণ্ডলীতে আপনাদের স্থান ও অধিকার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন; দেশের জন্য, জাতির জন্য এই সময়ে তাঁহাদের যাহা কর্তব্য ছিল, তাহা অকৃতই রহিয়া গেল। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের তখন শৈশবকাল, তখন তাঁহারা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যই ব্যতিব্যস্ত। তথাপি তাঁহাদের কোন কোন প্রচারকের ক্ষীণকণ্ঠ হইতে দুই একটী বক্তৃতারূপ প্রতিবাদধ্বনি উঠিতেছিল, কিন্তু সেই দেশব্যাপী কোলাহলে তাহা কোথায় ডুবিয়া যাইত, কেহ বড় একটা শুনিতে পাইত না। কেবল মহামনা বঙ্কিমচন্দ্র সেই ধর্মকোলাহলের বিরুদ্ধে আপনার অমোঘ লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রচার নামক পত্রে ভবিষ্যৎ বক্তার ন্যায় ঘোষণা করিয়াছিলেন "পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি যে ধর্মান্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা কদাপি স্থায়ী হইতে পারিবে না।"

পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ

১৮৮৪ সালের আশ্বিন মাসে আমরা কয়েকটী বন্ধু একত্রে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। আমি ও অমরচন্দ্র দেশ দর্শনের জন্য বাহির হইব স্থির করিয়াছিলাম। এই সময়ে আগ্রাপ্রবাসী গীতকবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যার সহিত শ্রীমান নবকুমার সমাদ্দারের বিবাহ-সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তিনিও আমাদের সঙ্গী হইলেন। আমাদের শরৎ বাবুর কলিকাতায় এবং চন্দ্রমোহনবাবুর চক্ষু চিকিৎসার জন্য ঢাকায় যাওয়া আবশ্যক ছিল; আমরা সকলে এক নৌকায় যাত্রা করিলাম। আমাদের দলটী বেশ পুষ্ট এবং সঙ্গটী বিলক্ষণ আকর্ষণের বিষয় হইয়াছিল। তখন ঢাকা পর্যন্ত রেল পথ হয় নাই, আমরা একদিন অপরাহ্নে ব্রাহ্ম দোকানের ঘাটে নৌকারোহণ করিলাম। অনেকগুলি বন্ধুবান্ধব এবং প্রেমাস্পদ ছাত্রগণ আমাদিগকে বিদায় দিবার জন্য ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। বিদায়ের

সময়ে আমাদের মনে বিলক্ষণ ভাবোচ্ছ্বাস হইয়াছিল। আমরা নৌকায় দাঁড়াইয়া প্রমত্তভাবে তৎকালে নূতন রচিত এই সঙ্গীতটী গাহিতেছিলাম :—

"সংসার বিদেশে থাকি কেমন করে,
না শুনে মা'র মুখের কথা, মুখচন্দ্রমা না হেরে।
দিতে নব সুসংবাদ, হইলেন যিনি প্রেরিত,
তিনি কার্য সেরে মা মা করে, গেলেন নিজ বাড়ী ঘরে।
আমরাও মা'র আজ্ঞা নিয়ে, জীবনের ব্রত সাধিয়ে,
চল তাড়াতাড়ি, যাই হে বাড়ী, বিধানগাড়ী আশ্রয় করে।"

ঢাকা—তখন আর্মানিটোলায় বিধানপল্লী স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের ভক্তিভাজন ও প্রেমাস্পদ ভ্রাতৃগণ তথায় আছেন। আমরা শ্রদ্ধেয় গোপীবাবুর বাড়ীতে উঠিলাম। তথায় নবনির্মিত দেবালয়ে প্রত্যহ উপাসনা হইত, আমরা তাহাতে যোগ দিয়া অতিশয় উপকৃত হইলাম। অনেকদিন পরে ধর্মপথের অগ্রগামী গুরুজন ও সহযাত্রীদের সঙ্গে মিলিয়া জননীর নামামৃত রস পান করিয়া বড়ই তৃপ্ত লাভ করিলাম।

কলিকাতা—এখানে অল্প কয়েকদিন ছিলাম। তখন কলিকাতার সে প্রেমের হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সাধারণ সমাজের সমবিশ্বাসীদিগের সহিত তখনও তেমন ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। ওদিকে যাঁহাদের প্রতি প্রাণের গভীর আকর্ষণ ছিল, তাঁহারাও নানারূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন; ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির একরূপ শূন্য পড়িয়া ছিল। বন্ধুবর আনন্দচন্দ্র ও কৃষ্ণকুমার প্রভৃতির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া তাড়াতাড়ি কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

বৈদ্যনাথ—ইহাই পশ্চিমের প্রথম দর্শনীয় স্থান। তখন এখানে আমাদের ভক্তিভাজন প্রাচীন সাধক রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বাস করিতেন। আমরা তাঁহার পবিত্র কুটিরে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তিনি কত আদরেই আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন! আহা, সে অতুল স্নেহের ও বিনয়পূর্ণ ব্যবহারের আর তুলনা নাই। তাঁহার পবিত্র সহবাসে ধর্মের উষ্ণতা বিলক্ষণ অনুভূত হইল। দেখিলাম সেই প্রাচীন ঋষি জ্ঞানসাগরে চিরনিমগ্ন রহিয়াছেন! তখন আমার লিখিত দেবর্ষি নারদ ও পতিতা রমণীর উপাখ্যানটী কোন মাসিক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল; আমাকে পাইয়া

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন সুন্দর উপাখ্যানটী আপনি কোথায় পাইলেন? আহা, কি সুন্দর ভক্তিপূর্ণ লেখা! কি সুন্দর, কি সুন্দর! বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু আর্দ্র হইল! এখানে দুইদিন ছিলাম। তথাকার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া, সাধুসহবাসের বিমল আনন্দ হৃদয়ে লইয়া বাঁকীপুরের পথে গয়াধামে যাত্রা করিলাম।

গয়া—তখন শ্রদ্ধাস্পদ বাবু চন্দ্রকুমার ঘোষ গয়াতে ওকালতি করিতেন। তিনি একজন ভক্ত ও উপাসনাপ্রিয় ব্রাহ্ম ছিলেন। বিষয়ী হইলেও বিষয়ে কোন আসক্তি ছিল না, ওদিকে কোন উন্নতিও হয় নাই। তাঁহার জীবনে বৈরাগ্য ও সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। গয়া আমার নিকট বড়ই ভাল লাগিল। কি অপূর্ব প্রকৃতির শোভা! বিষ্ণুপদ মন্দিরে যাইয়া এক অব্যক্ত অভিনব ভাবোদয়ে চিত্ত যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল। ইহকাল এবং পরকাল যেন তথায় সম্মিলিত হইয়াছে, এমনি একটা অপূর্ব ভাবের উদয় হইল। মনে হইল, এখানকার যাত্রিগণ তো কেহই আত্মমুক্তি কামনায় আগমন করে নাই—সকলেই প্রেমাস্পদ পিতামাতা ও পূর্বপুরুষের মুক্তি কামনায় আসিয়াছে! আজ তো তাঁহাদেরই পুণ্যস্মৃতিতে সকলের প্রাণ পূর্ণ। আহা, এখানেই না নবদ্বীপচন্দ্র চৈতন্যদেবের হৃদয়ে প্রথমে সেই মহা প্রেমের সঞ্চার হয় যাহার প্রবল তরঙ্গে একদিন বঙ্গভূমি প্লাবিত হইয়াছিল! এইরূপে নানা ভাবের উচ্ছ্বাসে ২।৩ ঘণ্টা যেন কি এক নেশায় বিভোর হইয়া ছিলাম! সমস্ত দিন সেই ভাবাবেশে চিত্ত অভিভূত ছিল।

একদিন চন্দ্রবাবুকে সঙ্গে করিয়া আকাশগঙ্গা নামক পাহাড়ে কোন সাধু সন্ন্যাসীর দর্শনার্থ গমন করিলাম। আমরা ৮ টার সময়ে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি গুহায় বসিয়া ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তাঁহার কয়েকটী যুবক শিষ্য ব্যায়াম করিতেছিলেন; আমরা বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতেছিলাম। চন্দ্রবাবু আমাদের পরিচয় দিলেন, আমরা প্রণাম করিলাম। তিনি সস্নেহে নিকটে বসাইয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমাদের গোস্বামী মহাশয়ের সহিত তাঁহার সৌহার্দ ছিল; আমরা ব্রাহ্মসমাজী শুনিয়া কতই সমাদর ও ভালবাসা প্রকাশ করিলেন। আমরা একটী উচ্চ টীলার উপর বসিয়াছিলাম; সম্মুখে সুনীল পর্বতমালা ও নয়নরঞ্জন তরুরাজি; অনেক কথার পরে ব্রহ্মদর্শন কিরূপে হয়, এই প্রশ্ন

করা হইল। তখন যোগিবর অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ রহিলেন; পরে নয়ন উন্মীলন করিয়া দিগন্তপ্রসারিত পর্বতমালার দিকে উভয় হস্ত বিস্তার করিয়া বলিলেন, "উন্‌কো দেখনেহি হোতা।" অর্থাৎ উঁহাকে তো দেখিলেই হয়। কথাটী অতি গভীর ভাবে বলিলেন. সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। আমাদের প্রাণেও সেই মহাভাবের স্পর্শ হইল। ব্রহ্মের উজ্জ্বল আবির্ভাবে চারিদিক যেন আলোকিত হইয়া উঠিল! অনেকক্ষণ সকলেই নীরবে রহিলেন। আর কোন বিশেষ কথা হইল না।

তাঁহার শিষ্যদিগকে ব্যায়াম করিতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইঁহারা কি অভিপ্রায়ে ব্যায়াম অভ্যাস করিতেছেন? তদুত্তরে বলিলেন, ব্যায়ামদ্বারা শরীর সবল ও নীরোগ হয়—সুতরাং তপস্যায় অধিকার জন্মে। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে ৭ ঘণ্টাকাল এক ভাবে বসিয়া থাকিতে পারি, শরীরে কোন গ্লানি বোধ করি না। ব্যায়াম দ্বারা বলশালী হইলে ইন্দ্রিয় সহজে দমন রাখা যায়। "ক্ষীণাজনা নিষ্করুণা ভবন্তি।" বিদায়ের সময়ে আমরা কোন্ আশ্রমের লোক জিজ্ঞাসা করিয়া যখন আমাদিগকে গৃহী বলিয়া জানিলেন, তখন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপ্ বড়া কঠিন আশ্রম লিয়া।"

বুদ্ধগয়া—চন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমরা একদিন বুদ্ধগয়া দর্শন করিতে গমন করিলাম। গয়া হইতে কয়েক মাইল দূরে বুদ্ধগয়া অবস্থিত। ইহা মহাত্মা গৌতম বুদ্ধের সাধন ক্ষেত্র। এখানেই তিনি ষড়বর্ষব্যাপী মহাতপস্যা করিয়া সেই স্মরণীয় জম্বুবৃক্ষ তলে সিদ্ধিলাভ করেন। মহারাজ অশোক সেই স্থলে এক প্রকাণ্ড ত্রিতল মন্দির নির্মাণ করিয়া বৌদ্ধকীর্তি চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। ইতিপূর্বে ঐ মন্দিরের একতল ও চত্বরের চারি পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র মন্দিরগুলি মৃত্তিকাতলে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল; আমরা যখন ঐ মন্দির দেখিতে যাই, তখন বঙ্গের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সার এসলি ইডেন সাহেব ঐ মন্দিরের প্রোথিতাংশ উদ্ধার করিয়া উহাকে সুসংস্কৃত করিয়াছিলেন। এখন এই মন্দির ও তাহার যাবতীয় সম্পত্তি হিন্দু পাণ্ডাদিগের অধিকারে আছে। আমরা সমস্ত দিন তথায় ছিলাম, দিবসের অধিকাংশ সময় মন্দিরের তৃতীয় তলস্থ প্রকাণ্ড বৌদ্ধমূর্তির পদতলে বসিয়া ধ্যান প্রার্থনা ও বুদ্ধচরিত্র চিন্তায় যাপন করিলাম। অপরাহ্নে নিরঞ্জন নদী ও উরুবিল্ব গ্রাম দেখিতে গেলাম।

এখন এই নদীকে লীলাজান ও গ্রামকে উড়াইল কহে। নদী প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, গ্রামে অতি সামান্য কয়েক ঘর প্রজার বসতি ; তদ্ভিন্ন দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। একজন প্রদর্শক ব্রাহ্মণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন ; আমরা তাঁহাকে বৌদ্ধ ইতিহাসে বিখ্যাত স্থান ও ঘটনা সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম ; তিনি বড় একটা বেশী কিছু জানেন না। যাহা হউক, পরিশেষে তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি ব্রাহ্মসমাজের লোক ? একথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলাতে তিনি উত্তর করিলেন, ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাই বুদ্ধদেবের কথা জানেন ও জিজ্ঞাসা করেন, হিন্দুরা এ বিষয়ে কিছু বলেন না, তাঁহারা বুদ্ধমূর্তিকে বিষ্ণুমূর্তি বলিয়া পূজা করিয়া চলিয়া যান।

কাশী—এই সেই ইতিহাস-বিখ্যাত ব্যাস-বর্ণিত পুণ্যভূমি বারণসী ! গঙ্গার অপর পার হইতেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি, মনোহর অট্টালিকারাজি পরিশোভিত কাশীর অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া প্রাণে এক বিস্ময়ভক্তি মিশ্রিত পবিত্রভাবের উদয় হইল। তখন গঙ্গায় পুল হয় নাই। আমরা নৌকারোহণে মুগ্ধনেত্রে কাশীর শোভা দেখিতে দেখিতে গঙ্গা পার হইলাম। কাশীতে আমরা দুদিন মাত্র ছিলাম। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতি, অন্নপূর্ণার মন্দিরে অন্নচ্ছত্র, দশাশ্বমেধের ঘাটে অনির্বাণ চিতাগ্নি এবং মানমন্দিরে হিন্দুর জ্ঞানগরিমার শেষ চিহ্ন দর্শন করিয়া ভক্তি বিস্ময় ও আনন্দে চিত্ত মুগ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কাশীর সেই বিষয়কোলাহল, অধিবাসীদিগের ধনতৃষ্ণা ও বাঙ্গালীদিগের দুরাচারের কাহিনী সকল শুনিয়া আমার নিকট কাশী-মাহাত্ম্য অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। বলিতে কি, গয়াতে যেমন তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিয়াছিলাম, কাশীতে সেরূপ কিছু পাইলাম না। তবে একথা সত্য যে, যেখানে মহাত্মারা বাস করেন তথায় যাইতে পারি নাই, কোন সিদ্ধ পুরুষের সঙ্গেও দেখা হয় নাই।

লক্ষ্ণৌ—আমার ভগিনীপতি গোপালবাবু তখন লক্ষ্ণৌ নগরে কর্ম করিতেন। ভগিনীর গৃহে দুদিন মাত্র বাস করিয়া লক্ষ্ণৌনগরের নবাবী কীর্তি ও উদ্যানশোভা দর্শন করিয়া কাণপুরের পথে তাড়াতাড়ি যাত্রা করিলাম। কারণ, নবকুমারের সঙ্গে আমাদিগকে কন্যা দেখিতে আগ্রা যাইতে হইবে। কাণপুরে তৎকালপরিচিত ব্রাহ্মবন্ধু বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষ

মহাশয়ের গৃহে একদিন মাত্র থাকিয়া তথাকার দর্শনীয় বিষয়গুলি দেখিয়া লইলাম।

আগ্রা—বাঙ্গালীর প্রিয় সঙ্গীত "নির্মল সলিলে"র কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। ইঁহার কন্যা কুমারী দুর্বলার সহিত আমাদের স্নেহাস্পদ শ্রীমান নবকুমারের বিবাহসম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল; এখানে আমাদের আদর যত্নের সীমা ছিল না। দুই এক দিনেই পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। প্রত্যহ একত্রে উপাসনা ও সংগীতাদি হইত। আমাদের বাল্য-বন্ধু প্রফেসর কালীপ্রসন্ন রায় এম. এ, তখন আগ্রায় ছিলেন; তিনি তখন খুব সেতার-প্রিয় ছিলেন। "কত রঙ্গ জান তুমি রঙ্গময়ী মাগো আমার" এই গানটী তখন নূতন বাহির হইয়াছে, আমাদের মুখে উহা শুনিয়া সকলে খুব আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন; কালীপ্রসন্ন বাবু উহা সেতারে অভ্যাস করিয়া লইলেন। আগ্রায় তিন চার দিন থাকিয়া তাজমহল, আগ্রার দুর্গ এবং আকবর ও নুরজাহানের পিতার সমাধি-মন্দির প্রভৃতি দেখিয়া লইলাম। এক দিন তটশালিনী যমুনার তীরে বসিয়া গোবিন্দবাবুর মুখে "নির্মল সলিলে বহিছ সদা" গানটী শুনিয়া অতীত স্মৃতিতে চিত্ত অভিভূত হইয়াছিল।

নবকুমারের বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইল। তিনি কয়েক দিনের জন্য আগ্রায় রহিলেন। আমরা মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু আমার শরীর অসুস্থ হওয়াতে কাণপুরের পথে লক্ষ্ণৌ ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। অমরবাবু বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে গমন করিলেন। আমি কিছু দিন লক্ষ্ণৌ বাস করিলাম। এই সময়ে ১৮৮৪ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীমতী সারদার পঞ্চম কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। শিশুটীর চটুল নয়ন ও মুখের গঠন দেখিয়া কালে এই কন্যা প্রতিভাশালিনী হইবে বলিয়া মনে হইয়াছিল। কন্যার পিতা উহার নাম ভক্তিশীলা রাখিয়াছিলেন, পরবর্তী সময়ে ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া আমি তাহার নাম রাখিয়াছি ভক্তিসুধা।

অমরবাবু নানা দেশ পর্যটন করিয়া পুনরায় লক্ষ্ণৌ ফিরিয়া আসিলেন। আমরা তিন মাস পরে আবার একত্রে ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসিলাম। গৃহে আসিয়া দেখিলাম, আমার পূজনীয়া মাতৃদেবী কোন পারিবারিক কারণে

দিদি ঠাকুরাণীকে সঙ্গে করিয়া আমার বাসায় আসিয়া স্থিতি করিতেছেন। প্রায় এক বৎসরকাল মা আমার গৃহে ছিলেন, আমার পক্ষে ইহা আশাতীত সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছিল। এই সময়ে শ্রীমান গুরুদাস চক্রবর্তী সিটি-স্কুলের শিক্ষক হইয়া এখানে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমি পশ্চিমে গেলে তিনিই শাখা সমাজ ও সঙ্গতের কার্যাদি নির্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি তখন হইতেই আমার কার্যক্ষেত্রে এক প্রধান সহায় হইয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

(১৮৮৫—১৮৮৬)

১৮৮৫ সাল, মাঘ মাস। ষট্‌পঞ্চাশৎ মাঘোৎসব মহোৎসাহে সম্পন্ন হইল। এবার সমাজের বার্ষিক উৎসব ও মাঘোৎসব অবিচ্ছেদে অষ্টাদশ দিন ব্যাপিয়া চলিয়াছিল। অতঃপর কয়েক বৎসর এই রূপেই এই মহোৎসব সম্পন্ন হইত। তখন আমাদের বেশ জনবল ছিল; অনেকেরই ধর্মে অনুরাগ ও কর্মে উৎসাহ ছিল। সুতরাং এই দীর্ঘকাল ধরিয়া উৎসব করিতে কোন অসুবিধা বোধ হয় নাই। এই উৎসব-সময়ে আমার ২য় পুত্র শ্রীমান উৎসবানন্দের নামকরণ ও চন্দ্রমোহনবাবুর ১ম পুত্র শ্রীমান সুধাংশুমোহনের জাতকর্ম হয়। এবারকার মাঘোৎসবের কতক কার্য মন্দিরে, কতক আমার বাড়ীতে চন্দ্রাতপতলে সম্পন্ন হইল। তখন উভয় সমাজের উৎসব একই মন্দিরে স্বতন্ত্র সময়ে সম্পন্ন হইত, একদল আসিতেই অন্য দল চলিয়া যাইতেন। ইহাতে আমাদের মনে লজ্জা ও ক্লেশ জন্মিত। এইরূপ ব্যবস্থা আর ভাল লাগিত না। আর ঐ মন্দির সহরের বাহিরে থাকাতে সর্বসাধারণের পক্ষে সর্বদা উপস্থিত হওয়া কঠিন হইত। এই সকল কারণে শহরের মধ্যস্থলে একটী স্বতন্ত্র মন্দির প্রস্তুত করিতে আমাদের একান্ত ইচ্ছা হইল। শ্রদ্ধেয় শরৎবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে সর্বদাই আলোচনা হইত, কিন্তু আমরা ত কয়েকটী দরিদ্র ও নগণ্য লোক, আমাদের পক্ষে এমন গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব কি না, বুঝিতে পারিতাম না। এমন সময়ে একটী দৈব ঘটনায় আমাদের সকলের মনেই ঐ ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল।

মন্দিরের স্বত্বত্যাগ

১৮৮৫ সালের জুন মাসে স্কুলবন্ধের সময়ে এখানে এক প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছিল। ইহাতে সহরের অনেক পুরাতন অট্টালিকা পতিত ও ভগ্ন হইয়াছিল। আমার বৃদ্ধা জননী তখন আমার গৃহে ছিলেন। ভূমিকম্প সময়ে আমি সর্বাগ্রে তাঁহাকে গৃহের বাহিরে লইয়া গেলাম, কারণ আমার মা অন্ধ ছিলেন। এই ভূমিকম্পে আমাদের ব্রহ্মমন্দির ভগ্ন হইল, উহার ছাদ

পড়িয়া গেল। আমরা পুনরায় গৃহহীন হইলাম; আমার বাসার ক্ষুদ্র গৃহেই সমাজের কার্য নির্বাহ হইতে লাগিল।

এই ঘটনায় আমাদের স্বতন্ত্র মন্দির নির্মাণের ইচ্ছা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল, আমরা কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। সর্বপ্রথমে আমি ও শরৎবাবু এই নগরের অধিপতি মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য বাহাদুরের নিকট গমন করিলাম, তাঁহাকে আমাদের এই অভাব জ্ঞাপন করিয়া একটু স্থান প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমাদের কার্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া স্থান নির্দেশ করিতে বলিলেন, আমরাও স্থানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম।

তখন এখানে নববিধান মণ্ডলীতে অতি অল্পসংখ্যক লোক ছিলেন, ইতিপূর্বে মহিমবাবু প্রচারব্রত গ্রহণাভিলাষী হইয়া ঢাকায় গমন করেন, কালীকুমারবাবুও বরিশালে বদলি হইয়া গেলেন। এক বিহারীকান্ত ভিন্ন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম কেহ রহিলেন না। কার্যত বসন্তবাবুর উপরেই সমাজের ভার পড়িল। তিনিই তখন উক্ত সমাজের সম্পাদক ছিলেন। সমাজের এই অবস্থায় জঙ্গলবাড়ীনিবাসী প্রচারক ভ্রাতৃদ্বয় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীননাথ ও চন্দ্রনাথ কর্মকার এখানে স্থায়ীরূপে বাস করিয়া স্থানীয় নববিধান সমাজ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের আগমনে সমাজের মৃতভাব দূর হইতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরে উক্ত প্রচারক মহাশয়দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু বৈদ্যনাথ কর্মকার এখানে আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলেন এবং এই নগরে স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিলেন। দীনবাবু আমাকে বলিলেন, আমরা ত পৃথক মন্দির করিতে পারিব না, আপনারা স্বতন্ত্র মন্দির করুন, আমরা ভিক্ষা করিয়া পুরাতন ভগ্ন মন্দির মেরামত করিয়া লইতে চেষ্টা করি। এই প্রস্তাবই কার্যে পরিণত হইল।

পুরাতন মন্দিরের তৈজসপত্রগুলি উভয় সমাজ সমান ভাগে গ্রহণ করিলেন। আমরা ভূমির মূল্য স্বরূপ দুই শত টাকা পাইব এরূপ নির্ধারিত হইল। বসন্তবাবু বলিলেন, আমাদের হাতে তো টাকা নাই, সংগ্রহ করিয়া ক্রমে দিব; আমাদের পক্ষে ইহাতে আপত্তি হইল, যখন সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা গেল, তখন আর ভবিষ্যতের জন্য গোলযোগ রাখা কেন? সহজে মীমাংসার জন্য আমি বসন্তবাবুকে ২০০৲ টাকা বিনা সুদে ধার দিলাম, তিনি ঐ টাকা দ্বারা কার্য নির্বাহ করিলেন। এইরূপে আমাদের

পুরাতন প্রিয় মন্দিরের সহিত সকল সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইল। ইহার কিছুদিন পরে ভক্তিভাজন বঙ্গবাবু এখানে আসিয়া এই মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইলেন। আমি টাকা ধার দিয়াছি, আবার সম্পাদকরূপে ঐ টাকা আমিই গ্রহণ করিয়াছি, শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, এ যে "শিবের কন্যা শিবেই দান" হইয়াছে।

আত্ম-কথা

১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি জেলাস্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হইলাম। ইতিপূর্বে ১৮৮৩ সালে উক্ত স্কুলের প্রাচীন প্রধান পণ্ডিত মাননীয় ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় পেনশন গ্রহণ করাতে হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত রত্নমণি গুপ্ত মহাশয় আমাকেই তৎপদে উন্নীত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তখন সুপ্রসিদ্ধ সি, এ, মার্টিন সাহেব স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন; তিনি শিক্ষকদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহাদের পদোন্নতির জন্য সর্বদাই যত্ন করিতেন। তৎকালে বিক্রমপুরনিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় কুমিল্লা জেলাস্কুলের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ইনি অতিশয় উৎসাহী লোক এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মার্টিন সাহেব তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার প্রার্থনায় তাঁহাকে ময়মনসিংহে বদলি করিয়া আমাকে কুমিল্লা জেলাস্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করা হইল। স্থানীয় হার্ডিঞ্জ স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু বাবু ঈশানচন্দ্র রায় আমার পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু আমি তখন ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায়ও যাইতে পারি না। ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর সেই ভগ্নদশায় এই দীন সেবকের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া অনুভব করিলাম। সুতরাং সাহেবের এই কৃপার দান গ্রহণ করিতে না পারিয়া সানুনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। ইহাতে আত্মক্ষতি অপেক্ষাও আমার বন্ধু ঈশানবাবুর অধিক ক্ষতি হইল দেখিয়া আন্তরিক দুঃখিত হইলাম।

বিধাতার কৃপায় আমার ক্ষতি শীঘ্রই পূরণ হইয়া গেল। দুই বৎসর না যাইতেই চন্দ্রকান্ত বিদ্যারত্ন চট্টগ্রামে উচ্চতর পদে গমন করিলেন, আমি আমার প্রিয় স্কুলের প্রধান পণ্ডিত হইলাম। জীবনের সকল ঘটনাতেই এই

সত্যের পরিচয় পাইয়াছি যে, প্রভুর কার্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিলে কেহ কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। আমার সকল অভাব তাঁহারই কৃপায় পূর্ণ হইয়াছে, তিনি এই ক্ষুদ্র জীবনে তাঁহার বিশ্বস্ততা চিরদিন অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন।

সাধকমণ্ডলী গঠন

ব্রাহ্মসমাজের আত্মকলহে ব্রাহ্মদিগের নানারূপ ক্ষতি হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রধান এই যে, পরস্পরের দোষ দর্শন, কার্যের সমালোচনা এবং দলের প্রাধান্য স্থাপন ও পরনিন্দা করিতে যাইয়া অনেকেরই মন শুষ্ক, উপাসনায় বীতরাগ এবং বিশ্বাস ভক্তির অভাব হইতেছিল। এই সকল বিরুদ্ধ ভাব দূর হইয়া যাহাতে মণ্ডলী মধ্যে ধর্মের উচ্চ ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য শাখা সমাজের কতিপয় ধর্মোৎসাহী যুবককে লইয়া একটি সাধকমণ্ডলী গঠন করা গেল। শ্রীমান রজনীকান্ত গুহ, অশ্বিনীকুমার বসু, বঙ্কবিহারী দাস ও দ্বারকানাথ সরকার তন্মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। শ্রীমান রজনীকান্ত তাঁহার স্মৃতি পুস্তক হইতে এই সাধন-বিধিগুলি আমাকে লিখিয়া দিয়াছেন। নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত হইল।

"১৮৮৪ সালের পূজার ছুটীর পূর্বে আপনি জেলাস্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদে উন্নীত হন। এই সময়ে বিশেষ ভাবে সাধন-বিধি গ্রহণের জন্য আপনি ব্রাহ্ম যুবকদিগকে আহ্বান করেন; তদনুসারে আমরা কয়েকটী যুবক উক্ত সালের ২রা আশ্বিন প্রতিজ্ঞাপূর্বক এই বিধি গ্রহণ করি। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময় হইতেই আমার জীবনে যথাকথঞ্চিৎ ধর্ম সাধন আরম্ভ হয়। আমি এই সাধন-বিধি হইতে প্রচুর উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। নিম্নে উহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

সাধন বিধি

(ধর্মপ্রবেশার্থীর জন্য)

বিশ্বাস

১। এক ঈশ্বর, এক ধর্ম, এক পরিবার।

২। ঈশ্বর পিতা, নরনারী ভাই ভগিনী।

৩। জীবন্ত ও ক্রীয়াশীল বিধাতাপুরুষ নিত্য জীবের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন।

৪। প্রত্যক্ষভাবে তাঁহা হইতে জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য লাভ করিয়াই মনুষ্য ধর্মজীবনে অগ্রসর হয়।

৫। সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছা জীবনে সম্পন্ন হইতে দিলেই মানব পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়।

৬। সরল ও ব্যাকুল প্রার্থনাযোগে ভগবানের করুণা জীবনে অবতীর্ণ হয়।

৭। সকল দেশের ও সকল জাতীয় মহাত্মারা আমাদের নমস্য ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

৮। মনুষ্য দৃষ্টান্তমাত্র, আদর্শ কেবল সেই এক মহান ঈশ্বর।

নিত্য কর্ম

১। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গে ঈশ্বরের করুণা ও স্নেহ স্মরণ করিয়া প্রণাম করিবে।

২। কার্য আরম্ভের পূর্বে বিধাতার বিদ্যমানতা স্মরণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইবে।

৩। স্নানান্তে পবিত্র হৃদয়ে প্রার্থনা করিবে।

৪। কৃতজ্ঞচিত্তে অন্নদায়িনী জননীকে স্মরণ করিয়া আহার গ্রহণ করিবে।

৫। বিদ্যালয়ে বা কার্যক্ষেত্রে ঈশ্বরের আবির্ভাব মনে রাখিবে।

৬। যথাসময়ে নিষ্ঠার সহিত দৈনিক উপাসনা করিবে।

৭। দিনান্তে বা শয়ন সময়ে সমস্ত দিনের অবস্থা চিন্তা করিবে এবং পাপের জন্য অনুশোচনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা ও বল প্রার্থনা করিবে।

৮। শয়ন সময়ে ঈশ্বরের মাতৃভাব বিশেষরূপে স্মরণ করিবে এবং মা'র ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছি, এই ভাব লইয়া পবিত্র মনে নিদ্রিত হইবে।

বিধি

১। সদুৎসাহে সৎকার্যে নিযুক্ত থাকিবে।

২। পরগুণে সমাদর ও পরদোষে ক্ষমা প্রদর্শন করিবে।

৩। সপ্তাহান্তে নিয়মিতরূপে সমবিশ্বাসীদিগের সহিত সামাজিক উপাসনা করিবে।

৪। ধর্মবন্ধুদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিবে।

৫। সঙ্গতসভায় সরলহৃদয়ে মন খুলিয়া আলোচনা করিবে।

৬। সাধুগ্রন্থ অধ্যয়ন, সাধুজনের সংসর্গ, সাধুচিন্তা ও সাধু আলাপে অবকাশ সময় যাপন করিবে।

৭। মনঃসংযম ও আত্মচিন্তার জন্য সময় সময় নির্জ্জনে গমন করিবে।

নিষেধ

১। কটু কথা ও কর্কশ ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে।

২। পরের দোষ লইয়া আমোদ করিবে না।

৩। কুসংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

৪। ধর্ম লইয়া বৃথা তর্ক ও কলহ করিবে না।

৫। অসৎ গ্রন্থ পাঠ, অসদালাপ ও অসৎ চিন্তা পরিত্যাগ করিবে।

৬। কাহাকেও হেয় জ্ঞান করিয়া ঘৃণা করিবে না।

৭। আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া সর্বপ্রকার অভিমান পরিত্যাগ করিবে, কদাপি অহঙ্কার করিবে না।

৮। আহারে লোভ, বেশভূষায় বিলাস, কর্মে আলস্য, ব্যবহারে অবিনয় ও আমোদে অবিশুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিবে।

প্রতিজ্ঞা

আমি শ্রী··· পবিত্র ধর্মজীবন লাভের জন্য কৃতসংকল্প হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক এই সকল সাধন-বিধি গ্রহণ করিলাম। করুণাময় পরমেশ্বর এই প্রতিজ্ঞা পালনে আমার সহায় হউন।

মাণিকদহে শারদীয় উৎসব

মাণিকদহ ফরিদপুর জেলার একটী প্রসিদ্ধ স্থান। মাণিকদহবাসী বাবু মহিমচন্দ্র রায় পূর্ববঙ্গে আপামর সাধারণের পরিচিত। কোন পারিবারিক দুর্ঘটনাবশত এই বংশের এক শাখা একবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল! এই মহিমবাবুর পুত্রই স্বনাম-প্রসিদ্ধ বাবু বিপিনচন্দ্র রায়। ইনি সপরিবারে

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া এই ধর্মের উন্নতির জন্য প্রাণমন ও ধন সম্পত্তি সকলই অর্পণ করিয়াছিলেন। জমিদারীর প্রধান প্রধান কর্মে ব্রাহ্মদিগকে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় গ্রামে অনেকগুলি ব্রাহ্মপরিবার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং গ্রামে গ্রামে স্কুল ও ডাক্তারখানা স্থাপন করিয়া প্রজাকুলের হিতসাধনে সতত নিযুক্ত ছিলেন। মাণিকদহে এবং তদীয় বিস্তৃত জমিদারীর নানা স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বিপিনবাবুর গৃহে প্রতিবৎসর মহাসমারোহে শারদীয় উৎসব হইত। নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মগণ নিমন্ত্রিত হইয়া এই উৎসবে উপস্থিত হইতেন। ১৮৮৫ সালের আশ্বিন মাসে ময়মনসিংহ হইতে বাবু শরৎচন্দ্র রায়, চন্দ্রমোহন বিশ্বাস প্রভৃতি আমরা কয়েকজন উক্ত উৎসবে গমন করিলাম। তখন ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে মাত্র, রীতিমত গাড়ী চলে নাই। পূজার সময়ে কতকগুলি মালগাড়ী জুড়িয়া একখানি ট্রেণ যাত্রিগণের জন্য দেওয়া হইল। আমরা একখানি গাড়ী পাইলাম, বন্ধুবর শ্রীনাথ ভট্টাচার্য, কালীনারায়ণ সান্যাল প্রভৃতি আমাদের সহযাত্রী হইলেন। পথে জয়দেবপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে একখানি মালগাড়ী ভাঙ্গিয়া রেলচ্যুত হইল, বড়বাসায় চন্দ্রকান্তবাবু প্রভৃতি ঐ গাড়ীতে সপরিবারে ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ড্রাইভার উহা দেখিতে পাইয়া গাড়ী থামাইল। রেলপথ অবরুদ্ধ হওয়াতে ৪।৫ ঘণ্টা কাল তথায় প্রতীক্ষা করিতে হইল। রাত্রি ৯টার সময় আমরা ঢাকাতে পঁহুছিলাম। তথা হইতে শ্রদ্ধেয় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মাণিকদহ-যাত্রী ব্রাহ্মগণের সহিত গোয়ালন্দে উপস্থিত হইলাম। তথায় বিপিনবাবুর প্রেরিত নৌকা ও লোকজন খাদ্যসামগ্রীসহ উপস্থিত ছিল। কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ শাস্ত্রী ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ, বরিশাল হইতে শ্রদ্ধেয় গিরিশবাবু ও তদীয় পত্নী শ্রদ্ধেয়া মনোরমাদেবী প্রভৃতি আসিলেন। গোয়ালন্দে প্রায় ১৫০ শত ব্রাহ্মব্রাহ্মিকার সমাগম হইল; আমাদের নৌকাগুলি ব্রহ্মনামের নিশান তুলিয়া একে একে মাণিকদহের দিকে যাত্রা করিল।

বিপিনবাবুর বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে তিনদিন ব্যাপিয়া ব্রহ্মোৎসব হইল। পূর্বে দুর্গোৎসবে তাঁহার গৃহে যেরূপ বাদ্যভাণ্ড ও নহবৎ প্রভৃতি হইত, যেরূপ লোকজনের সমাগম ও গরীবদুঃখীর দানাদি হইত, সেইরূপ সকলই হইল।

উপাসনা, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, সদালোচনা ও একত্রে আহারাদি মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। শ্রদ্ধেয়া মনোরমাদেবীকে এইবার প্রকাশ্য বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতে দেখিলাম। দশহরার দিন নদীতটে বিসর্জনের মেলায় ব্রাহ্মদিগের বক্তৃতাতেই অধিক লোক আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমার বন্ধু বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র তখন বিপিনবাবুর ম্যানেজার ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "সঙ্গীত সম্প্রদায়" একদিন আনন্দচন্দ্রের রচিত বাউল সঙ্গীত গাহিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছিল।

সপ্তপঞ্চাশৎ মাঘোৎসব

১৮৮৬ সালের মাঘমাস নিকটবর্ত্তী হইল। উৎসবের জন্য সকলের প্রাণে ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল। এই সময়ে কোন কোন কারণে আমাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল। একটী কারণ জেলাস্কুল ও ইনৃষ্টিটিউশনের মধ্যে অযথা প্রতিযোগিতা। জেলাস্কুলের উচ্চশ্রেণীর ভাল ভাল ছাত্রগণ নূতন স্কুলে চলিয়া যাইতেছিল, ব্রাহ্ম ছাত্রগণ অনেকে চলিয়া গেল। বাবু অমরচন্দ্র দত্ত, নবকুমার সমাদ্দার, শশিকুমার বসু, গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, ও গোলকচন্দ্র দাস তখন নূতন স্কুলের ব্রাহ্মশিক্ষক ছিলেন। ইঁহারা সকলেই জেলাস্কুলের হেডমাষ্টার রত্নমণি গুপ্ত মহাশয়ের ছাত্র। কেহ তাঁহার গৃহে পালিত। আমি তখন জেলাস্কুলের পণ্ডিত। রত্নমণিবাবু আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, এবং সকল কার্য্যেই একান্ত নির্ভর রাখিতেন। আমি দেখিতাম, এখানে দুইটী স্কুলের বেশ স্থান আছে, ছাত্র লইয়া কাহারও মনে কষ্ট দিবার বা অপ্রীতি জন্মাইবার কোন কারণ নাই। এজন্য আমি নূতন স্কুলের শিক্ষক ও ব্রাহ্ম ছাত্রগণের সকল ব্যবহারের অনুমোদন করিতে পারি নাই। তজ্জন্যও তখন মণ্ডলী মধ্যে সকলের মনোভাব উত্তম ছিল না।

অধুনা ব্রজমোহন কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীমান রজনীকান্ত গুহ এম্, এ, তখন জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন, তিনি এইবার মাঘোৎসবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ; এবারের বিবরণ তাঁহার লিখিত স্মৃতিলিপি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"এই বৎসর পূজার ছুটীর পর হইতে পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হয়। তাহার ফলে নবেম্বর মাসে (১৮৮৫)

আমি এক মণ্ডলীভুক্ত হই। স্বদেশসেবা তাহার মূল মন্ত্র ছিল। এই সময়ে আমার মনে এই সঙ্কল্পের উদয় হয় যে, দেশীয় বিদ্যালয় থাকিতে আমি সরকারী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিব না। আমি তখন জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রত্নমণি গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে বাস করিতে-ছিলাম। ২৩শে নবেম্বর আমি ঐ গৃহ ও জেলা স্কুল ত্যাগ করিয়া বর্তমান সিটি স্কুলে ভর্তি হই। ইহার কিছুকাল পরে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইবার সঙ্কল্প আমার মনে দৃঢ় হয়; এবং যথাসময়ে উহা আপনার ও গুরুদাসবাবুর নিকট জ্ঞাপন করি।

ইহার কিছুদিন পূর্বে আপনি নববিধান সমাজের উৎসবে নগর সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ আপনার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। তৎপর আমার জেলা স্কুল ত্যাগ আপনি তেমন অনুমোদন করিতে পারেন নাই; এজন্য সমাজ মধ্যে একটু মনোমালিন্যের সঞ্চার হয়। ইহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে মাঘোৎসব আরম্ভ হইবার কিছুদিন পূর্ব হইতে আপনি ও গুরুদাসবাবু প্রতিদিন প্রাতঃকালে মিলিত হইয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন; এবং বোধকরি আপনাদিগের আকুল প্রার্থনার ফলেই ১২৯২ সালের মাঘোৎসবে ভগবানের অপার কৃপা বর্ষিত হয়। এবার গুরুদাসবাবুর গৃহে উৎসব সম্পন্ন হয়, শাখাসমাজের সভ্যগণ উৎসাহের সহিত গৃহ ও প্রাঙ্গন সজ্জিত করেন। আমি তখন গুরুদাসবাবুর গৃহে বাস করিতাম। ১লা মাঘ হইতে প্রস্তুতির উপাসনা আরম্ভ হয়। আমরা প্রত্যুষে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া আসিতাম, উপাসনার পর ৫।৭ জনের জন্য প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন ১০।১২ জনে ভোজন করিতাম। আমার বেশ মনে আছে, আপনি ভাত, ডাল ও অন্যান্য উপকরণ একত্রে মাখিয়া আমাদের হাতে তুলিয়া দিতেন, আমরা মহানন্দে তাহা গ্রহণ করিতাম।

১১ই মাঘ প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে আপনি আচার্যের কার্য করেন। রাত্রির উপাসনার পর বঙ্কবিহারী দাস* ও আমি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত

* এই বঙ্কবিহারী টাঙ্গাইল অঞ্চল নিবাসী ও কৈবর্ত্ত-জাতীয় ছিলেন। জেলা স্কুলে অধ্যয়ন সময়ে ব্রাহ্মধর্মে অনুরক্ত হন। পরে এই ধর্মে দীক্ষিত হইয়া স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত ও আমার গৃহে স্থান লাভ করেন। ইনি অতিশয় বিনয়ী, ধর্মোৎসাহী সচ্চরিত্র যুবক

হই। গুরুদাসবাবু আমাদিগকে দীক্ষার জন্য উপস্থিত করেন; আপনি উদ্দীপনা পূর্ণ সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করেন। এই উপলক্ষে যথেষ্ট লোক সমাগম হইয়াছিল। এই দিনের উজ্জ্বল চিত্র এখনও মনে মুদ্রিত রহিয়াছে।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের আগমন

এই বৎসর (১৮৮৬ সালের এপ্রিল মাসে) নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এখানে আগমন করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের ময়মনসিংহে এই প্রথম আগমন। তাঁহাকে পাইয়া আমাদের কত উৎসাহ হইয়াছিল বলা যায় না। কয়েকটী উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবক তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কাওরাইদ হইতে আমাদের শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভাবুক ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার দলবল সহ আগমন করিলেন। মহোৎসাহে নববর্ষের উৎসব সম্পন্ন হইল। একদিন আমার গৃহে ব্রাহ্মদিগের সম্মিলন ও প্রেমভোজ হইয়াছিল। উপাসনা, কীর্তন ও ভাবোচ্ছ্বাসে সে এক অপূর্ব ব্যাপার হইযাছিল। একটী সুগায়ক ব্রাহ্ম যুবক ফিকিরচাঁদের নব রচিত "ভব পারের তরী তোদের লেগেছে তীরে" এই গানটী গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন; গুপ্ত মহাশয়ের "ওঁ ব্রহ্ম" ধ্বনিতে দশদিক প্লাবিত হইতে ছিল। আমার প্রশস্ত আঙ্গিনায় শতাধিক ব্রাহ্ম ও বন্ধুগণ আহারে বসিলেন। আহার সময়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের ও গুপ্ত মহাশয়ের নানা ভাবের কথায় সকলের মনে এক

ছিলেন। তৎকালে প্রসিদ্ধ ষ্টেশন মাষ্টার বন্ধুবর নিমচাঁদ দে মহাশয়ের জামাতা বাবু বেচারাম-বসু ডাকবিভাগে কর্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মদেশে গমন করেন, বঙ্কবিহারীও তাঁহার সঙ্গে ঐ দেশে যাইয়া ডাকবিভাগে কর্ম প্রাপ্ত হন। পরে ব্রাহ্মসমাজে একটি ভদ্র বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার বড়ই সাধ ছিল যে, শেষ বয়সে ব্রাহ্মপল্লীতে বাড়ী করিয়া আমাদের সঙ্গে একত্রে থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। কয়েকটী শিশু সন্তান ও বিধবা পত্নী রাখিয়া অকাল কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। বেচারামবাবুর কৃপায় অসহায় বিধবা সন্তানসহ স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। আহার করিতে করিতেই সঙ্গীত ধ্বনি উঠিল—

ভবপারের তরী তোদের লেগেছে তীরে।
ওরে সকাতরে ডাকলে তাঁরে নেবে রে পারে,
জায়গার কমি নাই নায়েতে, জাতের বিচার নাই বসিতে,
(তোরা কে যাবি রে, ভবপারের তরণীতে)
চলে নাও দ্রুতগতিতে, এক হালের জোরে।
যদি নেয়ে মনে করে, ব্রহ্মাণ্ড নায়ে নিতে পারে,
(সামান্য নয় রে, এ তরী তরীর মত, বিশ্বসংসার নিতে পারে)
কিন্তু প্রেমিক ভিন্ন নিবে না রে, আস্‌তে হয় ফিরে।
ফিকির এখন ফিকির করে, না পেয়ে নাও কেঁদে মরে,
(আমার কি হল রে, ভব পারে যাওয়া হল না,
আগে তাঁরে প্রেম না ক'রে)
দয়াময়, পার কর মোরে, ডাকি কাতরে ॥

গাহিতে গাহিতে সমস্ত জনমণ্ডলী ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তখনই খোল করতাল আসিল, প্রমত্তভাবে ঐ মহাসঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। আমরা পরিবেশনকারিগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম। আহা, সে অপূর্ব দৃশ্য আর এ জীবনে দেখিব কি?

এখানে কয়েক দিন থাকিয়া শাস্ত্রী মহাশয় সদলে গুপ্ত মহাশয়ের কাছারী বাড়ী কাওরাইদ গমন করিলেন। আমরাও একদল তাঁহাদের সঙ্গী হইলাম। তখন কাওরাইদ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান মন্দির ও কাছারীবাড়ী প্রস্তুত হয় নাই; কিঞ্চিৎ দূরে পুরাতন কাছারীবাড়ী ছিল, একখানি তৃণ-কুটীরে ব্রাহ্মসমাজ হইত। তথায় দুই দিন উপাসনা, কীর্তন ও নানাবিধ ধর্মকথায় ব্রহ্মানন্দ ভোগ করা গেল। একদিন একখানি নৌকায় আরোহণ করিয়া নদীতে ভ্রমণ করা হইল। নৌকায় বসিয়া সেই ভবপারের তরীর গান গাহিতে গাহিতে সকলে ভাবোন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। সেই মহাভাবের আবেশ আজিও হৃদয়ে অনুভূত হয়।

সুখদা

সুপরিচিত বাঙ্গালা লেখক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় তৎকালে ময়মনসিংহে একজন সম্ভ্রান্ত মোক্তার ছিলেন। তাঁহার সহিত আমাদের সৌহার্দ ছিল। উমেশবাবু প্রসিদ্ধ কালিয়া গ্রামনিবাসী কুলীন বৈদ্য বংশোদ্ভব। তিনি একজন উদার মতাবলম্বী ও সমাজসংস্কারে অনুরাগী। ১৮৮৬ সালের আষাঢ় মাসে একদিন উমেশবাবু একটী হিন্দু বালবিধবার দুঃখের কথা আমাকে বলিলেন। ঐ বালিকা তাঁহারই সহোদরা ভগিনীর কন্যা। বালিকার পিতামাতা কন্যাসহ অষ্টমীস্নান উপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন; কন্যার পুনঃ পরিণযে অভিমত আছে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। আমি কন্যাটীর সকল বিবরণ অবগত হইয়া এবং ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে আমার গৃহে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলাম। এই কার্যে যে কঠোর নির্যাতন সহিতে হইবে তাহা জানিতাম, তথাপি অস্বীকার করিতে পারিলাম না। উমেশবাবু একদা রজনীতে তাঁহার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী সুখদাসুন্দরীকে আমার গৃহে রাখিয়া গেলেন।

পরদিন সহরময় আন্দোলন উপস্থিত হইল। কন্যার পিতা উমেশবাবুকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে স্পষ্ট কথা শুনিয়া তিনি স্থানীয় প্রধান প্রধান হিন্দু মহোদয়দিগের শরণাপন্ন হইলেন। আমার প্রতিবেশী বৈদ্যবংশীয় উকীল বাবু শ্রীকণ্ঠ সেন আসিয়া আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দিন কাটিয়া গেল। দেখিলাম, আমার বাড়ীর চতুর্দিকে কয়েকটী লোক দূরে দূরে থাকিয়া পাহারা দিতেছে। তন্মধ্যে উক্ত উকীল বাবুর মুসলমান চাকরদিগকেও দেখিলাম। মনে ভয় হইল; হয় ত ইহারা রাত্রিতে বলপূর্বক সুখদাকে লইয়া যাইবে। তখন অনেক রাত্রি, আর কাহাকেও সংবাদ দিতে পারিলাম না; বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্তী, বঙ্কুবিহারী দাস ও দ্বারকানাথ সরকার এই তিনটী ব্রাহ্ম যুবক তৎকালে আমার গৃহে ছিলেন। তাঁহাদিগকে নিয়া সাহসে ভর করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলাম। একটী সুপারী গাছ পতিত ছিল, তাহা দ্বারা কয়েকটি সুদীর্ঘ হলঙ্গা (বর্শা) প্রস্তুত করিলাম, তাহাই আমাদের সেই সংগ্রামের অস্ত্র হইল। তখন মনে কি দুর্জয় সাহসই আসিয়াছিল। মনে হইল, শত লোকও যদি আইসে, আমাদের এই চারিটী মাথা থাকিতে তাহারা গৃহের

চতুঃসীমাতেও আসিতে পারিবে না। যাহা হউক, রাত্রি নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। পরে শুনিলাম, আমরা পাছে সুখদাকে অন্যত্র প্রেরণ করি, এই আশঙ্কায় পাহারা রাখা হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে বাবু কালীশঙ্কর গুহ, অনাথবন্ধু গুহ, পরমানন্দ সেন, শ্রীকণ্ঠ সেন, ব্যারিষ্টার ঘোষ সাহেব, মোক্তার রমাপ্রসাদ বিষ্ণু প্রভৃতি স্থানীয় অনেক সম্ভ্রান্ত লোকসহ সুখদার পিতা আমার গৃহে উপস্থিত হইলেন। নানা কথা, তর্কবিতর্ক, শাসনবাক্য, ভয়প্রদর্শন এবং উপরোধ অনুরোধ চলিতে লাগিল। শেষে এই কথা উঠিল যে, কন্যার অনিচ্ছায় আমি তাঁহাকে গৃহে রাখিয়াছি, ইহা ধর্মত অন্যায়। আমি বলিলাম, কন্যার একান্ত ইচ্ছাতেই আমি তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছি। তিনি যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকিতে পারিবেন; তাঁহার অনিচ্ছায় তাঁহাকে এখান হইতে নিতে পারে, এরূপ শক্তি কাহারও নাই। এই সুদৃঢ় স্পষ্ট বাক্য শুনিয়া কেহ কেহ রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন, এবং আমি কেমন করিয়া উহাকে রক্ষা করি, শীঘ্রই তাহা দেখাইবেন বলিয়া শাসাইয়া গেলেন। শ্রদ্ধাস্পদ কালীশঙ্করবাবু প্রভৃতি সুবিবেচক ভদ্রগণ আমাকে বলিলেন, দেখুন, আমরা ত সকলই বুঝিতেছি, তথাপি কন্যার মুখে শুনিয়া যাইতে চাই, যে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আপনার গৃহে আসিয়াছেন। আমি সম্মত হইয়া কালীশঙ্করবাবুকে বলিলাম আপনি স্বয়ং কন্যার পিতাকে লইয়া অন্দরে গমন করুন, যতক্ষণ ইচ্ছা কন্যার নিকটে থাকিয়া তাঁহার অভিমত অবগত হউন, সে গৃহে আর কেহই থাকিবে না। কন্যা যদি পিতার সহিত যাইতে চাহেন, এই মুহূর্তে লইয়া যাইতে পারিবেন। সকলে সন্তুষ্ট হইলেন; আমাকেও তথায় উপস্থিত থাকিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমি গেলাম না।

তাঁহারা অনেকক্ষণ সুখদার নিকটে রহিলেন। কি কথাবার্তা হইল জানি না। তৎপর কালীশঙ্করবাবু আসিয়া সকলের সমক্ষে বলিলেন, "কন্যাটী নিজের ইচ্ছায় শ্রীনাথবাবুর গৃহে আসিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজেই থাকিবেন। তাঁহার পিতা অনেক বুঝাইলেন, ভয় দেখাইলেন, কান্নাকাটিও করিলেন, আমিও অনেক উপদেশ দিলাম, কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প অটল। অতঃপর আমাদের আর কিছু বলিবার নাই।" সুখদার পিতা নীরবে অশ্রুপাত করিলেন; সকলে ফিরিয়া গেলেন।

আমরা একটু নিশ্চিন্ত হইলাম। দুইদিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে আমি স্কুলে গেলাম; সুখদার মাতা আমাদের বাড়ীতে আসিলেন, উমেশবাবুকেও ডাকিয়া আনিলেন, তাঁহাকে আর কাছারীতে যাইতে দিলেন না। ভাবিলাম, ভাইবোনে কন্যা লইয়া পরামর্শ করিবেন। ৩ টার সময়ে শুনিতে পাইলাম, সুখদার পিতা কন্যা লাভের জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপে দরখাস্ত করিয়াছেন, তাঁর ১৩ বৎসরের কন্যাকে (বস্তুতঃ বয়স ২২ বৎসর) উমেশবাবু বলপূর্বক নিয়া শ্রীনাথ চন্দের গৃহে আটক রাখিয়াছেন, উহাকে মুক্ত করিয়া পিতার হস্তে দিতে আজ্ঞা হয়, ইত্যাদি। সাহেবও হুকুম দিয়াছেন, পুলিশ ইন্‌স্পেকটর এখনই কন্যাটীকে উদ্ধার করিয়া ২০০৲ টাকার জামিন লইয়া তাহার পিতার জেম্বায় রাখে, পরদিন মোকদ্দমা শুনা যাইবে। প্রসিদ্ধ দারোগা ৺নবকিশোর পাল স্বয়ং ৮ জন কনেষ্টবল সহ কন্যা উদ্ধারের জন্য বাহির হইলেন। উমেশবাবু কাছারীতে থাকিতে সহজে জানিতে পারিবেন, তজ্জন্যই তাঁহাকে পূর্বেই সরান হইয়াছিল। কূটবুদ্ধি চক্রীগণের পরামর্শে স্থির হইয়াছিল, তখনই মেয়ে উদ্ধার করিয়া পিতার হস্তে দেওয়া হইবে, তিনি কন্যাসহ একবারে বরিশালে চলিয়া যাইবেন, জামিনের টাকা সকলে চাঁদা করিয়া দিবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ হইল।

অত্যধিক আনন্দে বিহ্বল হইয়া দারোগাবাবু আবেদন পত্রের সকল কথা পড়িলেন না; সুখদা কোথায় আছে, সে কথা জানিলেন না; উমেশবাবু আসামী, সুতরাং কন্যাটী তাঁর গৃহেই আছে মনে করিয়া, সৈন্যসহ তাঁহার বাড়ী ঘিরিয়া বসিয়া রহিলেন; উমেশবাবু কাছারী হইতে আসিলে কন্যাকে বাহির করিয়া লইবেন। এদিকে কন্যার পিতা পুলিশের অপেক্ষায় আমার বাড়ীর চতুর্দিকে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছেন। কিন্তু পুলিশ আর আসে না! উমেশবাবুকে ত তাঁর ভগিনী আমার ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছেন, তিনিও বাড়ীতে যাইতে পারেন না; খালি বাড়ীতে পুলিশ কি করিয়া কন্যা উদ্ধার করিবে।

এমন সময়ে আমি খবর পাইলাম। তৎক্ষণাৎ গৃহে আসিলাম। তখন আর কাহারও সঙ্গে পরামর্শ করিবার সময় ছিল না, ভগবান বুদ্ধিতে যাহা যোগাইলেন, তাহাই করিলাম। কয়েকজন যুবক ব্রাহ্মকে খবর দিলাম, তাড়াতাড়ি পালকী আনাইলাম, সুখদাকে সকল কথা সংক্ষেপে বলিয়া

পালকীতে তুলিয়া লইলাম। পুলিশ আসিবার পূর্ব্বেই একবারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যাইতে হইবে। কয়েকটী উৎসাহী যুবক পিচের লাঠি হস্তে লইয়া আমাদের সঙ্গী হইলেন; উমেশবাবুকে উকীলের জন্য পাঠাইলাম। আমরা যেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি, অমনি সুখদার পিতা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দোহাই মহারাণীর, আমার কন্যাকে জোর করিয়া লইয়া যায় ইত্যাদি।" তাঁর মনে হইয়াছিল, আমরা সুখদাকে লুকাইতেছি। আমি বলিলাম, ভয় নাই, আপনি যে সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন, সুখদাকে তাঁহার নিকটেই লইয়া যাইতেছি, আপনিও আসুন। তখন তিনি নীরবে আমাদের অনুসরণ করিলেন। তখন অপরাহ্ণ; সাহেব এজলাস ছাড়িয়া প্রাইভেট রুমে গিয়াছেন। বারান্দায় পাল্কী রাখিয়া উকিলের অপেক্ষা করিতেছি, তখন সুখদার পিতা বলিলেন, একবার কন্যাকে দেখিতে চাই, একটি কথা বলিব, দয়া করিয়া অনুমতি দিন। আমি বলিলাম আপনি পাল্কীর ভিতর যাইয়া যাহা ইচ্ছা বলুন, কোন ভয় নাই। অনেকক্ষণ কথা হইল। পরে শুনিলাম, পিতা বলিয়াছিলেন, তুমি আমার নিকট থাকিতে চাহিও, নতুবা মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছি বলিয়া আমার জেল হইবে। সুখদা মহাসঙ্কটে পড়িয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। যাঁহারা তাঁহার জন্য এত করিতেছেন, মিথ্যা বলিয়া তাঁহাদিগকে বিপন্ন করিতে পারিলেন না।

তখন উকীল মৌলবী হামিদউদ্দিন সাহেব আসিলেন, হিন্দু উকীল পাওয়া গেল না। উমেশবাবু উকীলসহ সাহেবের প্রাইভেট রুমে যাইয়া সকল অবস্থা বুঝাইয়া বলিলেন। হিন্দু আমলাগণ প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন; পূর্ব্বেই হুকুম হইয়া গিয়াছে, আর কিছু হইবে না বলিয়া পেস্কারবাবু আমাদের বিদায় করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। সাহেব কন্যাকে স্বয়ং দেখিতে চাহিলে সুখদা সেই রুমে নীত হইলেন। উমেশবাবু ও আমি তাঁর দুইপার্শ্বে রহিলাম। লজ্জায় দুঃখে ও আশঙ্কায় সুখদার মুখ ম্লান হইয়াছিল, পা কাঁপিতেছিল; কিন্তু ইহার মধ্যেও একটী অটল সাহস ও নির্ভরের ভাব দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। সাহেব অতিশয় সম্মান সহকারে সুখদাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, একবার মাত্র তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া আদেশ

লিখিলেন, "এই কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা ও বিধবা ; ইঁহার ইচ্ছামতে ও আপন মাতুলের সম্মতি ক্রমে ইঁহাকে শ্রীনাথবাবুর গৃহে বা অন্যত্র থাকিতে অনুমতি দেওয়া গেল।" আমাকে বলিলেন, আপনি ইঁহাকে গৃহে নিয়া যান, আশা করি সৎপাত্রে ইঁহার বিবাহ দিতে পারিবেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম চারিদিকে জনসমুদ্র। সহরের লোক কাছারীতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সেই বিশাল জনতার মধ্যে আমরা কয়েকটী ক্ষুদ্র প্রাণী। আমার কোন হিতৈষী বন্ধু কানে কানে বলিয়া গেলেন, কন্যাকে সাবধানে নিও, পথে বল প্রকাশের আয়োজন হইতেছে। কিন্তু তখন মনে এরূপ দুর্জয় সাহস হইয়াছিল যে, সেই বিপুল জনমণ্ডলীকে যেন তৃণের ন্যায় বোধ হইতেছিল। কয়েকটী ব্রাহ্মযুবক যষ্টিহস্তে পালকীর অগ্রপশ্চাৎ চলিলেন, আমি ও উমেশবাবু দুইদিকে দরজার নিকটে রহিলাম। ধীরে ধীরে জনসমুদ্র ভেদ করিয়া আমরা গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। তখনকার ষ্টেশনমাষ্টার বন্ধুবর নিমচাঁদ দে মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন, তিনি খবর পাইয়া আমার সাহায্যের জন্য কতকগুলি পশ্চিমা লোক পাঠাইয়াছিলেন ; দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া মনে ভয় হইয়াছিল, কিন্তু ব্রাহ্মবীর শরচ্চন্দ্রকে তাহাদের অগ্রবর্তী দেখিয়া সকল ভয় দূর হইল। আমরা নির্বিঘ্নে গৃহে উপনীত হইলাম। এইরূপে একটী অসহায়া বালবিধবা ঘোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লাভ করিলেন।

সুখদা কাছারী হইতে আসিয়া শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতেছেন, শুনিয়া আমি তাঁহার নিকটে গেলাম। দুই একটী সান্ত্বনা বাক্য বলাতে তিনি ধৈর্য ধরিয়া বলিলেন, "দাদা, বাবা বলিয়াছেন, তাঁর জেল হইবে। আপনারা এই দুঃখিনীর জন্য অনেক করিলেন, এখন বাবাকে রক্ষা করুন।" আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম, মোকদ্দমা মিটিয়া গিয়াছে, তাঁহার কিছুই হইবে না। তখন সেই পিতৃবৎসলা কন্যার মুখে যে সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতার ভাব দেখিলাম, তাহা কখনও ভুলিব না। এইদিন হইতে শেষ দিন পর্যন্ত সুখদা আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে আমার উপর তাঁহার অটল আস্থা ও নির্ভর ছিল। তাঁহার পবিত্র কণ্ঠ নীরব হইয়াছে, কিন্তু সে সুমিষ্ট বাক্য, সে অকারণ স্নেহ, সে জীবনব্যাপী ভালবাসা আজও এ হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

মোকদ্দমা মিটিয়া গেল, কিন্তু সুখদার অগ্নিপরীক্ষা এখানেই শেষ হইল না। সুখদার পিতা মাতা, আমার প্রতিবেশী শ্রীকণ্ঠবাবুর বাসায় আশ্রয় লইলেন। সুখদার জননী তথা হইতে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। পুত্রকন্যা মরিলে স্ত্রীলোকেরা যেরূপ বিলাপ ও রোদন করে সেইরূপ করিতে লাগিলেন। সকলে কাছারীতে চলিয়া গেলে প্রত্যহ ৩।৪ ঘণ্টা করিয়া এইরূপ চীৎকার, বিলাপ ও অভিশাপ চলিতে লাগিল। বালিকার প্রাণে আর কত সহিবে, সুখদাও সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন করেন ও শয্যায় পড়িয়া থাকেন। ক্রমে যখন প্রতিবেশিগণ মহা বিরক্ত হইয়া উঠিল তখন তিনি আমার গৃহে আসিতে লাগিলেন; এবং কখনও প্রবোধ দিয়া কখনও তিরস্কার করিয়া ও ভয় দেখাইয়া কন্যাকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইল। অতঃপর তাঁহারা নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন। সমাজের অপমান ও নির্যাতন ভয়ে তাঁহারা আর স্বদেশে ফিরিয়া যান নাই, অবশিষ্ট জীবন কালীঘাটে যাপন করিয়াছেন।

সুখদার বিবাহ

চৈত্র মাসে অষ্টমী স্নান উপলক্ষে সুখদা উমেশবাবুর গৃহে আসিয়া ৩।৪ মাস তথায় ছিলেন। উমেশবাবু সেই সময়ে বরিশালনিবাসী বিহারীলাল দাস নামে বৈদ্যবংশজ একটী যুবকের সঙ্গে সুখদার বিবাহ প্রস্তাব করেন। স্বজাতিতে বিদ্যাসাগরের প্রণালীতে বিবাহ দিবেন বোধ হয় এই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি বিহারীকে ময়মনসিংহে আসিতে লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সে যথাসময়ে আইসে নাই। এখন সুখদা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিহারী আসিয়া উপস্থিত হইল। সুখদার পিতা বিহারীকে জানিতেন, সে স্বদেশে দুর্দান্ত চরিত্রের লোক বলিয়া পরিচিত ছিল। তিনি উহাকে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন, এবং আমাকে ও উমেশবাবুকে বার বার বলিয়া গেলেন, যেন বিহারীর সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ না হয়। সুখদা পিতার অতিশয় স্নেহপাত্রী ছিলেন, তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিয়া গেলেন, আপনি ধার্মিক লোক, আমার পুত্রতুল্য; সুখদাকে আপনার হাতে দিয়া গেলাম, সে যেন সৎপাত্রে পড়িয়া সুখে থাকে, এই করিবেন। বিধাতার প্রসাদে তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল।

বিহারী ভগ্নমনোরথ হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিল। সুখদার সম্বন্ধে নানারূপ কুৎসা রটনা করিতে লাগিল, পথে ঘাটে আমাদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা, এরূপ করিলে আমরা সুখদাকে আশ্রয় দিব না, এবং ব্রাহ্মসমাজে তাহার পরিণয় হইবে না। এরূপ ভয়ানক চরিত্র ও প্রতিহিংসাপরায়ণ লোক আমি আর দেখি নাই।

আষাঢ় উৎসব এবার আমার বাড়ীতেই হইল। উৎসবের সময় আমার পত্নী কঠিন পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন। তাঁহার চিকিৎসার জন্য শ্রাবণ মাসে সপরিবারে ঢাকায় গেলাম। সুখদাও সঙ্গে গেলেন। তখন আর্মানিটোলায় বিধানপল্লী স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার দুর্গাদাস রায় মহাশয়ের গৃহে পীড়িতা পত্নী, তিনটী শিশু-সন্তান ও শ্রীমতী সুখদাকে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল। সুরেন ও শান্তিকে নিয়া আমি ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসিলাম। এই সময়ের একটী ঘটনা সামান্য হইলেও স্মরণযোগ্য; উহা অনেকেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে স্কুল বন্ধ হইল, আমি পীড়িতা পত্নীকে দেখিবার জন্য ঢাকায় গেলাম। আমার দ্বিতীয়া কন্যা পুণ্যলতা তখন পঞ্চম বর্ষের বালিকা। সে বড়ই পিতৃবৎসলা ছিল। আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু বাধ্য হইয়া তাহাকে মাতার সঙ্গে ঢাকাতেই রাখিতে হইয়াছিল। যখন আমি ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসি, পুণ্য বড়ই কাঁদিয়াছিল; তাহাকে সকলে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। আমি চলিয়া আসিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে পায়খানার পার্শ্বস্থিত একটি ক্ষুদ্র গলিতে প্রবেশ করিয়া আপনার ডানা কামড়াইয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিল। ভক্তিভাজন বঙ্গবাবু প্রভৃতি সকলে যাইয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং নানারূপ খেলনা ও খাদ্য বস্তু দিতে লাগিলেন; কিন্তু সে কেবলই বলিতেছিল, "আমি আর কিছুই চাই না, কেবল বাবাকে চাই।" বালিকার এইরূপ ব্যাকুলতায় সকলের হৃদয় দ্রব হইয়াছিল। রায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আহা, কবে আমরাও এইরূপ ব্যাকুলপ্রাণে বলিতে পারিব, আমি আর কিছু চাই না, কেবল আমার পিতাকেই চাই—এমন দিন আমাদের কবে হবে।"

যাহা হউক, সুখদার কথা বলি। তিনি ঢাকায় আসিয়া অনেকটা শান্তিলাভ করিলেন, পল্লীবাসিনী ব্রাহ্মিকাদিগের সঙ্গ লাভ করিয়া ধর্ম-

বিষয়েও অনেকটা উপকার হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই, তাঁহার অগ্নিপরীক্ষার তখনও শেষ হয় নাই। সুখদা ঢাকাতে গিয়াছেন শুনিয়া সেই বিহারী তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল। সে নানা কুৎসিত কথা বলিয়া পল্লীবাসীদিগের মন ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিল, সুখদাকে আশ্রয় দিলে ভাল হইবে না বলিয়া নানারূপে শাসাইতে লাগিল। তাহাতেও ফল হইল না দেখিয়া দুইখানি ব্রাহ্মবিদ্বেষী সংবাদপত্রে নানা কথা লিখিয়া ব্রাহ্মদিগকে গালাগালি করিতে লাগিল। সম্পাদকেরাও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া এই অনাথা হিন্দু বিধবার নিন্দা ঘোষণা করিতে লাগিলেন!

আশ্বিন মাসে পূজার বন্ধে পুনরায় ঢাকায় গেলাম। ডাক্তারি চিকিৎসায় ফল হইল না দেখিয়া পত্নীসহ মত্ত ও সাভারের প্রসিদ্ধ কবিরাজ মহাশয়দিগের নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগের ব্যবস্থা ও ঔষধ লইয়া সপরিবারে ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসিলাম।

তখন ঢাকার প্রচারকগণ "দাস মণ্ডলী" নামে অভিহিত হইতেন। আমার আত্মীয় এবং ধর্মবন্ধু বাবু বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ এই দাস মণ্ডলীভুক্ত ছিলেন; তিনি তখনও অবিবাহিত। এই সময়ে তথাকার বন্ধুগণ তাঁহার বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত করেন; তিনিও মণ্ডলীর উপরই পাত্রী নির্বাচনের ভার অর্পণ করেন। তাঁহারা সকলে সমবেত ভাবে উপাসনায় এবিষয়ে ভগবদিচ্ছা জানিতে প্রার্থী হইলে সুখদার সঙ্গে বিবাহ হওয়াই বিধাতার ইচ্ছা এরূপ অনুভব করেন। ইহা অনেকের অপ্রিয় হইলেও তাঁহারা অবনতমস্তকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। বৈকুণ্ঠবাবু মহা সংগ্রামে পড়িলেন, নানারূপ সমালোচনা ও লোকনিন্দা সহিতে হইল। কিন্তু পরিণামে বিধাতার ইচ্ছাই জয়লাভ করিল। আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন ধর্মবন্ধু শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র সেন ও দুর্গানাথ রায় এই বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া আমাকে পত্র লিখিলেন। আমার নিকট ইহা অভাবনীয় বোধ হইল। কারণ সুখদাকে নিয়া যে সকল অপ্রিয় আন্দোলন হইয়াছে, তাহাতে অনেকেরই মন ম্লান হইয়াছে। আমি কেন এরূপ কন্যা নিয়া বিধানপল্লীতে রাখিলাম, সে জন্যও কেহ কেহ অনুযোগ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর সেই সুখদার সঙ্গে তাঁহাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন পূতচরিত্র প্রচারকের বিবাহ সম্বন্ধ

উপস্থিত করিলেন, ইহা বস্তুতই আমার নিকট অভাবনীয় বোধ হইয়াছিল। যাহা হউক, আমি উমেশবাবুর সম্মতি লইয়া আনন্দ সহকারে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম। ওদিকে সুখদার বিবাহ প্রস্তাব স্থির হইয়াছে, কোনরূপে জানিতে পারিয়া বিকারী আরও ক্ষেপিয়া গেল। সে বেনামা পত্র লিখিয়া সকল ব্রাহ্মকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। যাহা হউক এবিষয়ে আর বাহুল্য না করিয়া তৎকালে আমি বৈকুণ্ঠবাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাঁহার অনুমতিক্রমে উহা এই স্থলে প্রকাশ করিলাম। ইহাতেই তখনকার অবস্থা ও আমাদের মনোভাব অনেকটা ব্যক্ত হইবে। পত্রখানি এই :—

"প্রিয় বৈকুণ্ঠ,

এ বিবাহে যে বাহিরের পরীক্ষা অনেক হইবে তাহাতো জানাই আছে। সে জন্য আমার মন সর্বদাই প্রস্তুত। মানুষের কথার, মানুষের নিন্দা প্রশংসার আর কোন মূল্য দেখিতেছি না। মা'র ইচ্ছা পালন করিতে গেলে পৃথিবীর নির্যাতন সহিতেই হইবে। মা'কে জীবন্তভাবে যাহারা গ্রহণ করে, পৃথিবী তাহাদের কার্য সহ্য করিতে পারে না।

লোকে কিরূপ কথা উঠাইয়াছে তাহা আর শুনিতে চাই না। মানুষ না বলিতে পারে, না করিতে পারে এরূপ কি আছে? মার কাছে খাটি থাকিয়া তাঁর ইচ্ছা বুঝিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। মার ইচ্ছা পালনই তোমাদের ব্রত, আমি আর কি বলিব?

তোমরা কি একটু চিন্তিত হইয়াছ? তোমাদের কোন পত্রে পরিস্কার ভাব জানিতে না পারিয়া আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। দুর্গানাথ বাবু ও ঈশানবাবু পত্র লিখিয়া জানাইবেন বলিয়াও কিছু লেখেন নাই। শ্রীমতী কয়েকদিন হইল তোমার বা ঢাকার আর কাহারও পত্র না পাইয়া একটু বিষণ্ণ হইয়াছেন বোধ হয়।

এখানকার শরৎবাবু প্রভৃতি আমাদের আত্মীয়গণ কোনরূপ আপত্তি করিলে করিতে পারেন বলিয়া আমি যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আশ্চর্য বোধ হইয়াছে; শরৎবাবু এরূপ আগ্রহ ও সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা আমি কল্পনাও করি নাই।

বিহারী এখানে কয়েকদিন ছিল ; তাহার ভাব এই বুঝা গেল, যাহাতে ভয় পাইয়া কেহ বিবাহ না করে, এই মেয়েটী ক্লেশ পায়, সে তাহারই চেষ্টা করিবে। এরূপ প্রতিহিংসা আর দেখি নাই। আমার মতে এ বিষয়ে উপেক্ষা দেখাইয়া আমাদের কর্তব্য করিয়া যাওয়াই ভাল। তোমরা যাহা নির্দ্ধারণ কর, সত্বর জানাইবে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্যন্ত শ্রীমতী এখানে থাকিবেন, আমি ইহা অন্তরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবং তাহা যথা সময়ে তোমাকে জানাইয়াছি। গতকল্য ভ্রাতৃদ্বিতীয়া গিয়াছে ; আমাদের গৃহে কল্য বড় চমৎকার উপাসনা ও ভাইভগিনীর সম্মিলন হইয়াছিল। মা'কে না জানিলে ভাইভগিনীকে চেনা যায় না ; মাঝখানে মা'কে পাইলে পুত্র কন্যাদের যে পবিত্র আনন্দ ও স্বর্গ সুখ লাভ হয়, তাহার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা হইয়াছিল।

বাবার সহিত আলাপ করিয়া দেখিলাম, সুখদার সম্বন্ধে তাঁহার মনোগত ভাব পূর্বের মত নাই। এ বিবাহে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। তবে লোক নিন্দার কথা এক এক বার ভাবেন—যাহার কিছু মূল্য নাই।

* * * * * *

তোমার

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ।

কিছুদিন পরে শ্রদ্ধেয় ভাই ঈশানবাবু ও দুর্গানাথবাবু সুখদাকে নিতে আসিলেন। সপরিবারে বিশেষভাবে উপাসনাদি করিয়া সুখদাকে শুভ-বিবাহের জন্য প্রেরণ করিলাম। এই কয়েক মাসে সুখদা সকলের স্নেহপ্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গমনে সকলের মনে কষ্ট বোধ হইল—বালকবালিকারা রোদন করিতে লাগিল। শ্রীমান উৎসব তখন ৩ বৎসরের শিশু, সে তাহার ভাবী মামীকে ছাড়িতে পারিল না, সুখদাও তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে বড়ই কষ্টবোধ করিতেছিলেন ; আমি উৎসবকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে দিলাম। সুখদা ঢাকায় যাইয়া ভাই দুর্গানাথ রায়ের পরিবারে বাস করিতে লাগিলেন।

বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইবার প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে সুখদার বিবাহের দিন স্থির হইল। শুনিয়াছিলাম ইতিমধ্যে নানারূপ অনুসন্ধান দ্বারা

সুখদার সম্বন্ধে সকল সংশয় দূর হইয়াছিল। বস্তুত বিহারী দাসই ভয়ানক প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া এই দুঃখিনী বালিকার প্রতি অজস্র নিন্দাবাণ বর্ষণ করিতেছিল; তদ্ভিন্ন তাঁহার বিরুদ্ধে আর কাহারও নিকট কোন কথা শুনা যায় নাই। তাঁহার পরবর্তী জীবনেও সকলেই তাঁহার বিশুদ্ধ ও তেজস্বিনী প্রকৃতির যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলেন। ফলতঃ এই ঘটনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, সহস্র প্রবল চক্রান্তজাল ভেদ করিয়া সত্য ও পুণ্য নিজ গুণেই জয়যুক্ত হয়।

১৮৮৭ সালের ১লা জানুয়ারী ১৮ই পোষ শনিবার ঢাকা আর্মানীটোলা বিধানপল্লীতে নববিধান প্রচারক শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের সহিত সুখদার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল। আমি সপরিবারে তদুপলক্ষে ঢাকায় গেলাম। শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের প্রশস্ত আঙ্গিনায় চন্দ্রাতপতলে বিবাহমণ্ডপ সজ্জীকৃত হইল। উভয় সমাজের ব্রাহ্মগণ উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় আচার্যের কার্য নির্বাহ করেন। আমাকেই কন্যাকর্তার কার্য করিতে হইল। বাবু জগদ্বন্ধু লাহা রেজিষ্টারী করিয়াছিলেন। প্রচারকের বিবাহ বলিয়া কোন অঙ্গহানি হয় নাই; সকলের যত্নে এবং শুভ ইচ্ছায় যথা সম্ভব সমারোহে কার্য নির্বাহ হইল। বিহারী এ কয়দিন কেবলই শাসাইতেছিল, বৈকুণ্ঠবাবুর প্রাণনাশ করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছিল। পাছে বিবাহসভায় কোন উৎপাত উপস্থিত করে, এজন্য গোপীবাবু পুলিশ পাহারা রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কোন গোলযোগ ঘটে নাই। বিবাহের পরে সে ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া যায়, অতঃপর আর তাহার কোন কথা শুনা যায় নাই।

ব্রাহ্মপরিবার বৃদ্ধি

১৮৮৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতা নগরীতে শ্রীমান গুরুদাস চক্রবর্তীর বিবাহ হয়। শিমলাপ্রবাসী বাবু কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী জয়াবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। ইতিপূর্বে ইটখোলা নামক স্থানে একটী স্থান ক্রয় করিয়া শ্রীমান নবকুমার ও গুরুদাস একত্রে বাস করিতেছিলেন, নবকুমার কার্যানুরোধে স্থানান্তর গমন করাতে গুরুদাস ঐ বাসার অর্ধাংশে এবং শ্রীমান শশীকুমার বসু অপরাংশে সপরিবারে

বাস করিতে লাগিলেন। গুরুদাস সস্ত্রীক ময়মনসিংহে আগমন করিলে আমি প্রার্থনাদি করিয়া তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলাম। শ্রীমান শশীকুমার যদিও হিন্দুসমাজে বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কার্যতঃ ব্রাহ্মপরিবার মধ্যেই গণ্য হইয়াছিলেন। ভক্তিভাজন কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় শশীর প্রথমা কন্যার নামকরণ ব্রাহ্মপদ্ধতিক্রমে নির্বাহ করিয়াছিলেন। শ্রীমান গোলকচন্দ্র দাসও ঐ পল্লীতে বাড়ী করিয়া ভ্রাতাদিগের সঙ্গে বাস করিতেছিলেন। চন্দ্রমোহনবাবু সপরিবারে বালিকা বিদ্যালয়ে থাকিতেন। তৎকালে এই সহরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ব্রাহ্মগণ বাস করিতেছিলেন।

মন্দিরের জন্য স্থান প্রাপ্তি

এই সময়ে মন্দিরের অভাবই আমাদের নিকট গুরুতর বোধ হইতেছিল। মহারাজের আশ্বাস পাইয়া আমরা স্থানের অনুসন্ধান করিতেছিলাম, কিন্তু উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করা সহজ হয় নাই। যাহা হউক বিধাতার কৃপায় সহরের মধ্যস্থলে গাঙ্গিনার পারে একটী সুন্দর স্থান পাইবার সম্ভাবনা হইল। ঐ স্থানটীতে ২।৩ জন ক্ষুদ্র প্রজা বাস করিত; মহারাজের কাছে ঐ স্থানের বিষয় উল্লেখ করাতে তিনি উহা দান করিতে সম্মত হইলেন। প্রজাদিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ দিতে বলিলেন? তখন এ নগরে ভূমির মূল্য অতি সামান্যই ছিল। উহাদিগকে কত দিতে হইবে তাহা মীমাংসা করিবার ভার মিউনিসিপালিটির তৎকালপ্রসিদ্ধ চেয়ারম্যান স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল। তাঁহার নির্ধারণক্রমে আমাদিগকে ১৫০ শত টাকা দিতে হইল।

১৮৮৭ সালের জুন মাসে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "জুবিলি" উৎসব হইল। আমরা সেই উৎসব-সময়ে ঐ স্থানে অধিকার স্থাপন করিব, এরূপ স্থির করা গেল। ঐদিন পূর্বাহ্নে স্থানীয় জনমণ্ডলীর একটী মিছিল বাহির হইল। মহারাজ সূর্য্যকান্ত প্রমুখ স্থানীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উহাতে যোগদান করিলেন। আমরাও এই সময়ে উক্ত স্থানে প্রবেশ করিব স্থির হইল। মহারাজ মিছিলসহ ঐ স্থানে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া আমাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। তদনুসারে ঐ দিন প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় সকলে সমবেত হইলে আমি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" মন্ত্র উচ্চারণ

করিয়া একটী প্রার্থনা করিলাম, এবং মহারাজ ও সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। এইরূপে দয়াময় পিতার অপার করুণায় এবং মহারাজ সূর্য্যকান্তের বদান্যতায় ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের একটী গুরুতর অভাব দূর হইবার উপায় হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(১৮৮৭—১৮৯২)

পূর্বে সারস্বত উৎসবের কথা বলা হইয়াছে ; এই সময়ে উক্ত উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইত। এখানকার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই উৎসবের একটা আশ্চর্য প্রভাব দৃষ্ট হইত। সরস্বতী পূজার পূর্বদিন রজনীতে শিক্ষিতগণের একটী মহতী সভার অধিবেশন হইত। এক এক বৎসর এক একটী বক্তার উপর বক্তৃতা করিবার ভার থাকিত ; তাঁহাদের এই বক্তৃতা বিলক্ষণ জ্ঞানপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ হইত। বাঙ্গলা রচনার জন্য ছাত্র লেখকদিগকে পুরস্কার প্রদান করা হইত, জেলার সমস্ত স্কুলের ভাল ভাল ছাত্রগণ এজন্য রচনা প্রেরণ করিতেন। সরস্বতী পূজার দিন সূর্যোদয়ের পূর্ব হইতেই স্কুলের ময়দান লোকে লোকারণ্য হইত। কোথাও মল্লেরা ব্যায়াম প্রদর্শন করিতেছে, কোথাও মুসলমান সর্দারগণ লাঠীখেলা দেখাইতেছে, কোথাও ছাত্রদের ক্রীড়া, কোথাও বা পশু পক্ষীর লড়াই হইতেছে। আর জেলাস্কুলের চারিদিকের বারেন্দা ও হলে কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী খুলিয়াছে। মাঠের মধ্যে বিশাল চন্দ্রাতপতলে পূর্ব রাত্রিতে সভা হইয়াছে, অদ্য রজনীতে নাট্যাভিনয় ও জাতীয় সঙ্গীতাদি হইবে তাহার আয়োজন হইতেছে। সেদিন আর কাহারও অবসর নাই, গৃহে যাইবার কথা মনে নাই ; বাসায় বাসায় সরস্বতী পূজা একরূপ বন্ধ বলিলেই হয়। একজন বৃদ্ধ হিন্দু একদিন বলিয়াছিলেন আপনারা ত সরস্বতী পূজা তুলিয়া দিবার বেশ কৌশল করিয়াছেন ; দেবীকে অঞ্জলি দিবার সময় একটী ছাত্রকেও বাড়ীতে পাওয়া যায় না ! একবার আমাদের কোন বন্ধু মধুসূদনের সেই ভবিষ্যৎ বাণী "নহে দিন দূর দেবি, যবে ভূভারতে, বিসর্জিবে বিস্মৃতির জলে—ও তব ধবলমূর্তি" ইত্যাদি কবিতাটী ছাপাইয়া সারস্বতক্ষেত্রে বিতরণ করিয়াছিলেন।

পরদিন অতি প্রত্যূষে ঘোড়দৌড়ের মাঠ লোকে পূর্ণ হইয়া যাইত, একটু দেরীতে গেলে আর স্থান পাওয়া যাইত না। ওখানে ঘোড়দৌড়, হাতী দৌড়, ছাত্রদের দৌড়, সিপাহীদিগের দৌড় ইত্যাদি ক্রীড়া দিবা ১২টা পর্যন্ত চলিত। জেলার জমিদার, তালুকদার, দেশীয় ও ইংরেজ হাকিমগণ

এবং দূর গ্রামবাসী প্রজাগণ অনেকেই অতি উৎসাহের সহিত এই কার্যে যোগদান করিতেন। জমিদারগণ অকাতরে অর্থদান করিতেন। কোন কোন জমিদারের জমিদারী বণ্টন সময়ে সারস্বতের চাঁদা কে কত দিবেন, তাহাও দলিলভুক্ত হইয়াছিল। ৬ মাস পূর্ব হইতে প্রদর্শনীর জন্য চেষ্টা হইত; থানায় থানায় গ্রামে গ্রামে ঢোল দিয়া প্রদর্শনীর জন্য দ্রব্যজাত সংগ্রহ করা হইত। পুলিশ চৌকীদারগণ ইহা তাহাদের কর্তব্য মধ্যে গণ্য করিত। এক একজন হাকিম এক এক বর্ষে কমিটীর সভাপতি হইতেন। জজ সাহেব প্রতি বর্ষে পুরস্কার বিতরণ সভায় সভাপতির পদ গ্রহণ করিতেন। কোন কোন বর্ষে মহারাজ সূর্য্যকান্তও এই কার্য নির্বাহ করিয়াছেন। কমিটীর সভাপতিদিগের মধ্যে সদুৎসাহী ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় প্রাণকুমার দাস মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য। কর্মকর্তাদের মধ্যে বাবু জানকীনাথ ঘটক, কালীকৃষ্ণ ঘোষ, কালীনারায়ণ সান্যাল, দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য, শরচ্চন্দ্র রায়, অমরচন্দ্র দত্ত ও অক্ষয়কুমার মজুমদারের নাম সারস্বত নামের সঙ্গে চির সংযুক্ত হইয়া থাকিবে। কি হিন্দু কি মুসলমান কি ব্রাহ্ম কি খৃষ্টান সকল শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণই সর্ববিধ ভেদবুদ্ধি বর্জন করিয়া এই জাতীয় উৎসবে যোগ দান করিতেন। আমার মাননীয় বন্ধু মৌলবী হামিদউদ্দীন আহাম্মদ উকীল মহাশয়ের উপস্থিতিগুণেই সারস্বতের অভিনয় হইতে "দুরন্ত যবন" প্রভৃতি শব্দ চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। আমাদের মাঘোৎসবের সঙ্গে কোন কোন বার এই জাতীয় উৎসবের কিছু কিছু সঙ্ঘর্ষ হইত। যে বার একই সময়ে উভয় উৎসবের দিন পড়িত, সেবার আমরা কিছু সঙ্কটে পড়িতাম। যাহা হউক যতদূর সম্ভব উভয় দিক বাঁচাইয়া কার্য করা যাইত।

১৮৮৭ সালে সপ্তপঞ্চাশৎ মাঘোৎসব সম্পন্ন হইল। তাহার কয়েক দিন পরেই সারস্বত উৎসব আসিল। এবার সারস্বতের কর্মকর্তারা ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকার কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের দলকে এই উৎসবে নিমন্ত্রণ করিলেন। ইঁহাদের দলবল বিলক্ষণ পরিপুষ্ট ছিল। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে ঢাকার প্রসিদ্ধ গায়ক চন্দ্রনাথ রায় এবং স্বনাম খ্যাত ব্রাহ্ম নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও প্রসিদ্ধ বক্তা মন্মথবাবু প্রভৃতি ···ছিলেন। শ্রদ্ধেয় হরিনাথ মজুমদার মহাশয়ও তাঁহার দলবল সহ

আগমন করিলেন। অশ্রান্তকর্মা শরচ্চন্দ্র ইঁহাদের সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বড়বাজারে একটী দালানে ইঁহাদের বাসস্থান দেওয়া হইয়াছিল। আমরা প্রায় সর্বদা উপস্থিত থাকিতাম। গোস্বামী মহাশয়ের সৎপ্রসঙ্গ এবং ফিকিরচাঁদের ধর্মসঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তথায় প্রত্যহ প্রাতে উপাসনা হইত। একদিন উপাসনান্তে মুড়ি খাওয়া হইতেছিল, তখন ফিকিরচাঁদ গান ধরিলেন, "আর নাই রে শঙ্কা, খাও রে লঙ্কা চিবাইয়া মুড়ির সাথে।" ইত্যাদি। একদিন ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে যাইয়া গাহিয়াছিলেন, "কেন রে ঝরে নেত্র, ব্রহ্মপুত্র আজ আমারে বল বল।" দুঃখের বিষয় উক্ত সঙ্গীতগুলির সকল পদ মনে নাই।

এবার মহাসমারোহে সারস্বত উৎসব সম্পন্ন হইল। গোস্বামী মহাশয়ের ভক্তির উচ্ছ্বাস ও কীর্তনে নৃত্য, ফিকিরচাঁদের সঙ্গীতের মাদকতা এবং মন্মথ বাবুর প্রাণোন্মাদিনী বক্তৃতা, নগরবাসীদিগকে যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিল। একদিন দুর্গাবাড়ীতে ফিকিরচাঁদের দল আহূত হইয়া সঙ্গীত করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথবাবু প্রভৃতি গেরুয়াধারী গায়কগণ "শক্তি পূজা কথার কথা নয়" গানটী অতিশয় উৎসাহের সহিত গাহিয়াছিলেন। ঐ গানে "সর্ববর্ণ এক হ'য়ে ডাক মা বলিয়ে, নৈলে মায়ের দয়া হবে না" এই পদ শুনিয়া কোন কোন বৃদ্ধ হিন্দু অতিশয় রুষ্ট হইয়াছিলেন এবং "কলিতে সব একাকার হইল" বলিয়া মহা ভীত হইয়াছিলেন। তখন কোন কোন উদারচিত্ত ব্যক্তি এই বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়াছিলেন যে, দুর্গা নামে সকল বর্ণের অধিকার আছে, তিনি জগজ্জননী--সকলেরই মা—সুতরাং ইহাতে কোন দোষ হয় নাই।

সত্যানন্দের নামকরণ

আমার পারিবারিক ব্যাপার হইলেও এই অনুষ্ঠান ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ ঘটনা। যিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দিগ্বিজয়ী বক্তারূপে যুগধর্মের বিজয়ভেরী বাজাইয়া পূর্ববঙ্গ বিকম্পিত এবং সর্বত্র নব জীবনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, যিনি শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানে নবভক্তির সঞ্জীবনী সুধা মিশ্রিত করিয়া ব্রাহ্মধর্মে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, আর বর্ণিত সময়ে যাঁহার মুখে অমৃতময় "মা নাম" শুনিয়া কত শুষ্ক ও মলিন হৃদয়

বিগলিত হইতেছিল, এই শেষ বার আমরা তাঁহার পবিত্র সঙ্গ লাভ করিলাম, ময়মনসিংহে আর তাঁহার পদধূলি পতিত হয় নাই! ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে আর সেই অমৃতবাণী শ্রবণ করি নাই। সুতরাং এই অনুষ্ঠানটী অনেকেরই চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

২০এ মাঘ আমার তৃতীয় পুত্র সত্যানন্দের জন্ম দিন, এবার তাহার বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইল। ঐ তারিখেই গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা তাহার নামকরণ করা স্থিরীকৃত হইল। ব্রাহ্মগণ সকলেই মহোৎসাহে আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রশস্ত আঙ্গিনায় বৃহৎ চন্দ্রাতপতলে উপাসনার স্থান হইল। তৎকালে মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত অমৃতনারায়ণ ও যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী ও ব্রাহ্মসমাজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কত কার্যে যে আমরা তাঁহাদের উৎসাহ ও সহায়তা পাইয়াছি বলিতে পারি না। তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই অনুষ্ঠানে আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজনের গৃহে উপস্থিত হইলেন। গোস্বামী মহাশয়ের উপাসনা, ফিকিরচাঁদের সঙ্গীত এবং জমিদারদিগের আগমন, আমার বাড়ীতে আর লোক ধরে না! যখন শ্রদ্ধাস্পদ সাধু হরিনাথ সদলে কীর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন গোস্বামী মহাশয় বেদী হইতে অবতরণ করিয়া মহানৃত্য আরম্ভ করিলেন। জনমণ্ডলী মুগ্ধনেত্রে সেই পবিত্র দৃশ্য দেখিতে লাগিল! যথারীতি উপাসনা ও নামকরণ হইল। গোস্বামী মহাশয় শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া "সত্যানন্দ" নাম রাখিলেন। আমি শিশুকে বক্ষে লইয়া একটী প্রার্থনা করিলাম। বিশ্বজননীর এমন প্রকাশ জীবনে আর দর্শন করি নাই।*

উপাসনান্তে সাধক হরিনাথ আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, আপনার প্রার্থনায় মাকে আজ বড় কাছে পাইলাম, এত কাছে আগে পাই

* আমার প্রার্থনায় এইরূপ কথা ছিল, "মা, ভাল ক'রে দেখা দাও, আরও কাছে এসো! এই শিশুর মুখে আমি তোমাকেই দেখিতেছি; তুমি আমার মা, তুমিই আমার সন্তান, তুমিই আমার সর্বস্ব! আমি তোমারই কোলে মাথা রাখি, তোমারই মুখে চুম্বন করি, তোমারই প্রেমে চিরকালের জন্য ডুবিয়া যাই।" তখন সকলে ভক্তিতে মাতোয়ারা, মা নামে উন্মত্ত! তখন কাহারও মুখে কোন সমালোচনা শুনি নাই। পরবর্তী সময়ে কোন কোন ব্রাহ্ম এই প্রার্থনার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন।

নাই। আপনি ধন্য! আমি তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিলাম, হাঁ, সত্যই আমি আজ ধন্য হইলাম; যার গৃহে ভক্ত মুখে আনন্দময়ীর নাম হইল, যার গৃহে আজ এই সকল সাধু সজ্জনের পদধূলি পড়িল, সে যদি ধন্য না হয়, তবে পৃথিবীতে আর কে ধন্য হইবে?

বাহিরের অনুষ্ঠান শেষ হইলে অন্দরমহলে আমার শয়নগৃহের বারান্দায় গোস্বামী মহাশয় শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। সম্মুখে নূতন পাত্রে সুসজ্জিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি দেওয়া হইল। প্রার্থনা করিয়া মহাভাবে বিহ্বল হইয়া তিনি শিশুর মুখে পরমান্ন তুলিয়া দিলেন। তখন তিনি ভাবোন্মত্ত হইয়া বলিলেন, মা আজ এই + + গৃহে আমারও অন্নপ্রাশন হইল, আমি আজ আবার শিশু হইয়া তোমার হাতের এই মহাপ্রসাদ খাইতেছি, এই বলিয়া সেই পরমান্ন নিজ মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন! একবার শিশুকে দেন, একবার নিজে গ্রহণ করেন! আহা, সে অপূর্ব দৃশ্য আজও চক্ষে ভাসিতেছে!

ব্রাহ্ম-পল্লীর প্রতিষ্ঠা

পূর্বে বলা হইয়াছে, এই নগরে যে কয়টী ব্রাহ্ম-পরিবার ছিলেন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে দূরে দূরে বাস করিতেছিলেন। ইহাতে নানা বিষয়ে গুরুতর অসুবিধা বোধ হইতেছিল; মহিলাদের একত্রে মিলন ও উপাসনাদির ব্যাঘাত ঘটিত। বালকবালিকারা সঙ্গীর অভাবে কষ্টবোধ করিত। বিশেষত এই নগরে কয়েকটী পরিবার স্থায়ীরূপে বাস করিতে না পারিলে ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী উন্নতি হইতে পারে না, এই চিন্তা অনেকের মনেই উদিত হইয়াছিল। আমরা একদা এই নগরের অধিস্বামী মহারাজ সূর্য্যকান্তের নিকটে একটী ব্রাহ্মপল্লী স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম, মহারাজ এই কার্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, শহরের একটু বাহিরে গ্রামের মধ্যে স্থান দেখুন, সহরের উপরে একস্থানে বেশী জমি পাওয়ার সম্ভাবনা নাই; এদিকে খাজানাও হ্রাস করিয়া দেওয়া কঠিন। মহারাজের এই মূল্যবান উপদেশ স্মরণ রাখিয়াই আমরা স্থানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

বাবু অমরচন্দ্র দত্ত তখন অবিবাহিত, তিনি ব্রাহ্মদোকানে শরৎবাবুর

সঙ্গে বাস করিতেন। তাঁহার মাতৃদেবী তদীয় আত্মীয় কবিবর দীনেশচরণ বসু মহাশয়ের বাসায় থাকিতেন। মাতার একান্ত ইচ্ছা, তাঁহার একমাত্র পুত্র বিবাহ করিয়া সংসারধর্মে প্রবিষ্ট হয়েন। কিন্তু পুত্র সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। যাহা হউক পরিণামে মাতার ইচ্ছাই জয়লাভ করিল; পুত্র বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু গৃহিণীর পূর্বে গৃহের প্রয়োজন।

রেলওয়ে ষ্টেশনের দক্ষিণে অনেকগুলি সম্পন্ন মুসলমান প্রজার বসতি ছিল। তাহারা একে একে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছিল। বাবু বিপিনচন্দ্র রায় নামক একজন ফৌজদারীর আমলা এই পল্লীর একটী বাড়ী ক্রয় করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার বাড়ীর সংলগ্ন একটী বাড়ী বিক্রয় হইল, অমরবাবু সুলভ মূল্যে উহা ক্রয় করিলেন। কিন্তু তখনও পল্লী কোথায় হইবে স্থির হয় নাই, কাজেই ঐ বাড়ীটী প্রায় এক বৎসর কাল পতিত রহিল। কিছুদিন পরে এই পাড়ায় আর একটী বড় বাড়ী ৭০০৲ টাকায় ক্রয় করা হইল। উহাতে ৭।৮ বিঘা জমি ছিল। ঐ স্থানটীতে তিনখানি বাড়ী হইবে স্থির হইল। একখানি শ্রীমান গুরুদাস চক্রবর্তী, আর একখানি বাবু চন্দ্রমোহন বিশ্বাস, তৃতীয়খানি বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্তী গ্রহণ করিলেন। গুরুদাসের শ্বশুর বাবু কেদারনাথ চৌধুরী তখন শিমলা পাহাড়ে কার্য করিতেন, তথায় পুত্রকন্যাদের শিক্ষার সুবিধা হইত না বলিয়া জামাতার নিকটে পরিবার রাখা স্থির করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে চন্দ্রমোহনবাবুর জন্য রক্ষিত ভূমি ক্রয় করিয়া পৃথক বাড়ীতে গুরুদাসের শ্বশ্রূমাতা ভুবনমোহিনী দেবী সন্তানগণসহ বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীমান গোলকচন্দ্র দাসও একখানি ছোট বাড়ী ক্রয় করিয়া ভ্রাতৃগণ সহ তথায় উঠিয়া আসিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মপল্লীর প্রতিষ্ঠা হইল।

কিছুদিন পরে ১৮৮৭ সালের শ্রাবণ মাসে আমার জন্যও একটী স্থান ক্রয় করা হইল। আমার পণ্ডিতপাড়ার বাড়ী বেশ সুবিধাজনক স্থানে ছিল; উহা জেলাস্কুলের অতি নিকটে, আমার এবং ছেলেদের স্কুলে যাইতে কোন কষ্ট হইত না। অনেক চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে ঐ স্থানটী পাওয়া গিয়াছিল; ওখানে আমার দুইটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল ইত্যাদি নানা কারণে উহার প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মমণ্ডলীর স্থায়ী কল্যাণ হইবে, আমরাও সকলের সহায়তা ও সঙ্গ লাভ করিতে পারিব,

এই সকল বিবেচনায় পল্লীতে যাইয়া বাস করাই কর্ত্তব্য বোধ হইল। আমার পক্ষে এতদূর হইতে পদব্রজে যাইয়া স্কুল করাও অসম্ভব ছিল, সে চিন্তাতেও মন ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। যাহা হউক পল্লীর আকর্ষণ সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিল। ঈশ্বরকৃপায় এবং ভ্রাতৃগণের চেষ্টায় পল্লীর সর্ব্বোত্তম স্থানেই আমার বাড়ী প্রস্তুত হইল। নিজের একখানি গাড়ীও হইল। সুতরাং আমার কোন অসুবিধা রহিল না।

কিছুদিন পরে আমাদের পল্লীবাসী বিপিনচন্দ্র রায় তাঁর বাড়ী বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলেন। আমরা উদ্যোগী হইয়া চন্দ্রমোহনবাবুর জন্ম ৫০০ টাকা মূল্যে ঐ স্থান ক্রয় করিলাম। এই সূত্রে একটী অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছিল। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ঐ স্থান ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়া বায়না দিয়াছিলেন, পল্লীতে আমাদের সঙ্গে একত্রে বাস করিতে তাঁহার আগ্রহ ছিল; কিন্তু নানা কারণে পল্লীবাসিগণ উহা পছন্দ করেন নাই। আমরা উমেশবাবুকে সরলভাবে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম এবং ঐ বাড়ী ক্রয় করিতে নিষেধ করিলাম। তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধমনে ঐ কার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন। শ্রীমান দ্বারকানাথ সরকার প্রভৃতি ব্রাহ্ম যুবকগণ ইহাতে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে, তাঁহাদের সে ভ্রম দূর হইয়াছিল।

আমাদের পুরাতন ব্রাহ্মবাসা টাউন হলের জন্য গৃহীত হইলে শ্রীমান বিহারীকান্ত পণ্ডিতপাড়ায় আমার বাড়ীর নিকটে একটী স্থান লইয়া বাস করিতেছিলেন। আমি ব্রাহ্মপল্লীতে উঠিয়া আসাতে তাঁহার তথায় থাকা কঠিন হইয়াছিল। ইতিমধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র প্রেমচন্দ্র পরলোকগত হয়, ইহাতে বিহারী ও তাঁহার পত্নী অতিশয় শোকাতুর হইয়া পড়েন; তখন নববিধান সমাজের কর্মকার মহাশয়েরা ও বসন্তবাবু প্রভৃতি বড় বাসার নিকট একটী স্থান ক্রয় করিয়া তথায় বিধানপল্লী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন; বিহারীকান্তও তৎসঙ্গে একটী স্থান রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় যাইয়া বাস করা তাঁহাদের অভিপ্রেত হইল না। আমাদের কাছে আসিয়া বাস করিতে একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে গুরুদাসবাবুর শ্বশ্রূমাতা কলিকাতায় চলিয়া যান, তাঁহার বাড়ী বিক্রয়ের ভার আমার উপর থাকে; আমি চন্দ্রমোহনবাবুর সম্মতিক্রমে ঐ বাড়ী বিহারীর নিকট বিক্রয় করিলাম

তিনি অচিরে পল্লাতে উঠিয়া আসিলেন। এজন্যও আমাকে স্বতঃ পরতঃ কিঞ্চিৎ গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমাদের পল্লীটী স্থায়ী লোকের বাসস্থান হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এই পল্লী প্রতিষ্ঠা ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের একটী স্মরণীয় ঘটনা এবং এই নগরের অধিপতি মহারাজ সূর্য্যকান্তের একটী স্মরণচিহ্ন।

মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ

পূর্বে যে স্থান প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে তথায় একখানি টীনের ঘরে আমাদের সমাজের কার্য চলিতেছিল; কিন্তু উৎসবাদির সময়ে অতিশয় অসুবিধা ও ক্লেশ হইত। বহুলোক বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিতেন। ব্রাহ্মিকাদের বসিবারও উপযুক্ত স্থান হইত না। এই সময়ে ১৮৮৭ সালের আগষ্ট মাসে শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার ধর্মদাস বসু মহাশয় এখানকার অস্থায়ী সিবিল সার্জন হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে পাইয়া আমরা অতিশয় উৎসাহী হইয়া উঠিলাম। আমরা একটী ইষ্টক মন্দির প্রস্তুত করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলাম। তখন শরৎবাবু সমাজের সম্পাদক ছিলেন। আমরা মন্দিরের জন্য চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম। মহারাজ সূর্য্যকান্ত ২৫০ শত এবং দানশীল শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য ২৫০ শত টাকা দিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্মগণও যথাসাধ্য অর্থ দান করিলেন। ইতি মধ্যে ডাঃ বসু মহাশয় ছুটী লইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন।

১৮৮৮ সালের মার্চ মাসে ডাঃ বসু স্থায়ী সিবিল সার্জন হইয়া এখানে পুনরাগমন করিলেন। তাঁহাকে পাইয়া আমাদের উৎসাহ বর্ধিত হইল। আমাদের আগ্রহে তিনি সমাজের সম্পাদকীয় পদ গ্রহণ করিয়া উৎসাহের সহিত মন্দিরের জন্য অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। ডাঃ বসু যে কেবল আমাদের মন্দির নির্মাণে সহায়তা করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি আমাদের সহিত মিলিত হইয়া সাধন ভজন করিতেন, স্থানীয় সর্ববিধ কল্যাণকর কার্যে যোগদান করিতেন, এবং ব্রাহ্ম পরিবারগুলির রোগশোকে পরমহিতৈষী বান্ধবের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। আমাদের পরিবারে কাহারও সামান্য রোগ হইলেও যদি তাঁহাকে সংবাদ না দিতাম তিনি অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন।

এক বৎসর অবিরত চেষ্টায় প্রায় সহস্র মুদ্রা স্বাক্ষরিত হইল। আমরা চুক্তি দিয়া নিজে ইট প্রস্তুত করাইয়া লইলাম। ১৮৮৯ সালের বৈশাখ মাসে নববর্ষের উৎসব সময়ে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসাধক শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় "ওঁ ব্রহ্ম" নাম উচ্চারণ করিয়া মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মধর্মানুরাগী উৎসাহী যুবক বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্তী তখন কোন বিষয় কর্ম করিতেন না, তাঁহাকে মন্দির নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত করা হইল; তাঁহার জীবিকার ভার সমাজ গ্রহণ করিলেন।

পল্লীতে প্রথম অনুষ্ঠান

অমরবাবুই আমাদের পল্লীর প্রথম অধিবাসী; তাঁহার মাতৃদেবী একজন নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা ছিলেন; তাঁহার যেমন ধর্মনিষ্ঠা, তেমনি প্রখর বুদ্ধি, উদার হৃদয় ও গভীর সন্তানস্নেহ ছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র এত বয়সেও বিবাহ করিলেন না, এজন্য তিনি সর্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিতেন। যাহা হউক পরিণামে জননীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। যশোহর জেলার বাঘআঁচড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মল্লিকের একমাত্র কন্যা কুমারী হেমমালার সহিত অমরচন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল। শরৎবাবু ও আমার প্রতি কার্য নির্বাহের ভার অর্পিত হইল। শরৎবাবু এখানে থাকিয়া সকল আয়োজন করিতে লাগিলেন, আমি বরযাত্রী হইয়া কলিকাতায় গমন করিলাম। তথায় একটী বাড়ী ভাড়া করা হইল, মল্লিক মহাশয় বাঘআঁচড়া হইতে আসিয়া সপরিবারে তথায় অবস্থিতি করিলেন। আমরা ১৩নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে আমাদের পরমাত্মীয় শ্রীমান উপেন্দ্রকিশোর ও গগনচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে রহিলাম। প্রত্যহ স্নানান্তে কন্যাগৃহে একত্রে উপাসনা হইত; সাধারণত আমার প্রতিই উপাসনার ভার থাকিত। এইরূপে পক্ষাধিক কাল একত্রে উপাসনাদি দ্বারা বিবাহের গুরুত্ব ও উচ্চভাব সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছিল। ১২৯৪ সালের (ইং ১৮৮৮) ২৮শে ফাল্গুন বিবাহানুষ্ঠান বেশ সমারোহপূর্বক সম্পন্ন হইল। শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্যের কার্য করিলেন, আমি বরকন্যাকে কিছু বলিলাম। যথাসময়ে আমরা ময়মনসিংহে উপস্থিত হইলাম। শরৎবাবু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর্তব্য সকলই করিয়া রাখিয়াছিলেন;

এখানেও সুমধুর উপাসনা ও উত্তম প্রীতিভোজন দ্বারা সকলে পরিতৃপ্ত হইলেন। এইরূপে আমাদের পল্লীর পরিবার বৃদ্ধি পাইল। ইহার প্রায় তিন বৎসর পরে অমরবাবুর প্রথম পুত্র শ্রীমান পরিমল জন্ম গ্রহণ করিল। পৌত্রমুখ দর্শন করিয়া বৃদ্ধা জননী যে বিমল আনন্দ ও শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, আজও তাহা স্মরণ হইতেছে। তিনি আমাকে বলিলেন দেখ বাবা, আমার এ গাছে যে আবার ফল ধরিবে, আমি কখনও সে আশা করি নাই, তাই আমি এই ছেলের নাম রাখিলাম "অধরচন্দ্র"।

ঊনষষ্ঠিতম মাঘোৎসব—কলিকাতা গমন

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পরে আর মাঘোৎসবে কলিকাতায় যাই নাই। গৃহবিচ্ছেদে প্রাণে এত ক্লেশ হইয়াছিল যে আর উৎসবে যাইতে ইচ্ছা হইত না। এবার প্রাণে একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিয়া উৎসব সময়ে কলিকাতায় গমন করিলাম। তথায় মাঘোৎসবের উপাসনাদিতে যোগ দিয়া যথেষ্ট শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিলাম। শ্রীমান গুরুদাসের শ্বশুর বাবু কেদারনাথ চৌধুরী তৎকালে কলিকাতায় আসিয়া পৃথক বাসায় ছিলেন, তাঁহার পরিজনেরাও তথায় গিয়াছিলেন; আমিও এই পরিবারে অবস্থিতি করিলাম। এই পরিবারে আমি যেরূপ আদর ও যত্নলাভ করিয়াছিলাম, তাহা আজও মনে আছে।

৯ই মাঘ মন্দিরে মহিলাগণের উৎসব হইল। ব্রাহ্মগণ সকলে সিটি-কলেজ গৃহে উপাসনার্থ মিলিত হইলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে আমাকেই আচার্যের কার্য করিতে হইল। বহুদিন পরে কলিকাতায় উৎসবে যোগ দিয়া কতই পুরাতন স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়াছিল, আমাদের সে প্রেমের বাজার ভাঙ্গিয়াছে দেখিয়া মনে কতই শোক-তরঙ্গ উঠিয়াছিল; সে দিনকার উপাসনায় এবং "প্রেম" বিষয়ক উপদেশে মহাভাবোচ্ছ্বাস হইয়াছিল। সে তরঙ্গ সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল।

এই উৎসব সময়ে আমার "ভক্তিলীলা" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ভক্তিলাভের পন্থা ও সে পথের সঙ্কটাদি রূপকচ্ছলে লিখিত হইয়াছিল। অনেকেই এই পুস্তক পড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আপনার লেখা ভক্তিরসপূর্ণ

ও সুমধুর; ভক্তিলীলা অধ্যাত্ম জীবনের সুন্দর চিত্র ও সাধন পথের সহায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে এরূপ পুস্তকের যে বিশেষ আদর হইবে, এমন বোধ হয় না।" পাঁচশত মাত্র পুস্তক ছাপা হইয়াছিল, উহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় বার আর মুদ্রিত হয় নাই। ইহার বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থই ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির তহবিলে প্রদত্ত হইয়াছিল।

পারিবারিক

১৮৮৯ সালের (১২৯৫) ২৮শে চৈত্র আমার তৃতীয়া কন্যা ভক্তিলতার জন্ম হয়। এই সময়ে আমার মাতৃদেবী প্রায় ৭৫ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা; তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট এলাসিন গ্রামে ছিলেন। তিনি অন্ধ হওয়া অবধি আর সংসার চিন্তা করিতেন না, সর্বদা ভগবৎ স্মরণ মননে সময় কাটাইতেন। এ সময়ে তিনি পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আমার কন্যা হইয়াছে শুনিয়া বলিয়াছিলেন, আমি কন্যার নাম "নিস্তারিণী" রাখিলাম; তারা ব্রহ্মময়ী এবার আমাকে নিস্তার করুন। সত্য সত্যই মার ইচ্ছা পূর্ণ হইল, এই বৎসর ১লা কার্তিক মা স্বর্গারোহণ করিলেন।

আশ্বিনমাসে পূজার বন্ধে আমাদের পল্লীবাসী শ্রীমান গোলকচন্দ্র দাসের শুভবিবাহ আমার বাড়ীতে সম্পন্ন হইল। ডাঃ ধর্মদাস বসু প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধুগণ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া কার্য সুনির্বাহ করিলেন। ইহাই আমাদের পল্লীতে প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ। আমি কার্যে ব্যাপৃত থাকাতে পূজার বন্ধে মাতৃদর্শনে যাইতে পারিলাম না। কিন্তু মা'র জন্য মন অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল। ইহার কয়েকদিন পরেই সংবাদ আসিল, মা অতি কাতর, আমাকে দেখিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। তখন নারায়ণগঞ্জ ও গোয়ালন্দ হইয়া আমাদের গ্রামে যাইতে হইত। আমি পত্র পাইয়াই যাত্রা করিলাম। রাত্রিতে গোয়ালন্দ পঁহুছিলাম, মা'কে আর দেখিব কিনা এই ভাবনায় মন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। হোটেলের লোক সমাগমে সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না। শেষ রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলাম, মা আমার শিয়রে বসিয়া একদৃষ্টে আমার দিকে তাকাইয়া আছেন। মা'র মাথায় চুল নাই। আমি বলিলাম, মা তোমার চুলগুলি এমন করিয়া ফেলে দিয়াছ?

মা একটু হাসিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন সহসা চমকিয়া উঠিলাম, আর ঘুম হইল না। মা'কে যে আর দেখিতে পাইব না, তাহা নিশ্চিত বুঝিলাম।* বনগ্রাম ষ্টেশন হইতে ৩।৪ মাইল জল কাদা ভাঙ্গিয়া অপরাহ্ণে এলাসিন গ্রামের নদীতীরে উপনীত হইলাম। অপর পারে আমাদের স্নানের ঘাট; ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাইয়া চমকিয়া উঠিলাম। শ্মশান ঘাটে নিশান উড়িতেছে। কম্পিতপদে গৃহে উপনীত হইয়াই জানিতে পরিলাম, পূর্বদিন এমনই সময়ে মা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। যাত্রার পূর্বে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "শ্রীনাথ এখনও এল না রে?" আর সেই প্রাণাধিক স্নেহের কন্যা সারদার নাম বার বার উচ্চারণ করিয়াছিলেন। আমি মা'র শয্যা স্থানে পড়িয়া শিশুর ন্যায় মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

কয়েক দিন মাত্র বাড়ীতে থাকিয়া ময়মনসিংহে চলিয়া আসিলাম। এখানে মাতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন হইল। বাড়ীতে দাদা হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ করিলেন, সে ব্যয় আমাকে দিতে হইল। শ্রীমতী সারদাও কতক সাহায্য পাঠাইলেন। শ্রাদ্ধের পূর্বেই আমি "কিডনি"র ব্যথায় শয্যাগত হইয়া পড়িলাম; জীবন সংশয় হইয়াছিল। আমার পরমহিতৈষী বন্ধু ডাঃ ধর্মদাস বসু মহাশয় অতিশয় যত্নপূর্বক চিকিৎসা করিলেন, ও সপ্তাহ কাল কঠোর রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ঈশ্বরকৃপায় আরোগ্য লাভ করিলাম। রোগশয্যায় থাকিয়াই কোন প্রকারে মাতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিলাম। পরে ভ্রাতৃসেবা ও দরিদ্রদিগকে অন্ন-বস্ত্র দান করা হইয়াছিল।

---

* পরে জানিয়াছিলাম, মাতৃদেবীর পৃষ্ঠাঘাত রোগ হইয়াছিল, এজন্য মৃত্যুর পূর্বদিন প্রায়শ্চিত্ত করাইবার সময় মস্তক মুণ্ডন করা হইয়াছিল। আমি মা'কে তদবস্থায়ই স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। ইহা একটি আশ্চর্য ঘটনা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(১৮৯০—১৮৯২)

ষষ্ঠিতম মাঘোৎসব

এবারের মাঘোৎসব অতিশয় সমারোহপূর্বক সম্পন্ন হইয়াছিল। তখন আমাদের সমাজের সভ্যসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বোধ হয়, এতগুলি ব্রাহ্মব্রাহ্মিকার সমাগম এখানে আর হয় নাই। বরিশালনিবাসী ব্রহ্মভক্ত বাবু প্যারীমোহন ঠাকুরতা এবং বাবু নন্দকুমার ঘোষ সমাজের সঙ্গীত সংকীর্তনে নেতৃত্ব করিতেন। প্যারীবাবুর সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া মনোমোহিনী দেবী আমাদের বালিকাস্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। পল্লীতেও তখন অধিবাসীর সংখ্যা অধিক ছিল। সিটি স্কুলে অনেক ব্রাহ্ম-শিক্ষক ছিলেন। ডাঃ বসু মহাশয় সমাজের সিটি স্কুল কমিটীর সম্পাদকরূপে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন।

১লা মাঘ হইতে ১৩ই মাঘ পর্যন্ত উৎসবের কার্য নির্বাহ হইল। নিম্নে কার্যনির্বাহক সভার প্রসিডিং তুলিয়া দিলাম, ইহাতে তৎকালের অবস্থাদি বোধগম্য হইবে।

কার্যনির্বাহক সভা—২৯ পৌষ। ১২৯৬।

উপস্থিত—শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্মদাস বসু
,, বাবু শ্রীনাথ চন্দ
,, ,, চন্দ্রমোহন বিশ্বাস
,, ,, গুরুদাস চক্রবর্তী
,, ,, গোলোকচন্দ্র দাস

আগামী ষষ্ঠিতম মাঘোৎসবের নিম্নলিখিত কার্যপ্রণালী নির্ধারিত হইল।:
(বন্ধনীর মধ্যে আচার্য বা বক্তার নাম লিখিত হইল।)

১লা মাঘ—প্রাতে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ পরিবারে প্রার্থনা।
২রা মাঘ—সন্ধ্যাকালে শ্রীনাথবাবুর বাটীতে উপাসনা (গুরুদাসবাবু)।
৩রা মাঘ—ঐ গুরুদাসবাবুর বাটীতে উপাসনা (শ্রীনাথবাবু)।

৪ঠা মাঘ—,, চন্দ্রমোহনবাবুর বাটীতে উপাসনা (গুরুগোবিন্দবাবু)।

৫ই মাঘ—অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা বাহিরে প্রচার।

৬ই মাঘ—৬টায় টাউনহলে বক্তৃতা—"উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম" (শ্রীনাথবাবু)।

৭ই মাঘ—প্রাতে উদ্বোধন (চন্দ্রমোহনবাবু)। মধ্যাহ্নে পাঠ ও ব্যাখ্যা (ডাঃ ধর্মদাস বসু)। রাত্রিতে উপাসনা (গুরুগোবিন্দবাবু)।

৮ই মাঘ—দিনে ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব। রাত্রিতে টাউনহলে বক্তৃতা "বিবেক ধর্মশাস্ত্র" (গুরুদাসবাবু)।

৯ই মাঘ—পূর্বাহ্নে ছাত্রোৎসব (শ্রীনাথবাবু)। মধ্যাহ্নে বালকবালিকা সম্মিলন। সন্ধ্যায় টাউনহলে বক্তৃতা "বলিদান" (ডাঃ ডিঃ বসু)।

১০ই মাঘ—প্রাতে উপাসনা (চন্দ্রমোহনবাবু)। অপরাহ্নে নগর সংকীর্তন। সায়ংকালে প্রার্থনা ও উপদেশ (ডাঃ ধর্মদাস বসু)।

১১ই মাঘ—প্রাতে সংগীত ও উপাসনা (শ্রীনাথবাবু)। মধ্যাহ্নে আলোচনা; বিকালে কীর্তনাদি; রাত্রিতে উপাসনা (শ্রীনাথবাবু)।

১২ই মাঘ—প্রাতে উপাসনা (চন্দ্রমোহনবাবু) মধ্যাহ্নে দান। রাত্রিতে উপাসনা (শ্রীনাথবাবু) তৎপরে প্রীতিভোজন।

ইতিপূর্বে মাঘোৎসবে কোন কোন বার টাউনহলে বক্তৃতা হইয়াছিল। এইবার হইতে প্রতিবৎসর নিয়মিতরূপে বক্তৃতা হইতে থাকে। এবার আমি "উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলাম। বহু শিক্ষিত লোকে টাউনহলে পূর্ণ হইয়াছিল। ডাঃ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন, যখন বক্তৃতার বিষয়টী স্মরণ হইল এবং বহু উচ্চশিক্ষিত লোক উপস্থিত হইলেন, তখন বড়ই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, এরূপ গুরুতর বিষয়ে শিক্ষিত মণ্ডলীকে সন্তুষ্ট করা বোধ হয় সম্ভব হইবে না। কিন্তু বক্তৃতাটী আশার অতিরিক্ত হইয়াছে এবং উহাতে উচ্চ শিক্ষিতগণেরও যথেষ্ট শিক্ষা করিবার বিষয় আছে। শ্রীমান গুরুদাস "বিবেক ও ধর্মশাস্ত্র" বিষয়ে বক্তৃতা করেন; এইটী তাঁহার টাউনহলে প্রথম বক্তৃতা। ডাঃ বসু মহাশয় "বলিদান" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন; বাঙ্গালাভাষায় তেমন অধিকার নাই বলিয়া তিনি অতিশয় সঙ্কুচিত ও ভীতচিত্তে বক্তৃতা করিয়াছিলেন কিন্তু বক্তৃতাটী সারগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল।

কয়েকটী ঘটনা

১। ইহার কিছুদিন পূর্বে মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য বাহাদুরের সহধর্মিণী রাণী রাজরাজেশ্বরী পরলোক গমন করেন। তিনি দুরন্ত কলেরা রোগে জল জল করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন স্মরণচিহ্ন প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজ বাহাদুর স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের হস্তে ৫০ হাজার টাকা দিতে ইচ্ছা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব এ বিষয়ে নগরবাসীদিগের অভিমত জানিতে চাহেন। এই বিষয় লইয়া ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে আন্দোলন ও মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। কেহ বাগান করিতে, কেহ নগরের চারিদিকে "রাণী সাগর" নাম দিয়া চারিটী জলাশয় করিতে, কেহ কেহ বা গ্যাসের আলো করিতে প্রস্তাব করেন। কোনও সাহেব কোম্পানি এই গ্যাসলাইট করার জন্য দাতা ও সাহেবদিগকে হস্তগত করিতে যত্ন করেন। আমরা কেহ কেহ এই সহরে জলের কল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপস্থিত করি; মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান চন্দ্রকান্তবাবু ও ভাইস্ চেয়ারম্যান শ্যামাচরণবাবু এবং সিবিল সার্জন ডাঃ ধর্মদাস বসু এই প্রস্তাব সর্বোত্তম বলিয়া গ্রহণ করেন। এই বিষয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। বাবু অনাথবন্ধু গুহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ডাঃ তারানাথ বল প্রভৃতি মিউনিসিপাল কমিশনারগণ ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিলেন। নূতন টাক্সের ভয়ে অনেক লোক তাঁহাদের দলভুক্ত হইল। একদা ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের আহ্বানে টাউনহলে নগরবাসীদিগের এক বিরাট সভা হইল। চন্দ্রকান্তবাবু আমাদিগকে বক্তৃতাদি করিতে স্বয়ং আসিয়া অনুরোধ করিয়া গেলেন। সভার কার্য আরম্ভের বহু পূর্বে আমরা জলের কলের সপক্ষ লোক যাইয়া সমুখের সমুদয় আসন অধিকার করিয়া বসিলাম। প্রথম প্রস্তাব উপলক্ষে আমি একটী বক্তৃতায় জলের কলের উপকারিতা বর্ণনা করিলাম, ইহাতে বহু লোকের মত ফিরিয়া গেল। ডাঃ ডিঃ বসু সুযুক্তি ও বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার সমর্থন করিলেন। তিনি বলিলেন, "এখন যদি নগরবাসিগণ এই বৃহৎ দান পরিত্যাগ করেন, পরে তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া টাকা ধার করিয়া জলের কল করিতে হইবে। তখন জলের জন্য ট্যাক্সও দিতে হইবে, আবার ঋণের সুদও যোগাইতে হইবে।" জেলার জজসাহেব এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনিও জলের কলের প্রস্তাব দৃঢ় বাক্যে সমর্থন করিলেন। বহু বাক্‌বিতণ্ডার

পর অধিকাংশের মতে জলের কল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ধার্য হইল। পরে এই আপত্তি উঠিল যে, ৫০ হাজার টাকায় ত আর জলের কল হয় না। প্রায় দেড়লক্ষ টাকা লাগে, এ টাকা কে দিবে? চন্দ্রকান্তবাবু প্রমুখ কয়েকটী উদ্যোগী লোক মহারাজ সূর্যকান্তের নিকট গমন করিলেন। তিনি সকলের আগ্রহ দেখিয়া এক লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। এই সময়ে আমি মহারাজকে বলিয়াছিলাম, শুনিয়াছি আমাদের রাণীমাতা জল জল করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার আত্মার তৃপ্তির জন্য আপনি এই নির্মল পানীয় জলের ব্যবস্থা করুন। মহারাজ সজল নেত্রে আমাদের কথায় অনুমোদন করিয়াছিলেন। পরে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে ৩০ হাজার টাকা প্রদত্ত হইল। এই কার্যে মাত্র সহরের লোকেরা উপকৃত হইবে, সমগ্র জেলার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, এই বলিয়া অনেক পদস্থ ব্যক্তি বোর্ডের টাকা দিতে বাধা জন্মাইয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় এবং রাণী রাজরাজেশ্বরীর পুণ্যফলে সকল বিঘ্ন বাধা কাটিয়া গেল; "রাজরাজেশ্বরী জলের কল" প্রতিষ্ঠিত হইল। এই কার্যে মহারাজ সূর্যকান্তের নামের সঙ্গে অক্লান্তকর্মা স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়ের নামও চিরস্মরণীয় থাকিবে।

২। ১৮৯০ সালের আষাঢ় মাসে আমার ব্রাহ্মপল্লীস্থ বাড়ীতে একখানি ইষ্টকালয় নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। তখন শাখা সমাজের উৎসব উপলক্ষে ঢাকা পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন; ২৩শে আষাঢ় উৎসব দিনে তিনি আমার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৯১ সালে মাঘোৎসবের পরে উক্ত গৃহে প্রবেশ করা হয়। এই সময়ে আমার পুত্র সত্যানন্দ কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হয়। ডাঃ বসু মহাশয়ের উপদেশে তাড়াতাড়ি কার্য শেষ করিয়া রুগ্ন সন্তানকে নূতন দালানে আনিতে হইয়াছিল। তদ্বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

৩। এইবার সারস্বত উৎসবে শিক্ষিতদিগের সভায় আমাকেই টাউন হলে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল; এবং অতঃপর কয়েক বৎসর মধ্যে মধ্যে কাওরাদি, ঢাকা, বরিশাল ও কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে যাইয়া বক্তৃতা ও উপাসনাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সহায়তা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম; বাহুল্য বোধে তদ্বিবরণ বিস্তারিতরূপে লিখিত হইল না।

৪। একবার মাঘোৎসব সময়ে ঢাকা পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজে কয়েকটী

যুবক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা করেন। উক্ত সমাজের তৎকালের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয় আমাকে এই কার্য নির্বাহার্থ আহ্বান করেন। আমি তথায় যাইয়া উক্ত দীক্ষা কার্য নির্বাহ করিলাম এবং পরদিন "ধর্মঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু" এ বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলাম। তখন আমার মাননীয় বন্ধু স্বর্গীয় কে. এন, রায় প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমান নিশিকান্ত বসু, রজনীকান্ত বসু, জ্ঞানচন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি ৫টী যুবক দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

৫। এই সময়ে সদুৎসাহী ব্রাহ্মযুবক বাবু বরদাকান্ত বসু সিটি স্কুলের ২য় শিক্ষক হইয়া এখানে আগমন করেন। এখানে আগমনের কিঞ্চিৎ পূর্বে তিনি বগুড়া-প্রবাসী সুপরিচিত ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুশীলাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহাদিগকে এখানে পাইয়া আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলাম। ইঁহারা উভয়ে প্রায় দশবৎসর কাল ময়মনসিংহে থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ কার্যে শক্তি ও জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। মা সুশীলা সংগীত, উপাসনা ও পরসেবা দ্বারা এখানে সকল পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিতেন; ভগিনী-সমাজ স্থাপন করিয়া উহার কার্য নির্বাহ করিতেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু পরিবারে যাইয়া জ্ঞান ধর্মের আলোচনা ও সাধু দৃষ্টান্ত দ্বারা নারী জাতির উন্নতি সাধনে যত্ন করিতেন। মহিলাদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথমে এখানকার ব্রহ্মমন্দিরের বেদীতে বসিয়া উপাসনা ও বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে পুরুষদিগের সঙ্গে তিনিও একবার ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের মধুরতা, ভগবদ্‌ভক্তি এবং আমাদের প্রতি স্নেহমমতা স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বরদা বাবুর কর্মোৎসাহ ও অকপট সেবানিষ্ঠা ব্রাহ্ম যুবকগণের অনুকরণীয়।

বসন্তকুমারী দেবী

কিশোরগঞ্জের অন্তঃপাতী বনগ্রাম নিবাসী বাবু জয়নাথ চক্রবর্তী তখন জেলা স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষকের কার্য করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী বালবিধবা ছিলেন। তিনি ভ্রাতার সাহায্যে

কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া নিজ গ্রামে একটী বালিকা স্কুল স্থাপন করিয়া শিক্ষয়িত্রীর কার্য করিতেন। কিছুদিন পরে আমাদের বালিকাস্কুলে ২য় শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। ক্রমে তাঁহার মনে ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাস ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকর্ষণ জন্মিল। ১৮৯১ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে তিনি বাবু চন্দ্রমোহন বিশ্বাস মহাশয়ের সহায়তায় ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং চন্দ্রমোহনবাবুর পরিবারে অবস্থিতি করেন। এই ঘটনায় প্রাচীন সমাজে কিছু আন্দোলন ও উত্তেজনা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু এখন আর লোকের মন পূর্বের ন্যায় বিরোধী ছিল না। জয়নাথবাবু যদিও উদারপ্রকৃতি ও ভগিনীর কল্যাণপ্রার্থী ছিলেন, তথাপি সমাজের ভয়ে এই কার্যে প্রকাশ্য অনুমোদন করেন নাই। শুনিয়াছিলাম লোকের গঞ্জনায় তিনি ভগিনীকে বলপূর্বক গৃহে লইয়া যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন। একদিন রবিবার সকলে ব্রহ্মমন্দিরে গিয়াছি; মেয়েরা অনেকে পল্লীতে রহিয়াছেন। কিন্তু ডাঃ ধর্মদাস বসু মহাশয় সেদিন আর সমাজে যান নাই। আমরা গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম, বসু মহাশয় আমার দালানের বারান্দায় বসিয়া আছেন; মেয়েরা বসন্তকুমারীকে লইয়া ঘরে রহিয়াছেন। ডাঃ বসু মহাশয় বলিলেন, আমি মন্দিরে যাইবার সময় পথে শুনিতে পাইলাম, কতকগুলি ডনগির লোক বসন্ত কুমারীকে জোর করিয়া নিয়া যাবে, ব্রাহ্মেরা মন্দিরে গেলে তাহারা শূন্য পল্লীতে এই কার্য করিবে। তখন আর লোক সংগ্রহের সময় ছিল না; আপনাদিগকে জানাইয়া উপাসনার ব্যাঘাত করিতেও ইচ্ছা হইল না। তজ্জন্য নিজে আসিয়া উঁহাকে আপনার পাকাঘরে রাখিয়াছি এবং বারান্দায় বসিয়া পাহারা দিতেছি। আজ বড় চমৎকার উপাসনা ভোগ করা গেল।

কিছুদিন আমাদের পল্লীতে বাস করিয়া বসন্তকুমারী দেবী কলিকাতায় ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিতে গমন করিলেন এবং তথায় ব্রাহ্মদিগের সাহায্যে উক্ত বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ১৮৯৬ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে আমাদের প্রিয় ভ্রাতা বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্তীর সহিত তাঁহার পরিণয় হইল। তাঁহারা প্রায় দশ বৎসর কাল পল্লীতে বাস করিয়া ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। গুরুগোবিন্দ বাবু বিবাহের পূর্ব হইতেই প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা হেমনগরের জমিদার পরিবারে কার্যোপলক্ষে

বাস করিতেছেন এবং বিবিধ উপায়ে লোকসমাজে শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের সহায়তা করিতেছেন।

পারিবারিক

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, আমার তৃতীয় পুত্র সত্যানন্দ ১৮৮৬ সালের ২০শে মাঘ জন্মগ্রহণ করে। ১৮৮৭ সালের মাঘ মাসে গোস্বামী মহাশয় কর্তৃক তাহার নামকরণ হয়। ইহাকে আমরা মাখন বলিয়া ডাকিতাম। ১৮৯১ সালের মাঘমাসে ৫ বৎসর বয়সে সত্যানন্দ কঠিন অত্যাগী জ্বরে আক্রান্ত হয়। ৬ই মাঘ তাহার জ্বরের সঞ্চার হয়, মাঘোৎসবের কার্যে ব্যস্ত থাকাতে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় নাই। উৎসবান্তে জ্বর কঠিন আকার ধারণ করিল। ডাঃ ধর্মদাস বসু মহাশয় অতিশয় যত্নসহকারে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহকারী ডাঃ পূর্ণচন্দ্র পুরকাইত এল, এম, এস্ মহাশয়ও যথেষ্ট সহায়তা করিলেন। ৪৫ দিন পরে জ্বর ত্যাগ হইল, কিন্তু জ্বরের মধ্যেই দেখা গেল রোগীর প্লীহা হইয়াছে। এই প্লীহার চিকিৎসাও উক্ত ডাক্তার মহাশয়রা দীর্ঘকাল করিলেন। আশ্বিন পর্যন্ত চিকিৎসা চলিল, প্লীহা সারিল না।

ইতিমধ্যে ১৮৯১ সালের ১৩ই আগষ্ট ২৯শে শ্রাবণ আমার চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যলতা জন্ম গ্রহণ করে। সকলে ইহাকে ননী বলিয়া ডাকে। শ্রীমান গুরুদাসের প্রথম পুত্র শ্রীমান সুকুমারও এই সময়ে জ্বরপ্লীহায় পীড়িত ছিল; সহসা তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রটী রক্তামাশয় রোগে তিন দিন মধ্যে প্রাণ-ত্যাগ করিল, শিশুর পিতা মাতা এবং আমরা সকলেই শোকাকুল হইলাম। আমার ক্রোড়েই শিশুটী নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেল। শোকাকুল পরিবারটীকে আমার দালানে আনিয়া রাখিলাম এবং রুগ্ন সন্তানের চিকিৎসা হইতে লাগিল।

আশ্বিন মাসে শারদীয় অবকাশে শ্রীমান গুরুদাস রুগ্ন সন্তানের চিকিৎসার জন্য সপরিবারে কলিকাতা গমন করিলেন, আমিও আমার মাখনকে নিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিলাম। তথায় ডাঃ নীলরতন সরকার প্রভৃতি ডাক্তারগণকে দেখাইয়া তাঁহাদের উপদেশে জল বায়ু পরিবর্তনের জন্য মধুপুরে গমন করিলাম। তথায় যাইয়া শ্রীমান সুকুমারের বেশ উপকার হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মাখনের জ্বর বাড়িয়া গেল।

১৮ দিন প্রবল জ্বরে শিশু মহাকষ্ট পাইল : আমি দিবা রাত্রি তাহার শয্যায় বসিয়া থাকিতাম ; শ্রীমতী জয়াবতী আহার পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। মাখন সর্বদাই মায়ের জন্য ব্যাকুল হইত। মধুপুরে কোন ডাক্তার ছিলেন না ; জামতারা হইতে ব্রাহ্ম ডাক্তার শশীবাবুকে আনাইয়া দেখাইলাম। তখন কলিকাতায় যাইয়া চিকিৎসা করানই কর্তব্য স্থির হইল। বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিলাম ; পরিবারস্থ সকলে কলিকাতায় আসিলেন, আমিও মাখনকে নিয়া ফিরিয়া গেলাম, এবং আমার প্রীতিভাজন ছাত্র শ্রীমান উপেন্দ্র কিশোর রায়ের গৃহে সপরিবারে অবস্থিতি করিয়া কবিরাজ দ্বারা মাখনের চিকিৎসা করাইতে লাগিলাম। মাসাধিক কাল চিকিৎসার পর পুনরায় মধুপুরে যাওয়াই স্থির হইল। শ্রীমান গুরুদাস তখনও তথায় ছিলেন, আমরা যাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইলাম। পৌষ মাস পর্যন্ত তথায় রহিলাম ; কিন্তু বিশেষ কোন উপকার হইল না। ওদিকে গুরুদাসের পুত্রটী ভগবৎকৃপায় আরোগ্য লাভ করিল। তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন ; আমরাও ফিরিলাম। কলিকাতায় ব্রাহ্মপাড়ায় শ্রীযুক্ত শশীপদ বাবুর একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া পুনরায় প্রসিদ্ধ কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের দ্বারা কিছুদিন চিকিৎসা করাইলাম। স্বৌকালীন জ্বর কিছুতেই ছাড়িল না।

এই সময়ে দ্বিষষ্টিতম মাঘোৎসব উপস্থিত হইল। ব্রাহ্ম গৃহ ও পল্লী উৎসবানন্দের কোলাহলে পূর্ণ হইল। আমরাও সে আনন্দোৎসবে যথাসাধ্য যোগ প্রদান করিলাম। মাখনের মনে বিলক্ষণ ধর্মভাব ও সহিষ্ণুতা জন্মিয়াছিল। সেও উৎসবের কোন কোন কার্যে উৎসাহ প্রকাশ করিত এবং একদিন আনন্দবাজারে আহার করিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছিল।

মাঘোৎসবের পরে ডাঃ ডি, এন্ রায় মহাশয়ের দ্বারা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা গেল। ৭ দিনেই বিশেষ উপকার হইল। সকলেই বিলক্ষণ আশান্বিত হইলাম। জ্বর ছাড়িল, প্লীহা কমিল, শরীরে বলাধান হইল। এই সময়ে কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আমাদের প্রিয়ভ্রাতা বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয়ের সহধর্মিণী ঐ রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন ; আমরা বালকবালিকাদের জন্য চিন্তিত হইলাম। ডাঃ রায় মহাশয় মাখনকে খুব সাবধানে রাখিতে বলিলেন।

কিন্তু যে ভয়ে ব্যাকুল ছিলাম, তাহাই উপস্থিত হইল। একদিন রাত্রিতে মাখনের প্রবল জ্বর ও তৎসহ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের আক্রমণ হইল। ডাঃ রায় আসিয়া বলিলেন, এতদিনে যাহা উপকার হইয়াছিল, তাহা বৃথা গেল, ডবল নিমোনিয়ার সঞ্চার হইয়াছে। আমি আর চিকিৎসার ভার রাখিতে চাই না। তখন নিরুপায় হইয়া ডাঃ নীলরতন সরকার ও ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়দিগকে দেখাইলাম। তাঁহারা অতি যত্নে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। বহুকষ্টে নিমোনিয়া ও জ্বর দূর হইল, কিন্তু প্রবল কাসি রহিয়া গেল। শিশুর সে কষ্টের কথা স্মরণ করিলে মন ব্যথিত হয়। ডাক্তার মহাশয়দের পরামর্শে স্বদেশে ফিরিয়া আসাই স্থির করিলাম এবং ফাল্গুন মাসের প্রথম ভাগে রুগ্ন সন্তানসহ গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীমান গুরুদাস চক্রবর্তীর প্রচারব্রত গ্রহণ

১৮৯২ সালের মাঘোৎসবের পরে শ্রীমান্ গুরুদাস চক্রবর্তী সপরিবারে ময়মসিংহে প্রত্যাগমন করিলেন বটে কিন্তু তিনি আর বিষয়কর্মে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। উক্ত মাঘোৎসব সময়ে কলিকাতাতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্ম সাধনাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মদিগকে ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য জীবন অর্পণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। শ্রীমান গুরুদাস এই আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য জীবন অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। সাংসারিক হিসাবে তাঁহার পক্ষে তৎকালে বিষয়কর্ম পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন ছিল, কিন্তু যাঁহারা প্রাণে অমৃতের আহ্বান শ্রবণ করেন, কোন বাধা বিঘ্নই তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে না। তিনি প্রচারব্রত গ্রহণের সংকল্প জানাইয়া এখানকার ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের কার্যনির্বাহক সভার অধিবেশনে ঐ পত্র সাদরে গৃহীত হইল এবং ১১ই মার্চ তারিখে এতদুপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইবে স্থিরীকৃত হইল। ১২ই মার্চ তারিখে তিনি টাউনহলে একটী বক্তৃতা করিয়া তাঁহার জীবনের মহদভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং ময়মনসিংহের বৈষয়িক কর্মক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যদিও তাঁহাকে বিদায় দিতে আমরা বিশেষ কষ্ট অনুভব করিয়াছিলাম, তথাপি তাঁহার প্রচারব্রত গ্রহণ ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের এবং

ব্রাহ্মমণ্ডলীর গৌরবের বিষয় জানিয়া সকলেই সুখী হইয়াছিলাম। ঈশ্বর কৃপায় তিনি সম্পূর্ণ মনপ্রাণ দিয়া প্রভুর সেবা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদ্বারা ময়মনসিংহে ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত হইয়াছে।

সারস্বত সমিতি ও জুবিলি মেলা

এই সময়ে আমাদের সারস্বত উৎসবের সঙ্গে একটী বার্ষিক মেলা করার চেষ্টা হয়। তজ্জন্য ব্রাহ্মপল্লীর সমীপবর্ত্তী একটী বিস্তৃত স্থান গ্রহণ করা হইল। মহারাজ সূর্য্যকান্ত জুবিলি উৎসবের স্মরণার্থ এই স্থান প্রদান করিলেন। প্রধানত স্বর্গীয় শ্রীকণ্ঠ সেন উকীল মহাশয়ের উদ্যোগে এই মেলার প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৯২ সালের সারস্বত উৎসব সময়ে মেলাটী বেশ জমিয়াছিল। কলিকাতা হইতে বাবু গুরুদাস পাল প্রভৃতি দেশীয় ব্যবসায়িগণ নানাবিধ দ্রব্যজাতসহ এই মেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সরস্বতী পূজার পূর্ব্বরজনীতে স্থানীয় ভদ্রগণের এক মহতী সভা হয়। রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় (এক্ষণ রাজা-বাহাদুর) ইহাতে সভাপতির কার্য করেন। ডাঃ ধর্মদাস বসু মহাশয় সেবার সারস্বত কমিটীর সভাপতি ছিলেন। আমার প্রতি বার্ষিক বক্তৃতার ভার অর্পিত ছিল। "জীবন সংগ্রাম" বিষয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে স্বদেশী আন্দোলনে যে সকল গুরুতর প্রশ্ন উঠিয়াছে, জাতীয় জীবনে অগ্রসর হইতে যে সকল উপায় অবশ্য গ্রহণীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতেছে, উক্ত বক্তৃতায় তাহার অধিকাংশ আলোচিত হইয়াছিল। শিল্পবাণিজ্যাদির উন্নতি করিয়া আমাদিগের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে কি কঠোর প্রতিযোগিতার সংগ্রাম করিতে হইবে, তাহার জীবন্ত চিত্র যখন প্রদর্শিত হইতেছিল, তখন সভাস্থ গবর্ণমেণ্ট কর্মচারীগণ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে-ছিলেন। আবার তখনই ঐ সকল জাতির সহায়তা ও কৃতউপকারের বর্ণনা শুনিয়া তাঁহারা হর্ষ প্রকাশ করিতেছিলেন। এই বক্তৃতায় সকলেই অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ মহাশয় পরদিন এক খানি পত্র লিখিয়া মনের হর্ষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে এইরূপ সভায়

স্থানীয় শ্রেষ্ঠ বক্তা বাবু ব্রজনাথ বিশ্বাস ও বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করিয়াছেন, সেরূপ স্থলে আমার অগ্রসর হওয়াই দুঃসাহস মনে করিয়া ভীত হইয়াছিলাম; কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছিল। আমার জীবনে এই সত্যই সর্বদা দেখিয়াছি যখনই আপনার দৈন্য ও অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া সেই মহাশক্তির শরণাপন্ন হইয়াছি, আকুলপ্রাণে বল ভিক্ষা করিয়াছি, তখনই প্রাণে স্বর্গীয় তেজ অবতীর্ণ হইয়াছে, মনে নব নব জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে, এবং রসনায় অপরিজ্ঞাত সুমধুর ভাষা উচ্চারিত হইয়াছে। জীবনের বহু ঘটনায় এই আশ্চর্য প্রহেলিকার পরিচয় পাইয়াছি। এই অপূর্ব কৃপাতত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্যই এই সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে হইল; আত্মগৌরব প্রকাশের জন্য নহে। যাঁহারা আমার বিদ্যা বুদ্ধির তত্ত্ব জানেন, তাঁহারাই একথার সাক্ষী।

দুইটী যুবকের দীক্ষা গ্রহণ

শ্রীমান হরানন্দ গুপ্ত ও শ্রীমান রামকুমার দাস নামক এই জেলা নিবাসী দুইটী যুবক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য সম্পাদক সমীপে আবেদন করিলেন। উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর ১৮৯২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারীর কমিটীতে তাঁহাদের আবেদন গৃহীত হইল। তখনও মন্দিরনির্মাণ কার্য শেষ হয় নাই। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাঃ ধর্মদাস বসু মহাশয়ের গৃহে ৫ই মার্চ শনিবার তাঁহাদের দীক্ষাকার্য সম্পাদিত হইল। আমি ও ডাঃ ধর্মদাস বসু দীক্ষাকার্য সম্পাদন করিলাম। শ্রীমান হরানন্দ তখন সিটিস্কুলে শিক্ষকতা করিতেন, রামকুমার বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ঈশ্বরকৃপায় ইঁহারা ব্রাহ্মসমাজে বিবাহাদি করিয়া এখন সমাজের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া গিয়াছেন। গয়াপ্রবাসী সুপরিচিত ব্রাহ্ম স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীমণির সহিত হরানন্দ বাবুর বিবাহ হয় এবং তিনি সিটিস্কুলের শিক্ষকের পদে থাকিয়া কয়েক বৎসর আমাদের পল্লীতে বাস করেন। শ্রীমতী লক্ষ্মীমণির একটী কন্যা সন্তান জন্মিলে তাঁহার ডাক্তারি শিক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়। তিনি শিশু কন্যা সহ ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে ৪ বৎসর কাল শিক্ষালাভ করেন, এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বরিশালে লেডি ডাক্তার হইয়া যান। কয়েক

বৎসর পরে ময়মনসিংহ হাসপাতালে উক্ত কার্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। হরানন্দবাবুও এখন সিটি স্কুলে কর্ম পাইয়াছেন এবং উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ কার্য নির্বাহ করিতেছেন।

ব্রাহ্ম বিবাহে কলিকাতা গমন

ফাল্গুনমাসে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে জন্মভূমির জলবায়ু গুণে মাধনের শরীর বেশ সুস্থ বোধ হইল। জৈষ্ঠ্যমাসে আমার পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান গগনচন্দ্র হোম ও শ্রীমান রজনীকান্ত গুহের শুভবিবাহ উপলক্ষে আমি কলিকাতায় আহূত হইলাম। যদিও নানারূপ বিঘ্ন বাধা ছিল, তথাপি উঁহাদের স্নেহের আকর্ষণ কাটাইতে পারিলাম না। বাবু কেদারনাথ চৌধুরীর দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণলতার সহিত রজনীকান্তের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। এই কন্যাটী ২।৩ বৎসর আমাদের পল্লীতে ছিলেন, আমি ইঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতাম এবং ইঁহার শিক্ষা ও ধর্মোন্নতির জন্য যত্ন করিতাম। বস্তুত এই পরিবারস্থ বালক বালিকাগণ আমাকে অতিশয় ভালবাসিত; আমার প্রতি অনেক নির্ভর করিত। ওদিকে শ্রীমান রজনীকান্ত আমার প্রিয় ছাত্র ও প্রেমানুগত; তাই উভয়ের সম্মিলন আমার আনন্দের বিষয় হইয়াছিল।*

* শ্রীমান গগনচন্দ্রের লিখিত স্মৃতিলিপি হইতে এস্থলে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

"ইটনাস্কুল হইতে মধ্যবাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া আমি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহে গমন করি। প্রিয়বন্ধু নবকুমার সমাদ্দারও সেই বৎসরে ছাত্রবৃত্তি পাইয়া তথায় আসিয়াছিলেন। উভয়ে জেলাস্কুলের একই শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছিলাম। প্রথম মিলনে উভয়ের মধ্যে কি যে এক সৌহার্দ জন্মিয়াছিল, তাহা জন্মের মত অচ্ছেদ্য হইয়া রহিয়াছে। আমাদের উভয়ের অভিভাবকই গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের নামে তাঁহারা উভয়েই খড়্গহস্ত ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা স্কুলে অধ্যয়ন কালেই আমাদের উভয়ের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। একদিন নবকুমার বলিলেন, চল ব্রাহ্মসমাজে যাই। আমি বলিলাম, জানিতে পারিলে হুলস্থূল পড়িবে, বাসা হইতে তাড়িত হইব। অবশেষে গোপনে যাওয়াই ঠিক হইল।

"শীতকালের প্রাতঃকাল, আমি প্রত্যুষে অভিভাবক মহাশয়ের নিদ্রা হইতে উঠিবার পূর্বে নবকুমারের বাসায় আসিয়া তাঁহার সহিত কাছারীর মাঠে ব্রহ্মমন্দিরে ভয়ে ভয়ে

আমি এই উভয় আকর্ষণে কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। ৯ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার মজিলপুর গ্রামে স্বর্গীয় কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বসন্তবালার সহিত শ্রীমান গগনচন্দ্রের শুভ পরিণয় সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমুখ ব্রাহ্মগণ, শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ব্রাহ্মিকাগণ একটী বৃহৎ দলে মজিলপুরে উপস্থিত হইলেন।

এই গ্রামটী বিলক্ষণ বর্ধিষ্ণু ও সুপরিচিত; ইহা শাস্ত্রী মহাশয়, উমেশ বাবু ও নীলরতনবাবু প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্রাহ্মগণের জন্মস্থান। শাস্ত্রী মহাশয় এই বিবাহে আচার্যের কার্য করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সম্মিলিত উপাসনায় আমাকেই উপাসনার কার্য নির্বাহ করিতে হইল।

প্রবেশ করিলাম। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম, বেদীর উপর বসিয়া শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় গাহিতেছেন, "কে জানে রে অমৃতধনে"। ৩৮ বৎসর পূর্বে যে সঙ্গীত শুনিয়াছিলাম, হৃদয়-তন্ত্রীতে আজিও যেন তাহা ধ্বনিত হইতেছে। এই সঙ্গীতের ধ্বনি যখনই কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখনই আমার মনে ব্রহ্মমন্দিরে প্রথম প্রবেশের মধুর স্মৃতি জাগরিত হইয়া আমাকে আনন্দরসে আপ্লুত করে। সেইদিন আমার জীবনের এক বিশেষ দিন। ব্রহ্মোপাসনার আস্বাদ আমি প্রথম সেই দিনে অনুভব করিয়াছিলাম; সেই দিনে আমার প্রাণে ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড়ে স্থানলাভের আকাঙ্খা জন্মিয়াছিল। সেইদিনের উপাসনাতে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের সহিত গুরুশিষ্যের অটল সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, এ পর্যন্ত আর কাহারও সহিত সেরূপ সম্বন্ধ অনুভব করি নাই। এখনও তাঁহার উপাসনায় যোগদান করিতে পারিলে প্রাণে কত তৃপ্তি, কত আনন্দ, কত আরাম অনুভব করিয়া থাকি। এজন্যই জীবনের প্রধান অনুষ্ঠান বিবাহোপলক্ষে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলাম। * * * বিবাহের পরদিন পারিবারিক বিশেষ উপাসনায় তিনিই আচার্যের কার্য করিয়াছিলেন। ধ্রুবের ন্যায় বিশ্বাসী আমার দ্বিতীয় পুত্র পরলোকগত বিমলচন্দ্রের নামকরণ অনুষ্ঠানে শ্রীনাথবাবু কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন এবং আচার্যের কার্য করিয়াছিলেন। আমার ভগবদ্ভক্ত শ্বশুরমহাশয় উপাসনান্তে বলিয়াছিলেন, "কেশববাবুর সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অতি অল্পদিনই এরূপ মধুর ও প্রাণস্পর্শী উপাসনাতে যোগদান করিয়াছি।" ব্রাহ্মসমাজে স্থান প্রাপ্ত হইয়া দুইটী বিষয়ে আমি নিজকে পরম সৌভাগ্যশালী মনে করি,—প্রথমজীবনে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের ন্যায় কর্মশীল, ধর্মপ্রাণ, ভাবপ্রবণ ও সরসহৃদয় ধর্মাচার্যের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ধর্মজীবনের প্রৌঢ়াবস্থায় ভগবদ্ভক্ত পূজ্যপাদ ৺কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের সাহচর্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।" শ্রীগগনচন্দ্র হোম

১৪ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা নগরে ৪৫নং বেণেটোলা লেন ভবনে শ্রীমান রজনী ও শ্রীমতী স্বর্ণলতার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। এ বিবাহেও শাস্ত্রী মহাশয় আচার্যের কার্য করিলেন।

এই মাসেই আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের একটী কন্যার এবং পুর্ণিয়ার পার্বতীবাবুর কন্যার সহিত কুমিল্লার উকীল শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দীর বিবাহানুষ্ঠান কলিকাতায় সম্পাদিত হইয়াছিল। আমরা সবগুলি বিবাহেই উপস্থিত থাকিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম।

স্মৃতি লিপি

১৮৮৮ সাল হইতে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার ধর্মদাস বসু মহাশয় ময়মনসিংহের সিবিলসার্জন ছিলেন। ময়নসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের জন্য যে স্মৃতিলিপি প্রেরণ করিয়াছেন, উহাতে সংক্ষেপে তাৎকালিক অবস্থার সুন্দর পরিচয় আছে। নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল।

"১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সরকারী কর্ম উপলক্ষে অর্থাৎ Offg. Civil Surgeon পদে নিযুক্ত হইয়া আমি প্রথম ময়মনসিংহ গমন করি। তথায় অবস্থিতিকালে স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধুগণ অনুগ্রহপূর্বক আমার বাসাবাটীতে আইসেন ; তাঁহাদের নিকট অবগত হই যে, ওখানে দুইটী ব্রাহ্মসমাজ আছে, অর্থাৎ নববিধান সমাজের শাখাস্বরূপ একটী এবং সাধারণ সমাজের শাখাস্বরূপ একটী। * * * তখন সাধারণ সমাজের সভ্যগণের একটী মন্দিরের অভাব ছিল। পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের বাসাতে একটী গৃহে ব্রহ্মোপাসনার কার্য হইত। আমি মধ্যে মধ্যে সেই স্থানে গিয়া উপাসনায় যোগদান করিয়াছি। পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ই আচার্যের কার্য করিতেন। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস, অমরচন্দ্র দত্ত, গুরুদাস চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্ম উপাসনায় যোগদান করিতেন। সে বার আমি মাত্র ৩ মাস ওখানে ছিলাম। তৎপর ছুটিলইয়া পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে যাই। বিধাতার বিধানানুসারে আমি পুনরায় ১৮৮৮ সালে মার্চ মাসে সপরিবারে ময়মনসিংহ গমন করি। এইবার আমি স্থায়ীরূপে কর্ম করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলাম। বস্তুত ৪ বৎসর অপেক্ষা অধিক কাল ছিলাম

এবং ঐ ৪ বৎসর আমার ধর্মজীবনের পক্ষে বিশেষ সময় ছিল। আমরা সহর হইতে দূরে পুলিশ লাইনের নিকট একটী ভাল বাড়ী পাইয়াছিলাম।

এবার ময়মনসিংহ গমন করিলে পর ব্রাহ্মবন্ধুদের সহিত আরও অধিক পরিমাণে আলাপ পরিচয় হইল। ক্রমে একটী পৃথক ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্মাণের কথা উত্থাপিত হয়। যতদূর স্মরণ হয়, বোধ হয় এই সময়ে রেলওয়ে ষ্টেশনের অপর পার্শ্বে কতক খালি ভূমি লইয়া একটী ব্রাহ্মপল্লী নির্মাণের আয়োজন হইয়াছিল। তথায় ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধেয় শ্রীনাথ চন্দ, চন্দ্রমোহন বিশ্বাস, অমরচন্দ্র দত্ত, গুরুদাস চক্রবর্তী মহাশয়গণ পৃথক পৃথক গৃহাদি নির্মাণ করেন। বোধ হয় প্রথম কিছুদিন চন্দ মহাশয়ের বাটীর বহির্ভাগে একখানি পৃথক গৃহে রবিবাসরিক উপাসনাকার্য সম্পন্ন হইত। এমন সময়ে একটী মন্দির নির্মাণের বিষয় আলোচিত হয় এবং একটী মন্দির নির্মিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এইরূপ নির্ধারিত হয়।

সর্বাগ্রে দানশীল মহাত্মা পরলোকগত মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্যের কথাই স্মরণ করা উচিত। তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়াতে তিনি সদর রাস্তার উপর দুর্গাবাড়ীর নিকট একখণ্ড ভূমি সমাজমন্দির নির্মাণের জন্য দান করেন। স্থানটী প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে একটি কাঁচা ঘর নির্মিত হয়; বোধ হয় ২।৩ বৎসর সেই গৃহেই সাপ্তাহিক উপাসনা ও বাৎসরিক উৎসবাদির কার্য হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ই নিয়মিতরূপে আচার্যের কার্য করিতেন। উৎসবের সময় চন্দ্রমোহনবাবু, গুরুদাসবাবু বা অন্য কেহ কতক কার্যভার গ্রহণ করিতেন। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কলেবর ক্রমে বৃদ্ধি পায়। কারণ ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউশন নামক বিদ্যালয়ে (পরে যাহা সিটি কলেজের শাখায় পরিণত হয়) কয়েক জন ব্রাহ্ম শিক্ষক নিযুক্ত হয়েন; যথা—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, গোলকচন্দ্র দাস, দ্বারকানাথ সরকার। বোধ হয় আরও কেহ আসিয়াছিলেন কিন্তু নাম স্মরণ হয় না। যাহা হউক ভগবানের প্রসাদে ব্রাহ্মপল্লীতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়; সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের পুষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত ঐ সময় যাঁহারা প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম স্বীকার করিতেন না, আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন না, অথচ ব্রাহ্মধর্মের সহিত সহানুভূতি ছিল, এমত লোকও সমাজের উপাসনায় যোগদান করিতেন। তবে ইহাও প্রকাশ করা উচিত যে যদিও কয়েকজন হিন্দুসমাজের লোক উপাসনা ও উৎসবাদিতে যোগ দিতেন, তবু

অনেকেই ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী ছিলেন। এমন কি মনে হয় ২।১ বার উৎসবের সময় যখন মন্দিরে ব্রাহ্মিকাগণ গমন করিতেন, ঐ সময় কেহ কেহ অত্যন্ত উপদ্রব করিয়াছিলেন। সে জন্য আমাদিগকে সতর্ক হইয়া বাহিরে প্রহরীর বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল।

ঠিক সময় স্মরণ হয় না, তবে ঐ সময়ের মধ্যে ক্রমে আমাকেই সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করা হয়; এবং একটী পাকা ইষ্টক-নির্মিত মন্দির নির্মাণের চেষ্টা করা হয়। ঐ বিষয়ে উপস্থিত সকলের বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। ভগবানের প্রসাদে ও সুনিয়মে সময় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বা জাতির উন্নতির উপায় হইয়া থাকে, সুযোগ ঘটিয়া থাকে। এই সাধারণ নিয়মানুসারেই ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির উপায় ঘটিয়াছিল। সুতরাং মন্দির নির্মাণার্থে যখন আমরা স্থানীয় জমিদার ও প্রজাবর্গের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম ও আমাদের অভাব জ্ঞাপন করিলাম তখন সকলেই মুক্ত হস্তে ঐ শুভ কার্যের জন্য দান করিতে লাগিলেন। কে কত দান করিয়াছিলেন তাহা এখন স্মরণ হয় না, তবে ইহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি যে ব্রহ্মপুত্রের উভয়পার্শ্বস্থ জমিদারগণ বেশ উদারতার সহিত দান করিয়াছিলেন। সহজেই যথেষ্ট ধন সঞ্চিত হয়। তখন মহারাজ সূর্য্যকান্ত বাহাদুর প্রদত্ত সেই ভূমির উপর একটী মন্দির নির্মাণের আয়োজন হয়। প্রধানত সম্পাদকের হস্তেই কার্যভার থাকে, কিন্তু তাঁহার সহায়তার জন্য বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে নিযুক্ত করা হয়।

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, উৎসবাদিতে হিন্দুসমাজের লোকও যোগ দিতেন। উৎসবের পর যে প্রীতিভোজন হইত, তাহা দুই একবার বোধহয় আমাদের বাড়ীতে হয়, তাহাতে হিন্দু খৃষ্টিয়ান ও ব্রাহ্মগণ একত্রে সমবেত হইয়া আহারাদি করিয়াছিলেন। পরে দুই একবার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যানবাটীতে হইয়াছিল; উহাতে সকলেরই বিশেষ উৎসাহ ও সহানুভূতি ছিল।

সমাজে সাপ্তাহিক উপাসনা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে আলোচনা সভা হইত, ঐ আলোচনায় সময়ে সময়ে দুই একটী গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইত। ঐ সময়ে সভ্যদের মধ্যে কোন কোন কারণে মতভেদও হইয়াছিল। বোধহয় শ্রীযুক্ত গোলকচন্দ্র দাসের বিবাহ সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছিল। কিন্তু আমরা

সপরিবারে ঐ বিবাহে যোগ দিয়াছিলাম। পরলোকগত শ্রদ্ধেয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের বিধবাবিবাহ লইয়াও অনেক আন্দোলন হইয়াছিল। যতদূর স্মরণ হয়, ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ ঐ বিবাহ অনুমোদন না করিয়া বরং প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

পূর্বে বলিয়াছি দ্বিতীয় বার ময়মনসিংহে যাওয়াতে আমার ধর্মজীবনের বিশেষ উন্নতির সহায়তা হইয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, যদিও আমি ১৮৮১—৮২ সালে প্রকাশ্যভাবে ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াছিলাম, তবু বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিশেষভাবে লিপ্ত হই নাই। ফরিদপুরে অবস্থিতিকালে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন মহাশয়ের সংসর্গে থাকিয়া কতক পরিমাণে উপকৃত হইয়াছিলাম ও তাঁহার সহানুভূতিতেই পারিবারিক উপাসনার ব্যবস্থা হয়। তাহাতে কেবল আমাদের দুই বাড়ীর নয়, অন্যান্য বাড়ীর পরিবারেরাও আসিয়া যোগদান করিতেন; এবং যদিও তথায় আমি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া তত্রস্থ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্মাণের আয়োজন করিয়াছিলাম, ও আমার দুই তিনটী পুত্র কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তবু উপাসনাদিতে বড় অধিক পরিমাণে নিযুক্ত হই নাই। তবে এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, প্রভু পরমেশ্বরের বিশেষ কৃপাতে একটী ভয়ানক ব্যাপারের মধ্য দিয়া লইয়া যাইবার সময় তিনি স্বয়ং আপনাকে আপনি প্রকাশিত করেন, এবং তদবধিই বাস্তবিক ধর্মজীবনের আরম্ভ হয় এবং নূতনভাবে জীবন গঠিত হইতে থাকে। যদিও এইরূপে ধর্মজীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল, তবু উহার বিশেষ উন্নতি হইবার সুযোগ বা অবকাশ হয় নাই। ১৮৮৮ সালে ময়মনসিংহ যাওয়াতে অনেক সুবিধা হইয়াছিল। আমার মনে হয়, যেমন পাঠশালায় "হাতেখড়ি" হয়, ফরিদপুরে আমার তাহাই হইয়াছিল, ময়মনসিংহে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি। তথায় কতিপয় ধর্মবন্ধুদের সংসর্গে থাকাতে, তাঁহাদের জীবনের গতি উদ্দেশ্য ও পন্থা দেখিয়া এবং কতকপরিমাণে তদনুসরণ করিতে চেষ্টা করায় বিশেষ উপকার হইয়াছিল। পরম শ্রদ্ধেয় পরলোকগত শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের মত নির্ভীক সত্যপ্রিয় ও চরিত্রবান লোকের সংসর্গে থাকিলে উপকার না হইয়াই পারে না। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের ন্যায় বিধাতার বিধানে বিশ্বাসী ও প্রেমময়ী বিশ্বজননীর প্রেমে প্রেমিক আচার্যের উপাসনা, প্রার্থনা ও উপদেশ

শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই উপকার হয়। আর শ্রদ্ধেয় গুরুদাস চক্রবর্তী মহাশয়, যিনি বিধাতার আদেশ শ্রবণ করিয়া আপনার পরিবার প্রতিপালনের একমাত্র উপায়স্বরূপ শিক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং তদবধি যিনি বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজের জন্য, সাধনাশ্রমের জন্য, রামমোহন রায় সেমিনারির জন্য কতই পরিশ্রম করিয়াছেন ও ভগবানের প্রসাদে কৃতকার্য হইয়াছেন, তাঁহার জীবনের ঐ ঘটনা দেখিয়া কে বলিবে যে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করা যায় না? কে বলিবে যে তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না? এবং ঐরূপ বিশ্বাস ও তাহার ফল দেখিয়া কাহার বিশ্বাস না দ্বিগুণিত হয়?

এতদ্ব্যতীত মহাত্মা কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় ২।১ বার ময়মনসিংহ সমাজে গিয়া তাঁহার জ্বলন্ত ব্রহ্মবিশ্বাস ও আগ্রহ দ্বারা সকলকেই উত্তেজিত করিয়াছিলেন এবং সকলেরই বিশ্বাসকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবীণ বয়সের ঐ ভাব দেখিয়া আমারও হৃদয়ের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল।

রমণীগণের মধ্যেও বেশ ধর্মভাব পরিস্ফুট হইতেছিল। ব্রাহ্মিকাগণ সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিতেন, ও উৎসবাদির বিশেষ দিনে আপনাদের মধ্যে উৎসবের কার্যাদি সম্পাদন করিতেন। সময় সময় টাউন হলে বক্তৃতাদি হইলে তথায় গমন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বালিকা বিদ্যালয়ের কার্যেরও সহায়তা করিতেন। বালকবালিকাগণও পিতামাতার জীবনের ভাব দেখিয়া উৎসাহে মাতিয়া বেড়াইত; উৎসবের সময়ে নানা-প্রকারে আপনাদের বয়সোচিত কার্যে ব্যাপৃত থাকিত। এইরূপে নানা-প্রকারে ব্রাহ্মদের জীবনে জীবন্তভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। সুতরাং আমিও নির্জীব থাকিতে পারিতাম না। আমাকেও কতক পরিমাণে জীবন্তভাব অর্জন করিতে হইয়াছিল।

তাই উপরে বলিয়াছি যে, ফরিদপুরে যখন ছিলাম তখন যেন পাঠশালায় প্রবেশ করিয়াছিলাম, ময়মনসিংহে যখন যাই তখন যেন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলাম। ক্রমে মহান পরমেশ্বরের ব্যবস্থানুসারে যশোহরে মনিটারের কার্যে নিযুক্ত হই এবং রঙ্গপুরে ও তাহার পর বীরভূমে এক প্রকার শিক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন বেশ বুঝিতেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হই নাই। মধ্যে যে সমস্ত পরীক্ষার মধ্য দিয়া আসিতে

হইয়াছে সেই সমুদয় পরীক্ষায় সুচারুরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। আপনা আপনি হয়ত মনে করিয়াছি, বেশ লিখিয়াছি, ফলে জানিয়াছি সমস্ত ভুল হইয়াছে। এইরূপে পাপ প্রলোভনে দুঃখ শোকে বার বার পরীক্ষিত হইতেছি কিন্তু এখনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইতেছি না। বাহিরে যতটুকু ধর্মজীবনের ভাব প্রকাশ পায়, বাস্তবিক অন্তরে সেরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। এখনও শোকে অভিভুত হই, এখনও ক্রুদ্ধ হই, সামান্য কারণে বিরক্ত হই। এখনও দয়া ক্ষমা ও প্রেম লইয়া সকল সময়ে উপাসনায় বসিতে পারি না।

তবে দয়াময় পিতা স্নেহময়ী মাতার কৃপায় এইটুকু শিখিয়াছি যে, তিনিই একমাত্র উপায়, অবলম্বন, সহায় ও সম্বল। তিনিই গুরু, জ্ঞানদাতা। এই সমস্ত জানিয়া বুঝিয়াও তদনুরূপ বিশ্বাস লাভ করিতে নির্ভরশীল হইতে পারি নাই ও সেজন্যই যথোচিত শান্তি লাভ করিতে অক্ষম হইয়া আছি। কেবল আশার উপর ভরসা করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

চন্দননগর
৭।১।১৯১০

শ্রীধর্মদাস বসু

সপ্তম অধ্যায়

(১৮৯৩—১৮৯৭)

মন্দির প্রতিষ্ঠা

১৮৯২ সালের আশ্বিন মাসে মন্দির নির্মাণ কার্য শেষ হইল। আমাদের প্রাণে কত আনন্দ কতই উৎসাহ হইল। এই সময়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় ধর্মবন্ধু ডাক্তার ধর্মদাস বসু মহাশয় ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। আমার প্রতি সমাজের সম্পাদকীয় কার্যভার অর্পিত হইয়াছে। অগ্রহায়ণের প্রথম হইতেই মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতে লাগিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীকিশোর কুশারী ও শ্রীমান গুরুদাস চক্রবর্তী প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হইলেন। ২৬শে পৌষ আমাদের সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব ; সেই সময়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে এবং নব মন্দিরে সমাজের অষ্টাত্রিংশ সাম্বৎসারিক উৎসব সম্পন্ন হইবে নির্ধারিত হইল। শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবু এই উৎসবের কিছুদিন পূর্বেই আগমন করিলেন এবং উপাসনা ও বক্তৃতাদি দ্বারা আমাদিগকে উৎসবের জন্য প্রস্তুত করিয়া গেলেন। কার্যবশত তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত থাকিতে পারিলেন না। মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় সম্পাদক যে রিপোর্ট পড়িয়াছিলেন, আমরা এস্থলে তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করিলাম।

"ধন্য প্রভু দয়াময়, তুমিই ধন্য। তোমার অযাচিত কৃপায় আমরা এই সুন্দর মন্দির প্রাপ্ত হইয়াছি। যখনই আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি সামর্থ্যের কথা স্মরণ করি, তখনই বিস্মিত হই যে কেমন করিয়া এমন মন্দির নির্মিত হইল। তখন হে সর্বশক্তিমান, তোমারই অসীম শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই। ইহার প্রত্যেক ইষ্টক খণ্ড তোমার প্রেম ও কৃপার বন্ধনে গ্রথিত হইয়াছে। হে প্রেমময়, আমরা সর্বাগ্রে তোমার নাম স্মরণ করি ; হে পরম দাতা, কৃতজ্ঞতার সহিত তোমার চরণে প্রণত হই।

"১৮৬৯ সালে এই নগরে প্রথম ব্রহ্মমন্দির নির্মিত হয়। ১৮৭৮ সালের মতবৈষম্যের তুফানে পড়িয়া আমাদিগকে সেই মন্দির পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয়। যখন আমরা সেই মন্দির পরিত্যাগ করি, তখন বৃক্ষতল

ভিন্ন আমাদের মস্তক রাখিবার আর দ্বিতীয় স্থল ছিল না। তদবধি আমরা আশ্রয়হীন ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ১৮৭৮ সাল হইতে এই সুদীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর এক প্রকার বনবাসে যাপন করিয়া আমরা আমাদের ভারাক্রান্ত মস্তক রাখিবার স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। বৃক্ষতল ও সামান্য পর্ণকুটীর ভিন্ন যাহাদের আশ্রয় ছিল না, আজি তাহাদের জন্য নগরের বক্ষঃস্থলে এমন সুন্দর মন্দির নির্মিত হইয়াছে! এ আনন্দ হৃদয়ে ধরে না; হে আনন্দময় তুমিই ধন্য!* * *

"এই সুদীর্ঘ ক্লেশকর সময়ের মধ্যেও ঈশ্বরের করুণা আমাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। এই সময়ের মধ্যে তাঁহারই বিশেষ কৃপায় এই নগরে একটী ব্রাহ্মপল্লী স্থাপিত হইয়াছে এবং বিশেষ আহ্লাদের কথা এই, আমাদেরই একজন বিষয়কর্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর আহ্বানে ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন।

"১৮৮৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীমতী ভারতেশ্বরীর জুবিলী উপলক্ষে এই নগর মহোৎসবে প্রমত্ত, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর পরব্রহ্মের মহিমান্বিত নাম এই ভূমিতে প্রথম উচ্চারিত হয়। মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর আমাদিগকে এই ভূমি দান করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি রাজাবাহাদুরের এই একমাত্র অনুগ্রহ নহে। তিনি ভূমিপ্রতিষ্ঠা উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া আমাদের যথেষ্ট উৎসাহ বর্ধন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

"ছয় বৎসরব্যাপী যত্ন ও পরিশ্রমে এই মন্দির নির্মিত হইয়াছে। আজি এই মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে আমাদের শ্রদ্ধেয় ধর্মবন্ধু শ্রীযুক্ত ধর্মদাস বসু মহাশয়কে উপস্থিত না দেখিয়া অধীর হইতেছি। তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্যে অবসাদ জানিতেন না। তাঁহার উৎসাহ ও পরিশ্রমই এই মন্দির নির্মাণ কার্যে আমাদের প্রধান সহায় হইয়াছিল। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

"কোন প্রকার পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ দাস এবং ওভারশিয়ার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই

মন্দির নির্মাণকার্যে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

"ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল ; ইহা আমাদের গভীর আনন্দের বিষয় বটে কিন্তু ইহাতে কৃতিত্বের বিষয় কিছুই নাই ; স্বয়ং ভগবান ইহার মূলে বর্তমান। আর এই মন্দির উদারস্বভাব দানশীল মহোদয়গণের সদাশয়তার প্রত্যক্ষ পরিচয়। আমাদের ত কোন সম্বলই ছিল না ; কিন্তু প্রায় ছয় হাজার মুদ্রা ব্যয়ে এই মন্দির নির্মিত হইয়াছে। যাঁহারা এই কার্যে মুক্তহস্তে অর্থদান করিয়াছেন, কি বলিয়া তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব, জানি না। সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র ভেলাস্বরূপ পতিতপাবন ব্রহ্মনাম জাতিবর্ণ নির্বিশেষে কীর্তন করিবার জন্য যাঁহারা এমন সুবিধা করিয়া দিলেন, তাঁহাদের ঋণ কথায় পরিশোধ করা যায় না। তাঁহারা আমাদের আন্তরিক গভীর কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।"

উৎসবের কার্যবিবরণ

এই বিবরণ তৎকালে লিখিত সমাজের রিপোর্ট হইতে সংক্ষেপে গ্রহণ করিলাম।

"২২শে পৌষ বৃহস্পতিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্তী এবং ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয় আগমন করেন। প্রত্যুষে শ্রীযুক্ত চন্দ মহাশয়ের ভবনে কীর্তন ও প্রার্থনা হয়। রাত্রিতে উপাসনার পর শ্রীনাথ বাবু ও চণ্ডীবাবু উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতে ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করেন।"

"২৩শে পৌষ শুক্রবার ঊষাকীর্তনের পর গুরুদাসবাবুর গৃহে ব্রাহ্মিকাদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা হয় ; শাস্ত্রী মহাশয় আচার্যের কার্য করেন। অপরাহ্নে বাবু শশিকুমার বসুর বাসা হইতে নগরসংকীর্তন বাহির হয়। এই উপলক্ষে বাবু অমরচন্দ্র দত্ত একটী নূতন নগর সংকীর্তন রচনা করিয়াছিলেন। নগরের দুই স্থানে শাস্ত্রী মহাশয় দুইটী শ্লোক উচ্চারণ করিয়া দুইটী সংক্ষিপ্ত প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। কীর্তন করিতে করিতে সকলে মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইলে একটী নবরচিত সংগীত গীত হয় ; শাস্ত্রী মহাশয় কিছু বলিয়া মন্দির দ্বার উন্মুক্ত করেন। সকলে গৃহে প্রবেশ করিয়া ভাবোন্মত্ত-

চিত্তে সংকীর্তন করিতে থাকেন। শাস্ত্রী মহাশয় বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। সে দিনের উপাসনা ও উপদেশ যেন মহাসাগরের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় সকলের হৃদয় প্লাবিত করিয়াছিল; ভক্তদিগের ভাবোন্মত্ততায় যেন মন্দির টলমল করিতেছিল। নগরবাসিগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সে অপূর্ব দৃশ্য দেখিতেছিলেন। কপিল শাপে ভস্মীভূত ষষ্ঠি সহস্র সগর সন্তানের উদ্ধারার্থ ভগীরথ যেমন সুরধুনী গঙ্গাকে ধরাতলে আনয়ন করিয়াছিলেন, তেমনি এই পাপতাপপূর্ণ পৃথিবীর কোটী কোটী নরনারীর উদ্ধারের জন্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় পতিতপাবন ব্রহ্মনাম ধরাতে আনয়ন করিয়াছেন। এই মর্মে তিনি সে দিন যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক শুষ্ক হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল, অনেক সন্তপ্তচিত্ত শীতল হইয়াছিল, নিরাশ-মনে আশার উদয় হইয়াছিল।"

"২৪শে পৌষ শনিবার প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়, শাস্ত্রী মহাশয় আচার্যের কার্য করেন। অপরাহ্ণ ৩টার সময় মন্দিরে আলোচনা হয়। সন্ধ্যাকালে থানার ঘাটে কীর্তন হয় এবং চণ্ডীবাবু বক্তৃতা করেন। রাত্রিতে সূর্য্যকান্ত টাউন হলে শাস্ত্রী মহাশয় "যুগসন্ধি ও যুগসমস্যা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। টাউন হল লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, নগরের সকল শ্রেণীর শিক্ষিত লোক ও ছাত্রবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এরূপ বক্তৃতা ময়মনসিংহে কদাচিৎ শোনা গিয়াছে।"

"২৫শে পৌষ রবিবার সমস্ত দিন উৎসব হয়। প্রাতে শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। মধ্যাহ্নে চণ্ডীবাবু ও গুরুদাসবাবু উপাসনা ও সৎগ্রন্থ পাঠ করেন। অতঃপর সাধারণ সভা হয়; সভায় মন্দির নির্মাণের রিপোর্ট ও ট্রাষ্টডীড পড়া হয়। তৎপর শাস্ত্রী মহাশয়, ব্রাহ্মদের মন্দির কি, তীর্থ কি, শাস্ত্র কি, ধর্মের মূল ও সাধন কি ইত্যাদি প্রশ্ন তুলিয়া অতি সরল ও সরসভাবে উত্তর প্রদান করেন। রাত্রিতে সংগীত ও সংকীর্তন হইয়া উপাসনা হয়; শাস্ত্রী মহাশয় আচার্যের কার্য করেন।

"শাস্ত্রী মহাশয় ও গুরুদাসবাবু এই রাত্রিতেই কলিকাতায় গমন করেন। পরদিন ২৬শে পৌষ সমাজের বার্ষিক উৎসব হয়। চণ্ডীবাবু ও স্থানীয় আচার্যগণ কার্য নির্বাহ করেন। একদিন মধ্যাহ্নে মন্দিরে মহিলাদিগের

উৎসব হয়। ব্রাহ্ম, হিন্দু ও খৃষ্টান প্রায় ৪০টী মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন; শ্রীমতী সুশীলা বসু এই সম্মিলনে নেতৃত্ব করেন। ময়মনসিংহ ব্রহ্মমন্দিরে এইরূপ সম্মিলন এই প্রথম।"

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীড

আমারা এই ট্রষ্টডীডের অবশ্য জ্ঞাতব্য কিয়দংশ নিম্নে গ্রহণ করিলাম। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধর্মদাস বসু মহাশয় এই ট্রষ্টডীড সম্পাদন করেন।

"ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের বিশেষ অধিবেশনে বিগত ১২৯৯ সনের ২১শে বৈশাখ তারিখের নির্ধারণক্রমে অধিকাংশ সভ্যের মতে নিম্নলিখিত ৭জন ব্যক্তি ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির ও স্থাবর সম্পত্তির ট্রষ্টী নিযুক্ত হইয়াছেন। যথা:—

ময়মনসিংহের সিবিল সার্জন শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্মদাস বসু, ময়মনসিংহ ব্রাহ্মপল্লীনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চন্দ ও শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন বিশ্বাস, কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, এবং ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালী নারায়ণ গুপ্ত। এই ট্রষ্টডীডের পাণ্ডুলিপি উক্ত বিশেষ অধিবেশনে সভ্যগণের সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

* * * * *

(২) উল্লিখিত মন্দির "ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির" নামে অভিহিত হইবে। ঐ গৃহে প্রতিদিন, অন্তত প্রতি সপ্তাহে, একমাত্র, অদ্বিতীয়, অনন্ত, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, নিরাকার, নির্বিকার, চৈতন্যস্বরূপ, মঙ্গলময়, নিত্য, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময়, পবিত্রস্বরূপ, নিত্যক্রিয়াশীল, ক্ষমাশীল পরব্রহ্মের উপাসনা হইবে। এখানে কোন সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা হইবে না; কোন মনুষ্য অথবা ইতর জীব বা জড় পদার্থ ঈশ্বর জ্ঞানে অথবা ঈশ্বরের সমকক্ষ বা অবতার জ্ঞানে পূজিত বা পরিগৃহীত হইবে না; এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও নিকট বা কাহারও নামে প্রার্থনা স্তুতি বা সঙ্গীত হইবে না; এবং যে সকল নামে পৌত্তলিক দেব দেবীকে লক্ষ্য করে এখানকার উপাসনাতে সেই সকল নাম বা শব্দ ঈশ্বরের প্রতি ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। কোন খোদিত বা চিত্রিত প্রতিকৃতি অথবা কোন সম্প্রদায়নির্মিত বাহ্যিক চিহ্ন যাহা পূজার্থে

বা কোন ঘটনা বা ব্যক্তির স্মরণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে, তাহা এখানে রক্ষিত হইবে না। এই মন্দিরে অথবা পূর্বোক্ত চতুঃসীমাভুক্ত ভূমিতে কোন বলি, উপকরণ বা অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু উপাসনার অঙ্গীয়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না এবং অহিংস্র জীবের প্রাণ বধ করা হইবে না। মন্দির মধ্যে জীবন রক্ষার্থ নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কোন প্রকার পানাহার হইবে না কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক হইলে তৃষ্ণা নিবারণার্থ জলপান ও রোগ নিবারণার্থ ঔষধ ব্যবহার করা যাইবে। এখানে কোন প্রকার আমোদ বা কলহবিবাদ হইতে পারিবে না। এই মন্দিরে অবরোধ প্রথার অনুরোধে মহিলাদিগের জন্য পরদা প্রভৃতির ব্যবহার হইতে পারিবে না। তাহাতে কোন সৃষ্ট জীব বা পদার্থ যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজিত হইয়াছে বা হইবে, তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবে না। এখানে কোন বিশেষ পুস্তক বা ব্যক্তি ঈশ্বরপ্রেরিত বা অভ্রান্ত বা মুক্তির উপায় (means of salvation) বলিয়া স্বীকৃত বা গৃহীত হইবে না। কিন্তু কোন পুস্তকাদি যাহা কোন সম্প্রদায় বিশেষে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে বা হইবে, তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবে না। এখানে কোন সম্প্রদায়কে বা ব্যক্তিবিশেষকে নিন্দা উপহাস বা বিদ্বেষ করা হইবে না। এখানকার উপাসনা ও বক্তৃতাদিতে কোন প্রকার পৌত্তলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা বা পাপের অনুমোদন ও তৎপ্রতি উৎসাহ দান করা হইবে না। যাহাতে জাতি বর্ণ সম্প্রদায় ও অবস্থা নির্বিশেষে সকল নরনারী একতা ও প্রীতি সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন, এবং উদার ও পবিত্র ব্রাহ্মধর্মের সাহায্যে সকল প্রকার ভ্রম পাপ ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান প্রীতি ভক্তি ও সাধুতাতে উন্নত হইতে পারেন, এমন ভাবে ও প্রণালীতে এখানে উপাসনা ও বক্তৃতাদি হইবে।”

সত্যানন্দের পরলোক যাত্রা

আমার তৃতীয় পুত্র সত্যানন্দের পীড়ার বিবরণ পূর্বে লিখিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রায় ২ বৎসর কাল সে কঠোর রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিল। ১৮৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে আমাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা হইল; এই সময়ে যে নগর কীর্ত্তন রচিত হয়, আমার গৃহে বসিয়া তাহার তালিম হইত; সত্যানন্দ ঐ গানটী শিখিয়াছিল। সে প্রায়ই নির্জ্জনে বসিয়া গাহিত,

"মোহ ঘোর কবে হবে ভোর, কবে অমর আত্মা মোর, আনন্দে হবে বিভোর, গাবে সদা মাতৃগুণ গাথা।" এই বৎসর বর্ষাকাল তাহার পক্ষে অতিশয় ক্লেশজনক হইয়াছিল, রোগের যন্ত্রণা অতিশয় বাড়িয়া গেল, শরীর শীর্ণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে সর্বদাই আমার কাছে থাকিতে চাহিত; আমি দিনে কয়েক ঘণ্টার জন্য স্কুলে যাইতাম, তাহাও তাহার সহ্য হইত না। বৎসরে আমি ১৫ দিন ছুটী পাইতাম, তাহার হিসাব সে রাখিত এবং এক এক দিন আমাকে কোন রূপেই ছাড়িতে চাহিত না। অনেক সময় জোর করিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া যাইতে হইত।

ডাক্তারেরা তাহাকে কিছু দিন নৌকায় রাখিতে বলিলেন। তদনুসারে আশ্বিনের বন্ধটা আমি তাহাকে লইয়া নৌকায় কাটাইলাম। কিন্তু কিছুতেই সেই দুরন্ত রোগের উপশম হইল না।

সত্যানন্দের ধর্ম-বিশ্বাস বেশ প্রকাশ পাইয়াছিল। রোগ যন্ত্রণার সময় সে ঈশ্বরের নাম করিতে বলিত এবং নিজেও "দয়াল দীনবন্ধু" নাম বার বার বলিত। বালকের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া লোকে অবা ক হইত। একদা আমার শ্রদ্ধেয় ধর্মবন্ধু ৺ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক দিন আমাদের গৃহে ছিলেন। আমি পার্শ্বের কোঠায় মাখনকে নিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতাম। সে একবার কোলে উঠিত, একবার শয্যায় বসিত, শয়ন করিতে পারিত না। এত কষ্টেও তাহার মুখের প্রসন্নতা যাইত না, কথার মিষ্টতা কমিত না, ঈশ্বরের নামে অনুরাগ যেন আরও বাড়িয়া যাইত। নবকান্তবাবু আমাকে বলিলেন, এমন বালক পৃথিবীর জন্য নয়, ও যে একবারে প্রস্তুত হইয়াই রহিয়াছে।

ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে সে আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিত। তাহার ভাবে বোধ হইত, সে এই সকল কথা অতি সহজ ভাবে বুঝিতে পারে। সন্ধ্যাকালে আমি তাহার শিয়রে বসিয়া গান ও প্রার্থনা করিতাম। একদিন গান করিতে করিতে দেখিলাম সে যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; তাই কথা না বলিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলাম। কার্য শেষ হইলে মাখন বলিল, বাবা আজ ত প্রার্থনা করিলে না? আমি বলিলাম, তোমার ঘুম হইয়াছে মনে করিয়া কথা বলি নাই, মনে মনে প্রার্থনা করিয়াছি। সে বলিল, "আমি ঘুমাই নাই, তা প্রার্থনা কথায় বলিলেও হয়, মনে মনে

বলিলেও হয় ; না বাবা ?” আর একদিন সন্ধ্যাকালে গাড়ীতে চড়িয়া নদীর তীরে বেড়াইতেছিলাম। সাহেবদের গীর্জা ঘরের কাছে যাইয়া যাখন নীরবে কাঁদিতে লাগিল, জিজ্ঞাসা করাতে অনেকক্ষণ পরে বলিল, “উপাসনার জায়গা দেখিলেই আমার প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করে ; আমি তো কিছুই বলিতে জানি না, আমার কেবল কান্না পায়।”

অধিক দিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করিলে অনেকেই অসহিষ্ণু ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে, আহারাদির নিয়ম রক্ষা করিতে পারে না ; কিন্তু সত্যানন্দ কখনও সেরূপ হয় নাই। চিকিৎসকেরা যখন যেরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, বালক ধৈর্যের সহিত তাহা প্রতিপালন করিয়াছে। একদিন গৃহে এক কাঁদি কলা বাঁধা ছিল, বালক সতৃষ্ণ নয়নে তাহা দেখিতেছিল, তাহার পিসীমা একটী কলা তাহার হাতে দিলেন। সে অনেকক্ষণ কলাটী হাতে রাখিয়া ফিরাইয়া দিল ; খাইতে বলিলে বলিল, “বাবাকে না বলিয়া খাইব না।” একদিন মাতার সঙ্গে কোন প্রতিবেশী গৃহে গিয়াছিল, গৃহিণী তাহার হাতে একখানি কচুরী দিয়া খাইতে বলিলেন ; বালক অনেকক্ষণ ইতস্তত করিয়া উহা রাখিয়া দিল এবং বিষণ্ণমুখে বলিল, “আমাকে এ সব জিনিস খাইতে দেন না।”

বর্ষা অতীত হইলে আমাদের মনে একটু আশা জন্মিল কিন্তু অগ্রহায়ণের প্রথম ভাগে তাহার পীড়া সীমা লঙ্ঘন করিল, ক্লেশ অসহ্য হইল। দেখিতে দেখিতে তাহার মহাযাত্রার দিন নিকটবর্তী হইল। ৩ দিন পূর্বে বলিল, বাবা আমি পাড়ার সকল বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইব। সে দিন তার প্রিয় জ্যেঠামহাশয় চন্দ্রমোহনবাবু তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সে কিছু আহার করিয়া আসিয়া বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিল। তারপর দিন মায়ের রাঁধা খাইতে চাহিল এবং বকফুল ভাজিতে বলিল। কিন্তু আহারের পূর্বে প্রবল জ্বর আসিল, আর খাওয়া হইল না। আমাকে ডাকিয়া বলিল, বাবা আমি ত খাব না, তুমি আমার কাছে বসিয়া খাও, আমি দেখি। আমি বলিলাম, বাবা, তুমি খাবে না, আমি কি খাইতে পারিব ? সে হাসিয়া বলিল, তাতে কি, তুমি খাও আমি দেখি, জ্বর ছাড়িলে কাল আমিও খাব। অগত্যা আমি তার শয্যার কাছে বসিয়া কিছু খাইলাম। কিন্তু তাহার সে দুরন্ত জ্বর আর ছাড়িল না, সে মুখে আর অন্ন উঠিল না।

১৩ই অগ্রহায়ণ সমস্ত রাত্রি মহা কষ্টে অতীত হইল, আমি সমস্ত রাত্রি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া কাটাইলাম। শেষ রাত্রিতে বলিল, বাবা, তোমার জন্য বড় কষ্ট হয়, তুমি একটু শোও, আমি মার কোলে থাকি। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই বলিল, বাবা তুমি যেমন ক'রে রাখ, মা তেমন পারেন না, তুমি আমাকে ধর, আমি কিছুতেই থাকিতে পারিলাম না; তোমার জন্য আমার বড় কষ্ট হয়।

১৪ই অগ্রহায়ণ প্রাতে একটু ঘুমাইল, আমি বাহিরে বেড়াইলাম; আসিয়া দেখি তাহার পা দুখানি ফুলিয়াছে ও ঠাণ্ডা হইয়াছে। তখন ডাক্তারেরা আসিলেন, ব্রাহ্মবন্ধুগণ আসিলেন। সেবা শুশ্রূষা চলিল। আমি তাকে কোলে লইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। একটু নির্জন হইলে বলিলাম, মাখন, তুমি তো আজ আনন্দময়ী মার কাছে যাইতেছ, মনে কোন ভয় হয়? সে মাথা তুলিয়া বলিল কিসের ভয়? আমি বলিলাম, তোমার মনে কোন কষ্ট আছে? সে বলিল, না, কিছুই না। কাহাকেও দেখিতে চাও? "সকলেই ত আছেন। বাবা, আজ সকলকে আমাদের ঘরে খেতে বল, বেলা অনেক হলো ডাক্তারবাবুদেরে খেতে দাও।" বেলা ৩টার সময় হাত পা শীতল হইয়া গেল, নাড়ী ছাড়িয়া আসিতে লাগিল, তখনও দিব্য জ্ঞান, স্পষ্ট কথাবার্তা। "বাবা আমাকে কোলে লও, কোলে লও" বলিয়া বড়ই আব্দার করিতেছিল, ডাক্তার বৈদ্যনাথবাবু নিবারণ করিলেন, আর সময় নাই। ডাক্তার পূর্ণবাবু বারান্দায় বসিয়াছিলেন, বলিলেন, কি চায়? কোলে উঠিতে চায়? কোলে করুন, উহার শেষ সাধ পূর্ণ করুন। আমি কোলে করিলাম, কাঁধে মাথা রাখিয়া নাম করিতে বলিল। আমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তখনই শয্যায় রাখিলাম, বলিল "গান কর।" বাবু কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মব্রত শিয়রে বসিয়াছিলেন, তাঁকে গাহিতে বলিলাম, তিনি চেষ্টা করিলেন কিন্তু কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল! মাখন বলিল, "মা বাবা শোন", তাড়াতাড়ি তার মুখের উপর মুখ দিলাম, প্রাণপাখী উড়িয়া গেল, সে রুগ্ন দেহপিঞ্জর শূন্য পড়িয়া রহিল। তখন মনে এই প্রার্থনা আসিল—"জগতজননী লহ লহ কোলে, বিরাম মাগিছে ক্লান্ত শিশু এ।"

সমাধি

মানুষের এত আদরের দেহটী শ্মশানে নিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করা আমি কিছুতেই সহিতে পারিতাম না। যখন ইহা স্মরণ হইত, আমার শরীর শিহরিয়া উঠিত। প্রাণতুল্য পুত্র মাখনের সেই কোমল দেহে অগ্নি সংযোগ করিতে আমি কিছুতেই সম্মত হইলাম না। সমাধি প্রথাই আমার নিকট ভাল বোধ হইল। মাখনের দেহ সমাধিস্থ করিতেই ইচ্ছা হইল। কিন্তু বাড়ীতে সমাধি দেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। উহার জন্য মিউনিসিপালিটীর অনুমতি আবশ্যক। আমি একটু ধৈর্য ধারণ করিয়া অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলাম। আমার মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় মহাশয় তখন চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন; তিনি লিখিয়া দিলেন, "যেহেতু ব্রাহ্মদিগের কোন স্বতন্ত্র সমাধিস্থান নাই, তজ্জন্য বিশেষ নিয়মে এই অনুমতি দেওয়া গেল।" তিনি সমাধির যে নিয়ম নির্দেশ করিয়া দিলেন' তদনুসারে উহা সম্পাদিত হইল।

পুত্রশোক

পুত্রশোক অতি কঠোর ও তীক্ষ্ণ শেলের ন্যায়। উহার যন্ত্রণায় মানুষ পাগল হইয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মকৃপায় আমরা এই শোক বহন করিবার শক্তি পাইলাম। ব্রহ্মনামের অমৃত ধারায় এই ভীষণ শোকানল নির্বাণ প্রাপ্ত হইল। প্রত্যহ উপাসনায় নবজীবনের নবভাব প্রকাশ পাইতেছিল। পুত্রশোক পরম বন্ধুর ন্যায় জননীর অমৃত ক্রোড়ে আমাদিগকে তুলিয়া দিতে লাগিল। আমার পত্নীর জীবনের আশ্চর্য পরিবর্তন ও অসাধারণ সহিষ্ণুতা দেখা গেল। নিম্নলিখিত কয়েকটী তত্ত্ব তখন হৃদয়ে অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

১। যখন কোন কাষ্ঠফলকে হাতুড়ী দ্বারা লৌহ বিদ্ধ করে তখন পাছে কাষ্ঠ ফাটিয়া যায়, এজন্য অপরদিকে একজন লোক উহা চাপিয়া ধরে; সেইরূপ এক দিকে আমাদের আত্মার চৈতন্যের জন্য তিনি এই শোকশেল বিদ্ধ করিতেছেন, আবার উহা যেন বিদীর্ণ না হয়, এজন্য স্বহস্তে চাপিয়া ধরিয়াছেন! তাঁহার এই স্পর্শ অতি স্পষ্টরূপে অনুভব করিয়াছিলাম।

২। এত দিন পরলোক দূর ছিল, শ্রুত বিষয় মাত্র ছিল। এখন উহা নিকট হইল এবং প্রিয়জনের স্থান বলিয়া উহার চিন্তা অপরিহার্য হইল।

পৃথিবীর কোন অপরিচিত স্থানে যদি প্রিয়জনের কেহ গমন করে, তবে যেমন সে স্থানটী আর অপরিচিত থাকে না, তাহার সঙ্গে একটা প্রীতির যোগ হয়, তাহার ভাবনা সর্বদাই ভাবিতে হয়, সেইরূপ মাখনের পরলোক গমনে সেই অমৃতলোকের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ প্রিয় সম্বন্ধ জন্মিয়া গেল।

৩। একদিন উপাসনায় ব্রহ্মের অনন্ত সত্তায় ও অমৃত ক্রোড়ে সকলই আছে দেখিয়া মনে বড় আরাম পাইলাম। দেখিলাম সৃষ্টির কিছুরই বিনাশ নাই, একটী পরমাণুরও ধ্বংস নাই। মাখনের আত্মায় যে অপূর্ব ভালবাসা ও জ্ঞানের বিকাশ দেখিলাম, তাহা কি বিনষ্ট হইতে পারে? আর দেহই কি বিনষ্ট হইয়াছে? এই যে বাগানের মাটিতে সেই সুন্দর দেহের অণুরেণু মিশিয়া গেছে, এই ফুলে এই ফলে এই বাতাসে এই আকাশে নানা মূর্তিতে সেই দেহ বিরাজ করিতেছে! নানা রূপ ধরিয়া আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে।

৪। "তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি যাই, কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই", এই সঙ্গীতে যে মহাভাব ব্যক্ত হইয়াছে, উহাতে যে সত্য রাজ্যের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, মাখনের পরলোক গমনে আমার প্রাণে সেই ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই রাজ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু মহাকবি যেরূপ সহজ কথায় সেই অপূর্ব তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, আমি সেরূপ ব্যক্ত করিতে পারি নাই; আমার চক্ষে যাহা ছায়ার ন্যায় ভাসা ভাসা ছিল, কবি তাহার প্রত্যক্ষ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই সঙ্গীত যে দিন শুনিলাম, সেদিন আমার নিকটে উহা যেন চিরপরিচিত বলিয়া বোধ হইল। আমি যাহা মানসচক্ষে দেখিয়াছি, কিন্তু বুঝাইতে পারি নাই, এতদিনে কবিকণ্ঠে সহজে সেই অব্যক্ত কথা সুব্যক্ত হইল। ইহাতে মনে কতই আনন্দ হইল, বলিতে পারি না।

৫। মাতা যখন রুগ্ন সন্তানের মুখে তিক্ত ঔষধ তুলিয়া দেন, তখন অবোধ সন্তান কতই বিরক্ত হয়, মাকে কত তিরস্কার করে; কিন্তু মা জানেন, এই তিক্ত ঔষধ দ্বারাই সন্তানের সাংঘাতিক রোগ নিবারিত হইবে। সেইরূপ জগন্মাতা আমাদের ভবব্যাধি নিবারণের জন্য সময়ে সময়ে এই তিক্ত ঔষধ বিধান করেন, আমরা তাঁহার কর্মের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি কতই অসন্তুষ্ট হই, মনে মনে কতই অভিযোগ করি; কিন্তু মা জানেন

ইহাতেই পরিণামে আমাদের মঙ্গল হইবে। "তব দয়া পদে পদে, সম্পদে দুঃখ বিপদে, কিন্তু হে, বিপদে বুঝে তোমার প্রেমিক সবে" এই সঙ্গীতটী তখন বড় ভাল লাগিত।

সত্যানন্দের শোক আমাদের পল্লীবাসিগণ সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন; উহা ব্রাহ্মদিগের সাধারণ শোকরূপে পরিণত হইয়াছিল। এই শোক সময়ে স্থানীয় এবং বিদেশস্থ ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাদিগের এরূপ সহানুভূতি পাইয়াছিলাম, যাহা আমি আশা করি নাই। ইহার পরবর্তী মাঘোৎসব সময়ে আমাদের মণ্ডলীর এই শোকের ভাব অতি উজ্জলরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। এই উৎসবের জন্য আমার প্রিয় ভ্রাতা বাবু অমরচন্দ্র দত্ত যে নগর কীর্তন রচনা করিয়াছিলেন তাহার প্রারম্ভ এইরূপ—

"ও ঘিরিল রে শোকে তাপে এ জীবন,
দেখি চৌদিকে বেড়া যেন হুতাশন।
জীবের হাহাকার, শোকতাপের ভার,
করে নিবারণ আছে সাধ্য কার?
কেবল নিস্তার ঐ তারক ব্রহ্ম নাম সাধন।"

এই সংকীর্তন শুনিয়া একজন বিদেশাগত ব্রাহ্ম বলিয়াছিলেন, "শ্রীনাথ বাবুর পরিবারে শোক হইয়াছে বলিয়া কি আমাদের সকলকেই শোকতাপে ঘিরিয়াছে বলিতে হইবে?" বস্তুত তখন আমাদের মণ্ডলীতে বিশেষত পল্লীবাসীদিগের মধ্যে এমনই একপ্রাণতা ছিল যে, আমরা একের শোক দুঃখ সকলেই সমভাবে অনুভব করিতাম।

পারলৌকিক

প্রায় একমাস সপরিবারে শোক-কাল যাপন করিয়া ১২ই পৌষ পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পাদন করা গেল। এই অনুষ্ঠানে একটু বিশেষত্ব ছিল। যে প্রণালীতে কার্য হইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত নিমন্ত্রণ পত্রে তাহা জানা যাইবে।

"সবিনয় নিবেদন,

আগামী মঙ্গল ও বুধবার দিবস নিম্নলিখিত প্রণালীমতে আমার স্বর্গগত শিশু সন্তান শ্রীমান সত্যানন্দের "পারত্রিক শুভানুষ্ঠান" সম্পাদিত হইবে। আপনি কৃপা করিয়া উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইলে অনুগৃহীত হইব।

১২ই পৌষ, মঙ্গলবার

পূর্বাহ্ন ৪টা হইতে ৬টা পর্যন্ত উষাকীর্তন ও সমাধিস্থানে প্রার্থনা।

" ৭॥টা হইতে ৯॥টা——ব্রহ্মোপাসনা।

মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে ৩টা——পাঠ ও প্রসঙ্গ।

অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৪টা——ধ্যান ও প্রার্থনা।

" ৪টা " ৫টা——নাম কীর্তন।

" ৫টা " ৭টা——উপাসনা।

১৩ই পৌষ, বুধবার

পূর্বাহ্ণ— ৪টা হইতে ৭টা কীর্তন ও উপাসনা।

মধ্যাহ্ণ— ব্রাহ্ম বালক বালিকা সেবা।

অপরাহ্ণ— দরিদ্র বালক বালিকাদিগকে বস্ত্রাদি দান।

সন্ধ্যার পর— কীর্তন ও প্রার্থনা।"

এই অনুষ্ঠানটী অতি সাত্বিক ও গভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ সকলেই অতিশয় আগ্রহের সহিত এই কার্যে যোগ দিয়াছিলেন। মাখন যে সকল খাদ্য দ্রব্য ভাল বাসিত, তাহার জননী স্বহস্তে সেই সকল দ্রব্য রন্ধন করিয়া সমস্ত ব্রাহ্ম বালকবালিকাদিগকে আহার করাইলেন। মাখন পরমান্ন খুব ভালবাসিত বলিয়া উহা যথেষ্ট পরিমাণে শিশুদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সেই দিন হইতে সর্বদাই স্বহস্তে পায়স রন্ধন করিয়া সকলকে আহার করান, কিন্তু নিজে আর এ জীবনে উক্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই।

এ সময়ে স্থানীয় নববিধান সমাজের উৎসব উপলক্ষে ভক্তিভাজন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় এখানে আগমন করেন। উৎসবের কার্য প্রণালী নির্ধারণের সময় আমি তাঁহাকে একদিন পাইতে চাই; তদনুসারে তিনি অনুগ্রহ করিয়া একটী দিন আমার গৃহে আসিয়া যাপন করেন। আমরা স্বামী স্ত্রী উভয়ে অনন্যকর্মা হইয়া সে দিনটী তাঁহার পবিত্র সঙ্গে যাপন করিয়াছিলাম। একত্রে উপাসনা, আলোচনা ও আহারাদি হইয়াছিল। মাখনের জীবন শুনিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে অতি পরিষ্কার আলাপ ও জীবনের ঘটনাদি প্রকাশ

করিয়াছিলেন। ফলত এই সময়ে তাঁহার সঙ্গলাভ করাতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। মনে হইল, বিধাতা যেন আমাদের জন্যই তাঁহাকে এখানে আনিয়াছিলেন। আমাদের সমাজিক বিচ্ছেদের পর অনেক বার তাঁহাকে এখানে আনিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি আর ময়মনসিংহে আসিতে সম্মত হন নাই। একবার বড় পীড়াপীড়ি করাতে বলিয়াছিলেন, 'শ্রীনাথ বাবুই নাই, আর ওখানে যাইয়া কি করিব?' শ্রীমান বিহারীকান্তের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার এই কথাতে এখনকার কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বস্তুত এই ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতি তাঁহার এমনই স্নেহ ও ভালবাসা ছিল যে, কোন কারণেই তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

সান্ত্বনা-লিপি

এই শোক সময়ে আমি যে সকল সান্ত্বনালিপি পাইয়াছিলাম তন্মধ্যে কয়েকখানি এই গ্রন্থে মুদ্রিত রাখা আবশ্যক বোধ হইল। এই সকল বান্ধবের জীবনব্যাপী স্নেহমমতা আমাকে চিরদিন বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

(১)

"স্নেহের ভ্রাতা শ্রীনাথ,

ভ্রাতা বৈকুণ্ঠের নিকট যে পত্র লিখিয়াছ, তাহা তিনি আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। মা তাঁহার স্নেহের সন্তানকে তোমাদের জন্য যেরূপ ব্যবহার তাহা করিয়া যথা সময়ে ক্রোড়স্থ করিবার করিয়াছেন। তোমাদের শিক্ষার জন্য তিনি তাঁহার স্নেহের শিশুকে এরূপ উৎকট রোগাক্রান্ত করিয়াও অনেকদিন তোমাদের চক্ষের সমক্ষে রাখিলেন এবং তাঁহার শুদ্ধ আত্মাকে তাঁহার মধুর নামে মজাইয়া তোমাদিগকে তাঁহার শিশু হইতে নির্দেশ করিলেন। এক একটী শিশু এইরূপে প্রেরিত হইয়া যে এক এক পরিবারে কেমন আশ্চর্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া যান তাহা ভাবিতে গেলে অবাক হইতে হয়। এই উপলক্ষে আমার স্নেহের যতীশকে মনে পড়িতেছে। মা কেবল পাপতাপে জর্জরিতদিগকে নিয়া তাঁহার পরলোক পূর্ণ করেন না। শিশুদিগকেও তাঁহার পরলোকে প্রয়োজন আছে বলিয়াই তিনি

এরূপ শিশুদিগকেও তথায় লইয়া যান। "তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া মার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ ব্যতীত এ সময়ে আমাদের আর কি করিবার আছে? তাঁহার কৃপাতে তাঁহার স্নেহের শিশুকে তাঁহার ক্রোড়ে দেখিয়া মোহিত এবং শোকতাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই সৌভাগ্য। তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিতে লিখিয়াছ; মা তাঁহার স্নেহের শিশুকে কেমন ভালবাসিয়া তাঁহার প্রেমের অঞ্চলে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কি তাহার নিমিত্ত পাপমলিন হৃদয় প্রার্থনা করিতে সাহসী হয়? মা'র প্রকাশিত ক্রোড়ে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য প্রার্থনা করিতে হৃদয় ব্যাকুল হয়। তোমাদের জন্যই তদ্রূপ প্রার্থনা হয়। স্নেহের বামাকে আমার হৃদয়ের সহানুভূতি জানাইয়া এই পত্রের মর্ম জানিতে দিবে। এ সময়ে যে আমাদিগকে তোমার পাইতে ইচ্ছা হইয়াছে ইহা স্বাভাবিক। ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হইবার নয়। তোমাদের দুইজনকে ছেলেমেয়ে সহ এখন এই শোকের তাড়া দিয়া মা যেরূপ ক্রোড়স্থ করিতে চাহিতেছেন, তাহাই সংসিদ্ধ হউক।

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

রাঁচি। ৯।১২।৯৩। শ্রীবঙ্গচন্দ্র রায়।

(২)

"ভাই শ্রীনাথ,

তোমার পত্র পাইলাম। শোকাবহ ঘটনার সংবাদ পূর্বেই পাইয়াছি। তুমি ও স্নেহময়ী বামা উভয়ে শোকে কাতর হইয়া পড়িয়াছ শুনিতে পাইয়াছি। পুত্রশোক নিদারুণ শোক তাহার আর সন্দেহ কি। কেশবচন্দ্র আমাদিগকে আনন্দময়ী মার সংবাদ বিশেষরূপে দিয়া গিয়াছেন; এই মা'কে বিশ্বাস করিতে পারিলে শোক বন্ধুর ন্যায় এই মা'র কাছে অলক্ষিত ভাবে লইয়া যায়, জীবনে আমরা দেখিয়াছি; তবে আর ভয় কি? প্রিয়দর্শন মাখনের শরীর ধরায় পড়িয়াছে, মাখন মা'র বুকে আশ্রয় লইয়াছেন ইহা কি আমরা আর সংশয় করিতে পারি? পৃথিবীর শিশু কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গের শিশুরূপ ধারণ করিলেন। এখন ত মাখন আমাদের নমস্য হইলেন। যিনি নমস্য হইলেন তাঁহাকে আমার আমার বলিয়া শোক করা কি শোভা পায়? চল

ভীত অন্তরে কেশবচন্দ্রের পদধূলি মাথায় লইয়া আনন্দময়ী মার হাসিমুখ ধ্যান করি এবং তাঁহার বুকের ভিতর মাখনের হাসিমুখ দেখি। ব্যাপার সহজ নয়, কঠিন বটে, কিন্তু আশার চন্দ্র বড় আশা দিয়া গিয়াছেন, সেই আশার নির্ভর করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হই, দেখি দেখা দেন কি না? এ সময় আমাদের দেখিতে চাও, এটীও প্রেমময়ীর প্রেমের লীলা। বুঝি না তবু প্রাণ টানে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দবাবু তথায় উৎসব উপলক্ষে আসিবার কথা হইয়াছে, যদি ডাক্তারগণ নিষেধ না করেন তবে আসিবেন। তাঁহার সঙ্গে তথায় যাইবার মানস করিয়াছি, শারীরিক বিশেষ প্রতিবন্ধক না হইলে যাইতে পারি এবং ভগবানের ইচ্ছা হইলে দেখা হইতে পারে। আমি বুকজ্বালা ও বেদনায় প্রায়ই কাতর থাকি। ভরসা করি পাড়ার সকলে ভাল আছেন। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

ঢাকা, উয়ারী। ১১।১২।৯৩। শ্রীগোপীকৃষ্ণ সেন।

(৩)

পরমশ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনার গভীর শোকপূর্ণ পত্রখানি গত বুধবার প্রাতে আসিয়া পঁহুছিল। আমার শরীর অসুস্থ ছিল, হেমন্ত আমাকে পড়িয়া শুনাইল ও সমস্তই শুনিলাম। ইতিপূর্বে চন্দ্রমোহন বিশ্বাস মহাশয়ের একখানি পত্র পাইয়া সমস্তই অবগত হইয়াছিলাম ও আপনাকে পত্র লিখিব মনে করিয়াছিলাম, এমন সময় জ্বর হওয়াতে আর পারি নাই। পারিলেই বা কি হইত, লিখিতাম বা কি? শ্রীমান মাখন কিছুদিনের জন্য পথের পথিক হইয়া এ দেশে পরিভ্রমণ করিতে আসিয়াছিল, নিজ আবাস পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে গেলে যে সমুদয় কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা সহ্য করিয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট ও ম্লান হইয়া পুনরায় স্বদেশে চলিয়া গিয়াছে। এখানে যখন প্রেরিত হইয়াছিল তখন আপনাদিগের উপর তাহার পার্থিব পিতামাতার ভার দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহার লালনপালনের উপযুক্ত স্নেহ ভালবাসাও হৃদয়ে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যেন তার বিদেশ বাস বোধ না হয়—যেন সে পথিক বলিয়া বুঝিতে না পারে।

আপনারা তাহাকে যেরূপে রাখিয়াছিলেন ও তাহার জন্য যেরূপ ও যতপ্রকার যত্ন করিয়াছিলেন ও তাহাকে রোগের যন্ত্রণা মুক্ত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনাদের মনে সে বিষয়ে কোন কষ্ট পাইবার কারণ নাই। আর বোধহয় শ্রীমান মাখনও তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। তবে সে এখানে যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল বা প্রেরিত হইয়াছিল—তাহার নিজের উন্নতির জন্য বা আপনাদের উন্নতির জন্য বা আমাদের সকলের উন্নতি বা শিক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য—মঙ্গলময় বিধাতার গূঢ় ও মঙ্গলময় উদ্দেশ্য—এতদিনে সিদ্ধ হইল ; সুতরাং আর মাখনের এখানকার জলবায়ু বরদাস্ত হইল না, আপনাদের স্নেহ ভালবাসা আবশ্যক হইল না, যাঁহার আদেশ পাইয়া আসিয়াছিল তাঁহারই আদেশে আপনাদিগকে ছাড়িয়া নিজ স্থানে বিশ্বজননীর স্নেহপূর্ণ বিশাল ক্রোড়ে গিয়া উপস্থিত হইল ; পুনরায় সুস্থতা লাভ করিল, শান্তি লাভ করিল, সেখানে আর তাহার কোন অভাব নাই। সে কি আশ্চর্য স্থান—যেখানে গিয়া সকলেই এমত আশ্চর্যরূপে শান্তি লাভ করে। চর্মচক্ষে দেখিবার যো নাই, চিন্তা করিয়া স্থির করিবার যো নাই, অথচ প্রতিদিন স্পষ্টই দেখিতেছি সকলেই সেইখানে যাইতেছে ও যাহার যে জ্বালা সকল হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে। আমরাও ত সেইদিকে যাইতেছি ; কিন্তু আমরা আগে আসিয়াছি বলিয়া আমাদের আগে যাইবার যো নাই, আমাদের পরে যাহারা আসিয়াছে আমাদের চক্ষে ধুলা দিয়া উহারা চলিয়া যাইবে, আমরা আমাদের জিনিষ হারাইলাম বলিয়া চীৎকার করিব, ক্রন্দন করিব বা ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া অন্তরে দগ্ধ হইব, এই বা কিরূপ? কিন্তু আমাদের ক্রন্দন শোক আমাদের ভুলের ফল, আমাদের স্বার্থপরতার ফল। আমরা "আমাদের" মনে করি বলিয়াই এত কষ্ট। আমাদের কি, কিছুই না ; যতদিন আমাদের কাছে থাকে, ততদিন আমরা তাহাদের তত্ত্বাবধানের, সেবায় ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি মাত্র। আমরা তাহাই ভুলিয়া যাই ; ভালবাসার সঙ্গে মমতা সম্মিলিত, কাজেই আমাদিগকে ভুলিতে হইবে। কিন্তু আমরা যে ভুলি তাহার কি কোনও অর্থ নাই? উদ্দেশ্য নাই? অবশ্যই আছে। আমরা ঐরূপ ঘটনা হইতে কি লাভ করিলাম তাহা খুঁজিতে ও দেখিতে পারিলেই হয়, কিন্তু সব সময় তা পারি কোথায়? আমরা আজও শৈলবালার বিষয় ভুলিতে পারি

নাই; এখনও মনে হইলেই একটী ভয়ানক ধাক্কা লাগে। তবে আর আপনাদের কি বলিব। আপনারা যেরূপ ধৈর্য সহিষ্ণুতা ও স্বার্থত্যাগের সহিত শ্রীমান মাখনের সেবা করিয়াছেন, তাহাতে বোধহয় আপনারা ধন্য হইয়াছেন, ও সেই সঙ্গে এই দীর্ঘকালব্যাপী বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা দ্বারা যে আত্মার উন্নতি হইয়াছে, তাহাও বোধহয় অতি দুর্লভ। এই সমুদয় লাভের জন্যই কি এইরূপ হইল, জানি না। অনেকদিন যাবত মনের মধ্যে এই বিষয়ে আশঙ্কা ছিল, সেইজন্য কখন কখন পত্র লিখিব মনে করিয়াও লিখিতে পারি নাই। যখন শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস মহাশয় পুত্রটি হারাইলেন, আমরা সুস্থ সুপুষ্টশরীর শৈলকেও হারাইলাম তখনই মনে ভয় হইল যে আপনাদের ভাগ্যে বা কিরূপ হয়। কেন মনে হইল জানি না, কিন্তু যেন ইহার মধ্যে কি মহৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। আর একটী আশ্চর্য, যাইবার সময় ভয় করে না কাঁদে না। আপনার মাখন ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া গিয়াছে ও আপনাদিগকে দেখিয়া গিয়াছে। আমাদের শৈল আমাদের দেখিতেও দেয় নাই, দেখিতেও চায় নাই। সেই অনন্তধামে যাবার জন্য এত আগ্রহ এত আনন্দ না কি, জানি না।

আপনি যা বলিয়াছেন তাহা ঠিক, মধুর ব্রহ্ম নামের যে মধুরতা তাহা এখনই ঠিক অনুভব করিতে পারা যায়। সে নাম স্মরণে কান্না আসিল না। দাদা বলিলেন, Shaila is no more, দাঁড়াইয়া শুনিলাম ও নাম স্মরণ করিলাম; ধাক্কা সামলাইয়া গেল। কিন্তু তা পারি কই? বিশ্বাস ও নির্ভর এই দুইয়ের অভাব নিত্য অনুভব করিতেছি ও তাহারই জন্য প্রার্থনা করি। আপনি ত ধাক্কা সামলাইয়াছেন, তাহার জন্য চিন্তা করি না; সুরেনের মা কেমন করিয়া ভার বহন করিতেছেন তাহাই জানিতে চাই। তাঁহার শরীর যেরূপ দুর্বল তাঁর জন্য চিন্তা হয়। বোধহয় আপনার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার কতক উপশম হইবে। শান্তিদাতা পরমেশ্বর এ অবস্থায় স্বয়ং শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া শোকের জ্বালা নির্বাপিত করুন। আর যে আত্মা বিশ্বজননীর পবিত্র ক্রোড়ে গিয়াছে, তাহার কষ্ট যন্ত্রণা জানিয়া তিনি কি আর ক্রোড়ে আলিঙ্গন করিতে বিলম্ব করিতে পারেন? তাহা কখনই হইতে পারে না। আর অধিক কি লিখিব, মনে আসিতেছে না। আমার ন্যায় অতি অকিঞ্চিৎকর জনের প্রার্থনাতে যদি কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে,

তাহা অবশ্যই হইবে। পত্রে আর কি লিখিব, কাছে থাকিলে তবুও বা কিছু কাজে লাগিতাম, হৃদয়ের ভাব জানাইতে পারিতাম। অন্যান্য বিষয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস মহাশয়ের পত্রে শীঘ্র লিখিব। আপনারা উভয়েই আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন এবং করুণাময় পরমেশ্বর নিজ গুণে কৃপা ক'রে আপনাদের হৃদয়ে কৃপাবারি সিঞ্চন করুন।

একান্ত অনুগত

পুরুলিয়া, ৮ই ডিসেম্বর। শ্রীধর্ম্মদাস বসু।

(৪)

প্রিয় সুহৃদ,

প্রিয় দর্শন মাখনলাল অশরীরী হইয়া পরম মাতার কোলে গিয়াছেন, রোগজীর্ণ পিঞ্জরবদ্ধ পাখী উন্মুক্ত চিদাকাশে উড়িয়া গিয়াছে; সংবাদ পাইয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে মার পানে তাকাইলাম, মা দেখিতে দিলেন আমাদের প্রিয় ধন তাঁর ক্রোড়ে প্রফুল্লমনে বিরাজ করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার জন্য আর শোক করিবার কারণ নাই। ধন্য সেই শিশুআত্মা, সংসারের আবিল্য গায় না লাগিতেই অমরধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার আত্মাকে মা এখানে বিলক্ষণ প্রস্তুত করিয়া নিয়াছেন, গতবারে আমি যখন দেখিলাম তখন ইহা বেশ টের পাইয়াছিলাম।

আমি শেষবার বিদায় হইবার সময় শ্রীমান কাঁদিয়াছিল, আমার হঠাৎ মনে হইল যেন শেষ বিদায় তাই গোপনে চক্ষুর জল ফেলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কয়েকদিন হইল স্বপ্নে দেখিলাম, মাখন অমরধামে চলিয়া গিয়াছে। মনটা কেমন কেমন করিতে লাগিল। কিছুই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। আজ তাঁহার অমরলোক গমনের দশম দিনে তোমার পত্র পাইলাম।

তোমাদের শোকের অবস্থা মনে করিয়া আর চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যে ব্রহ্মপদে মাথা রাখিয়া সান্ত্বনা পাইতেছ, সেই পদেই চিরকাল মাথা থাকুক। তিনি ভিন্ন আর শান্তি আরাম নাই। পুত্রহারা বামা না জানি কত পাগলিনীর ন্যায় ক্রন্দন করিতেছেন। এ দুঃখে, এ মর্ম্মভেদী শোকে হরি পদ ভিন্ন আর জুড়াইবার স্থান নাই। পরিবারের

সকলকে লইয়া ভগবানের চরণ জড়াইয়া ধরিবে। ভ্রাতৃবিচ্ছেদে অবসন্ন বালকবালিকাদের প্রাণে মা জননী শান্তি বিধান করুন।

তোমাদের

গেতলসুদ, রাঁচি। ৭।১২।১৩ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ।

(৫)

প্রিয়তম,

অনেকদিন তোমার পত্রাদি পাই নাই। সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতেছ ইহাই জানিতাম; আমার ভাবনা ও খাটুনীর বিরাম নাই বলিয়া আমিও পত্র লিখিতে পারি না। ইহার মধ্যেও যখনই তোমার কথা মনে হইয়াছে তখনই তোমার ক্লেশের কথা ভাবিয়া ব্যথিত হইয়াছি, এবং অচিরেই হয় তো বিষম পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইবে ভাবিয়া প্রাণ কেমন করিয়াছে। আমাকে তুমি লেখ নাই, হয়তো লিখিতে পার নাই, কিন্তু আজ শরৎবাবুর নিকটে ঐ নিদারুণ সংবাদ শুনিয়াছি। শুনিয়া প্রাণটা অনেকক্ষণ কেমন কেমন করিতেছে। শিশুর সেই মুখ আমার অন্তরে জাগিতেছে। তোমার বিষণ্ণ মুখ, ভগিনীর সাশ্রু নয়ন চিন্তাচক্ষে উদিত হইয়া চক্ষে জল আসিতেছে; সেই ময়মনসিংহে প্রথম সাক্ষাৎ হইতে আরম্ভ করিয়া গত জীবনের অনেক কথা মনে পড়িতেছে। দশবৎসর পূর্বে মানিকদহে যখন আমি এইরূপ পরীক্ষাতে পতিত, তখন তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিয়া যে একটী কথা লিখিয়াছিলে চিরদিনের জন্য তাহা আমার অন্তরে রহিয়াছে; আমি সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি, শান্তিদাতার কৃপায় সে ঘটনা আর শোকের উদ্রেক করে না। পরলোককে উজ্জল ও প্রিয়তর করিতেছে। ভাই, শান্তিদাতাকে ডাক।

অভাব দুশ্চিন্তা এবং উদরান্নের জন্য দাসত্বের মধ্যেও আবার আমার কবিত্ব জাগিয়া উঠিয়াছে; আমি ভারতমঙ্গল নামক এক মহাকাব্য লিখিতেছি। কাব্য লিখিতে লিখিতে অনেক দিন পত্নীকে কহিয়াছি "আমার বড় সাধের কাব্য সমাপ্ত হইলে শ্রীনাথ দেখিয়া কতই না আনন্দিত হইবে এবং কতই না গৌরবে ইহার ভূমিকা লিখিবে। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীনাথ বড় ক্লেশে আছে।" তোমার ক্লেশের পরাকাষ্ঠার কথাও আজ পত্নীকে কহিয়াছি, শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন।

প্রিয়তম, তুমি আমার ধর্মজীবনের প্রথম সখা, আমার সাহিত্যজীবনের প্রথম সঙ্গী, তোমার মত বন্ধুর এই প্রথম বিপদের সংবাদে আমার চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হয়। আমি তোমাকে উপদেশ দিবার যোগ্য নই; আমার অপেক্ষা তোমার ধর্মবিশ্বাস উজ্জ্বল, আমা অপেক্ষা তোমার সহিষ্ণুতা অধিক, তোমাকে আমি কি বলিব? তোমার শান্তির জন্য দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা করি এবং এই বলি, প্রার্থনা সার করিয়া শোক দুঃখের অতীত হও। ভগিনীর জন্য বড়ই ক্লেশ হয়। নিকটে থাকিলে এ সময়ে আমি তাঁহার কাছেই গিয়া থাকিতাম। তাঁহাকেও আমার কথাগুলি বলিও।

আমরা একরূপ ভালই আছি। আমার এই পত্রের উত্তর সত্বর না পাইলে আমি চিন্তিত থাকিব।

কলিকাতা, ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৯৩। তোমার আনন্দ।

(৬)

প্রিয় শ্রীনাথবাবু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। শিশুটী নিষ্কলঙ্ক আত্মা লইয়া আসিয়াছিল এবং নিষ্কলঙ্কই চলিয়া গেল, সংসারের কোন পাপ তাপ তাহাকে ভোগ করিতে হইল না। এ মৃত্যুতে ত দুঃখ করিবার কিছু নাই; তবে আমাদের মোহান্ধ মন সহজে সান্ত্বনা পায় না। ঈশ্বর করুন যাখন আপনাদিগকে যে শিক্ষা দিয়া গেল, তাহা স্থায়ী হউক। ধন্য দয়াময়।

ফরিদপুর, ১লা জানুয়ারী, ১৮৯৪। আপনার শ্রীতারকবন্ধু চক্রবর্তী।

(৭)

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার নিকট আর কি লিখিব? কি কথা বলিয়া আপনার প্রাণে সান্ত্বনা দিতে পারি। বিশ্বজননী তাঁহার সন্তানকে তাঁহার আনন্দময় ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন, আমরা কেন শোক করি? মায়ের ক্রোড় ভাল করিয়া দেখিতে পাই না বলিয়াই প্রাণে ক্লেশ হয়।

এখানে নীলরতনবাবুর পঞ্চমবর্ষীয় একমাত্র সন্তান একমাস ভুগিয়া পরিবারকে শোক সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। এই একমাস তিন চার জন সর্বপ্রধান সাহেব ডাক্তার, আর কত বাঙ্গালী

ডাক্তার কত চিকিৎসাই করিয়াছে, কিছুতেই কিছু হইল না। যত্নের সীমা নাই; কোন রাজ পরিবারের সন্তানেরও এত হয় না। আপনিও মাখনের জন্য তিন বৎসর যাহা করিয়াছেন, এমন অতি অল্প লোকেই করিতে পারে। তাঁহার অভিপ্রায়ে বাধা দেয় এমন সাধ্য কার আছে?

আপনি যথার্থই বলিয়াছেন মাখন স্বর্গের দূত হইয়া আপনার গৃহে আসিয়াছিল, আর আপনাদিগকে অস্ফুট ভাষায় কি তত্ত্ব বলিয়া চলিয়া গেল। প্রেমময়ের প্রেমমুখ এই সব ঘটনায় খুব উজ্জ্বল হয়। তাঁহার ইচ্ছা বুঝিতে পারিলেই শান্তি। বিশ্বাস শান্তি দিবে।

গতকল্য Shelter এ উপাসনার সময় আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

আর কি বলিব। আমরা একবাদী, জীবনেরও এক, মরণেও এক সম্পদেও এক, বিপদেও এক; ঈশ্বর করুন আমরা সম্পূর্ণরূপে একের উপাসক হই, এককে ভাল করে ধরি। শোকার্তের ঔষধ তাঁহার নাম। ইচ্ছা হয় এই সময়ে এক সঙ্গে বসিয়া প্রভুর নাম করি। সুরেনের মাকে আমার প্রণাম জানাইবেন। আপনার পরিবারের একজন আগে গেল, এখন সে রাজ্যের খবর রোজ লইতে হইবে। আমরা ভাল।

কলিকাতা, ৫ই ডিসেম্বর, ১৮৯৩। আপনার স্নেহের গুরুদাস।

(৮)

প্রিয়তম ভ্রাতঃ,

গত মঙ্গলবার হইতে আমি শ্বাসের পীড়ায় শয্যাগত আছি, এই রোগশয্যায় থাকিয়াই তোমার বাড়ীর শোকাবহ সংবাদ পাইয়াছি; ভাবিয়াছিলাম একটুকু সুস্থ হইলেই তোমার কাছে যাইব কিন্তু দেখিতে দেখিতে আজ ছয় দিন তথাপি আমার যন্ত্রণার অবসান হইল না। তাই রুগ্নশয্যাতে থাকিয়াই আজ এই কয় লাইন লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

তুমি নিজে সুবিবেচক, প্রশান্ত ও ধার্মিক, তোমার কাছে সহিষ্ণুতা কর্তব্য-পরায়ণতা এবং ধর্মভাব আমরা শিখিবার আশা করি। এই শোকের সময় আমি আর তোমাকে কি সান্ত্বনা বা উপদেশ দিব?

সন্তানের প্রতি পিতার কর্তব্য কার্য যাহা, তাহা তুমি যথেষ্ট পরিমাণে করিয়াছ ; এত যে করিতে পারিয়াছ তাহা ভাবিয়া সুখী হও। আর পিতা পরমেশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে ইহা ভাবিয়া শান্ত হও ও আশ্বস্ত হও। আমি রাসেলাস্ পড়িয়াছি, সুতরাং জানি যে এরূপ স্থলে বুদ্ধিমানের ন্যায় উপদেশ দেওয়া সহজ হইলেও প্রকৃত শোকের দুঃসহ আঘাত হৃদয়ে বহন করা ও প্রাণে সহ্য করা সহজ কথা নহে। আমার বিশ্বাস এই যে তোমার অটল ও প্রশান্ত চিত্ত শোকে বিহ্বল হইবে না।

অধিক আর কি লিখিব? তোমার পরলোকগত সন্তানের আত্মা সেই দয়াময়ের চরণ ছায়ায় শ্রান্তি দূর করুক। সে এই সংসারে রোগ যন্ত্রণা অনেক ভুগিয়া গিয়াছে, এখন জন্মের মত শান্তি লাভ করুক। জগদীশ্বর তোমাকে শান্তি দিউন, ইহাই তোমার এই অনুপযুক্ত বন্ধুর বা শৈশব সহচরের দুর্বল অন্তরের প্রার্থনা ও একান্ত বাসনা।

৩ ডিসেম্বর ১৮৯৩। নিবেদক

শ্রীকালীকৃষ্ণ ঘোষ।

চন্দ্রপ্রভা

চন্দ্রপ্রভা আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা চন্দ্রমোহন বিশ্বাস মহাশয়ের প্রথম সন্তান এবং আমার অতিশয় স্নেহের পাত্রী ছিল। আমরা সমস্ত জীবন স্ত্রী-শিক্ষার জন্য যে সকল যত্ন চেষ্টা করিয়াছি, চন্দ্রপ্রভাই তাহার প্রথম ফল। সে স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয় হইতে মধ্য-বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় পড়িতে যায়। তথায় শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন মহাশয়ের গৃহে থাকিয়া ব্রাহ্মবালিকাস্কুলে অধ্যয়ন করে। পরেশবাবু তাহাকে কন্যাবৎ প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন। কয়েক বৎসর পরে ব্রাহ্মবালিকাস্কুলের বোর্ডিং-এ থাকিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রপ্রভা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেথুন কলেজে অধ্যয়ন করিত। এই সময়ে আমার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী শান্তিলতাও আমাদের বালিকা স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মবালিকা স্কুলে পড়িতেছিল। আমার প্রথম পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথও ১৮৯৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় পড়িতে যায়।

চন্দ্রপ্রভা ১৮৯৬ সালে এফ, এ পরীক্ষা প্রদান করিল কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিল না। অতঃপর আর তাহার পড়ার সুবিধা হয় নাই।

এই সময়ে চন্দ্রপ্রভার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইল। ঈশ্বরকৃপায় দুইটি ভাল প্রস্তাবই আসিয়াছিল। কন্যা স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিলে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইবে এরূপ নির্ধারণ হইল। চন্দ্রপ্রভার সহিত আমার অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহার মনের কথা বলিতে কোন সঙ্কোচ বোধ করিত না। তাহার পিতা আমাকেই এ ভার দিলেন। আমি তাহাকে সব কথা বলিলাম, সে তখন আর কিছু বলিল না, পরদিন তাহার অভিপ্রায় জানাইল।

আমাদের ভক্তি-ভাজন ধর্মবন্ধু শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিনয়চন্দ্র গুপ্তের সহিত এই শুভ পরিণয় প্রস্তাব নির্ধারিত হইল। তৎকালে ধনে জনে, মান সম্ভ্রমে ও ধর্মে কর্মে এই পরিবার অতিশয় খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। গরীবের কন্যা সেই পরিবারে সাদরে গৃহীত হইবে, ইহা কেহ আশা করে নাই; কিন্তু বিধাতার কৃপায় আর কন্যার অতুল গুণে সেই অসম্ভবও সম্ভব হইল। গুপ্ত মহাশয় স্বয়ং আসিয়া কন্যাকে আশীর্বাদ করিয়া গেলেন এবং শুভানুষ্ঠানের সকল ভার আমাদের প্রতি অর্পণ করিলেন।

আমাদের প্রাচীন সমাজে রীতি আছে, কন্যার পিতাই কন্যার বস্ত্রালঙ্কার ও বরের বসনাদি সমস্তই দিবেন। কারণ, তিনিই কন্যাদায়গ্রস্ত, সুতরাং তাঁহাকেই সব ভার বহন করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজেও এই প্রথাই চলিত হইয়াছে। আমরা ইহা অসাম্যজনক মনে করিয়া প্রস্তাব করিলাম, কন্যার প্রয়োজনীয় দ্রব্য কন্যাকর্তা দিবেন, বরের যাহা দরকার বরকর্তাই দিবেন। গুপ্ত মহাশয় বলিলেন, ইহা অপেক্ষা একপক্ষ অন্যপক্ষকে দিলেই অধিক আত্মীয়তা ও সম্মান করা হয়। আমরাও তাহা উত্তম বলিয়া মনে করিলাম এবং তদনুরূপই কার্য হইল।*

১৮৬৯ সনের আশ্বিনমাসে মহাসমারোহে এই বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইল।

* এই কার্যে কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাদের ভাব এই, কন্যা কেন ভাবী শ্বশুরের প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া বিবাহিত হইবে? কিন্তু বর যে ভাবী শ্বশুরের প্রদত্ত কাপড় চোপড়ে সাজিয়া যান, তাহাতে কোন দোষ মনে হয় না। অপর পক্ষ ধনী বলিয়া কেহ কেহ কটাক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা যে সাম্যতত্ত্বের আদর্শ মনে রাখিয়া কার্য করিয়াছিলাম, তাহা অনেকে বুঝিতে পারেন নাই।

আমাদের পল্লীতে এরূপ সমারোহের ব্যাপার আর হয় নাই। বিশাল গুপ্ত পরিবারের পুত্র ও বধূগণ, জামাতা ও কন্যাগণ এবং আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি বহু সম্মানিত ও পদস্থ ব্যক্তিগণ আগমন করিলেন। কন্যার মাতামহ ও মাতুলগণ সপরিবারে ও সবান্ধবে উপস্থিত হইলেন। কলিকাতা হইতে অনেকে আসিলেন। গুপ্ত মহাশয়ের প্রজাগণ এবং আশ্রিত লোকজনও অনেক উপস্থিত ছিলেন। পল্লীবাসিগণ সকলেই নিজ কন্যা মনে করিয়া মনপ্রাণ দিয়া কার্য নির্বাহ করিলেন। অভ্যাগতদিগের আদর অভ্যর্থনা ও বাসস্থানের কোন অসুবিধা হয় নাই। বিবাহ সভায় স্থানীয় ইংরেজ ও বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত লোকসকল উপস্থিত হইলেন। সহস্রাধিক লোকে বিবাহ-ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল। কন্যাকর্তার ও বরকর্তার স্নেহানুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া আমাকেই আচার্যের কার্য নির্বাহ করিতে হইল। দয়াময়ের অপার করুণায় কার্য অতি সুন্দররূপেই নির্বাহ হইল। চন্দ্রমোহনবাবুর দীনতা ও নির্ভরগুণে, গুপ্ত মহাশয়ের প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে, ব্রাহ্মগণের প্রাণগত পরিশ্রমে এবং নগরবাসীগণের সপ্রেম সহায়তায় অনুষ্ঠানটী এমন সুন্দররূপে নির্বাহ হইল যে সকলেই অতিশয় তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করিলেন। কন্যার মাতামহ প্রাচীন বিশ্বাসী ব্রাহ্ম শ্রদ্ধাস্পদ কালীকিশোর বিশ্বাস মহাশয় আনন্দে বিহ্বল হইয়া আমাকে স্নেহালিঙ্গনে কৃতার্থ করিলেন। তাঁহার সে পবিত্র স্নেহ-স্পর্শ আজও প্রাণে অনুভব করিতেছি।

আহা, মানুষের দৃষ্টি কত সংকীর্ণ! মানুষের আশা ভরসা কি তুচ্ছ! আজ কত সাধ করিয়া, কত আশা প্রাণে লইয়া, বিচ্ছেদকষ্টে কতই অশ্রুপাত করিয়া যে কন্যা বিদায় করিলাম, আর যে কন্যা নিজ গুণে শ্বশুরকুলের কতই আদর ও ভালবাসা এবং সৎপতির প্রাণভরা প্রেম লাভ করিয়াছে শুনিয়া কত তৃপ্তি অনুভব করিলাম, কে জানিত সম্বৎসর যাইতে না যাইতেই সে তাহার পূর্ণ-যৌবনে পূর্ণ-সখের সময়ে সকলের প্রাণে শেল বিদ্ধ করিয়া অকালে মানব লীলা সম্বরণ করিবে? আহা, সে দুঃখকাহিনী স্মরণ করিতেও প্রাণ আকুল হয়। আমি এ জীবনে তাহাকে ভুলিতে পারি নাই। তাহার সেই মধুমাখা "কাকা" ডাক আজও কানে বাজিতেছে! ১৮৯৭ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ মধুপুরে চন্দ্রপ্রভা স্বর্গারোহণ করিল। ইহার পর বৎসর আমি তথায় যাইয়া সেই পবিত্র শ্মশান দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

এই স্থলে আর একটি মহাশোক-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে হইল। ভক্তিভাজন কালীকিশোর বিশ্বাস মহাশয় তখন বৃদ্ধাবস্থায় ইটনা গ্রামে নিজ ভবনে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র ও জামাতাগণ বিদেশে থাকিতেন। ১৮৯৭ সনের ভাদ্র মাসে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান হরকিশোরকে দেখিবার জন্য তাহার কার্য্যস্থান বরিশালে যাইতেছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় জামাতা শ্রীমান মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। রাত্রিতে নারায়ণগঞ্জের ঘাটে ষ্টীমারে ছিলেন। মধ্য রাত্রিতে লোকজন নিদ্রিত হইলে তিনি উঠিয়া জাহাজের অগ্রভাগে পায়খানায় গিয়াছিলেন। তারপর আর তাঁহার খোঁজ পাওয়া গেল না। জলে কিছু পড়িবার শব্দ হইয়াছে, কেহ কেহ এরূপ বলিয়াছিল। সম্ভবত তিনি নদীবক্ষে প্রবলস্রোতে পড়িয়া ডুবিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জামাতা কত অন্বেষণ করিলেন, পরে পুত্রেরা নানাস্থানে কত অনুসন্ধান করিলেন, আর তাঁহার কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। তাঁহার ন্যায় বিশ্বাসী ও সকলের শ্রদ্ধাস্পদ লোকের এরূপ মৃত্যু অতিশয় শোচনীয়, এ ঘটনায় সকলেই অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলাম।

১৮৯৭ সনের প্রবল ভূমিকম্প

১৮৯৭ সনের ১২ই জুন (৩০শে জ্যৈষ্ঠ) অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় বঙ্গদেশে এক প্রলয়জনক ভূমিকম্প হইল। আসাম এবং পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে এই ভূমিকম্পের অতিশয় প্রাবল্য অনুভূত হইয়াছিল। ময়মনসিংহ সহর একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। মহারাজ সূর্য্যকান্তের বহু লক্ষ টাকা মূল্যের শশী-লজ একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার আলেকজাণ্ডার কাসেল প্রভৃতি দোতলা অট্টালিকাগুলির চিহ্নও রহিল না। জজ আদালতের নবনির্মিত প্রকাণ্ড দ্বিতল গৃহ এবং অন্যান্য রাজকীয় অট্টালিকা পড়িয়া গেল। জেলা স্কুল, সিটিস্কুল ও বালিকা বিদ্যালয়ের দালানগুলি ভূমিসাৎ হইল। সহরের বাজার অঞ্চলেও মহা প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়াছিল। দুর্গাবাড়ী, কালীবাড়ী এবং দশমহাবিদ্যার বিশাল মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। ফলত এই ভূমিকম্পে ময়মনসিংহ সহরের যে গুরুতর ক্ষতি হইয়াছিল, বিগত ১৫ বৎসরেও তাহা পূরণ হয় নাই। তদবধি এ সহরে আর কেহ দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করিতে সাহস পায় না।

আমাদের ব্রহ্মমন্দিরটী গুরুতররূপে জখম হইল। ছাদের তিনটী খিলান পড়িয়া গেল, দরজার খিলান ও দক্ষিণের দেয়াল ফাটিয়া চৌচির হইল। আমরা আবার নিরাশ্রয় হইয়া পরগৃহে আশ্রয় লইলাম। নববিধান সমাজের সেই পুরাতন মন্দিরটী ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

আমার নিজেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইল। অল্পদিন পূর্বে মতি ব্যাপারীর দালান পুনর্নির্মাণ করিয়া প্রায় ৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলাম। বারিষ্টার ঘোষ সাহেব উহাতে বাস করিতেছিলেন। এই দালান একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। বাজারের দালানটীরও ক্ষতি হইল। নিজবাড়ীর উপাসনা মন্দির ও রন্ধনের দালান এবং প্রাচীর প্রভৃতি পড়িয়া গেল। এ ক্ষতি পূরণ করিতে অনেকদিন লাগিয়াছিল।

এই ভূমিকম্প যেরূপ ভয়ানক হইয়াছিল, ঈশ্বরেচ্ছায় সেরূপ লোকক্ষয় হয় নাই। দুই চারিটী মাত্র প্রাণনাশের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের দুইটী মহিলার জীবন নষ্ট হইয়াছিল, তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ আছে। আমাদের হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত লাহিড়ী মহাশয়ের মাতা ও পত্নী দালানের নীচে পড়িয়াছিলেন। অনেক চেষ্টায় তাঁহাদিগকে উদ্ধার করা হয়, মাতা জীবিত ছিলেন, চন্দ্রকান্তবাবুর পত্নীর মৃত্যু হইয়াছিল। ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ গবর্ণমেণ্ট উকীল স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের বৃদ্ধা পত্নী তাঁহার পুত্র শ্রীমান ক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের সহিত এখানে বাস করিতে ছিলেন। ভূমিকম্পের সময় তিনি গৃহের বাহিরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাচীর চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার ১ম পুত্র শ্রীমান যোগেশচন্দ্র হাইকোর্টের উকীল, ২য় পুত্র স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র ডি, এল উপাধি পাইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ৩য় পুত্র শ্রীমান ক্ষিতীশচন্দ্র এখন ময়মনসিংহ বারের একজন উদীয়মান উকীল, ৪র্থ পুত্র শ্রীমান পৃথ্বীশচন্দ্র কলিকাতায় থাকিয়া স্বদেশ সেবায় খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই আমার ছাত্র এবং পরম প্রীতিভাজন। তাঁহাদের এই মাতৃশোকে আমরা সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলাম।

এই ভূমিকম্পে মহারাজ সূর্য্যকান্তেরই সর্বাপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি হইয়াছিল। এই সহরে তাঁহার মস্তক রাখিবার একখানি গৃহও ছিল না। মুক্তাগাছাতেও তাঁহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল। ভূমিকম্পের পর

আমার পত্রোত্তরে মহারাজ আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"আপনার প্রীতিপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া পরম তুষ্ট হইলাম এবং আপনি যে আমার জন্য মঙ্গলেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞ রহিলাম।

ভূমিকম্প ময়মনসিংহের যে সর্বনাশ করিয়াছে তাহা কোন কালে আর পূরণ হইবে, যে আশা মনে ধারণা করিতে পারি না ; তবে আপনার পত্রে নব উৎসাহের চিহ্ন দেখিয়া অবশ্যই সুখী হইলাম।

আপনাদের উপাসনা মন্দিরটী নষ্ট হওয়ায় বড়ই দুঃখিত হইলাম। মঙ্গলময়ের যাহা ইচ্ছা তাহা অবশ্যই ফলিবে ও ঘটিবে।

আমরা সকলে ভাল আছি, ইতি

স্বাক্ষর

অষ্টম অধ্যায়

(১৮৯৭—১৯০৬)

সুখদার পরলোক যাত্রা

আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বাবু বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের সহধর্মিণী শ্রীমতী সুখদার জীবনকাহিনী পূর্বে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। বিবাহের পর সুখদা স্বামীসহ আর্মানিটোলার বিধানপল্লীতে কোনও বন্ধু-গৃহে আশ্রয় পাইয়া সংসার-ধর্ম পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১২৯৪ সালের ১৪ই ভাদ্র সুখদার প্রথম কন্যা প্রেমলতা জন্মগ্রহণ করে। ইতিমধ্যে নিমতলিতে একটী স্থান ক্রয় করিয়া নূতন বিধানপল্লীর প্রতিষ্ঠা হয়। স্বর্গীয় গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। গোপীবাবু আমাকেও ঐ পল্লীতে স্থান রাখিয়া বাড়ী করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমার প্রেরিত অর্থে একটী স্থানও রাখা হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে আমি উহা গ্রহণ করি নাই; উহা বৈকুণ্ঠ বাবুকে প্রদত্ত হইল। এই তৃণকুটিরেই সুখদা জীবিত কালের অধিকাংশ যাপন করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে তাঁহার ৪টি কন্যা ও একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ৫ম বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে দৈবাৎ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া পুত্রটি প্রাণ পরিত্যাগ করে। এই নিদারুণ শোকও সুখদা অতিশয় ধৈর্যের সহিত বহন করিয়াছিলেন।

সুখদার পর্ণকুটিরখানি ক্রমে ক্রমে জীর্ণ হইয়া বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িল। "এমন সময় হইয়াছে যে, গৃহের সর্বাংশে জল পড়িয়াছে। রাত্রিতে শয্যা গুটাইয়া সন্তানগুলিকে কোলে লইয়া স্বামী স্ত্রীতে অনিদ্রায় রজনী যাপন করিয়াছেন। কখন কখন শিশুগুলি ঝড়বৃষ্টির ভয়ে চৌকীর নীচে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে।" আমি যখন সুখদার পুত্র দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদের দেহ দগ্ধ হওয়ার সংবাদ পাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম, তখন সুখদা সন্তানগণ সহ দুর্গানাথ বাবুর বাড়ীতে ছিলেন; বৈকুণ্ঠবাবু প্রচারার্থ বিদেশে ছিলেন। দ্বিজেনের সেই সুন্দর মৃতদেহ নিজের ঘরে আনিয়া সুখদা উহাকে স্বহস্তে সাজাইয়া শ্মশানে প্রেরণ করিলেন। তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, "দাদা, এই শিশুগুলিকে নিয়া নিজের ভিটায়ও পড়িয়া

থাকিতে পারি না। বিড়ালের ছানার ন্যায় এদেরে নিয়া সর্বদাই এঘর ওঘর করিতে হয়।" তাঁহার এই উক্তি আমার মর্মে বিদ্ধ হইয়াছিল। আমি সুখদার জন্য একখানি পাকা দালান করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিলাম এবং বৈকুণ্ঠ বাবুকে তাহার আয়োজন করিতে বলিলাম। সুখদা-চরিতের পাণ্ডুলিপি হইতে নিম্নলিখিত কথা কয়টী গ্রহণ করিতেছি।

"প্রভু পরমেশ্বর তাঁহার পদাশ্রিত জনের সকল অভাব মোচন করেন; যথাসময়ে সুখদার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু তাঁহার নাম, সে নামের মহিমা এই ক্ষুদ্র পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই পরিবারের হিতৈষী বন্ধু শ্রীনাথ বাবুর উদ্যোগে ও তাঁহারই অর্থানুকূল্যে একখানি সুন্দর পাকা গৃহ নির্মিত হইল। দুইখানি কোঠা এবং একটী বারান্দা হইল। সুমিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা-যোগে গৃহে প্রবেশ করা হইল। সুখদা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সমাগত ধর্মবন্ধুদের সেবা করিলেন। শ্রীনাথবাবু স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সমুদয় কার্য সম্পাদন করাইলেন।"

সুখদা ঘোর দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিয়া কত পরিশ্রমে, কত যত্নে সংসারধর্ম পালন করিয়াছিলেন, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত এস্থলে উধৃতি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। "যেদিন গৃহে যাহা থাকিত তাহা লইয়া সুখদা পাকের জন্য প্রস্তুত হইতেন। বৈকুণ্ঠবাবু কৌতুক করিয়া বলিতেন, চাল নাই ডাল নাই, কাঠ নাই, তুমি বাটনা কুটনা কর কোন্ আশায়?' তিনি বলিতেন, 'আমার হাতে যাহা আছে তাহা লইয়া প্রস্তুত থাকি, বিধাতা আহার দিবেন।'. সাংসারিক অভাব দুঃখে পড়িয়া তিনি কখনও স্বামীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। বস্ত্র বিষয়ে তিনি সর্বদাই বলিতেন, 'যখনই আমার কাপড়ের অভাব হয়, তখনই ভগবান উহা যোগাইয়া থাকেন, তিনি কখনও আমাকে লজ্জা দেন নাই।'

"স্বামী একপ্রকার চিররুগ্ন, তাঁহার ঔষধ পথ্য চাই; শিশুগুলির জন্য দুধ চাই; কোনও সংস্থান নাই। নিজের শরীর দিয়া যাহা সম্ভব, সুখদা তাহা করিয়াছেন। রুগ্ন স্বামী ও শিশুদিগকে দুধ দিতে পারেন না, এজন্য তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইত। সুখদার দাদা শ্রীনাথবাবু এবিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। কিন্তু সর্বদা তাঁহার নিকট টাকা চাহিতে লজ্জাবোধ করিতেন। এই সময়ে সুখদা শ্রীনাথবাবুর নিকট ১৫৲টী টাকা

চাহিয়া লইলেন। কেন লইলেন তাহা বলিলেন না। ঐ টাকায় তিনি একটী সামান্য গাভী ক্রয় করিলেন। সুখদার যত্নে সেবাগুণে গাভীটী বিলক্ষণ দুগ্ধবতী হইল। এইরূপ কঠোর পরিশ্রমে সুখদা স্বামী ও সন্তান-গণের পরিচর্যা ও অভাব মোচন করিয়া গিয়াছেন।"

সুখদার পরলোক গমনের বিবরণ তাঁহার স্বামীর লেখা হইতে সংক্ষেপে গ্রহণ করিলাম। "১৩০৪ সাল বর্ষাকাল। এই সময়ে সুখদার শরীর ও মনের বিলক্ষণ স্ফূর্তি দেখা গেল। তাঁহার নূতন গৃহ আত্মীয়জনে পূর্ণ হইল। ময়মনসিংহের একটী ব্রাহ্মমহিলা (শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি) একটী স্তন্যপায়ী শিশু-সহ তাঁহার গৃহে থাকিয়া ঢাকা মেডিকেল স্কুলে পড়িতেছিলেন। বৈকুণ্ঠ বাবুর দ্বিতীয়া ভাগিনেয়ী কুমারী পুণ্যলতাও মামীর কাছে থাকিয়া ঢাকা ইডেন বালিকা স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সুখদার কাজকর্ম যেমন বাড়িয়া গেল, তাঁহার উৎসাহ, শ্রমশীলতা ও সেবা প্রবৃত্তিও তেমনি প্রবল হইল। নির্বাণের পূর্বে প্রদীপ আরও জ্বলিয়া উঠিল। শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি তাঁহার শিশুকন্যাটী গৃহে রাখিয়া স্কুলে যাইতেন, তখন সুখদার ক্রোড়েও দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিল; এমন সময় হইত, যখন সুখদা দুইক্রোড়ে দুইটীকে নিয়া আপন স্তন্য পান করাইতেন, উভয়ের মাতৃস্থান অধিকার করিতেন। সে দৃশ্য বড় মনোহর হইত!

"সমস্ত বর্ষাকাল এইরূপ কঠোর শ্রমে ও পরসেবায় অতীত হইল। সুখদার কর্মের বিরাম নাই, বর্ষা বৃষ্টির জ্ঞান নাই, অসময়ে স্নানাহার, রজনীতে অনিদ্রা, মানুষের শরীর আর কত সহিবে? ২৭শে শ্রাবণ সুখদার ভয়ানক জ্বর হইল। ক্রমে রোগ বাড়িয়া চলিল। ক্রমে নিউমোনিয়া ও মস্তিষ্কের বিকার দৃষ্ট হইল। সংবাদ পাইয়া শ্রীনাথবাবু আসিলেন। অর্থ ও শারীরিক পরিশ্রমে যাহা সম্ভব তিনি অক্লান্তভাবে তাহা করিলেন, স্বহস্তে মলমূত্র পরিষ্কার করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। বড় বড় ডাক্তারেরা দেখিলেন। শ্রীমান পরেশরঞ্জন রায় তখন লাহোর মেডিকেল কলেজে পড়িতেন; ছুটিতে ঢাকায় ছিলেন, তিনি দিবানিশি সুখদার শিয়রে বসিয়া সেবাশুশ্রূষা করিলেন; পল্লীবাসী ভাইভগিনীগণ যথেষ্ট সহায়তা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ক্রমে রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠিল, সুখদা একবারে অচেতন হইয়া পড়িলেন। পীড়ার প্রথমেই তিনি বুঝিয়াছিলেন,

এবার তাঁহার শেষ যাত্রা। যত দিন জ্ঞান ছিল সকলের খবর লইতেন সঙ্গীত ও প্রার্থনাতে যোগ দিতেন; দাদা আসিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন। শ্রীনাথবাবু আসিলে তাঁহাকে বলা হইল, তিনি আগ্রহের সহিত চক্ষু মেলিয়া করজোড়ে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। অতঃপর তিন চারি দিন অজ্ঞান থাকিয়া পীড়ার ষোড়শ দিনের মধ্যরাত্রিতে দেহলীলা শেষ করিয়া নিত্যধামে প্রস্থান করিলেন, সকল যন্ত্রণার অবসান হইল।"

সুখদা ৪টি কন্যা সন্তান রাখিয়া গেলেন। বড় কন্যা প্রেমলতার বয়স তখন ১০ বৎসর, কনিষ্ঠা অমিয়ার বয়স এক বৎসর মাত্র। এখন কন্যা কয়টী কোথায় থাকিবে সেই চিন্তা হইল। কোলের শিশুটীকে আমি আনিয়া তার পিসীমার নিকট রাখিব ভাবিতেছিলাম। এমন সময় দ্বিতীয়া কন্যা প্রীতিলতা (তখন তাহার বয়স পাঁচ বৎসর) আমার গলা ধরিয়া বলিল, "পিসা মহাশয়, আমি আপনার কাছে থাকিব।" তাহার এই বাণী দৈববাণীর ন্যায় আমাকে আকৃষ্ট করিল। তখন আমার শিশু কন্যা চারুলতার বয়স এক বৎসরও হয় না, দুইটি দুধের শিশু পালন করা অসম্ভব মনে করিয়া প্রীতিকেই আমার গৃহে আনিয়া পালন করা স্থির করিলাম। স্বর্গীয় ভ্রাতা গোবিন্দবন্ধুর সহধর্মিণী শ্রীমতী হরবালা দেবী দয়া করিয়া ছোট মেয়েটির ভার গ্রহণ করিলেন। প্রথমা ও তৃতীয়া কন্যা সহ বৈকুণ্ঠবাবু কলিকাতায় যাইয়া প্রচারাশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। তদবধি ঢাকার কার্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতাতে অবস্থিতি করিয়াই আপনার জীবনের ব্রত পালন করিতেছেন।

ভূমিকম্পের পর

ভূমিকম্পে ময়মনসিংহে যে প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। এই ঘটনায় লোকের মনে এতদূর ত্রাস জন্মিয়াছিল যে, অনেকেই রাত্রিতে ঘরের বাহিরে বাস করিত; অনেক দিন পর্যন্ত কেহ দালানে বাস করে নাই। অনেকেরই বিষম ক্ষতি হইয়াছিল; কেহ কেহ সে ক্ষতি আর পূরণ করিতে পারে নাই। তন্মধ্যে সেহরা গ্রামের প্রসিদ্ধ ধনী হোসেন বক্স ব্যাপারীর নাম স্মরণযোগ্য। ভূমিকম্পে ইহার সহরের দশ বারখানি পাকা বাড়ী একবারে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। হোসেন বক্স পূর্বেই ঋণগ্রস্ত ছিল, অতঃপর আর তাহার ঋণ শোধের কোন উপায়ই রহিল না। এই

মনস্তাপই তাহার অকালমৃত্যুর কারণ। এখন তাহার সর্বস্ব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

আমি ভূমিকম্পের পর এক বৎসর কাল কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলাম। জেলাস্কুলের বাড়ী পড়িয়া যাওয়াতে এক বৎসর কাল হার্ডিঞ্জ বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রাতে জেলাস্কুল বসিত; শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় প্রত্যহ প্রাতে ১০টা পর্যন্ত স্কুলে কার্য করিয়া তৎপর অন্যান্য কার্য দেখিয়া ১২টার পরে গৃহে ফিরিতাম। তখন প্রধানত নিম্নলিখিত কার্যগুলির জন্য নানারূপে খাটিতে হইয়াছিল।

(১) ব্রহ্মমন্দির মেরামত। সমাজের সভ্যদের অনেকেরই মত হইয়াছিল মন্দিরের ছাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উপরে টিনের চালা দেওয়া হউক। আমি কিছুতেই এ কার্যে সম্মত হইতে পারি নাই। কিরূপে মেরামত করিতে হইবে তাহার সহজ প্রণালী স্থির করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার কিশোরী বাবুকে দেখাইলাম; তিনি আমার প্রণালীর সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। তদনুসারে কার্য করা গেল। বাবু বরদাকান্ত বসু এই কার্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বিলাতের ইউনিটেরিয়ান সোসাইটী ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরাদির জন্য অনেক টাকা পাঠাইয়াছিলেন। আমরা সেই ফণ্ড হইতে ৪০০ শত টাকা পাইয়াছিলাম। জমিদারগণের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল, তথাপি আমরা তাঁহাদের অনেকের সাহায্য পাইয়াছিলাম।

(২) সিটি স্কুলের দালান পড়িয়া গিয়াছিল; পাকা দেয়াল করিয়া বর্তমান টীনের ঘরগুলি সেই সময়ে নির্মিত হয়। আমি তখন সিটিস্কুল-কমিটীর সভ্য ছিলাম। এই কার্যে আমাকে সহায়তা করিতে হইয়াছিল।

(৩) বালিকাবিদ্যালয়ের দালানটী একেবারে চূর্ণ হইয়াছিল। রাবিশ গুলির উপর একখানা টীনের চালা করিয়া তাহাতে স্কুলের কার্য চলিতেছিল। ইতিমধ্যে বঙ্গের লেঃ গবর্ণর মাননীয় উড্‌বার্ণ সাহেব এখানে আগমন করিলেন। তিনি ও তাঁহার সুযোগ্য চীফ সেক্রেটরী বোল্‌টন সাহেব স্কুল দেখিতে আসিলেন। বোল্‌টন সাহেবকে আমি বালিকা স্কুলের বর্তমান অবস্থা বলিয়া তাঁহার সহায়তা চাহিলাম। তিনি কি করিতে পারেন জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, "আগামী কল্য টাউনহলে যে দরবার হইবে, তাহাতে যদি ছোটলাট বাহাদুর এই স্কুলের গুরুতর অভাবটীর কথা উল্লেখ করেন, তবেই উহার প্রতিবিধান হইবে।" তিনি স্বীকৃত হইলেন।

জমিদারদের মধ্যে গোলোকপুরের কুমার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী কোন সৎকার্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন জানিয়া আমাদের স্কুল কমিটীর উৎসাহী সভ্য বাবু কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে এই বিষয়টী জানাইয়া রাখিলেন। পরদিন দরবারে লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বক্তৃতায় বালিকাস্কুলের গৃহাভাবের কথা বলিলে উক্ত কুমার বাহাদুর এই কার্যে পাঁচ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইলেন। পরে তিনি এই কার্যের জন্য সাত হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। স্কুলের হেড পণ্ডিত বাবু চন্দ্রমোহন বিশ্বাস এই গৃহ নির্মাণে আমার প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। আমরা কন্‌ট্রাক্ট না দিয়া বেতনভোগী রাজমজুর নিযুক্ত করিয়া অল্প ব্যয়ে কার্য নির্বাহ করিয়াছিলাম। আমাকে প্রত্যহ দুইবেলা কার্য পরিদর্শন করিতে হইত।

আত্মকথা

ঐ সকল কার্য ভিন্ন নিজের বাড়ী কয়েকটী মেরামত ও পুনর্নির্মাণ করিতে হইল। তদুপরি ব্রাহ্মসমাজের কাজ, পল্লীর তত্ত্বাবধান, নিজের গ্রন্থাদির কাজ নিয়মিতরূপে করিতে হইত। এইরূপ কঠোর পরিশ্রমে শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, কঠিন মস্তিষ্কপীড়ায় আক্রান্ত হইলাম। তিন মাস চিকিৎসার পর ১৮৯৮ সনের অক্টোবর মাসে দার্জিলিং গমন করিলাম। দার্জিলিংএর অপূর্ব দৃশ্যে এবং স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর গুণে শরীর মন অতি শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠিল। তখন ব্রাহ্মপ্রচারক ভাই প্রকাশদেব, শ্রদ্ধেয় বন্ধু রামদুর্লভ মজুমদার, শ্রীমান ব্রহ্মানন্দ বড়কাকতি, শাস্ত্রী মহাশয়ের ও স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র রায়ের পরিবার স্যানিটারিয়ামে ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে অতি আনন্দে কিছুদিন বাস করিয়াছিলাম। ইঁহাদের সঙ্গগুণে আমার ধর্মজীবনেরও বিলক্ষণ উপকার হইয়াছিল। অল্পদিন মধ্যেই আমার মাথার অসুখ প্রশমিত হইয়া যায়। বিশেষ কোন কার্যবশত কলিকাতা চলিয়া যাই। তখনও আমার বাড়ীর উপাসনামন্দির প্রভৃতি ভগ্নাবস্থায় ছিল; শীতকালে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তৎসমুদয় পুনর্নির্মাণ করাইলাম। অতঃপর মাঘোৎসবে কলিকাতায় গমন করিলাম। তখনও আমার ছুটির কিছু বাকী ছিল, এই সময়টা স্বাস্থ্যকর স্থানে যাপন করিবার জন্য মধুপুরে গমন করিলাম। আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান গোলোক চন্দ্র দাস ও ডাক্তার ফকিরচন্দ্র সাধুখাঁ তথায়

সপরিবারে ছিলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে মাসাধিক কাল বাস করিয়া সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া চৈত্র মাসে দেশে ফিরিয়া আসিলাম। উক্ত ব্রাহ্ম পরিবারের সেবা যত্নে আমার প্রবাস বাসের কোন কষ্টই হয় নাই। এই সময়ে আমার ভগিনীপতি বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; তাঁহার সঙ্গে আমার লক্ষ্ণৌ যাইবারই কথা ছিল, কিন্তু কার্যবশত তাহা হয় নাই। ইহার কিছুকাল পরে ১৮৯৯ সনের ভাদ্র মাসে গোপালবাবু পরলোক গমন করেন; তখন তাঁহার পুত্র শ্রীমান বিমলচন্দ্র ঘোষ শিক্ষার্থ বিলাতে বাস করিতেছিলেন। গোপালবাবু বড় আশা করিয়া পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হয় নাই।

কলিকাতায় মাঘোৎসব

একোনসপ্ততিতম মাঘোৎসবে কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ও প্রিয় ছাত্র শ্রীমান দ্বারকানাথ সরকার তখন ৩৯ হ্যারিসন রোডে অবস্থিতি করিতেন, আমিও তাঁহাদের বাসায় থাকিয়া মাঘোৎসবে যোগ দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পূর্ণাবস্থা। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, মোহিনীমোহন বসু প্রভৃতি কর্মিগণ জীবিত ছিলেন। বিলাতের একেশ্বরবাদীদের প্রতিনিধি ফ্লেচার উইলিয়ম্‌স সাহেব অতিশয় উৎসাহের সহিত মাঘোৎসবের কার্যে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয়, নগেন্দ্রবাবু, নবদ্বীপবাবু প্রভৃতি প্রচারকগণ পূর্ণোৎসাহে কার্য করিতেছিলেন। ৮ই মাঘ মন্দিরে ব্রাহ্মিকা-গণের উৎসব হয়। সিটী কলেজে ব্রাহ্মগণ উপাসনা করেন। আমার প্রতি আচার্যের কার্যভার ছিল। এইদিন অপরাহ্নে মন্দিরে সঙ্গতসভার উৎসব হয়; অনেকেই জীবনের বিশেষ বিশেষ কথা ব্যক্ত করেন। সেদিন আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহার মর্ম তত্ত্বকৌমুদীতে মুদ্রিত আছে, উহাতে ব্রহ্মোপাসনার ক্রমবিকাশের অবস্থা বলা হইয়াছিল। ইতিহাসের পক্ষে উহার প্রয়োজন আছে মনে করিয়া এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"বাল্যকালে যখন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করি, তখনই এই 'সঙ্গত সভা' স্থাপিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাস ও সঙ্গতের ইতিহাস, ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালীর ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে এক। ব্রহ্মোপাসনার উপরেই

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। প্রথমে ঈশ্বরকে 'তিনি' বলিয়া সম্বোধন করা হইত। সৃষ্টি দেখাইয়া স্রষ্টার অস্তিত্ব নির্ণয় করা হইত; ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের উপর বেশী জোর দেওয়া হইত। তৎপর তিনি 'তুমি' শব্দে আরাধিত হইতে লাগিলেন। যিনি পরোক্ষ ছিলেন, এখন তিনি নিকটে আসিলেন। এ সময়ে তিনি জ্ঞানময় ও দয়াময় রূপে বিশেষভাবে উপাসিত হইতেন। এখন 'বিবেক' প্রস্ফুটিত হইল। 'শুনিব বিবেককর্ণে তোমার শ্রীমুখের বচন', ইহা তখনকার উক্তি। পাপের জন্য অনুতাপ এই সময়ের প্রধান ভাব। তখনও ব্রাহ্মসমাজ হয় নাই, ব্রাহ্ম পরিবার গঠিত হয় নাই। আমরা যে সমাজ ও পরিবারবদ্ধ হইব, এরূপ ভাব আমাদের মনে কখনও উদিত হয় নাই। আমরা মনে করিতাম যে, সব ছাড়িয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছি। ক্রমে ঈশ্বর পিতা ও মনুষ্য ভ্রাতা এই ভাব বিকশিত হইল। মানবের ভ্রাতৃত্ব ও ঈশ্বরের পিতৃত্ব বিষয়ে নানা ভাবে আলোচনা হইতে লাগিল এবং এই আলোচনার ফল স্বরূপ জগতের পাপ ও দুর্নীতি দূর করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইল। ধর্ম ব্যক্তিত্বের সীমাকে অতিক্রম করিল; কার্য আরম্ভ হইল; সঙ্গে সঙ্গে সমাজও স্থাপিত হইল। তখন ব্রাহ্ম প্রচারকগণের উৎসাহ অগ্নির ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে ঈশ্বরের প্রেম স্বরূপ প্রকাশিত হইল। প্রেমের দেবতারূপে তিনি গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, সুতরাং পরিবার গঠিত হইল। নরনারীর সমান অধিকার ঘোষিত হইল।

ক্রমে অমৃত যোগে তিনি উপাসিত হইতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে লাভ করিয়া অমৃত সাগরে ডুবিয়া গেলেন।

ঈশ্বরের অনন্ত স্বরূপ নিত্য নূতনভাবে প্রকাশিত হইতেছে। এখন নবভাবে নূতন প্রাচীনের মিল দেখাইয়া নব ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের নিকট আসিতেছে। উপাসনা যোগে আমাদিগকে নিত্য নূতনভাবে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। যত কিছু উন্নতি সকলই ব্রহ্মোপাসনার উপর নির্ভর করে। এই উপাসনার উপর যদি আমাদের সমাজ ও পরিবার প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে সব চূর্ণ হইয়া যাইবে। ব্রহ্মোপাসনার আকর্ষণেই সব সহ্য করিয়া আসিয়াছি, ইহারই উপর সকল প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।" (তত্ত্ব কৌ:— ১৬ই মাঘ, ১৮২০ শক)

৯ই মাঘ রাত্রির উপাসনার ভারও আমার উপর পড়িল। সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজের প্রকাণ্ড হল লোকে পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ উপাসক ও কৃতী লোকসকল উপস্থিত; মণ্ডলী স্নেহ করিয়া আমার উপর যে গুরুভার প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহা বহনের একান্ত অযোগ্য। তথাপি পিতার অপার করুণার কথা, ব্রহ্মনামের অনন্ত মহিমা স্মরণ করিতে করিতে কম্পিত হৃদয়ে বেদী গ্রহণ করিলাম। যাহা হউক, পিতা এই দীন দাসকে লজ্জা দেন নাই; তাঁহার প্রেম পুণ্যের কথা ভাই ভগিনীদিগকে বলিয়া এ অধম জীবন ধন্য হইল, তাঁহারই জয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

উপাসনান্তে আমি যখন বেদী হইতে নামিয়া বাহিরে আসিতেছিলাম, তখন একটী ভদ্রলোক দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন; প্রথমে চিনিতে পারি নাই, পরে দেখিলাম তিনি আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ডাক্তার হরনাথ ঘোষ। বাল্যে আমরা এক স্কুলের ছাত্র ছিলাম। হরনাথ আমার সঙ্গে এক বৎসরে ছাত্রবৃত্তি পাস করেন এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজের বাঙ্গলা বিভাগে অধ্যয়ন করিয়া ডাক্তার হন। বহুদিন পরে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল। তিনি কতই আনন্দ প্রকাশ করিলেন; আমার সঙ্গে বাসা পর্যন্ত আসিলেন। পরদিন প্রাতের উপাসনার পর তিনি আমাকে বলিলেন, "আমি আদি সমাজের পুস্তকগুলি টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের জন্য চাই, পরিচয়সূচক পত্র দাও।" আমি নবদ্বীপবাবুর পত্র লইয়া তাঁহাকে দিলাম। বিকালে নগর সংকীর্তন, পথে সর্বদাই দেখিলাম, হরনাথ মহোৎসাহে কীর্তনের কাগজ বিলি করিতেছেন। আমি তাঁহাকে দুই তিনবার নিবারণ করিলাম; তাঁহার হৃদপিণ্ডের পীড়া ছিল, কোনরূপ উত্তেজনা একবারে নিষিদ্ধ ছিল; হরনাথ অতি উৎসাহী। আমি তাঁহার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম; কিন্তু যখন কীর্তনসহ জনস্রোত মন্দিরে প্রবিষ্ট হইল, তখন কে কোথায় গেল দেখিতে পারি নাই। উপাসনান্তে বারান্দায় আসিলে হরনাথ আসিয়া জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, একটু দাঁড়াও, একখানি সঙ্গীত পুস্তক কিনিয়া আনি। একটু পরেই শুনিলাম হরনাথ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, সে দেহে আর প্রাণ নাই! ব্রহ্মোৎসবের প্রেমসাগরে ডুবিয়া চারিদিকে ব্রহ্মনামের মহাধ্বনির মধ্যে সেই পুণ্যাত্মা আনন্দধামে চলিয়া গেলেন! এমন সুখের মৃত্যু কাহার না বাঞ্ছনীয়? যে সকল যুবক ব্রহ্মমন্দির সাজাইতে আসিয়াছিলেন, শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদিগকে বলিলেন, "এবার আর মন্দির

সাজান হবে না। তোমরা এই পুণ্যাত্মার সৎকার করিয়া এবারের উৎসব স্বর্গে পরিণত কর।"

প্রিয় বন্ধু হরনাথের এই আশ্চর্য মৃত্যুতে এবারের ব্রহ্মোৎসব এক নূতন ভাবে সম্পন্ন হইল, অমৃতধাম নিকটবর্তী হইল, অনেকের জীবনেই নব চেতনার সঞ্চার হইল।

হরনাথ ঘোষ অতি গুণবান পুরুষ ছিলেন। তিনি বহু বাধা বিঘ্ন ও দারিদ্র অতিক্রম করিয়া ডাক্তারি শিক্ষা করেন এবং গভর্ণমেণ্টের কর্ম গ্রহণ করিয়া অতি সুখ্যাতির সহিত নানা স্থানে চিকিৎসা করেন। ইনি জীবনের প্রথম হইতেই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ইদানীং তাঁহার ধর্মে অনুরাগ ও উৎসাহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। বর্ষাধিক হইল ইঁহার হৃদ্‌রোগ প্রকাশ পায়; তজ্জন্য পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর ব্রাহ্মসমাজের কার্যে বিশেষ ভাবে জীবন অর্পণ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। করটিয়া ও টাঙ্গাইল তাঁহার প্রধান কর্মস্থল ছিল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ হইল; এই মাঘোৎসবেই তাঁহার কর্মজীবনের অবসান হইল। আমারও কলিকাতাতে এই শেষ মাঘোৎসব; অতঃপর আর সুস্থদেহে তথায় যাইয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্যে কোনরূপ সহায়তা করিতে পারি নাই;

ময়মনসিংহে কলেজ স্থাপন

এই সময়ে এ জেলার নানাস্থানে অনেকগুলি এণ্ট্রান্স স্কুল স্থাপিত হয়। এই সহরে বাবু অনাথবন্ধু গুহ তাঁহার পিতার নামে মৃত্যুঞ্জয় স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। উহার অনুষ্ঠান-পত্রে এই স্কুল কলেজে পরিণত হইতে পারে, এরূপ আভাস ছিল। তৎপূর্বেই বাবু শরচ্চন্দ্র রায়, অমরচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি সিটি স্কুলের নেতৃগণ উক্ত স্কুলে কলেজ ক্লাস খুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৮৯৯ সনে যখন স্বর্গীয় আনন্দমোহন ময়মনসিংহে আগমন করেন তখন ময়মনসিংহ সভা, আঞ্জুমানী সভা ও ছাত্রগণ তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন, তাহাতে ময়মনসিংহ নগরে একটি কলেজ স্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। তিনিও সিটি স্কুলটীকে কলেজে পরিণত করিবেন এরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন। এইক্ষণ ১৯০১ সনে মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের ঘোষণাপত্র পাঠে সিটি-স্কুলের নেতৃগণ ব্যস্ত হইয়া কলেজ স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

আনন্দমোহন তাঁহাদের প্রধান সহায় হইলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ হইতে এত বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হইতে লাগিল যে, অনেক সময়ে এই কার্যের সফলতা বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ হইতে লাগিল। যাহা হউক, ঈশ্বরকৃপায় ১৯০১ সনের ১৮ই জুলাই এখানে প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতা হইতে তিনজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। সেদিন সিটিস্কুল-প্রাঙ্গণে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইল। সম্পাদক শ্যামাচরণবাবুর অনুরোধে আমি প্রার্থনা করিয়া কার্য আরম্ভ করিলাম। শরৎবাবু তখন রোগশয্যায় পতিত ছিলেন। তথাপি অতিকষ্টে উক্ত সভায় উপস্থিত হইলেন এবং সর্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের পবিত্র নাম লইয়া যে কলেজের প্রতিষ্ঠা হইল এজন্য কতই আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

এই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত করিবার জন্য যখন আবেদন করা হইল, তখন সন্তোষের জমিদার শ্রীযুক্তা দিনমণি চৌধুরাণী তাঁহার স্বর্গীয় পতির স্মরণার্থ এই নগরে বৈকুণ্ঠনাথ কলেজ স্থাপনার্থ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া গভর্ণমেণ্টে আবেদন করেন। তাঁহার আবেদন সিণ্ডিকেটে যায়। এদিকে স্থানীয় অনেক লোক চৌধুরাণীর দান গ্রহণের জন্য সিণ্ডিকেট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন করেন। এই বিষয় লইয়া অনেক আন্দোলন ও বাদ প্রতিবাদ হয়। অনেকেই উভয় কলেজ মিলিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। আনন্দমোহন মিলনের পক্ষে যতদূর সম্ভব অগ্রসর হইয়াছিলেন।

সিণ্ডিকেট বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টকে উভয় কলেজ মিলাইবার চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। গভর্ণমেণ্ট কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের উপর ভার দেন। তাঁহারাও যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু চৌধুরাণী কোন নিয়মেই সিটি কলেজের সঙ্গে মিলিতে সম্মত না হওয়াতে গভর্ণমেণ্ট ও সিণ্ডিকেট সিটি কলেজই মঞ্জুর করিয়া চৌধুরাণীর কলেজ স্থাপনে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। এই কার্যে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, শরচ্চন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত অসাধারণ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন।

কলেজ স্থাপিত হইল কিন্তু বাড়ীর অভাবে অতিশয় অসুবিধা হইতে লাগিল। একটি ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অতি কষ্টে কলেজের কার্য চলিতে লাগিল। মহাত্মা আনন্দমোহন ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে এখানে আসিয়া

কলেজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে স্বয়ং জমিদারদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। গোলকপুরের দানশীল কুমার বাহাদুর পাঁচ হাজার, মুক্তাগাছার দাতা জগৎকিশোর দশ হাজার এবং রামগোপালপুর ও গৌরীপুর এক হাজার করিয়া দান করিলেন। আনন্দমোহন আমার উপর কলেজের জন্য দালান প্রস্তুত করিবার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি সম্বৎসরকাল যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া কলেজের জন্য দুইটী বৃহৎ হল প্রস্তুত করাইলাম। কুমার উপেন্দ্রচন্দ্রের দান এককালে প্রাপ্ত হওয়াতেই এত শীঘ্র বাড়ী প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছিল। তিনি কলেজ রক্ষার জন্য ঋণ করিয়া এক যোগে পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। এই কার্যে এবং বালিকাবিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

কয়েক বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মে কলেজের সকল অভাব মোচন করা অসম্ভব দেখিয়া কলিকাতার কলেজ কাউন্সিল ১৯০৮ সনের মে মাসে এখানকার কলেজটী উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। স্থানীয় কমিটী কলেজ রক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা যত্ন করিয়াছিলেন। এমন কি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যে সকল কঠিন নিয়মে আবদ্ধ করিতে চাহিলেন, কমিটি তাহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না। যাহা হউক কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীমান বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তী ও সেক্রেটারী বাবু শ্যামাচরণ রায় উদ্যোগী হইয়া গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে সেই বৎসর জুলাই মাসেই পুনরায় কলেজ স্থাপন করিলেন। প্রায় দুই বৎসর কাল আমাদের কলেজ গৃহেই উক্ত কলেজের কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। তৎপর বৈকুণ্ঠবাবুর বিশেষ যত্নে নূতন কলেজ বাড়ী প্রস্তুত হইল এবং উহা আনন্দমোহন কলেজ নামে খ্যাত হইল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, কলেজের প্রিন্সিপাল, আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান বৈকুণ্ঠকিশোর কলেজবাড়ী সমাধা হইবার পূর্বেই সহসা অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তদবধি কলেজের প্রিন্সিপাল নিয়োগ সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ চলিতেছে। সম্প্রতি আমার প্রীতিভাজন ছাত্র শ্রীমান রজনীকান্ত গুহ এম্, এ ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়া আসাতে আনন্দমোহন কলেজ এবং ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

পারিবারিক

১৮৯৩ সালের ২৫শে বৈশাখ আমার অষ্টম সন্তান যোগানন্দ এবং ১৮৯৬ সালের ৮ই কার্তিক নবম সন্তান চারুলতার জন্ম হয়। যোগানন্দ ৭ বৎসর কাল আমাদের গৃহে ছিল। এই বালক অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সরলপ্রকৃতি ও উৎসাহী ছিল। পল্লীর সকল শিশুর সঙ্গে তাহার বিলক্ষণ সখ্যভাব জন্মিয়াছিল। আমরা ইহাকে পাইয়া মাখনের শোক কথঞ্চিৎ ভুলিতে পারিয়াছিলাম। ইহার মধুর প্রকৃতিতে সকলেই আকৃষ্ট হইতেন; এবং বাঁচিয়া থাকিলে পরিবারের মুখোজ্জ্বল করিবে বলিয়া আশা করিতেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ হইল। ৭ম বর্ষ পূর্ণ হইলেই ১৯০০ সনের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ৩ দিনের দুরন্ত রক্তামাশয় রোগে সহসা পরলোক চলিয়া গেল। ভাল করিয়া চিকিৎসা করাইবারও সময় পাইলাম না। তাহার সে রোগযন্ত্রণার কথা স্মরণ হইলে এখনও চক্ষুর জল নিবারণ করা যায় না। মহাপ্রস্থানের কয়েক মিনিট পূর্বে তাহার দুর্বল হাতখানি দিয়া মাকে বেষ্টন করিল, এবং "মা, বাবা, কেঁদ না" বার বার এই বলিতে লাগিল। ব্রহ্মনামের মহাধ্বনির মধ্যে সেই নির্মল স্বর্গের ফুল স্বর্গে চলিয়া গেল।

এই সময়ে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শান্তিলতার বিবাহ প্রস্তাব চলিতেছিল। উক্ত দুর্ঘটনায় তাহা স্থগিত ছিল। বিক্রমপুর বারৈখালি গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় উমাকান্ত বসু চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান রজনীকান্তের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান হরকান্ত বসু যখন ময়মনসিংহ জেলাস্কুলে কর্ম করিতেন, তখন তাঁহারা আমাদের পল্লীতে বাস করিতেন; তদবধি ইঁহাদের সঙ্গে বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। শ্রীমান রজনীকান্ত অধ্যয়ন সময়ে ঢাকাতে আমার নিকটে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ১৯০০ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন স্থির হইল। ফরিদপুর হইতে বরযাত্রগণ আগমন করিলেন। আমার পরিবারে এই প্রথম অনুষ্ঠান। যথাসাধ্য আয়োজন করা গেল। পল্লীর সকলেই আপন পরিবারের অনুষ্ঠান মনে করিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়া কর্ম সুনির্বাহ করিলেন। কন্যার মাতুল বৈকুণ্ঠবাবু, আমার ভগিনী শ্রীমতী সারদা ও ভাগিনেয় শ্রীমান বিমল প্রভৃতি আত্মীয়গণ এবং ঢাকা, কলিকাতা ও কাওরাইদ হইতে অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়

আচার্যের কার্য করিলেন। দাদা শরচ্চন্দ্র, প্রীতিভাজন বরদাপ্রসন্ন রায়, স্নেহাস্পদ শ্রীমান গগনচন্দ্র হোম ও প্রসন্নকুমার বসু এখানে আসিয়া এই কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। সহরের সকল শ্রেণীর ভদ্র মহোদয়গণ আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া সুখী করিয়াছিলেন।

ইহার মাসাধিক পরে (ডিসেম্বর ১৯০০) আমার প্রিয় ভাগিনেয় শ্রীমান বিমলচন্দ্রের বিবাহ হয়। বিমল তখন কেম্বি্রজের গ্রাজুয়েট হইয়া দেশে আসিয়া সিটি কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রীক্ট জজ বন্ধুবর কেদারনাথ রায়ের কন্যা শ্রীমতী সরযূর সহিত এই শুভানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শান্তির বিবাহের পরেই আমি এক বৎসরের ফার্লো লইলাম এবং উক্ত বিবাহে বাঁকুড়া গমন করিলাম। তথায় মহাসমারোহে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। সে বিবাহ-ঘটনা অনেকেরই স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বিবাহান্তে বরকন্যা লইয়া ভগিনীদের সহিত আমি লক্ষ্ণৌ গমন করিলাম। শ্রীমান কয়েক দিন মাত্র তথায় থাকিয়া ডাক্তারি শিক্ষার জন্য পুনরায় সস্ত্রীক বিলাত গমন করিলেন। সরযূর একটী ভ্রাতা কয়েক বৎসর নানা রোগে ভুগিয়া মারা যায়; তাহাকে নিয়া সরযূ নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং মাতৃহীন শিশুর সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তখনই তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বিলাতে যাইয়া শুশ্রূষাবিদ্যা ভাল করিয়া শিক্ষা করিবেন। এইক্ষণ জীবনের উপযুক্ত সঙ্গী পাইয়া পিতার সহায়তায় সেই বাসনা পূর্ণ করিতে স্বামীসহ ইংলণ্ডে গমন করিলেন। কিন্তু মানুষের কল্পনা কি অসার! সে যাহা ভাবে তাহা তো পূর্ণ হয় না। কয়েক মাস বিলাতে থাকার পরই সরযূর ক্ষয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। কিছু দিন পরে তিনি পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। পিতা ও ভ্রাতৃগণ কতই চিকিৎসা করাইলেন, কতই অর্থব্যয় করিলেন, কিছুতেই সে দুরন্ত ব্যাধি নিবারিত হইল না। নবযৌবনে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও প্রিয়জনের স্নেহ প্রেম হৃদয়ে লইয়া স্নেহময়ী সরযূ দার্জ্জিলিং নগরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। কন্যার মৃত্যুর পরে রায়মহাশয় জামাতার ব্যয় বহনে অসম্মত হইয়া তাঁহার ফিরিবার পাথেয় প্রেরণ করিলে শ্রীমান বিমল উহা প্রত্যাখ্যান করেন। নিজে অর্থ উপার্জন করিয়া কেম্বি্রজের এম্, বি উপাধি পাইয়া প্রায় ৭ বৎসর পরে স্বদেশে ফিরিয়াছেন। এখন তিনি কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিলাতে অবস্থিতি সময়ে

তথাকার এক ভদ্র পরিবারের কুমারী কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়াছে।

আমি তিনমাস কাল লক্ষ্ণৌ নগরে ভগিনীর গৃহে বাস করিলাম। এইবার আমার বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ হইল। ৭ই চৈত্র আমার জন্মদিনে ভগিনীর গৃহে আনন্দোৎসব হইল। বৈশাখ মাসের প্রথমে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

শরচ্চন্দ্রের পরলোকগমন

সদাত্মা শরচ্চন্দ্র ও তাঁহার ব্রাহ্মদোকানের কথা ইতিপূর্বে কিছু কিছু লিখিয়াছি। তদানীন্তন কালে শরৎবাবু ময়মনসিংহে সর্ববিধ সাধু কার্যের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। নানাকারণে তাঁহার ব্রাহ্মদোকান নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল, তিনি বাধ্য হইয়া ১৮৮৮ সনে ব্রাহ্মদোকান তুলিয়া দিয়া এখানে জ্বালানি-কাষ্ঠের ব্যবসায়ের সূত্রপাত করেন। শ্রীপুরের একজন কনট্রাক্টর তাঁহার নিকট সহস্রাধিক টাকা অগ্রিম লইয়া বহু কাষ্ঠ ষ্টেশনে মজুত করে, ভাওয়ালের রাজ সরকার হইতে ঐ কাষ্ঠ আটক করা হয়, এবং কনট্রাক্টরের নামে নালিশ হয়। শরৎবাবু বহু চেষ্টা করিয়াও ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার পান নাই, তাঁহার অনেক টাকা লোকসান হইয়া গেল। তিনি একবারে ভগ্নমনোরথ ও ঋণভারে পীড়িত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। সাত আট বৎসর তথায় থাকিয়া ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করিলেন, ছাত্রমণ্ডলী ও ব্রাহ্মসমাজের কার্যে ব্যবহৃত হইলেন। তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই সম্যক কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে আর বিদেশে থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া ১৮৯৯ সনের মে মাসে জীবনের প্রিয় কর্মভূমি ময়মনসিংহে আগমন করিলেন। এখানকার বন্ধুদিগের উৎসাহে ও সহায়তায় একখানি ক্ষুদ্র অথচ অতি সুন্দর দোকান প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে এই দোকানে বাছা বাছা প্রয়োজনীয় জিনিস সংগৃহীত হইয়াছিল।

১৯০১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে শরচ্চন্দ্র কতিপয় বন্ধু সহ টাঙ্গাইল ব্রহ্মোৎসবে গমন করেন; ফিরিবার সময় যমুনা নদীর বালুকাময় চরে প্রচণ্ড রৌদ্রে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন

বোধ হইল যেন তাঁহার বিশাল দেহ অগ্নিদগ্ধ অঙ্গারবৎ হইয়া গিয়াছে। যে বহুমূত্র রোগ এতদিন গুপ্তাবস্থায় ছিল, এখন তাহা প্রবল মূর্তি ধারণ করিল। তাঁহাকে গৃহে আনিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সম্মত হইলেন না; অগত্যা দোকানে রাখিয়াই চিকিৎসা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করা গেল। এই সময়ে এখানে কলেজ স্থাপনের আন্দোলন উপস্থিত হয়। তিনি রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াই সেই সংগ্রামের নেতৃত্ব করিতেছিলেন। অবশেষে ১৮ই জুলাই কলেজ স্থাপিত হইল। শরচ্চন্দ্র সে দিন রুগ্নদেহে তথায় উপস্থিত হইলেন। দোকানে ফিরিয়া আমাকে বসিতে বলিয়া ব্রহ্মপুত্র হইতে স্নান করিয়া আসিলেন। রাত্রিতে ভয়ানক জ্বর হইল। দুই দিন পরে তাঁহাকে আমার গৃহে আনয়ন করিয়া চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করা গেল। সিবিলসার্জন ডাক্তার অ্যাস্, ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র দাস ও তারানাথ বল প্রভৃতি সুবিজ্ঞ চিকিৎকগণ অতিশয় যত্নপূর্বক দেখিতে লাগিলেন। সাত দিন পরে জ্বর ছাড়িল; তখন বহুমূত্র রোগ ভীষণ মূর্তি ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে রোগপ্রভাবে সে বিশাল দেহ শয্যায় লীন হইয়া গেল। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় জামাতা ও পুরাতন ভৃত্যসহ আগমন করিলেন। মানুষের পক্ষে যাহা সম্ভব, কিছুই ক্রুটী হইল না। ঢাকা হইতে বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্তী, কাওরাইদ হইতে আমাদের চিরসহায় গুপ্ত মহাশয় এবং কলিকাতা হইতে শ্রীমান শ্যামাচরণ দে প্রভৃতি তাঁহার সুহৃদ্বর্গ সমাগত হইলেন। ২০শে জুন তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ বাবু দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য পরলোক গমন করিলেন। ২৬শে তারিখে ব্রাহ্মদিগের চিরহিতৈষী মুক্তাগাছার জমিদার বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী দিব্যধামে চলিয়া গেলেন, শরৎ বাবু মৃত্যুশয্যায় থাকিয়াই এই শোকসংবাদ পাইলেন। ইহার কয়েক দিন পরে, ৩রা আগষ্ট (১৮ই শ্রাবণ) ব্রাহ্মসমাজের জয়স্তম্ভ, গরিবের বন্ধু, আমাদের চির সুহৃদ্, জিতেন্দ্রিয়, সাধু শরচ্চন্দ্র রায় চারিদিকে ধর্মবন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মনামের মহাধ্বনি শুনিতে শুনিতে সজ্ঞানে অমরধামে প্রস্থান করিলেন।

শরৎবাবুর মৃত্যুর পর মহাত্মা আনন্দমোহন বসু আমাদের কোন বন্ধুর নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এখানে উধৃত করিয়া উপস্থিত প্রসঙ্গ শেষ করিব।

"At length the final news reached me this morning from your letter of the passing away of one of the noblest souls it has been my privilege to know in this life. From your telegram a few days ago, I had hoped that there might perhaps be a reprieve, and Sarat Babu might yet be spared to us and to every noble cause, for sometime to come. But this was not to be. There is some consolation in the thought that his suffering, so long and so patiently borne, have come to an end ; but we have lost not only a dear and a valued friend, but a hero to fight for the right, a strenuous worker in every good cause, a soul unsurpassed in the loftiness of its aspiration, unselfishness of its aim and purity of its character. His lot was cast by Providence in a comparatively humble sphere ; but what brightness and joy, strength and inspiration he brought into the lives of those amongst whom he worked ! Who is there now among us to take his place and do his work ? If it can be said of any one in these days he worked not for himself but for others, and sacrificed himself in the pursuit of his high ideas, it can be surely said of our departed friend. But though his noble presence is gone away from amongst us, may his life and memory and example ever abide as an inspiring force !

With prayers for him who is gone away from our midst and the deepest condolence with you all.

I remain
Very sincerely yours
Ananda Mohan Bose.

139, Dhuramtola Street,
Calcutta
6th August 1901

শরৎবাবুর অভাবে তাঁহার দোকান লইয়া সঙ্কটে পড়িলাম। তাঁহার নিজের মূলধন কিছুই ছিল না, মহাজনগণ বাকী টাকার জন্য উপস্থিত হইলেন।

আমি সকল দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিয়া দোকানের জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া হারাহারিসূত্রে সকলকেই টাকা দিব স্বীকার করাতে তাঁহারা সম্মত হইলেন। তখনও আমার কার্যোর চার মাস বাকী ছিল ; সেই সময় আমি এই পবিত্র কার্যে ব্যয় করিলাম। শরৎবাবুর ভ্রাতা কৈলাসবাবুও আমাকে ক্ষমতা দিয়া এক দলিল রেজেষ্টরী করিয়া পাঠাইলেন। যাহা হউক, শরৎবাবুর সমস্ত দেনাই পরিশোধ হইল। মহাজনেরা কৃপা করিয়া সকলেই কিছু কিছু মাপ করিলেন। পূর্বের ঋণও কতক এই টাকা হইতে পরিশোধ করিয়া ২০০৲ টাকা উদ্বৃত্ত রহিল। ঐ টাকা কিছু দিন সুদে খাটাইয়া ৩০০৲ টাকা হইয়াছিল ; তাহারই সুদ হইতে বালিকাবিদ্যালয়ে "শরচ্চন্দ্র বৃত্তি" নামে মাসিক তিন টাকার একটী বৃত্তি দেওয়া হইতেছে। আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় শরচ্চন্দ্রের পুণ্যনামের এই সামান্য স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার বন্ধুগণ বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই।

স্বদেশী আন্দোলন

১৯০৩ সনে লর্ড কার্জন বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব করেন। ১৯০৫ অব্দে ১৬ই অক্টোবর বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ভেদী আর্তনাদ উপেক্ষা করিয়া বঙ্গবিভাগ সম্পাদিত হয়। এই ঘটনায় বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে মহা তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহার বর্ণনা এই গ্রন্থে সম্ভব নহে। যেমন ভূমিকম্পের একটা কেন্দ্র থাকে, তথায় সর্বাপেক্ষা প্রবল কম্পন অনুভূত হয়, সেইরূপ ময়মনসিংহই এই জাতীয় মহাকম্পনের কেন্দ্র স্থান হইয়াছিল। লর্ড কার্জনও তাহা বুঝিতে পারিয়াই চির উপেক্ষিত ময়মনসিংহে পদার্পণ করিয়া রাজশক্তির উগ্রমূর্তি প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ময়মনসিংহের কৃতী সন্তান মহাত্মা আনন্দমোহন ও মহারাজ সূর্য্যকান্ত এই জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া র'হয়াছেন।

বঙ্গবিভাগ উপলক্ষে সমস্ত ভারতবর্ষে সপ্তবর্ষব্যাপী যে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, ব্রাহ্মসমাজও তাহার তরঙ্গ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। অনেক ব্রাহ্ম বহু দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিয়া, আপনাদের স্বার্থ সুখ বিসর্জন দিয়া স্বদেশসেবায় প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলেন। কেহ বা কঠোর নির্বাসন-দণ্ড

তুচ্ছ করিয়া শেষ পর্যন্ত জন্মভূমির কার্যে বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়াছেন। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজও যথাসম্ভব এই আন্দোলনে সহায়তা করিয়াছেন। কয়েক বৎসর ১৬ই অক্টোবর ব্রহ্মমন্দিরে জাতীয় কল্যাণের জন্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনাদি হইয়াছে, তখন আমাকেই আচার্যের কার্য করিতে হইত। রাখীবন্ধন-দিনে শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ মহাশয়ের গৃহে যে পবিত্র ভ্রাতৃসম্মিলন হইত, সকলের অনুরোধে আমি তথায় প্রার্থনা করিতাম।

এই জাতীয় আন্দোলনে আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল বটে, কিন্তু যাহা অন্যায় ও নীতিধর্ম বহির্ভূত, যে সকল আচরণে স্বদেশের কল্যাণ না হইয়া অনিষ্টই হইয়া থাকে, আমরা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম। এই জন্য স্থানীয় নেতৃগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া কার্য করা অনেক সময় সম্ভব হয় নাই। সুবক্তা পাল মহাশয় ও ব্যারিষ্টার মিত্র সাহেবের কঠোর নিন্দা ও তীব্র বিদ্বেষপূর্ণ বক্তৃতায় অনেক শিক্ষিত লোকের মন পর্যন্ত বিকৃত হইয়াছিল, ছাত্রদিগের ত কথাই নাই। নেতৃগণও অচিরে তাহার বিষময় ফল ভোগ করিয়াছিলেন। এখনও সে তীব্র হলাহল জাতীয় চরিত্রকে কলঙ্কিত করিতেছে। এই স্বদেশী আন্দোলন যাহাতে ন্যায় ও ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, আমরা তদ্বিষয়ে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। এই কয় বৎসর মধ্যে নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, ঢাকা ও টাঙ্গাইল প্রভৃতি অঞ্চলে নানা উপলক্ষে যে সকল উপদেশ ও বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল, তাহাতে স্বদেশী আন্দোলনটিকে নৈতিক ভূমির উপর স্থাপন করিতে সর্বদা বলা গিয়াছে। ভারতভূমি চিরকাল ধর্মের জন্য প্রসিদ্ধ ; যদি আবার ভারতের উত্থান হয়, তবে ন্যায় ও ধর্মেই হইবে ; অন্যায়, অত্যাচার ও পরপীড়ন দ্বারা কখনও জাতীয় জীবন দাঁড়াইতে পারিবে না ; এই সত্যটী নানাভাবে প্রচার করিতে যত্ন করা গিয়াছে।

বালিকাবিদ্যালয়

১৯০৩ সনের মার্চ মাসে শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর মাননীয় পেড্‌লার সাহেব আমাদের বালিকাস্কুলটীকে উচ্চ ইংরেজী স্কুলে পরিণত করা যায় কিনা, জানিতে চাহিলেন। তখন উহা মধ্যবাঙ্গালা স্কুল ছিল, আমরা একটি অতিরিক্ত শিক্ষক রাখিয়া কিছু কিছু ইংরেজী পড়াইবার ব্যবস্থা

করিয়াছিলাম মাত্র। সহসা ইহাকে এন্‌ট্রান্স স্কুলে উন্নত করা সম্ভব কি না, সকলেরই সন্দেহ হইল। যাহা হউক, আমাদের একান্ত উৎসাহ দেখিয়া কমিটী এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তৎকালে চট্টগ্রাম বিভাগে কোন ভাল স্কুল না থাকাতে সেবার চট্টগ্রামেই হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। তথাকার স্ত্রীশিক্ষানুরাগী শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের বিশেষ উৎসাহে ও অর্থ-সাহায্যে তদীয় শ্বশুর ৺অন্নদাচরণ খাস্তগীর মহাশয়ের নামে ঐ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। পরবর্ষে আমাদের স্কুলটীকে হাই স্কুল করিবার প্রস্তাব আসিল। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষকদের বেতন জন্য বৎসর ২২শত টাকা দিবেন, অন্যান্য খরচ আমরা চালাইব, এই সর্ত্তে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১৯০৪ সনের মার্চ মাসে মহামতি পেডলার সাহেবের কৃপায় আমাদের ক্ষুদ্র স্কুলটী হাই স্কুলে পরিণত হইল। অনেকেই যাহা অসম্ভব ও দুরাশা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই কার্যে পরিণত হইল। আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান নবকুমার সমাদ্দার তখন বাঁকিপুর উচ্চ বালিকাস্কুলে হেডমাষ্টার ছিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহাকেই আমাদের স্কুলের হেডমাষ্টার করা গেল। বহুদিন পরে নবকুমার পুনরায় ময়মনসিংহের কার্যক্ষেত্রে আসাতে সকলেই আনন্দিত হইলেন। আমরা সেই বৎসরই বোর্ডিং স্থাপন করিলাম। উহার গৃহাদির জন্য গবর্ণমেণ্ট এক হাজার টাকা দিলেন। মুক্তাগাছার জগৎকিশোর-বাবুর পুত্রবধূ পরলোকগতা জ্যোতির্ময়ী দেবীর স্মরণার্থ তাঁহার স্বামী এই স্কুলে মাসিক ৬৲ টাকার একটী বৃত্তি দিলেন। এই সামান্য আয়োজন লইয়া বর্তমান উন্নত বিদ্যাময়ী হাই স্কুলের সূত্রপাত হইয়াছিল। প্রথম বর্ষেই নবকুমারের কন্যা কুমারী শৈলবালা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। সে আনন্দ-স্মৃতিতে এখনও হৃদয় উদ্বেলিত হয়। তদবধি এই স্কুলের ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। গত ৯ বৎসরে এই স্কুল হইতে ১৯টী বালিকা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইজন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ উপাধি লাভ করিয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই স্কুলের উপর দিয়া মহাঝড় বহিয়া গিয়াছে। পূর্ববঙ্গের প্রথম লেঃ গবর্ণর মাননীয় ফুলার সাহেবকে সাদরে গ্রহণ করা হইয়াছিল, এই প্রথম অপরাধ। তৎপরে মাননীয় হেয়ার সাহেব যখন এই স্কুল পরিদর্শন করিতে আসেন, তখন তাঁহারা স্কুলের

বালিকাদিগকে পুরস্কার বিতরণ করান হইয়াছিল। এই সকল পাপের জন্ম অতি গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের বিধান হইল। প্রাইজের দিন বালিকাদিগকে স্কুলে আসিতে বারণ করা হইল, সহরের সর্বত্র গালাগালিপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল; এবং সন্ধ্যা প্রভৃতি সংবাদপত্রে আমার ও অন্যতম কর্মকর্তা অমরবাবুর নাম উল্লেখ করিয়া নানারূপ অলীক অভিযোগ ও তিরস্কার করা হইল। আমাদের কন্যাদিগকে স্কুলের পথে অপমান করা হইবে, এমন কি আমার প্রাণের উপরও আঘাত আসিতে পারে, এরূপ সব বেনামী পত্র পাইতে লাগিলাম। ইহাই যথেষ্ট নহে, স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদের বিরুদ্ধে অকথ্য নিন্দা প্রচার করিয়া এই স্কুলে ছাত্রী দিতে সকলকে নিষেধ করা হইল। পরিশেষে জাতীয় বালিকাবিদ্যালয় নামে একটী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। ঐ স্কুল হইতে গাড়ী দিয়া বালিকাদিগের যাতাযাতের ব্যবস্থা হইল। অগত্যা আমরাও সেই ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলাম। এতদিন বয়স্কা কুমারী কন্যাগণও অনায়াসে পুস্তকহস্তে স্কুলে গমনাগমন করিত, কেহ কিছু মনে করিত না। এখানে এই রীতি ছিল বলিয়াই আমরা অল্প ব্যয়ে স্কুলটী সুপরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যাহা হউক, ঐ জাতীয় স্কুলে কন্যা প্রেরণ করিতে অনেকেই পশ্চাৎপদ হওয়াতে পরে উহাকে মহাকালী পাঠশালায় পরিণত করা হইল।

অনেকে মনে করেন, আমরা এই মহাকালী পাঠশালার বিরোধী লোক। বস্তুত তাহা নহে। যে কোন উপায়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হয়, আমরা তাহারই অনুমোদন করি। প্রত্যেক সম্প্রদায় আপন আপন ধর্মসঙ্গত উপায়ে স্ত্রীশিক্ষা প্রদান করিলেও দেশের যথেষ্ট কল্যাণ হইবে। সম্প্রতি আমার প্রিয় ছাত্র মুন্সী সাহেব আলি মুসলমান বালিকাদিগের জন্য যে স্কুল স্থাপন করিয়াছেন, তাহার স'হিতও আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তিনিও ঐ কার্যে সর্বদা আমার পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করেন। তবে কি না মহাকালী পাঠশালার প্রবর্তকগণের মধ্যে কেহ কেহ যে স্থানীয় সর্বসাধারণের হিতকর স্কুলটীর বিনাশ সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন, আমরা তাহারই ঘোরতর বিরোধী ছিলাম। ঈশ্বর-কৃপায় সে মহাসংগ্রামে যে আমাদের স্কুলটী রক্ষা পাইয়াছে, ইহা ময়মনসিংহের সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

এই সকল ঘটনায় দেখা যায়, স্ত্রীশিক্ষা যে আমাদের দেশে অপরিহার্য

বিধির মত প্রচলিত হওয়া উচিত এবং এই শিক্ষার প্রভাবেই যে আমাদের সমাজ সর্ববিধ ভ্রম ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া একদিন জ্ঞানধর্মে উন্নত হইয়া উঠিবে, এই মহা সত্য এখন সকলেই স্বীকার করিতেছেন। আমরা যে পবিত্র কার্যে জীবন-ব্যাপী পরিশ্রম করিয়াছি, জীবনের এই সন্ধ্যাসময়ে চারিদিকে তাহার সফলতার লক্ষণ দেখিয়া মঙ্গলময় বিধাতার চরণে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অবনত হইতেছি।

কয়েকটী স্মরণীয় ঘটনা

১। এখন আমার দুইটী পুত্র এবং পাঁচটী কন্যা সন্তান বর্তমান আছে। কন্যাদিগকেও পুত্রতুল্য জ্ঞান করিয়া তাহাদের সুশিক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। বড়কন্যা দুইটীকে কলিকাতা রাখিয়া এন্‌ট্রান্স পর্যন্ত পড়াইয়াছিলাম। তখন এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার অতি সামান্য ছিল; ইংরেজী পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল না। ১৯০৩ সনের ১৩ই কার্তিক বিক্রমপুর বেজগাঁও নিবাসী স্বর্গীয় কালীনাথ গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান তড়িৎমোহনের সহিত আমার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী পুণ্যলতার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। প্রীতিভাজন প্রচারক বরদাপ্রসন্ন রায় মহাশয় এই বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা করেন। তড়িৎমোহন আগরতলা রাজ-সরকারে কর্ম করিতেছে।

২। ১৯০৪ সালের ৫ই বৈশাখ আমার কন্যাতুল্য স্নেহের পাত্রী মা স্বর্ণলতা—শ্রীমান রজনীকান্তের সহধর্মিণী—বরিশাল নগরে অকালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইনি বাল্যকালে অনেক দিন আমাদের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, কুমারী জীবনের পবিত্র স্নেহ মমতায় আমাদিগকে সুখী করিয়াছিলেন। শ্রীমান রজনীর সঙ্গে ইঁহার পরিণয় হওয়াতে সেই সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠতর ও মধুরতর হইয়াছিল। নানা স্থানে ইঁহার পারলৌকিক অনুষ্ঠান হয়; আমার পারিবারিক উপাসনামন্দিরেও পল্লীবাসীদিগকে লইয়া উক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা যায়। স্বর্ণলতা দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন; তাঁহার স্বামী তদবধি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন পূর্বক জ্ঞানানুশীলন, বিদ্যাদান ও ধর্মসাধন করিয়া জীবন কাটাইতেছেন।

৩। ১৯০৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব।

আমি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু জন্মভূমি টাঙ্গাইলে যাইয়া ব্রাহ্ম-সমাজের কোন কার্য করিতে পারি নাই। এবার নানা বিঘ্ন সত্বেও তথায় গমন করিলাম। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মথুরানাথ গুহ ও স্নেহাস্পদ বিনোদবিহারী সেন আমার সঙ্গী হইলেন। কলিকাতা হইতে কৃষ্ণকুমার সপরিবারে আসিলেন। শ্রদ্ধেয় চন্দ্রনাথ বাগচী, গুরুগোবিন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি টাঙ্গাইল অঞ্চলের অনেক ব্রাহ্ম উপস্থিত হইলেন। তখন আমার প্রীতিভাজন আত্মীয় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত টাঙ্গাইলে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার কুঠিতেই সকলে সাদরে গৃহীত হইলাম। এবারের উৎসব টাঙ্গাইলের বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। কয়েকদিন যেন ধর্মের একটী মহাতরঙ্গ বহিয়া যাইতেছিল। কৃষ্ণকুমারের বিদুষী কন্যা কুমারী কুমুদিনী ও বাসন্তী সুমধুর ব্রহ্মসঙ্গীত দ্বারা উৎসবটীকে আনন্দময় করিয়াছিলেন। টাঙ্গাইলবাসিনী মহিলাগণের মধ্যেও যথেষ্ট ধর্মোৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল। আমি টাউনহলে যুগধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলাম। দূরবর্তী গ্রাম হইতেও বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। আরও অনেক বক্তৃতা, উপাসনা ও নগরসংকীর্তন হইয়াছিল। এইবার নাগরপুরের জমিদার স্বর্গীয় যাদবলাল চৌধুরী মন্দিরে মহিলাদিগের জন্য একটী কোঠা প্রস্তুত করিতে পাঁচশত টাকা দান করেন। ভিত্তি স্থাপনের দিন তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই ব্রহ্মোৎসবের তৃতীয় দিবসে অমরবাবুর টেলিগ্রাম পাইলাম, তাঁহার কন্যা পারিজাত মরণাপন্ন, আমাকে তখনই চলিয়া আসিতে হইবে। ব্রাহ্মমণ্ডলী কিছুতেই ছাড়িলেন না। সেদিন মন্দিরে আমার উপাসনা করিবার কথা। আর দুইদিন পরে যাইব বলিয়া অমরবাবুকে টেলিগ্রাফ করা হইল। দুইদিন পরে উৎসবের শেষ দিনেই আমি চলিয়া আসিলাম।

পারিজাত আমার অতি স্নেহের পাত্রী ছিল; সে প্রায় তিন বৎসর কাল দুরন্ত জ্বর প্লীহা রোগে ভুগিতেছিল। তখন উদরে এক ভয়ানক বেদনা হয়, ডাক্তারগণ অস্ত্র করিতে চাহেন। আমার অনুপস্থিতিতে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে অমরবাবু অনিচ্ছুক হইয়াই আমাকে আসিতে টেলিগ্রাফ করেন। এখানে আসিয়া দেখিলাম, আর বড় দেরী নাই। "জ্যাঠামহাশয় এসেছেন," বলিয়া বালিকা সহাস্তে হাত বাড়াইয়া দিল। কয়েক দিন দিবারাত্র সমভাবে সেবাশুশ্রূষা করা গেল; কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল; সেই স্বর্গের

পারিজাত স্বর্গে চলিয়া গেল। বুঝিলাম, এ মর্ত্তভূমিতে পারিজাতের স্থান নাই! তাঁর মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হইল।

৪। ১৯০৬ সনের ১লা ফাল্গুন কলিকাতানিবাসী সুপরিচিত ব্রাহ্ম ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী সুকুমারীর সঙ্গে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথের শুভ পরিণয় কলিকাতা নগরে সম্পন্ন হইল। আমার পরিবারে এই প্রথম নববধূর আগমন। শ্রীমান সুরেন তখন বি. এ পর্যন্ত পড়িয়া জেলাস্কুলের শিক্ষক হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান উৎসবানন্দ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া ময়মনসিংহে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিল। এই সময় হইতেই সংসার-ভার ক্রমে ক্রমে পুত্রদের উপর দিয়া আমি অবসর গ্রহণ করিতেছিলাম।

জীবানন্দ

সুরেনের বিবাহের পরেই আমার পরিবারে একটী গুরুতর দুর্ঘটনা হয়। আমার ভগিনী শ্রীমতী সারদার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান জীবানন্দ লাহোরে থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিত। তখন চক্ষুর পীড়াবশত তাহার অধ্যয়ন স্থগিত ছিল, সে মামার বাড়ীতে কিছুদিন থাকিবে মনে করিয়া এখানে আসিয়াছিল। সে কখনও বঙ্গদেশ দেখে নাই। এদেশ তার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। কয়েকদিন আমার গৃহে অতি আদরে বাস করিল। আমরাও তাহাকে পাইয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। এমন সময়ে সহসা এরূপ দৈব দুর্ঘটনা হইল, যাহার শোক-স্মৃতি চিরদিন এ হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

১৯০৬ সালের ৩রা মার্চ পূর্বাহ্নে আমি স্কুলে যাইতেছি, বাহিরে জীবানন্দকে দেখিয়া বলিলাম, "তোমার মামী ভাত নিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, তোমরা স্নান করিয়া খেতে যাও।" ইহার এক ঘণ্টা পরে বাড়ী হইতে একটী লোক দৌড়াইয়া যাইয়া বলিল, "জীবানন্দ জলে পড়িয়া মারা গিয়াছে!" সহসা এই বজ্রপাতে সংজ্ঞাহারা হইতেছিলাম। ব্রহ্ম নাম স্মরণ করিয়া ধৈর্যাবলম্বন করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ গাড়ী করিয়া গৃহে আসিয়া দেখিলাম, সে সুন্দর তরুণ যুবক ধূলায় পড়িয়া আছে, ডাক্তারেরা সংজ্ঞা লাভের জন্ম বিবিধ চেষ্টা করিতেছেন, বাড়ীতে লোকারণ্য। শুনিলাম, জীবানন্দ স্নান করিতে যাইয়া পুকুরে ডুবিয়া যায়; সে সাঁতার জানিত না;

নিকটে কোন লোক ছিল না। তাহার মামীমা তাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন, গৌণ দেখিয়া সন্দেহ হইল; ঘাটে আসিয়া তাহার কাপড় ও চসমা দেখিয়া ভয় পাইলেন। তখনই জলে অনেক লোক নামিয়া পড়িল; ডাক্তার বিপিন বাবু তাহাকে তুলিয়া আনিলেন; তখন আর জ্ঞান ছিল না। আরও ডাক্তার আসিলেন, মানুষের যাহা সাধ্য করা হইল। কিন্তু সকলই বৃথা হইল। এই আকস্মিক কঠোর বজ্রাঘাত এত গুরুতর বোধ হইয়াছিল যে, পুত্র-শোকেও এত বিহ্বল হই নাই। আজও আমি সে দৃশ্য ভুলিতে পারি নাই। সে কথা মনে করিলেও হৃদয় অধীর হইয়া পড়ে। জীবানন্দের মামীমা এতই শোক-বিহ্বলা হইয়াছিলেন যে সেই দিনই রাত্রিতে তাঁহার ভেদ বমি আরম্ভ হয়। শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, ডাক্তারেরা তাঁকে নিয়া মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সেই দিন যে পীড়ার সঞ্চার হয় তাহাতেই তাঁহাকে এক রূপ জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপে নানা শোক দুঃখের ভিতর দিয়া এই ক্ষুদ্র জীবনে প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে।

"মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ, আপনার পানে চাই;
অন্তর-গ্লানি সংসার-ভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার, রাখিবারে যদি পাই।"

পেনশন গ্রহণ

মস্তিষ্কের পীড়া ক্রমেই বাড়িতে লাগিল; রোগশোকে কর্ম-শক্তি হ্রাস পাইয়া গেল। স্কুলের কার্য পূর্ববৎ সম্পাদন করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ৫৫ বৎসর পূর্ণ হইলেই অবসর গ্রহণ করিব, পূর্ব হইতেই সঙ্কল্প ছিল। ১৯০৫ সনে বঙ্গবিভাগের আন্দোলনে ছাত্র শিক্ষকে অনেক সময় নানারূপ সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। এখানে পুলিসের সঙ্গে ছাত্রদের যে বিবাদ হয়, তাহাতে অনেক কৌশল করিয়া ছাত্রদিগকে রক্ষা করিতে হইয়াছিল। অনেক ছাত্র শিক্ষক ও গুরুজনের অবাধ্য হইতেছিল; তাহারা পথে ঘাটে মাননীয় শিক্ষকদিগের অপমান করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তবে একথা বলা উচিত যে, ছাত্রগণ আমার প্রতি কোনরূপ অসম্মান দেখায় নাই বা আমার কথা অগ্রাহ্য করে নাই।

তখন শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বসু মহাশয় জেলাস্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া আসিয়াছেন ; তিনি এখানে নূতন লোক ; আমার প্রতিই অনেক বিষয়ে নির্ভর করিতেন। তৎকালে আমিই স্কুলের প্রাচীনতম শিক্ষক ছিলাম। এই স্কুলের সঙ্গে আমার একটা জীবনব্যাপী দুশ্ছেদ্য যোগ জন্মিয়াছিল। আমাকে আরও কিছুদিন কর্মে রাখিবার জন্য সকলেই অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন, এই সময়ে উপরের গ্রেডে প্রমোশনেরও আশা পাইয়াছিলাম ; কিন্তু আমি কিছুতেই থাকিতে পারিলাম না। সকলকে অনুনয় করিয়া বলিলাম, "আর মায়াপাশে বাঁধিবেন না।"

১৯০৬ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে, একই স্কুলে প্রায় ৩৫ বৎসর কর্ম করিয়া, স্নেহাস্পদ ছাত্র ও প্রীতিভাজন শিক্ষকদিগের নিকট হইতে সজলনয়নে চিরবিদায় গ্রহণ করিলাম। জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ যেখানে যাপন করিয়াছি, সুখে দুঃখে যাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে আবদ্ধ ছিলাম, সেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে কত কষ্ট হইয়াছিল, বলাই বাহুল্য। আমি এই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর নিকট বিশেষ ঋণী ও কৃতজ্ঞ। যখন যিনি হেডমাষ্টার ছিলেন, তিনিই আমার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। কোন গুরুতর কার্যই আমার পরামর্শ ভিন্ন সম্পন্ন হয় নাই। সহযোগী শিক্ষকগণের সঙ্গেও আমার বিলক্ষণ সখ্যভাব ছিল, একদিনের তরেও কাহারো সঙ্গে অপ্রণয় বা বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন অসৌহার্দ ঘটিলে আমাকেই তাহার মীমাংসা করিতে হইত। ছাত্র বিষয়েও আমি ভাগ্যবান ; জেলা স্কুলের কত কৃতী ছাত্র নানা স্থানে বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত আছেন ; বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, এমন কি সুদূর লাহোরে যাইয়াও দেখিলাম, আমার প্রিয় ছাত্রগণ সম্মানের সহিত কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন। আমার প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা প্রীতি দেখিয়া কতই না আনন্দ লাভ করিয়া থাকি! বস্তুত ইহাই আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ।

নবম অধ্যায়

(১৯০৬—১৯১৩)

স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসু

ভারতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, ময়মনসিংহের চির গৌরব, ব্রাহ্মসমাজের জয়স্তম্ভ, মহাত্মা আনন্দমোহনের পরিচয় আমরা আর কি লিখিব? ১৯০৬ সনের ২০শে আগষ্ট বাঙ্গালা ১৩১৩ সনের ৪ঠা ভাদ্র মহাত্মা আনন্দমোহন ইহলোক পরিত্যাগ করেন; ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের লিখিত তাঁহার স্বর্গারোহণ-চিত্র এই গ্রন্থে উধৃত করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক প্রেম প্রকাশ করিতেছি।

"১৮৯৮ খৃঃ অব্দে তিনি শেষবার ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার অভিনন্দন উদ্দেশে কলিকাতা টাউনহলে ২৬শে সেপ্টেম্বর যে মহতী সভা আহূত হয় তাহাতে উত্তর দিতে গিয়া তিনি সহসা মূর্চ্ছিত হন। তাঁহার সাংঘাতিক ব্যাধির এই প্রথম প্রকাশ। ইহার পরবর্তী আট বৎসর তাঁহাকে বহু বার মৃত্যুর সন্ধিস্থলে পতিত হইতে হইয়াছে। এই ঘটনার পর হইতে তিনি পরলোকে প্রস্থানের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইতেছিলেন। বিগত ১৯০৫ খৃঃ অব্দের ১১ই মাঘ প্রভাত হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যন্ত ব্রহ্মোৎসবে নিমগ্ন হইয়া ছিলেন। রোগ-ভগ্ন শরীরে এত দীর্ঘ সময় উৎসবক্ষেত্রে থাকিলে পীড়া বৃদ্ধি পাইবে, পরিজন এই আশঙ্কা প্রকাশ করিলে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে মাঘের উৎসব সম্ভোগ এই আমার শেষ, ইহার জন্য প্রাণ গেলে ক্ষতি কি?" তৎপরদিন ১২ই মাঘ পীড়া সংকট ভাব ধারণ করিল; প্রলাপ অবস্থায় কেবল এই কথা, "মা আমায় ডাকিতেছেন, আমায় এখানে ধরিয়া রাখিও না।" সেই বর্ষের ১৬ই অক্টোবরের স্মরণীয় দিনে অখণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তি স্থাপন উদ্দেশে যাত্রা করিবার পূর্বে, পরিবারস্থ সকলের নিকট সস্নেহে বিদায় লইলেন। মৃত্যুর একমাস পূর্বে যাহা করিয়াছেন, যাহা বলিয়াছেন, সমুদয়, অন্তিম দিন নিকটবর্তী স্মরণ করিয়া করিয়াছেন। মৃত্যুর জন্য এমন দিনে দিনে, পলে পলে প্রস্তুত হইতে আমি কাহাকেও দেখি নাই। বিগত ১৮ই আগষ্ট রাত্রিতে যথারীতি ভোজন করিলেন। তাঁহার পক্ষ

পরিজন সহিত সার্ধ দশ ঘটিকা পর্যন্ত প্রফুল্লমনে কথাবার্তা কহিলেন। পত্নীর নিকট জীবনের ভ্রম প্রমাদ ত্রুটির জন্য মার্জনা চাহিলেন। নিদ্রা যাইবার পূর্বে কর্মচারীকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমার মৃত্যু হইলেই তুমি সুরেন্দ্রনাথকে সর্বাগ্রে টেলিগ্রাম করিও।" ইহাই তাঁহার শেষ কথা। পরদিন প্রভাত হইলে দেখা গেল, তাঁহার সংজ্ঞা নাই। তিনি আমাদের অনেকবার বলিতেন, "প্রগাঢ় শান্তিতে আমি পৃথিবী হইতে বিদায় লইব।" তাহাই হইল। ২০ এ আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যা সার্ধ ছয় ঘটিকার সময় সূর্যের শেষ জ্যোতির সহিত তাঁহার আত্মাকে যখন ধীরে ধীরে এ জগতে অস্তমিত হইতে দেখিলাম, তখন শোক-স্তম্ভিত মন মথিত করিয়া এই প্রশ্ন উদিত হইল—এই কি মরণ?

"তাঁহার শোকে সংবাদপত্রে, সভামধ্যে, রাজপথে, অন্তঃপুরে যে ক্রন্দনধ্বনি উঠিয়াছিল লেখনী তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। অন্তিম শয্যা হইতে গঙ্গাতীর পর্যন্ত তাঁহার শবদেহের শশ্মান-যাত্রা কাব্যের এক করুণ অধ্যায় পূর্ণ করিবার যোগ্য। স্থানে স্থানে মহিলাগণের সভা, সর্বত্র ছাত্রগণের অধিবেশন ও বালকগণের কাতর রোদন, বালিকাগণের অশ্রুপাত আনন্দ-মোহনের প্রতি দেশের যে কি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছে। আমাদের হৃদয়ে যে দারুণ শেল বিদ্ধ হইয়াছে, কোন্ ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিব?"

আত্মকথা

বিষয়-কর্ম হইতে অবসর লইয়া বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবায় জীবন অর্পণ করিব, ইহাই আমার সংকল্প ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন প্রচারার্থ বরিশালে গিয়াছিলাম, তখন তথাকার ভ্রাতৃমণ্ডলীর আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাদিগকে ঐরূপ আকাঙ্ক্ষাই জানাইয়াছিলাম। এই সময়ে ঢাকায় পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর সূচনা হয়। আমি উহার অধিবেশনে প্রায়ই উপস্থিত থাকিতাম। সমবেত ব্রাহ্মগণ আমাকে সম্মিলনীর প্রচারকরূপে পাইবেন আশা করিতেন। একবার তাঁহারা দয়া করিয়া আমাকে সম্মিলনীর সভাপতি এবং অন্যবারে 'সেবক' পত্রের সম্পাদক মনোনীত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার নিত্যসঙ্গী মস্তিষ্কের পীড়া দিন দিন এরূপ

ভাব ধারণ করিতে লাগিল যে, অনেক সময় উপাসনা প্রার্থনা করা কিম্বা একাকী কোথাও যাওয়া অসম্ভব হইত। যখন একটু ভাল থাকিতাম তখনই যথাসাধ্য প্রচার কার্যে সহায়তা করিতে চেষ্টা করিতাম। রুগ্নদেহেও ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের কার্য সম্পাদনে বিরত থাকিতে পারি নাই। এতদ্ভিন্ন স্বাস্থ্য লাভের আশায় যখন যেখানে গিয়াছি তথাকার বন্ধুদের আগ্রহে সমাজের কার্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। পেন্‌শন গ্রহণের পরবর্তী সময়ের কয়েকটী ঘটনা যাহা মনে পড়িতেছে, সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিব।

রাঁচিতে তিন মাস

১৯০৭ সনের আশ্বিনমাসে সম্মিলনী হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার পৌত্র ও দৌহিত্রের (সুরেনের ও পুণ্যলতার ১ম পুত্রের) নামকরণ করিলাম। পৌত্রের নাম রণেন্দ্রনাথ এবং দৌহিত্রের নাম নিরঞ্জন রাখা হইল। এই সময়ে আমার সহধর্মিণী অতিশয় পীড়িতা ছিলেন। আমারও মাথার অসুখ বাড়িয়া একটি কর্ণ আক্রান্ত হইয়াছিল। রাঁচি জেলাস্কুলের হেডমাষ্টার আমার প্রীতিভাজন আত্মীয় শ্রীমান হরকান্ত বসুর পরামর্শে তথায় যাওয়াই স্থির করিলাম। কলিকাতায় আমার বৈবাহিক ডাঃ জে, এন, মিত্র মহাশয়ের গৃহে কয়েক দিন থাকিয়া রাঁচি যাত্রা করিলাম। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে পুরুলিয়া হইতে রাঁচি পর্যন্ত নূতন রেলপথ খুলিয়াছে মাত্র। আমরা উভয়েই রুগ্ন, সঙ্গে কেহ নাই; কোন কোন স্থানে কিছু সংকটেও পড়িয়াছিলাম। যাহা হউক, সেই চিরসহায় বিধাতার কৃপায় নির্বিঘ্নে রাঁচিতে পৌঁছিলাম। হরকান্তবাবু ও তাঁহার পত্নী আমার কন্যাস্থানীয়া কুসুমকুমারীর যত্নে ও স্নেহ-মমতায় তথায় তিনমাস কাল পরমসুখে বাস করিয়াছিলাম।

তখন রাঁচি ব্রাহ্মসমাজের বেশ উন্নত অবস্থা। তথায় দশটী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম পরিবার ছিলেন; সকলেই ধর্মোৎসাহী ও পদস্থ লোক। পেন্‌শন প্রাপ্ত হেডমাষ্টার বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, উকিলবাবু জয়কালী দত্ত ও সতীশচন্দ্র রায়, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত ও সুরেশচন্দ্র সরকার, প্রাচীন ভক্তব্রাহ্ম বাবু রামচরণ পাল, ডাক্তার বিহারীলাল বসু ও শ্রীযুক্ত রামলাল উপাধ্যায় প্রভৃতি সুপরিচিত ব্রাহ্মগণ এই সময়ে রাঁচিতে সপরিবারে

বাস করিতেছিলেন। অনেক সুশিক্ষিতা মহিলাও তথায় ছিলেন। তন্মধ্যে জয়কালীবাবুর পত্নী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। আমি যাইয়া দেখিলাম, তথায় যথেষ্ট আয়োজন আছে কিন্তু কেমন বিচ্ছিন্ন ভাব; কোন কার্যেই যেন প্রাণ নাই। কয়েক দিনে সকলের সঙ্গে বিশেষ আত্মীয়তা হইল। মাঘোৎসবের পূর্ব পর্যন্ত গৃহে গৃহে উপাসনাদি করা গেল; মন্দিরেও দুইবেলা উপাসনার ব্যবস্থা হইল। এবার রাঁচিতেই মাঘোৎসব সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। রাঁচির মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য, পাহাড়ে পাহাড়ে ব্রহ্মোপাসনা, ব্রাহ্মদিগের পবিত্র সঙ্গ, কন্যাদিগের আদর ও স্নেহমমতা স্মরণ করিলে এখনও অন্তরে আনন্দ জন্মে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বিষম শোকস্মৃতিতে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে।

মাঘ মাসের শেষ ভাগে দেশে ফিরিবার আয়োজন করিতেছি, এমন সময় আগরতলা হইতে দারুণ শোক-সংবাদ পাইলাম—আমার "রাজা" ৪ দিনের রক্তামাশয় রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই সেদিন তাহার নাম নিরঞ্জন রাখিয়া কত আহ্লাদ করিয়া আসিয়াছি, আজ এই ভয়ানক সংবাদ! এই শোকে পত্নীর পীড়া বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু বিধাতার বিধান মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করা ভিন্ন আমাদের বলিবার আর কি আছে? তাঁহার নামে শোক সম্বরণ করিয়া রাঁচি হইতে কুমিল্লায় চলিয়া গেলাম। তথায় কয়েক দিন থাকিয়া শোকাকুল পরিবারে সান্ত্বনা দিয়া কন্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলাম।

রাঁচির সঙ্গে আরও অনেক শোক-স্মৃতি জড়িত আছে। রাঁচি ব্রাহ্ম-সমাজের সে আনন্দবাজার অল্প দিন মধ্যেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রাঁচিতে যাঁহার অশেষ আদরযত্নে বিদেশও স্বগৃহের ন্যায় অনুভূত হইয়াছিল, বৎসর না যাইতে যাইতেই সেই স্নেহময়ী কন্যা কুসুমকুমারী একটী পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহারা মজঃফরপুরে ছিলেন। আমার কন্যা শান্তিলতা তথায় যাইয়া শিশুটীর ভার গ্রহণ করিল। ঈশ্বর-কৃপায় শিশুটী জীবিত আছে। তারপর ভক্তব্রাহ্ম রামচরণবাবু নানারূপ অশান্তিজনক ঘটনায় রাঁচি পরিত্যাগ করিয়া দারজিলিং যাইয়া সেখানেই চিরশান্তি লাভ করিলেন। ইনি আমাদের প্রতি অতিশয় অনুরাগী ছিলেন; আমরা দারজিলিং যাইয়া কিছুদিন তাঁহার গৃহে বাস করি, এজন্য কতই

আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। আর একটি শোক-স্মৃতি হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া আছে; আমাদের শ্রদ্ধেয় ধর্মবন্ধু বাবু শশিভূষণ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়দর্শন যুবক নলিনীভূষণ দত্ত স্বাস্থ্য লাভের জন্য রাঁচি গিয়াছিল, সে রুগ্ন দেহ লইয়াও মহোৎসাহে মাঘোৎসব করিয়াছিল; কিছুদিন পরেই শুনিলাম, সেই সুকুমার যুবক আর ইহধামে নাই। ইহার পরেই স্বনামখ্যাত পানীবাবু (গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত) ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ত্রৈলোকনাথ চক্রবর্তীর পত্নীও আর ইহধামে নাই, ইঁহার ন্যায় স্বাধীন প্রকৃতি রমণী আমি অল্পই দেখিয়াছি। এই রূপে যমতাড়নায় রাঁচির সে প্রেম-পরিবার ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

১৯০৮ সনের ২১শে আশ্বিন বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিমোহন দাস মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা কুমারী লাবণ্যপ্রভার সহিত আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান উৎসাবনন্দের শুভ পরিণয় কার্য ধুবড়ি নগরে সম্পন্ন হয়। শশীবাবু তথায় ডেপুটীকমিশনার আফিসের হেড ক্লার্ক। শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস ও বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল উপস্থিত থাকিয়া কার্য নির্বাহ করেন। আমরা একদল বরযাত্রী তথায় গমন করিয়াছিলাম। ধুবড়ির প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। এই সময়ে শশীবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র উৎসাহী যুবক শ্রীমান অক্ষয়কুমার গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া জাপান হইতে ফিরিয়া আসে; বৎসরাধিক কাল যথেষ্ট চিকিৎসাদির পর সে দিব্যধামে চলিয়া যায়। ইতিমধ্যে তাহার সেবা করিতে করিতে দ্বিতীয় পুত্র প্রিয়দর্শন যুবা শ্রীমান সরোজকুমার কলেরা রোগে সহসা প্রাণত্যাগ করে। এই বিশ্বাসী পরিবারের উপর দিয়া এইরূপ অনেক ঝড় বহিয়া গিয়াছে।

১৯০৯ সনের ২১শে জুলাই আমার বৈবাহিক কলিকাতার সর্বজন পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বহুমূত্র রোগে পরলোক গমন করেন। ইনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে সমাজের বহু হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজের কর্মিদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য পুরুষ ছিলেন। ইঁহার অভাবে সমাজের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে।

স্বর্গীয়া জ্ঞানদা দেবী

১৯১০ সনের ভাদ্র মাসে আমার কন্যাসম স্নেহপাত্রী ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের মহিলা উপাসিকাগণের অগ্রগণ্যা শ্রীমতী জ্ঞানদা দেবী সহসা পরলোক যাত্রা করিলেন। ইনি আমার প্রিয় ছাত্র এখানকার উকিল শ্রীমান পার্বতীচরণ দের সহধর্মিণী এবং ব্রাহ্মসমাজে পরিচিত ঢাকার বাবু শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয়ের সহোদরা। জ্ঞানদা হিন্দুপরিবারের কুলবধূরূপে বাস করিয়াও যেরূপ ধর্ম-কর্মে স্বাধীনতা ও ব্রহ্মোপাসনায় নিষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। মহা ঝড় বৃষ্টির দিনেও দেখিয়াছি জ্ঞানদা একখানি মোটা চাদরে শরীর আবৃত করিয়া ব্রহ্ম-মন্দিরের উপাসনাস্থলে বসিয়া আছেন। কত পরীক্ষা ও বিঘ্ন বাধার মধ্যে থাকিয়াও ইনি আপনার ধর্ম-বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন কোন বার মাঘোৎসব সময়ে দেখিয়াছি, শত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানদা আপনার বিছানা পত্র বাঁধিয়া কলিকাতায় ব্রহ্মোৎসব করিতে চলিয়া গিয়াছেন। পতির সঙ্গে ধর্ম কর্মে অমিল ছিল বটে, তথাপি জ্ঞানদা পতি-সেবায়, সংসার-ধর্মে এবং সন্তান পালনে সতীর আদর্শই রাখিয়া গিয়াছেন। একটি আত্মীয় হিন্দুবধূর প্রসব সময়ে জ্ঞানদা তাঁহার সেবার জন্য গিয়াছিলেন, সেখানেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন এবং কয়েক ঘণ্টা পরেই দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। জ্ঞানদার অভাবে ব্রাহ্মসমাজের কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলা অসাধ্য। জ্ঞানদার স্বামী হিন্দুমতেই পত্নীর শ্রাদ্ধাদির উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ (তাহারা সকলেই স্কুল ও কলেজের ছাত্র) কিছুতেই সম্মত হইল না। তাহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিল, আমাদের মা যাহা বিশ্বাস করিতেন না, আমরা সেরূপে তাঁহার শ্রাদ্ধ করিব না। আত্মীয় স্বজনেরা মহাব্যস্ত হইয়া তাহাদের মত পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বালকদিগের মনের দৃঢ়তা অটল রহিল। দশাহের দিনে সকলের ছোট দশ বৎসরের বালকটিকে বসাইয়া কোনরূপে পুরোহিত ঠাকুর মন্ত্র পড়িয়া গেলেন; কিন্তু তার পরেই সে বলিল, "আমার দাদারা যাহা করেন না, আমিও আর তাহার কিছুই করিব না।" তখন পার্বতীও বুঝিলেন, সন্তানদিগের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু করান উচিত নহে। তাঁহার নিজের মনও পরিবর্তিত হইয়া গেল। কলিকাতায় যাইয়া ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধ করাই স্থির করিলেন।

বিদেশ ভ্রমণ

সেই যে বিমলের বিবাহের সময় লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলাম, তার পর আর ওদিকে যাইতে পারি নাই। ১৯১০ সনের এপ্রিল মাসে আমার ভাগিনেয়ী কুমারী ভক্তিসুধা আমাদের বালিকাস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হইয়া আসিলেন। এবার আশ্বিনের বন্ধে তাঁহার সঙ্গে লক্ষ্ণৌ যাওয়া স্থির হইল। আমরা যেদিন কলিকাতায় পৌঁছিলাম, সেই দিনই জ্ঞানদার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল। ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয় আচার্যের কার্য করিলেন, আমি জ্ঞানদার জীবনের কয়েকটী কথা বলিয়া প্রার্থনা করিলাম।

লক্ষ্ণৌ যাইয়া কয়েকদিন ভগ্নীগৃহে অতি আনন্দে কাটাইয়া লাহোর যাত্রা করিলাম। লাহোর কলেজের অধ্যাপক গোপাল সিং চওলার পত্নী শ্রীমতী শকুন্তলা ভক্তিসুধার ছাত্রী। তাঁহাকে দেখিবার জন্যই ভক্তি তথায় গমন করেন, আমিও অমৃতসর দেখিবার বিশেষ ইচ্ছায় তাঁহার সঙ্গী হইলাম। লাহোরে উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের গৃহে কয়েকদিন অতিশয় আদরযত্নে বাস করিয়াছিলাম। আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান রোহিণীকুমার সেনের সঙ্গে তথাকার দ্রষ্টব্য কয়েকটী স্থান দেখিয়াছিলাম। ঐ সময়ে লাহোর ব্রাহ্ম-সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইতেছিল। অনেক ধর্মোৎসাহী ব্রহ্মোপাসকের সঙ্গ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। তথাকার সেবাপরায়ণ ত্যাগশীল ব্রাহ্ম শ্রদ্ধেয় অবিনাশবাবুর গৃহে একদিন বাঙ্গালায় উপাসনা করিলাম। অবিনাশ বাবুর কন্যা কুমারী হেমলতা নারী জাতির কল্যাণের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়া তথায় যে সকল কার্য করিতেছেন, তাহা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। এখানে শ্রদ্ধেয়া সরলা দেবীর সঙ্গে দেখা হইল। ময়মনসিংহ টাউনহলে তাঁহার অভ্যর্থনা সভায় আমি সভাপতি ছিলাম, আমাকে দেখিয়াই সে কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি বঙ্গের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দেখিলাম এই মনস্বিনী বঙ্গকন্যার হৃদয়টী এখনও স্বদেশের মঙ্গল-গৃহেই পড়িয়া আছে। লাহোর হইতে অমৃতসরে যাই। এখানে একদিন মাত্র ছিলাম। গুরুদরবার দেখিয়া বহুদিনের সাধ পূর্ণ হইল। সমস্ত দিন যেন ধর্মোৎসাহের মহা তরঙ্গে ভাসিতেছিলাম। এখানকার অনেক কথাই মনে পড়িতেছে, কিন্তু আর লিখিবার শক্তি নাই।

১৯১১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীমতী সারদা তাঁহার পাঁচটী কন্যা সহ আসিয়া

কিছু দিন আমার গৃহে ছিলেন। এই সময়ে আমার চতুর্থ ভাগিনেয়ী শ্রীমতী প্রমীলা বি, এ পাশ করিয়াছেন খবর আসিল। প্রমীলা এফ, এ, পাশের পর হায়দরাবাদে কর্ম করিয়া পরিবার প্রতিপালন ও ভগিনীদের শিক্ষার সহায়তা করেন। ভক্তিসুধা বি, এ, পাশ করিয়া কর্ম লইলে প্রমীলা পাঁচ বৎসর পরে আবার কলেজে ভর্তি হইয়া বি, এ পাস করিলেন। এইবার আশ্বিন মাসে আমি সস্ত্রীক দারজিলিং যাইব স্থির করিলাম। শ্রীমতী সারদা এবং ভক্তিসুধাও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। ২৭এ সেপ্টেম্বর দারজিলিং পৌঁছিলাম, তখনই ব্রহ্মমন্দিরে যাইয়া রাজর্ষি রামমোহন রায়ের স্মৃতি-সভায় আমাকেই সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে হইল। এবার পৃথক বাড়ী ভাড়া করিয়া দারজিলিংএ এক মাস অবস্থিতি করিয়াছিলাম। বাবু শশীভূষণ দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্ম বন্ধুগণ এবং আমার প্রিয়ছাত্র শ্রীমান দেবেন্দ্র প্রসাদ দাস আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মস্তিষ্কের পীড়া বাড়িয়া যাওয়াতে শরীরসম্বন্ধে কোন উপকার হয় নাই। তবে দারজিলিংএর স্বভাব-শোভা ও সজ্জনগণের সঙ্গগুণে মনের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল।

অগ্নিপরীক্ষা

কলেজ উঠিয়া গেলে বালিকাবিদ্যালয়ের জন্যই আমাকে অধিক খাটিতে হইত। এই সময়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম-গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। তৎকালীন ডিরেক্টর মাননীয় সার্প সাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার অনেক কথাবার্তা ও পত্রাদির ব্যবহার হইয়াছিল। আমার প্রস্তাবেই এ প্রদেশের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালিকাদিগের জন্য বিশেষ-বৃত্তির ব্যবস্থা হয়। গবর্ণমেণ্ট আমাদের স্কুলটী গ্রহণ করিয়া উহাকে একটী আদর্শ উচ্চ বালিকা স্কুলে পরিণত করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, ১৯০৮ সনের মার্চ মাসে স্কুলটী গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদত্ত হয়। (১) গবর্ণমেণ্ট সর্বদাই ইহাকে হাই স্কুল রাখিবেন, (২) একটি স্থানীয় কমিটী দ্বারা স্কুল পরিচালিত হইবে, এবং (৩) যদি কখনও স্কুল উঠিয়া যায় তবে তৎকালের সমস্ত সম্পত্তি এই জেলায় স্ত্রীশিক্ষা কার্যে ব্যয় হইবে,—প্রধানত এই তিনটী সর্তে স্কুল প্রদত্ত হইল। বাড়ী, জমি ও গভর্ণমেণ্ট-পেপার প্রভৃতিতে

প্রায় ৩০ ত্রিশ হাজার টাকার সম্পত্তি আমরা গবর্ণমেণ্টের হাতে দিলাম। সহরের অনেক লোক এই কার্যের বিরোধী ছিলেন। কমিটীর সভ্যগণও একমত হইতে পারেন নাই। গত ৩০ বৎসর কাল যেরূপ ক্লেশ বহন করিয়া স্কুলটী চালাইতে হইয়াছে এবং দিন দিন যেরূপ অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক হইতেছে, তাহাতে অতঃপর আর ইহাকে সাহায্যকৃত স্কুল রাখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যাঁহারা নারীজাতির উচ্চ শিক্ষারই আবশ্যকতা বোধ করেন না, তাঁহাদিগকে সে অবস্থার কথা বলিয়া ফল কি? তাঁহারা তো এরূপ আদর্শ স্কুলের কোন প্রয়োজনই দেখিতে পান নাই; সুতরাং আমাদের কার্য কিরূপে সমর্থন করিবেন?

স্কুলের ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল। সার্প সাহেব কেবল শিক্ষয়িত্রী দ্বারাই স্কুল চালাইবেন সঙ্কল্প করিয়া কার্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পুরাতন বাড়ীতে আর স্থান হয় না। গবর্ণমেণ্টের নিকট গৃহাদির জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করা গেল, ফল হইল না। ইতিমধ্যে মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ দাতা জগৎকিশোরবাবুর মাতৃবিয়োগ হইল; তাঁহার স্মরণার্থ কোন সৎকার্য করিতে জগৎবাবুর ইচ্ছা আছে জানিয়া আমাদের স্কুলের জন্য তাঁহাকে ধরা গেল। ময়মনসিংহের জনপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট ব্ল্যাকউড সাহেব আমাদের প্রধান সহায় হইলেন। জগৎবাবু ৫০ হাজার টাকা দিয়া স্কুলের বাড়ী করিয়া দিবেন, স্কুলের নাম "বিদ্যাময়ী বালিকা শিক্ষালয়" হইবে স্থির হইল। যেই এই সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হইল, অমনি চারিদিকে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। বৈকুণ্ঠবাবু এই টাকা কলেজে দেওয়ার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ধরিয়া বসিলেন। ওদিকে মহাকালী পাঠশালার পরিচালকগণ এই টাকা তাঁহাদিগকে দিবার জন্য সহরের গণ্যমান্য লোক লইয়া জগৎবাবুকে অনুরোধ করিতে গেলেন। মহাকালীতে দিলেই হিন্দু সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হইবে, বিদ্যাময়ীর আত্মার তৃপ্তি হইবে, সকলের মুখেই এই কথা শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে—আলেকজাণ্ডার বালিকা স্কুল কয়েকটী ব্রাহ্মের জন্য, উহা দ্বারা হিন্দু সমাজের কোন উপকার নাই; ওখানে বিজাতীয় শিক্ষা হয়, হিন্দুর অর্থ উহাতে ব্যয় হইতে পারে না—ইত্যাদি নিন্দা চর্চার আর অবধি রহিল না! কিন্তু মহামনা জগৎকিশোর কিছুতেই বিচলিত হইলেন না; তাঁহার বাক্য অপরিবর্তিত রহিল।

তারপর আর এক বিভ্রাট উপস্থিত। স্কুলের জন্য ৪।৫ বিঘা জমির আবশ্যক; মুক্তাগাছার স্বর্গীয় কেশববাবুর পুরাতন বাসা এবং আনন্দমোহন বসু মহাশয়দের একটি স্থান স্কুলের সংলগ্ন; কয়েকটী ভদ্রলোক তথায় বাস করিতেছিলেন। ঐ স্থান স্কুলের জন্য গ্রহণ করা স্থির হইল। ইহাতেও কম আন্দোলন হয় নাই। পরিশেষে ঐ স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ কালেক্টরীর সেরেস্তাদার কৃষ্ণকুমারবাবুকে ধরিলেন। তিনি অতি বুদ্ধিমান ও কৌশলী লোক; তাঁহার গোপন চেষ্টায় স্থির হইল, বর্তমান স্কুল-বাড়ী জগৎকিশোরবাবু ২৫ হাজার টাকায় ক্রয় করিবেন, মোট ৭৫ হাজার টাকায় সহরের বাহিরে মুসলমান পল্লীতে বালিকা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবে। তথায় যথেষ্ট খোলা জমি পাওয়া যাইবে, সুতরাং সাহেব খুব খুসী হইয়াছেন। আমরা এই সাংঘাতিক প্রস্তাবের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারি নাই। এক দিন সাহেব খবর পাঠাইলেন, তিনি বালিকা স্কুলের নূতন জায়গা দেখিতে যাইবেন, আমি ও নবকুমার যেন প্রাতে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হই। সহসা এই সংবাদ পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম এবং তখনই সহরে বাহির হইয়া পড়িলাম। একজন বন্ধুর মুখে কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া এবং সেরেস্তাদার মহাশয়কে ইহার মূল জানিয়া সেই রাত্রিতেই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। কথায় কথায় সকলই বাহির হইয়া পড়িল। যদি আমরা ভদ্রলোকদের বাসাগুলি ছাড়িয়া দেই, তবে বালিকা বিদ্যালয় স্বস্থানে থাকিতে পারে। সর্বসাধারণের পক্ষেও তাহাই বাঞ্ছনীয়, একথাও তিনি স্বীকার করিলেন।

পরদিন প্রাতে আমি নবকুমারকে সঙ্গে লইয়া সাহেবের কুঠিতে গেলাম। তথায় শ্যামাচরণবাবু ও কালীশঙ্করবাবু উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে সব জানাইয়া আমাদের সঙ্গী করিলাম। সহৃদয় ব্ল্যাকউড সাহেব সকল অবস্থা বুঝিয়া কালীশঙ্করবাবুর দৃঢ় প্রতিবাদ শুনিয়া তাঁহার মত পরিবর্তন করিলেন। তৎপরে বলিলেন, "জগৎবাবুর কর্মচারী দুর্গাপ্রসাদবাবু আমার নিকট আসিয়া সব ঠিক করিয়া গিয়াছেন, সেদিকে চেষ্টা করা আবশ্যক।" আমি বলিলাম, "সে ভার আমার উপর রহিল; আপনি সেরেস্তাদারবাবুকে প্রতিনিবৃত্ত করুন।" সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "তজ্জন্য ভাবিতে হইবে না।" সুকৌশলী প্রতিপক্ষ এবার যে চাল চালিয়াছিলেন, ইহা সফল হইলেই তাঁহাদের কামনা পূর্ণ হইত; এতদিনে স্কুলের অস্তিত্ব থাকিত না। কিন্তু

সর্বোপরি যে এক মহাকৌশলী নিয়ত কল ঘুরাইতেছেন, অবোধ আমরা তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে চাই না!

গবর্ণমেণ্ট জগৎবাবুর দান গ্রহণ করিলেন, সকল সর্ত ঠিক হইয়া গেল, জমিও গৃহীত হইল। ইহাতে প্রায় একবৎসর সময় লাগিল। এই সকল কার্যে এবং আলেকজাণ্ডার নাম পরিবর্তন করিতে বহু বিঘ্ন বাধা ঘটিয়াছিল, অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলেন, পাঁচজন মহিলা ও পাঁচজন পুরুষ লইয়া নূতন স্কুলকমিটি হইবে। পুরুষ পাঁচজনের মধ্যে স্কুল-ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর ও মুসলমান ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিবেন। সুতরাং পূর্বতন সভ্যগণের তিনজন মাত্র থাকিতে পারেন। একদিন কমিটীতে সাহেব এই সংবাদ জানাইয়া কি করা যায় জিজ্ঞাসা করিলেন। উপস্থিত সকলেই বলিলেন, আপনিই লোক নির্বাচন করিবেন, তবে শ্রীনাথবাবুকে অবশ্যই রাখিতে হইবে। যাঁহারা নানা সঙ্কট সময়ে স্কুলের জন্য অনেক খাটিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলের নাম রহিত হইল। ইহার পূর্বেই অভিজ্ঞ হেডমাষ্টার নবকুমার বাবুও চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমার কাজ ও দায়িত্ব বাড়িয়া গেল। এই কমিটীর পরিবর্তনেও কাহার কাহার মন স্কুলের প্রতি বিরূপ ভাব ধারণ করিল।

এদিকে নবাগত শিক্ষয়িত্রী ও বোর্ডিংবাসিনী ছাত্রীগণ স্বাধীনভাবে বাহিরে ভ্রমণ ও সভা সমিতিতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কুমারী ভক্তিসুধা টাউনহলে দুই একটী বক্তৃতাও করিলেন। ইহাতেও অনেকে চটিয়া গেলেন! অতঃপর আর তাঁহাদের কন্যাদিগকে ঘরে রাখা সম্ভব হইবে না বলিয়া চারিদিকে আতঙ্ক বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশ্য ভদ্রলোকেরা মতামত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু কোন কোন প্রকৃতির লোক নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিল। রাত্রিতে ভয় প্রদর্শন, কুৎসা প্রচার ও জঘন্য বেনামী পত্র লিখিয়া স্কুলের ক্ষতি করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল।

বিধাতার কৃপায় তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল দেখিয়া তাহারা আরও ক্ষেপিয়া উঠিল এবং আমাকেই সর্বমূলাধার মনে করিয়া স্কুলের সঙ্গে যাহাতে আমার সংস্রব না থাকে, তজ্জন্য স্বতঃপরত অশেষবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহাতে আমরা লোক-সমাজে অপমানিত ও অপদস্থ হই, এরূপ

ঘৃণিত পন্থা অবলম্বনেও কুণ্ঠিত হইল না। সে সকল দুঃখের কথা আর স্মরণ করিব না! তাহাদের দুশ্চেষ্টা হইতেও বিধাতা মঙ্গল ফলই উৎপাদন করিয়াছেন। কিন্তু উহারা জানে না যে, নিরর্থক হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে যাইয়া অন্যের কতখানি অনিষ্ট করিয়াছে; প্রাণাপেক্ষা মূল্যবান সুনামের হানি করিতে যাইয়া অনপকারী ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে কি কঠোর আঘাত করিয়াছে! ভগবান তাহাদের এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জনা করুন, তাহাদের মঙ্গল হউক।

এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যেই ১৯১২ সনের মাঘোৎসব সম্পন্ন হইল। ইহাই আমার জীবনের শেষ মাঘোৎসব। ইহার স্মৃতি আগ্নেয় অক্ষরে হৃদয়ে মুদ্রিত রহিয়াছে! একদিকে শরীর মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, চারিদিকে পরীক্ষার অগ্নি জ্বলিতেছিল, ইহার মধ্যে উৎসব করিতে হইল। উৎসবের উদ্বোধন হইতে শান্তিবাচন পর্যন্ত প্রধান প্রধান কার্যভার আমাকেই বহন করিতে হইল। ১১ই মাঘ ময়মনসিংহ ব্রহ্ম-মন্দিরের বেদীতে বসিয়া এই আমার শেষ উপাসনা। মাঘোৎসব করিলাম বটে, কিন্তু প্রাণের অবস্থা বাধ্য হইয়া ঢাকিয়াই রাখিতে হইল। অগ্নি-গর্ভ পর্বতের বহির্দেশ যেমন শ্যামল তরুলতায় আবৃত থাকে, কিন্তু তাহার অভ্যন্তর দারুণ উত্তাপে দগ্ধ হয়, তাহা কেহ জানে না, কেহ দেখিতে পায় না, আমার অবস্থাও সেইরূপই হইয়াছিল।

মাঘোৎসবের মধ্যেই দেখা গেল নানা কারণে আমাদের ক্ষুদ্র মণ্ডলীর মধ্যে অশান্তি ও অপ্রেমের সঞ্চার হইয়াছে; এবং যাঁহাদের কথায় লোকের আস্থা জন্মিতে পারে, এমন কোন কোন পদস্থ ব্যক্তিও নানারূপ বিপক্ষতা করিতেছেন। ইহা দমনের জন্য, বিশেষত যে সকল কন্যার সম্মান রক্ষার ভার আমাদের উপরে রাখিয়া তাঁহাদের অভিভাবকগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাঁহাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য, উপযুক্ত প্রতীকার করা আবশ্যক বোধ হইয়াছিল; তজ্জন্য কিছু চেষ্টা করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এমন সময় একদা রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলাম, একজন মহাপুরুষ বলিতেছেন, "চল্লিশ বৎসর নীরব থাকিয়া আজ আপনার ভার আপনি লইতে চাও? এতকাল পরে আপনাকে সমর্থন করিতে লজ্জা বোধ হইল না?" অতঃপর তিনি সেই সর্ববিদিত পৌরাণিক গল্পটী বলিলেন, "একজন সাধকের প্রতি লোকে বিষম

উৎপীড়ন করিতেছিল, ভক্ত-বৎসল ভগবান তাঁহার রক্ষার জন্ত অগ্রসর হইলেন; কিন্তু ক্ষণপরেই ফিরিয়া আসাতে লক্ষ্মী কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলেন, 'না, আমাকে আর দরকার হইল না; সে আত্মরক্ষার ভার নিজেই লইয়াছে।' সাধক সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যাচারীদিগকে ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন!" জাগিয়া আমার বড় লজ্জা বোধ হইল। ধর্মবন্ধু চন্দ্রমোহনবাবুকে এই স্বপ্ন-বিবরণ বলিলাম; অতঃপর সকল বিচারের ভার ভগবানের চরণে ও মণ্ডলীর হস্তে রাখিয়া নিজে একেবারে নীরব হইয়া গেলাম। কোথাও পড়িয়াছিলাম, "বিপদ যেমন অগ্নিকুণ্ড, তেমনি টাঁকশাল।"

যে সকল পরদুঃখকাতর হিতৈষী বন্ধু এবং পুত্রতুল্য স্নেহাস্পদ ব্যক্তি এই দুঃসময়ে অযাচিতরূপে আমার জন্য খাটিয়াছেন, এবং অশেষ প্রকার সহায়তা করিয়া আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন, আন্তরিক প্রেম ও কৃতজ্ঞতা ভিন্ন তাঁহাদিগকে দিতে পারি, আমার এমন আর কি আছে? ভিন্ন সমাজের লোক বলিয়া যাঁহাদিগকে একটু পর পর মনে করিতাম, এই সঙ্কট সময়ে তাঁহাদের কাছেই অধিকতর সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছি।

এই জীবনে অনেক অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু এরূপ আর হয় নাই। ইহা দৃশ্যত আমার প্রতি হইলেও কার্যত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতিই কঠোর আক্রমণ! আক্ষেপের বিষয় এই, ব্রাহ্মসমাজ এই সংগ্রামে পূর্ববৎ বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বিপক্ষের "ভেদনীতি" সফল হওয়াতেই এই দুর্বলতা ঘটিয়াছে এবং এজন্য ব্রাহ্ম-সমাজের কার্যে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিতে অনেক সময় লাগিবে। আমরা তো কর্মক্ষেত্র হইতে চিরবিদায় লইয়া সকলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া শেষদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি; এখন ভগবানের কৃপায় তাঁহার কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতর লোকের সমাগম হউক, পরবর্তিগণ সবল হস্তে তাঁহার পতাকা ধারণ করুন; আমরা নিভিয়া যাই, ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার প্রেমের অগ্নি প্রজ্বলিত হউক।

"প্রেম রাজ্য অবতীর্ণ হইবে ধরায়,
অব্যর্থ ঈশ্বর-বাণী কভু মিথ্যা নয়"।

রোগশয্যায়

১৯১২ সনের ৩রা জুন মাধ্যাহ্নিক আহার নিদ্রার পরে এই গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়ের "চন্দ্রপ্রভা" প্রস্তাবটী লিখিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া চন্দ্রমোহন বাবুর বাড়ীতে গেলাম। কেহ ঘরে নাই দেখিয়া ফিরিতেছি, এমন সময়ে চারিদিকের গাছপালা জীবজন্তু যেন এক বার আকাশে উঠিতেছে, আর এক বার ভূপৃষ্ঠে পড়িতেছে এমনই দেখিতে লাগিলাম ; শরীর কাঁপিয়া উঠিল, তৃণ-শয্যায় বসিয়া পড়িলাম। দূর হইতে কন্যাগণ আমার অবস্থা দেখিয়া দৌড়াইয়া আসিল, শয্যা করিয়া শোয়াইল, তার পর অচেতন হইয়া গেলাম। প্রীতিভাজন ডাক্তার বিপিনবিহারী সেন ও অন্যান্য প্রতিবেশীগণ আসিলেন। চিকিৎসা সেবায় একটু সুস্থ হইলে সকলে ধরাধরি করিয়া গৃহে আনিলেন। সেই দিন হইতে মাথা একেবারে অকর্মণ্য, শরীর স্থবির এবং শিশুর ন্যায় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। আশ্বিন পর্যন্ত এখানে চিকিৎসা হইল ; এই সময়ে ভাগিনেয় বিমলচন্দ্র (Dr. B. C. Ghosh M. A. M. B, CH. B.) আসিয়া নূতন ঔষধ দিলেন। একটু সবল বোধ করিলেই তাঁহার এবং সন্তানদের বিশেষ আগ্রহে স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিবার জন্য ২৫শে কার্তিক সপরিবারে বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। আমার বড় মেয়ে শান্তিলতা তাহার পুত্রের স্বাস্থ্যের জন্য ইতিপূর্বেই ঘাটশীলা নামক স্থানে বাস করিতেছিল. আমরাও কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিয়া তথায় গমন করিলাম। ঘাটশীলা স্থানটী বড় সুন্দর ; চারিদিকে পাহাড় ও বিস্তৃত মাঠ; অদূরে সুবর্ণরেখা নদীর নির্মল স্রোত বহিয়া যাইতেছে, খুব নির্জন এবং আরামজনক। কয়েক দিনেই শরীর মনে বেশ একটা পরিবর্তন বোধ হইল। কিন্তু এখানে লোকজন নাই, খাদ্য দ্রব্যও অতি দুর্লভ। এরূপ স্থানে স্ত্রীলোক ও শিশুদের লইয়া রুগ্নদেহে বাস করা অসম্ভব দেখিয়া কটকে যাওয়াই স্থির করিলাম। শ্রীমান সুরেনও আমাদিগকে এরূপ স্থানে রাখিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে ইতস্তত করিতেছিল।

কটক—উড়িষ্যার রাজধানী কটক নগর স্বাস্থ্যকর স্থান। নগরের দুইদিকে দুইটী প্রশস্ত নদী প্রবাহিত। উত্তরে মহানদী, দক্ষিণে কাটজুড়ী। কাটজুড়ীর তীরেই বাঙ্গালীদিগের বসতি অধিক। উড়িষ্যাবাসী শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথ কর মহাশয় এখানকার সর্বজন পরিচিত ব্রাহ্ম ; তিনি এবং আমার পূর্বপরিচিত ও পরম প্রীতিভাজন বাবু সনতকুমার বসু আমাদের জন্য বাড়ী

ঘর চাকর বাকর সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহায়তাতে এবং অন্যান্য ব্রাহ্ম বন্ধুগণের আদর যত্নে দুই মাস অতি সুখেই কাটাইয়াছি। আমরা ২রা ডিসেম্বর কটক যাই। দুই একদিন পরেই তথাকার সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ব্রাহ্ম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও মহাশয় আমাকে দেখিতে আসেন। এই সময়ে আমাদের শাস্ত্রী মহাশয়ও স্বাস্থ্যলাভের জন্য কটকে ছিলেন। তিনিও দয়া করিয়া একদিন আমাকে দেখিতে আসিলেন। ইঁহাদিগকে দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কিন্তু ইহার কয়েকদিন পরেই শ্রদ্ধেয় মধুবাবু গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত হইলেন এবং দুই সপ্তাহ মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজের একজন শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় ব্যক্তি। লোকে ইঁহাকে উড়িষ্যার বিদ্যাসাগর বলে। তাঁহার জন্য কটকের সকল শ্রেণীর লোকেই শোকাকুল হইয়াছিল।

এবার কটকেই মাঘোৎসব করা গেল। আমি ১১ই মাঘ দুই বেলা মন্দিরে যাইতে পারিয়াছিলাম মাত্র। ১লা মাঘ আমাদের গৃহে উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম; ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণ উপস্থিত হইয়া সুখী করিয়াছিলেন। তখন আর সমাজের কোন কাজ করিবার ক্ষমতা ছিল না। প্রত্যহ দুইবেলা কাটজুড়ি তীরে ভ্রমণ করিতাম; সেই সময়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও নির্জনতার মধ্যেই উপাসনা হইত; কত নব নব ভাবে প্রাণ পূর্ণ হইত। তখনকার বিশেষ ভাব ও জীবনের অবস্থা নিম্নলিখিত সঙ্গীতটীতে প্রকাশ পাইবে;—

(কটক—কাটজুড়ির তীরে, ২৫শে পৌষ—১৩১৯)

(দেখ) প্রেম নদী বহিয়া যায় সাগরে।
যায় ছুটে, যায় চলে, যায় সাগরে।
আকুল হইয়ে ধায়, অকুলের পথে,
পাপ তাপ ভবের জ্বালা যায় তার সাথে।
ছোট ছোট কত নদী মিশে জলে তার,
জাতি কুল হারাইয়া হয় একাকার।
যত যায় তত দেখি কুল কিনারা নাই,
তরঙ্গে ডুবিয়া গেলে দুকূল হারাই।
কত মরুভূমি ডুবে গেল তবু না ফুরায়,
যুগে যুগে প্রেম-গঙ্গা পাতকী তরায়॥

পুরী—আমরা ইতিপূর্বে সমুদ্র দেখি নাই। সকলেই সমুদ্র দেখার জন্ম ব্যস্ত হইলাম। ১লা ফেব্রুয়ারী প্রেমাস্পদ সনতবাবুকে সঙ্গে লইয়া "প্রভু জগন্নাথ, মন্‌মে লাগাও প্রেমডুরি" এই গান গাহিতে গাহিতে পুরীধামে উপনীত হইলাম। অতি প্রত্যুষে সমুদ্র দেখিতে ছুটিলাম। সে শোভার কি বর্ণনা আছে? না সে দৃশ্যের কোন তুলনা মিলে? হে অনন্তপ্রসারিত উত্তাল-তরঙ্গসঙ্কুল নীলাম্বু, তুমিই কেবল তোমার উপমা! আমার মনে হইল যেন হঠাৎ একটা প্রবল ঝড়ে চারিদিকের আবেষ্টনী যবনিকা উড়িয়া গেল, পুরো-ভাগে অনন্তের বিশাল সুনীল রাজ্য সহসা প্রসারিত হইয়া ক্ষুদ্রদৃষ্টি ও সংকীর্ণচিত্তকে একেবারে বিহ্বল করিয়া ফেলিল! মনে হইল, যেন এতদিন বিশ্বমাতার অন্তঃপুরে বাস করিতেছিলাম, আজ সহসা বিশ্বভুবনপতি রাজরাজেশ্বরের উন্মুক্ত সভাতলে আসিয়া বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইলাম! অদূরে জগন্নাথের বিশাল মন্দির, গম্ভীরভাবে ত্রিকালদর্শী বিরাট পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান। তখন মনের সকল গ্লানি ও কণ্ঠের সকল দুর্বলতা ভাসিয়া গেল, হৃদয় প্লাবিত করিয়া এই মহাসঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইল :—

কীর্তন

পুরী—সমুদ্রতটে ; ২০ মাঘ—১৩১৯

(সুর—ভাইরে কি মধুর নাম)

আয় ভাই প্রেমে ডুবে যাই।
তরঙ্গে ঝাঁপিয়া পড়ি, ভুলিয়ে সাঁতার রে,
ঢেউ খেয়ে জীবন জুড়াই ॥
কত দুঃখ কত জ্বালা, সংসারের ধূলাখেলা,
বাসনা-অনলে জ্বলে প্রাণ পুড়ে যায় রে,
এ যাতনা কে বুঝিবে হায় ;
ঐ শোন প্রেম-জলধি, ডাকিতেছে নিরবধি,
তরঙ্গ তুলিয়ে ডাকে, কে জুড়াবি আয় রে,
দুঃখী ধনী ভেদাভেদ নাই ॥

প্রেমসাগরের তীরে, বিশাল বিশ্বমন্দিরে,
জগবন্ধু ভক্তি-অন্ন জগতে বিলায় রে,
প্রেমের হাট লেগেছে ধরায় ;
প্রভুর প্রসাদ পেলে, আপনারে যাই ভুলে,
আনন্দ-বাজারে তাই জাতি কুল নাই রে,
সবে মিলে হরিগুণ গাই ॥

পুরীতে মাত্র তিন সপ্তাহ ছিলাম। আমি দিনের অধিকাংশ সমুদ্রতটেই যাপন করিতাম। দুইদিন শ্রীমন্দির এবং একদিন আমাদের গোস্বামী মহাশয়ের সমাধি-মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। পুরী-প্রবাসী আমার স্নেহাস্পদ ভাগিনেয় শ্রীমান উল্লাসচন্দ্র ঘোষ অতি আদর যত্নে তাঁহার গৃহে রাখিয়া আমাদের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। পুরীতে শ্রীমানের বেশ সুনাম আছে জানিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি।

অতঃপর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমান বিমলের গৃহে ভগিনী সারদা এবং স্নেহের ভাগ্নী কুমারী আমোদিনীকে পাইয়া সুখী হইলাম। তখন আমোদিনীর শুভ-পরিণয় সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, তদুপলক্ষে যেদিন উপাসনার আয়োজন হইল, সেই দিনই আমি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলাম। ৮ দিন পরে জ্বর ছাড়িল, কিন্তু পুরাতন বন্ধু মস্তিষ্কের পীড়া আবার নূতন আকারে প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করিয়া দেখা দিল। ২৪ দিন তথায় চিকিৎসাদি হয়। একটু বসিতে সমর্থ হইলেই বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম। তখন ময়মনসিংহের জন্য মন অতিশয় অস্থির হইয়াছিল। "আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি" পরমেশ্বরের চরণে কাতরে এই প্রার্থনাই করিতেছিলাম।

এই রোগ-যন্ত্রণা ও পরীক্ষা বিপদের মধ্যে একটী আনন্দের সংবাদে আমার হৃদয়ে অতুল তৃপ্তি লাভ হইয়াছে। এবার আমার তৃতীয়া কন্যা ভক্তিলতা বি, এ, চতুর্থ কন্যা লাবণ্যলতা আই, এ এবং কন্যাতুল্যা প্রীতিলতা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। আমার ক্ষুদ্র পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার এই শুভ ফল আমি যে প্রত্যক্ষ করিয়া যাইতে পারিলাম, এজন্য বিধাতার চরণে বার বার প্রণাম করি। বাঞ্ছা-কল্পতরু তাঁহার নাম, তিনি কতরূপেই মানুষের সাধ পূর্ণ করেন!

বিষবৃক্ষে অমৃত ফল

"বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
দুঃখ নয়, সে দয়া তব, জেনেছি মা দুঃখ-হরা।"

সম্পূর্ণ একটি বৎসর অসহায় শিশুর ন্যায় রোগ-শয্যায় পড়িয়া আছি। নানা ঘটনায় মনে শান্তি নাই, প্রাণে উৎসাহ নাই, রোগ-যন্ত্রণায় দেহ শীর্ণ ও অবসন্ন! এমন অবস্থায় গৃহে ফিরিলাম। ৭ই চৈত্র জন্মদিন আসিল। প্রাতে প্রিয় পুত্র-কন্যাগণ রোগ-শয্যায় আমাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন, শয়ন করিয়াই প্রার্থনা করিলাম; "কি ব'লে করিব নিবেদন, আমার হৃদয় প্রাণ মন" ভক্তিসুধা এই সঙ্গীত করিলেন। সমস্ত দিনই নীরবে আত্ম-সমর্পণের ভাবে যাপিত হইল। সন্ধ্যাকালে সেই প্রাণারাম সন্তানের কষ্ট সহিতে না পারিয়াই যেন আমার তাপিত হৃদয়ে অমৃত-রস ঢালিয়া দিলেন; জীবন শান্তিময়, সংসার আনন্দময়, চারিদিক মধুময় বোধ হইতে লাগিল। প্রাণের মধ্যে এই ভগবদুক্তি উচ্চারিত হইল—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

সহস্র সহস্র বৎসরের এই পুরাতন গাথা আজ আমার নিকট সন্ত উচ্চারিত জীবন্ত বাক্য রূপে প্রকাশিত হইল। আমার সকল ভয় ভাবনা, দুঃখ যাতনা ও মনের গ্লানি চলিয়া গেল। এখন আর আমার কাহারও বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই; কোনও অনুযোগ অভিযোগ নাই। এখন আমি মাতৃ-ক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় তাঁহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া শেষদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি। আমি সকলের চরণে কাতর হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁহারা আমার চিরজীবনের সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া এই আশীর্বাদ করুন, আমি যেন নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় অন্তরে আমার দয়াময়ী জননীর অমৃত ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি। আমার চির প্রেমময়ী মায়ের কাছে আমি আর কি চাহিব? তিনি তো অনন্ত হস্তে করুণা বিতরণ করিতেছেন! আমি আর তাঁহাকে কি বলিব? এখন কেবল ব্যাকুল প্রাণে এই প্রার্থনা করিতেছি—

"জগতজননী, লহ লহ কোলে,
বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ।"

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

১

আমার জীবনের বিশেষ কথা

১। আমার এ ক্ষুদ্র জীবন ব্রহ্মকৃপার জীবন। ইহার আদি, মধ্য, অন্ত, ব্রহ্মকৃপায় গঠিত। আমি সাধন ভজন যোগ তপস্যার কিছুই জানি না। মাতৃকৃপায়, শিশু সন্তানের ন্যায় মার ক্রোড়ে বসিয়া, যখন যাহা প্রয়োজন সকলই পাইয়াছি। কত ঝড় তুফান এই মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কত অগ্নিপরীক্ষায় উদ্ধার পাইয়াছি; কিন্তু আমার ত কোন বলই ছিল না। এ জীবনে বলবুদ্ধি সহায়-সম্পদ সকলই ব্রহ্মকৃপা। এখন দিন দিন শরীর মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; কিন্তু মা এখন আমার জন্য মহাব্যস্ত; এখন আর এক মুহূর্ত্ত দূরে থাকিতে পারেন না।

২। যখন সকল ছাড়িয়া—স্বজাতি, স্বজন ও স্বধর্ম—সকল ছাড়িয়া, প্রভু পরমেশ্বরের নামে ভাসিয়াছিলাম, তখন তিনি এই ক্ষুদ্র সন্তানের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, "যে আমাকে সকল ভার দেয়, আমি চিরদিনই তাহার ভার বহন করি।" আজ এই সুদীর্ঘ জীবনের শেষ ভাগে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত স্বীকার করিতেছি, এই ক্ষুদ্র জীবনের সকল বিষয়েই প্রভু তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট সর্বদা বিশ্বস্ত থাকিতে পারি নাই; কিন্তু তিনি চিরদিন বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় এ দীনের সকল ভার বহন করিয়াছেন।

৩। বৈষয়িক জীবনেও আমি কোন অভাব দুঃখ প্রাপ্ত হই নাই। যখনই অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে তখনই অর্থ আসিয়াছে। কয়েকখানি স্কুল-পাঠ্য পুস্তকই আমার জীবিকার প্রধান উপায় ছিল; কোন কোন বার অনেক চেষ্টা করিয়াও একখানি গ্রন্থ পাঠ্য করাইতে পারি নাই; তখন মনে হইয়াছে, নিশ্চয়ই এবার আমার অপেক্ষা অন্যের প্রয়োজন গুরুতর ছিল। ইহাতেই আমার মনের শান্তি নষ্ট হয় নাই, অন্যের উন্নতিতে হিংসা বা অসন্তোষ জন্মে নাই। বস্তুত আমি চিরজীবন ইহাই দেখিয়াছি, যাহা

পাইয়াছি, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা এবং অকারণ অভাব বৃদ্ধি না করাই সুখ ও শান্তি লাভের মূল।

৪। প্রথম জীবনে কোন ভক্তিভাজন ধর্মাচার্যের মুখে শুনিয়াছিলাম, "যে ব্যক্তি তাঁহার আশ্রিত, তাহার আর অন্যত্র প্রাণের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিতে হয় না; তাহার সুখদুঃখের কথা গোপনে তাঁহাকে বলিয়াই সে কৃতার্থ হয়; আত্ম-সমর্থনের জন্য সে আর অন্য উপায় গ্রহণ করিতে পারে না।" চিরজীবন এই পথেই চলিতে চেষ্টা করিয়াছি। অনেক গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আত্ম-সমর্থনের জন্য একটি কথাও বলিতে পারি নাই। বলিতে গেলে আমার মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বন্ধুগণও তাহা সকল সময়ে বুঝিতে পারেন নাই। কেহ বলিয়াছেন, "তুমি একটি কথা বলিলেই ত সব মিটিয়া যায়।" কিন্তু আমি যে কেন বলিতে পারি নাই, অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও তাহা সর্বদা বুঝিতে পারেন নাই।

৫। পৃথিবীর অকৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্নতা দেখিয়া অনেকের হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়। এজন্য অনেক মহৎ ব্যক্তিরও মানবপ্রীতি হ্রাস হইয়া গিয়াছে; কঠোর সমালোচনায় বিরক্ত হইয়া অনেকে কর্তব্য কর্মে বিমুখ হইয়াছেন। কিন্তু আমি ত চিরজীবন ইহাই দেখিয়াছি যে, আমি অন্যের নিকট যত উপকার, যত শ্রদ্ধাভক্তি ও যত ভালবাসা পাইয়াছি, সমস্ত জীবনেও তাহার কিঞ্চিন্মাত্র পরিশোধ করিতে পারি নাই। সুতরাং অন্যে আমার জন্য কি করিল না করিল, তাহা ভাবিবার ও দেখিবার অবসর কোথায়?

৬। পিতামাতা ও বংশের গুণে আমার একটু তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দেবভক্তি ও স্বজন-প্রীতি লাভ হইয়াছিল; কিন্তু স্বভাবত আমার প্রকৃতি দুর্বল, অলস ও সুখপ্রিয়। লোকে আমাকে কর্মশীল বলিয়া প্রশংসা করে কিন্তু আমার চরিত্রে দৃঢ়তা ও সাধনে নিষ্ঠা কখনও ছিল না। এ ক্ষুদ্র জীবন দ্বারা যদি কিছু হইয়া থাকে, তাহা ব্রাহ্মধর্মের শক্তিতে এবং ব্রাহ্মদিগের পবিত্র সঙ্গগুণে। তাহা ভিন্ন আমার বলিয়া আমি কিছুই দেখিতে পাই না।

৭। কি ধর্মসাধন, কি সমাজসংস্কার, কি পরিবারগঠন, ইহার যে কোন কার্যে প্রচলিত পদ্ধতি বর্জন করিয়া আপনার বিশ্বাস ও আদর্শানুযায়ী কার্য করিতে গেলেই অনেক নিন্দা, দুঃখ, পরীক্ষা ও অপমান সহ্য করিতে হয়। এ সকল দুঃখ দেখিয়া ভয় পাইলে কার্য সফল হয় না। প্রভুর অপার কৃপায়

এ জীবনে ঐরূপ দুঃখ বহনের অনেক সুযোগ ঘটিয়াছে। নব ধর্ম গ্রহণ, জাতিভেদ বর্জন, পরিবারে বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি কার্যে অনেক নিন্দা অপমান, বন্ধু-বিচ্ছেদ ও মনঃপীড়া বহন করিতে হইয়াছে।

৮। গ্রন্থ পাঠ ও তত্ত্বালোচনা বা গুরূপদেশ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। উহাতে ব্রহ্মবিষয়ক প্রচলিত মত শিক্ষা হয়, বুদ্ধি যুক্তির চরিতার্থতা হয়। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্ম হইতে সাক্ষাৎ ভাবে জীবাত্মাতে অবতীর্ণ হয়; তখনই তাঁহার সঙ্গে সত্য পরিচয় হয়। যেমন লোকমুখে দারজিলিং প্রভৃতি স্থানের বর্ণনা শুনিলে মনে একটি চিত্র অঙ্কিত হয়, ঐ স্থান সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়; কিন্তু যখন নিজে যাইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়, তখন দেখা যায়, সে স্থান সম্পূর্ণ নূতন; মনে যে ছবি ছিল, এ তাহা নহে। শ্রুত ও অবতীর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানেও এইরূপ প্রভেদ। এই সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যই চিরজীবন প্রার্থনা করিয়াছি; শাস্ত্রজ্ঞান, যুক্তি-তর্ক বা বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করি নাই।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্

২

পিতৃদেবের আধ্যাত্মিক জীবনের একটি দিক

পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের আধ্যাত্মিক জীবনের একটি বিশেষ দিক পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উপস্থিত করা যাইতেছে।

তৎকালে সাধারণভাবে সকল ব্রাহ্মদিগের অন্তরে ধর্মসংস্কারের দিকে আপ্রাণ চেষ্টার সহিত ধর্মসাধনমূলে ভক্তিভাবের প্রাবল্যই লক্ষিত হইত। চন্দ মহাশয়ের জীবন-কথার মধ্যেও ইহার পরিচয় পাই। এই পুস্তকের ২৬০ পৃষ্ঠায় তাঁহার রচিত একটি সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন "প্রার্থনা সাধনমূলং ভক্তিহি পরমা গতি"। কিন্তু তাঁহার এই ভক্তি ভাব

প্রবণতামূলক অন্ধ ভক্তি ছিল না, যাহাকে বলা যায় Emotionalism। তাঁহার এই ভক্তি যে বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত তত্ত্বজ্ঞানমূলক ছিল তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন যাহা সাধারণ্যে অপরিজ্ঞাত থাকাই সম্ভব তাহা নিবেদন করাই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

মদীয় পিতৃদেবের (গোলোকচন্দ্র দাস) কথা তিনি তাঁহার পুস্তকের শেষাংশের অনেক স্থানেই উল্লেখ করিয়াছেন। পিতৃদেব তাঁহা অপেক্ষা ৮।১০ বৎসরের ছোট ছিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে পিতৃদেবের মৃত্যুর পর আমি ও আমার ভ্রাতা সরোজ নানা স্থান হইতে নানাজনের সহানুভূতিসূচক পত্র পাই। তন্মধ্যে শ্বশুর মহাশয়ের একটি অতি মূল্যবান পত্র ছিল। পিতার শ্রাদ্ধবাসরে পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী আচার্যের কার্য করেন। সভা আরম্ভের প্রাক্‌কালে তিনি পত্রগুলি চাহিয়া লইয়া পাঠ করিলেন। অনন্তর আচার্যের আসনে উপবিষ্ট হইয়া তিনি প্রথমেই উচ্চকণ্ঠে বলিলেন 'ভ্রাতৃদ্বয় নানা স্থান হইতে সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র পাইয়াছেন। আমি তাহার মধ্য হইতে ময়মনসিংহ হইতে পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের লিখিত পত্র হইতে কয়েকটি বাক্য পাঠ করিয়া অনুষ্ঠান আরম্ভ করিব। এই বলিয়া বাষ্প গদগদ কণ্ঠে উচ্চৈস্বরে পত্রটির শিরোভাগ হইতে পাঠ করিলেন "ওঁ তৎসৎ, ব্রহ্ম সত্য, জগত সত্য, আমিও সত্য"। এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করিয়াই উদ্বোধন সঙ্গীত আরম্ভ করিতে বলিলেন।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে শ্বশুর মহাশয়ের ভাব ভক্তির পশ্চাতে সৃষ্টিকর্তা ও তৎসৃষ্ট জগত ও জীব সম্পর্কে তাঁহার বিচারবুদ্ধিমূলক একটি তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তি বিদ্যমান ছিল। উহা স্বকপোলকল্পিত অসংস্কৃত ধারণা মাত্র ছিল না। ব্রহ্ম, জীব ও জগত সম্বন্ধে এই প্রকার স্পষ্ট উক্তির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় মহাভারতের একটি শ্লোকে। তাহার পর দেখিতে পাই শঙ্করের নামে প্রচলিত মায়াবাদের মত। আবার পরবর্তীকালে আসিল বৈষ্ণব দার্শনিকগণ প্রচারিত মত ব্রহ্ম, জীব ও জগত সমান সত্য। বৈষ্ণব দার্শনিক বলদেব বলিয়াছেন ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, তিনি অসত্য (unreal) কিছু সৃষ্টি করিতে পারেন না বা করেন নাই। চন্দ মহাশয় কি অর্থে জীব ও জগতকে ব্রহ্মের সহিত একত্রে সত্য বলিয়াছিলেন তাহা এখন জানিবার উপায় নাই বা এস্থলে তাহা বিচারের প্রয়োজন নাই। স্পষ্টই দেখা

যাইতেছে শোকার্তজনকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে অন্য কোনো বাক্য ব্যবহারের পূর্বে যে তত্ত্বজ্ঞান মূলক চিন্তাধারা তদীয় অন্তরের পুরোভাগে জাগিতেছিল তাহারই অবতারণা করিয়া স্বীয় মনোভাবের প্রধান কথা প্রকাশ করিলেন। এই জন্য বলা হইয়াছে তাঁহার ভাব ভক্তি অন্ধ ভক্তি বা শূণ্যগর্ভ আবেগ মাত্র ছিল না।

[বর্তমান লেখকের অনুরোধে তাঁহার এই বিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের পরিচায়ক বাক্যগুলি তদীয় পৌত্রগণ কর্তৃক চিত্রশিল্পী সাহায্যে তাঁহার প্রতিকৃতির নিম্নে সংযোজিত হইয়াছে, এই প্রতিকৃতি শিবনাথ মেমোরিয়াল হলে রক্ষিত আছে]

প্রফুল্লকুমার দাস

৩

পিতৃদেবের ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসরের জীবনের সঙ্গে মায়ের জীবন জড়িত; মায়ের ঐকান্তিক সহযোগিতাই পিতার জীবনের যা কিছু সাফল্য এনে দিয়েছিল। সেই কারণে মায়ের জীবন কথা এখানে সামান্য কিছু লিপিবদ্ধ করা হইল।

মাতৃদেবী

বহুদিন আগেকার কথা। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙলা দেশের কোন এক অখ্যাত গ্রামে বাস করছিলেন আমাদের মা। মায়ের তখন অল্প বয়স, লেখাপড়া শেখেন নাই, ভবিষ্যত অন্ধকার, দুঃখের জীবন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমাদের বড় মামা, বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন ময়মনসিংহ সহরে। কখন দেশে গেলে বোনটিকে কিছু কিছু লেখাপড়া শেখান, একেশ্বরবাদের কথা, ব্রাহ্মসমাজের কথা বলেন। মায়ের অবচেতন মনে ভগবানের ডাক শুনেছিলেন কিনা জানা নেই, কিন্তু এই ভাবে মায়ের মনে সাহসের সঞ্চার হয় এবং ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে একদিন গভীর রাত্রিতে আত্মীয় স্বজন সকলের অজ্ঞাতে বড় মামার হাত ধরে বেরিয়ে এলেন মা ঘর থেকে, আর অসীম সাহস ও মনোবল নিয়ে মামা তাঁকে নিয়ে এলেন ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে। ঐ সময় কত ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে তাঁদের মাথার ওপর

দিয়ে, খাওয়া থাকা, পরিধান কোন কিছুর সংস্থান ছিল না—হয়ত বা কোন দিব্যজ্যোতি তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিল। কিছুদিনের পর মামা নৌকা পথে ঢাকা রওনা হলেন। সঙ্গে ছিলেন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম প্রচারক বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়। পথে এক জায়গায় নৌকা বাঁধা হল, মামা নেমে গেলেন বাজার করতে। সেই সময়ে সেই অসহায় অবস্থায় অতি সরল মনে মা প্রচারক মহাশয়কে জিজ্ঞেস করলেন "দাদা, আমরা যে চলে এলাম এতে কি আমাদের ভাল হবে?" শ্রদ্ধেয় বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় সস্নেহে মাকে উপদেশ দিলেন; বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছার ওপর একান্ত নির্ভর করে জীবন পথে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। মায়ের মন আশ্বস্ত হল। বড় মামার বিশেষ চেষ্টা ও আগ্রহের ফলেই আমাদের মা ব্রাহ্মসমাজে স্থান পেয়েছিলেন। নানা বাধা বিঘ্ন, সুবিধা অসুবিধার ভিতর দিয়ে মায়ের দিনগুলো কাটছিল; কিন্তু তবুও সুযোগ করে সাধারণ বাঙ্গলা লেখাপড়া মা শিখে নিয়েছিলেন। ক্রমে বড় মামা ও তৎকালীন ঢাকা ও ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সকল শুভানুধ্যায়ী সজ্জন ব্যক্তিদিগের আশীর্বাদ মস্তকে নিয়ে মা সংসারে প্রবেশ করলেন ও বাবার সঙ্গ পেয়ে ধর্মজীবন যাপনের মহৎ সুযোগ লাভ করলেন। মায়ের মুখে শুনেছিলাম "একটি ঘটি ও একটি কড়া সম্বল করে আমার সংসার যাত্রা সুরু হয়।" মায়ের কিন্তু অভিযোগ কিছু ছিল না, অসাধারণ পরিশ্রম করতে হত তাঁকে। ক্রমে পরিবার বড় হতে থাকে, বাবার কর্মক্ষেত্রও বিস্তার লাভ করে। সংসারের শ্রীবৃদ্ধি, সমাজসেবা দেশসেবা ইত্যাদিতে বাবাকে খুবই কর্মব্যস্ত থাকতে হত। মা কিন্তু অক্লান্ত খেটে যথাসম্ভব বাবার সহযোগিতা করতেন। আত্মীয় স্বজন কেউ গৃহে এলে তাদের অভাব অভিযোগ পূর্ণ করা, সাধ্যমত তাদের সেবা করা, কোন কিছুরই ত্রুটী হত না। আমাদের গৃহে সর্বদাই ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণের আগমন হ'ত। স্বর্গীয় নবদ্বীপচন্দ্র দাস, গুরুদাস চক্রবর্তী, কাশীচন্দ্র ঘোষাল, অমৃতলাল গুপ্ত প্রমুখ প্রচারকগণের আগমনে আমাদের গৃহ উৎসব মুখরিত হয়ে উঠত। মা যে কত খুশী হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের সেবা করতেন তাই ভাবি। সেই সময়ে বাড়ীর উপাসনা মন্দিরে বিশেষ উপাসনাদির ব্যবস্থা হত, মা সংসারের সকল কাজ সেরে সেই সব অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মপল্লীর ব্রাহ্মিকাদের একটি সাপ্তাহিক মিলনক্ষেত্র ছিল, যার

নাম ছিল 'ভগিনী সমিতি'। প্রতি সপ্তাহে তাঁরা মিলিত হতেন পল্লীর কোন গৃহে। সেখানে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা, আলোচনা ও প্রার্থনা হ'ত। সহরের কোন কোন মহিলাদেরও আকৃষ্ট করবার চেষ্টা হত। এই সব কাজে মায়ের খুবই উৎসাহ ছিল। নিজের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সন্ধ্যার সময় প্রদীপ জেলে মা আমাদের পড়তে বসাতেন। কথাবার্তা, আচার ব্যবহারে সংযম, বিনয়, ভদ্রতা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ নজর দিতেন মা। পিতৃদেবের সঙ্গে প্রতিদিন নিয়মিত উপাসনাতে যোগ দিতেন। শেষ জীবন পর্যন্ত মায়ের বিছানার পাশে তত্ত্বকৌমুদী, ধর্মতত্ত্ব, ব্রাহ্মধর্মের ব্যখ্যান, বাবার লেখা ভক্তিলীলা ইত্যাদি বইগুলি রাখা থাকত।

১৯৩১ সনে মহাত্মা গান্ধীর 'লবন আইন ভঙ্গ' আন্দোলনে যোগ দিবার উদ্দেশ্যে আমার ভগ্নী লাবণ্য কুমিল্লা সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার কাজে ইস্তফা দিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত জিনিষ পত্র ময়মনসিংহস্থ আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে সুদূর সবরমতি আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। মা দেখলেন তাঁর মেয়ে এলো না, শুধুই জিনিষপত্র-গুলো এলো; সেই সময় তাঁর মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। মা সেই জিনিষগুলোর পাশে বসে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। তখন থেকে মায়ের নিয়ত প্রার্থনা ছিল, ভগবান ননীকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করুন, ওর মন থেকে আমাদের জন্য সকল ভাবনা চিন্তা দূর হয়ে যাক, ওর প্রাণ শান্ত হোক, বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। লাবণ্যের কাপড় চোপড়গুলো কিছু দিনের পর মা দুঃস্থ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে-ছিলেন একখানিও ঘরে রাখেন নাই। লাবণ্য অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার পর থেকে মা বাঙ্গলা খবরের কাগজ পড়তেন, যদি ঘটনাক্রমে মেয়ের খবর কিছু পাওয়া যায়।

বাবা চলে যাবার পর (১৯৩৮ জুলাই) নানা অসহায় অবস্থার ভিতর দিয়ে মায়ের দুইটি বৎসর কাটে। ঐ সময় একবার মা আমার বোন লাবণ্যের সঙ্গে ছিলেন কলকাতা বিবেকানন্দ রোডের এক ভাড়া বাড়ীতে। লাবণ্যের সহকর্মী মেয়েরা অতি যত্নের সঙ্গে মায়ের দেখা শোনা ও সেবা করতেন। ওদের একটি কর্মী মহিলার সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়েছিল। তিনি

আমার মায়ের কথা অনেক বলেছিলেন আমাকে। "আপনার মায়ের মত এমন ঠাণ্ডা মিষ্টি স্বভাবের বৃদ্ধা মহিলা আমি কোথাও আর দেখি নাই। এমন মায়ের মেয়ে হওয়াও কত সৌভাগ্যের কথা।" মহিলাটির এই কথাগুলো আমার মনকে সর্বদাই আলোড়িত করে।

ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম পল্লীর প্রতিটি গৃহেই মায়ের যাতায়াত ছিল। মা ছিলেন সকলের আজীবনের বন্ধু। যখনই যে বাড়ীতে কোন অসুবিধা হ'ত মা ছুটে যেতেন তাদের সাহায্য করতে। মা ছিলেন অল্পভাষী, সেবা পরায়ণা। ৺শরৎ চন্দ্র রায় মহাশয় অসুস্থ হয়ে আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন, মা শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সেবা করে গেছেন। বাবা বলতেন 'সংসারে যা কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছি তার মূলে ছিল তোমার মায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম আর পূর্ণ সহযোগিতা"।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ২রা আশ্বিন মা আমাদের মায়া ছেড়ে দিব্যধামে চলে গেলেন আর আমাদের জন্য রেখে গেলেন আজীবনের বিরহ ব্যথা।

ভক্তিলতা চন্দ

৪

ধ্রুবানন্দ চন্দ লিখিত পত্রাংশ —

মহৎ জীবনের বৈশিষ্ঠ, স্থান এবং কাল তাঁদের চিন্তা ভাবনা সীমিত করে না। তাই তাঁদের জীবনের আলো কোন কালে কোন যুগে ম্লান হয়ে যায় না। ধর্মসমাজের উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে তাঁরা বিশ্বের মানুষকে ডাক দিয়েছিলেন।

"নব ভক্তি নব আশা, নব যুগে নব ভাষা,
নব ধর্ম নব রাজ্য নূতন জীবন-রে,
প্রেমে ধরা হবে একাকার"।

মানুষ যখন সকল সঙ্কীর্ণতার উর্ধে উঠতে পারে তখনই সে বলতে পারে—

কত নাম, কত রূপ, বিচিত্র আকার,
সাগর সঙ্গমে দেখি, সব একাকার

সত্যসন্ধানীর জীবনে যে বাণী মূর্ত হয়ে ওঠে তার অর্থ, তাৎপর্য, কোন একটি যুগেই নিঃশেষ হয় না—They are valid in all ages.

মহৎ জীবনের মূল্যায়ন নতুন যুগে নতুন দৃষ্টি দিয়ে করলে তবেই আজকের মানুষ পাবে সান্ত্বনা, প্রেরণা।

এই অবধি যেন কিছু বুঝতে পারলাম। দাদার জীবনের বিশ্বাসের বলিষ্ঠতা, জীবনের দুর্গম পথে নির্ভয় পদক্ষেপ, নিত্যসঙ্গী ঈশ্বরে নির্ভরতা ক্ষণিকের জন্যও যেন আমার উপলব্ধিতে ধরা দিয়ে যায়। কিন্তু সেটা আমি প্রকাশ কোরব কি করে? সে সাধনা আমার নেই।

আমার ঠাকুরদাদা সাধন ভজন জানতেন না—'একান্ত ভালবাসা'ই ছিল তাঁর ভরসা।

সংগ্রামময় কর্মজীবনের শেষে ক্লান্ত সন্ধ্যায় পূর্ণ মিলনের ক্ষণটি এসে উপস্থিত; অনন্তের আহ্বান স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হোল—

"সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য—মামেকং শরণং ব্রজ"

এ আমি বোঝাব কেমন করে? It is good to be born in a church 'but it is dangerous to die in a church.'

রবীন্দ্রনাথও এমনি কথাই ব'লে গেছেন—

"তোমার এ ভবে মম কর্ম যবে
সমাপন হবে হে,
ওগো রাজ রাজ, একাকী নীরবে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।"

হিমু